ব্রিস্টলে কর্নেল ব্রেরেটন-এর বিচার সভায় রামমোহন

রামমোহন-স্মরণ

সম্পাদকমণ্ডলী

পুলিনবিহারী সেন, সোমেন্দ্রনাথ বসু
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, দিলীপকুমার বিশ্বাস

প্রকাশন-সমিতি
করুণাকেতন সেন, এস. এ. মাসুদ,
কমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
তাপসকুমার দত্ত, কিরণচন্দ্র সেনগুপ্ত,
জগদিন্দ্র ভৌমিক ও আশিসকুমার পাইন (আহ্বায়ক)

বিষয়সূচী

প রি শি ষ্ট

চিত্রসূচী

চিত্রপরিচয়

১। জন গিবসন-কৃত মূর্তিটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত। ইহার একটি আলোকচিত্র পূর্বে প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪৩, কার্তিক সংখ্যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল। পত্রিকায় চিত্রটি বিষয়ে উল্লেখ ছিল :

"গত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কলিকাতার প্রধান নাগরিক দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার শেষ ইংলণ্ড প্রবাসকালে তাঁহার নেতা ও বন্ধু রামমোহন রায়ের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি তখনকার প্রসিদ্ধ ভাস্কর জন গিবসনের দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠাইয়া দেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহা নিজের বেলগাছিয়া উদ্যানে স্থাপিত করিবেন এই ইচ্ছা জানান। কিন্তু ইংলণ্ডেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ও ঋণ লইয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, এবং মূর্ত্তিটির বিষয় কাহারও বড় মনে ছিল না। পরে ইহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পৌত্র ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ গৃহে রক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করা হইবে, তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর [১৯৩৬] তাঁহার পরিবারবর্গ ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ২১১ সংখ্যক ভবনে শিবনাথ স্মৃতিমন্দিরে স্থাপিত হইয়াছে। আমরা ইহার একটি ফটোগ্রাফ প্রকাশিত করিলাম।"

৩। চিত্রটি নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলী-রচিত Raja Rammohun Roy (1934) গ্রন্থভুক্ত আছে। এ-সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে (পৃ ২১৭) উল্লেখ আছে :

"The picture of the Trial of Colonel Brereton, by Miss Rolinda Sharpless, which is preserved in the Bristol Art Gallery and here reproduced shows Ram Mohun as a visitor at the last session, in the Merchants' Hall, Bristol. Among local notabilities, mentioned in the note on the picture, are 'Miss Castle and her brother, Mr. Hare, the under-sheriff, and C. B. Hare Raja Rammohun Roy is seated between two chairs in the left-hand corner; to his right is Mrs. Rowlands, to his left is the Duchess of Roxburghe with her son, and just behind is standing Mr Castle, the brother of Miss Castle'.

Colonel Brereton was tried by court martial for his negligence in handling the troops at his disposal during the Bristol riots in 1831. The prosecution began on the 9th January, 1832, but after four sittings was suddenly brought to a close by the suicide of the defendant."

রামমোহন-স্মরণ

ভারতপথিক রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইতিহাসে দেখি অনেক বড়ো বড়ো প্রাচীন সভ্যতা দেশের নদীর সঙ্গে নাড়ীর যোগে প্রাণবান। নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফল; কিন্তু সব চেয়ে বড়ো তার দান— দেশকে সে দেয় গতি। দূরের সঙ্গে বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ শাখান্বিত করে নদী, স্থাবরের মর্মের মধ্যে নিয়ে আসে প্রাণের চলৎপ্রবাহ।

নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তা হলে তার মাটিতে ঘটে কৃপণতা, তার অন্ন-উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদি-বা কোনোমতে চলে, কিন্তু যে অন্নপ্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। সে না পারে দিতে, না পারে নিতে। নিজের মধ্যে সে রুদ্ধ হয়ে থাকে, বিভক্ত হয় তার ঐক্যধারা, তার আত্মীয়-মিলনের পথ হয় দুর্গম। বাহিরের সঙ্গে সে হয় পৃথক, অন্তরের মধ্যে সে হয় খণ্ডিত।

যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদী-মাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়— যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মনন-ধারা। সে বলতে পেরেছিল 'আযন্তু সর্বতঃ স্বাহা', সকলে আসুক সকল দিক থেকে। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে', শুনুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্', আমি জানি— এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার। যে তারা জ্যোতির্হীন তাকে নিখিল নক্ষত্রলোক স্বীকার করে না। প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে; বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে, আপনাকে দান করবার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিঞ্চনরূপে অকিঞ্চিৎকর।

শত শত বৎসর চলে গেল— ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ,

ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর-দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবরুদ্ধ, নির্জীব হল নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রস্ত করলে; খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।

ঘুমের অবস্থায় মনের জানালা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী। তখন যে-সব স্বপ্ন নিয়ে সে খেলা করে বিশ্বসত্যের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, কেবলমাত্র সেই সুপ্ত মনের নিজের উপরেই তাদের প্রভাব এক কেন্দ্রে আবর্তিত, তা তারা যতই অদ্ভুত হোক, অসংগত হোক, উৎকট হোক। বাহিরের বাস্তবরাজ্য থেকে এই স্বপ্নরাজ্যে আর কারো প্রবেশের পথ নেই। এ'কে বিদ্রূপ করা যায়, কিন্তু বিচার করা যায় না, কেননা এ থাকে যুক্তির বাহিরে।

তেমনি ছিল অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত ভারতবর্ষ; তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্যপরিচয় ছিল আচ্ছন্ন। এমন সময় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল এই দেশে, সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। সেদিন তার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত। ভারত আপন বাণী তখন হারিয়েছে, নিখিল পৃথিবীর এই নতুন কালের জন্যে তার কোনো বার্তা নেই, ঘরের কোণে বসে সে মৃত যুগের মন্ত্র জপ করছে।

যখন সে আপন দুর্বলতায় অভিভূত, সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে; আপন সম্মান রক্ষা ক'রে তাকে অভ্যর্থনা করবে এমন আয়োজন ছিল না: অতিথিরূপে তাকে গৃহস্বামী ডাকতে পারে নি, দ্বার ভেঙে দস্যুরূপে সে প্রবেশ করলে তার স্বর্ণভাণ্ডারে।

ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়— বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া

ভেঙে বেরোল, চারি দিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয়, যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থ।

এই বেড়া ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্‌ঘাটিত করা। এইজন্যেই এ সাধনা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের. যেহেতু এর বিরুদ্ধতাই ভারতে এত প্রভূত, এত প্রবল। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র দ্বীপের সীমায় বদ্ধ, সেইজন্যেই তার সাধনা গেছে দ্বৈপায়নতার বিপরীত দিকে, বিশ্বে সে আপনাকে সুদূরে বিস্তার করেছে। দেশের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই দেশের অঞ্জলি পাতা রয়েছে, সেই অঞ্জলির অর্থই এই যে, তার শূন্যতাকে পূর্ণ করতে হবে।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্যা; সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্‌ভাবনী শক্তি বললাভ করে। মানুষকে তার মনুষ্যত্ব প্রতিক্ষণে জয় করে নিতে হয়। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আপন জয়যাত্রার ইতিহাস। কঠিন বাধা দূর করবার পথেই তার স্বাস্থ্য, তার সম্পদ। এইজন্যেই বলেছে, বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা। দুর্গমকে সুগম করতে এসেছে মানুষ, দুর্লভকে উপলব্ধ। বিশেষ জাতিকে যে বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন বিধাতা, তার সত্য উত্তর দিতে থাকার মধ্যেই তার পরিত্রাণ। যারা সমাধান করতে ভুল করেছে তারা মরেছে। আর দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে তারাই যারা মনে করেছে তাদের সমাধান করবার কিছুই নেই, সমস্ত সমাধা হয়ে গেছে। যতক্ষণ মানুষের প্রাণ আছে ততক্ষণই তার সমস্যা, অবিরত সমস্যার উত্তর দিতে থাকাই প্রাণক্রিয়া। চারিদিকে জড়ের জটিল বাধা নিত্যই, সেই বাধা নিত্যই ভেদ করার দ্বারা প্রাণ আপনাকে সপ্রমাণ করে। ইতিহাসে যে জটা পাকিয়ে থাকে সেই গ্রন্থিকেই সনাতন ব'লে ভক্তি করলে সেটা মরণের ফাঁস হয়ে ওঠে।

মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়। যেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়।— মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধ'রে দেশকে চারি দিক থেকে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা সুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটে নি। যারা একত্র হয়েছে

তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রথম মন্ত্র হচ্ছে 'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'— এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক ব'লে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ, এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।

অন্য কোনো দেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যখন আমরা মুগ্ধ হই তখন অনেক সময়ে আমরা তার সিদ্ধির পরিণত রূপটার দিকেই লুব্ধদৃষ্টিপাত করি, তার সাধনার দুর্গম পথটা আমাদের চোখে পড়ে না। দেখতে পাওয়া গেল স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, মনে করি ঐ ব্যবস্থার একটি অনুরূপ প্রতিমা খাড়া করতে পারলেই আমাদের উদ্ধার। ভুলে যাই রাষ্ট্রব্যবস্থাটা দেহমাত্র— সেই দেহ নিরর্থক, যদি তার প্রাণ না থাকে। সেই প্রাণই জাতিগত ঐক্য। অন্য দেশে সেই ঐক্যেরই আন্তরিক শক্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে-সব দেশেও সেই ঐক্যে যেখানে যে পরিমাণ বিকার ঘটে সেখানে সেই পরিমাণেই সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য, পশ্চিম-মহাদেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। সেই শ্রেণীগত পার্থক্যের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য যদি না ঘটে তা হলে বাহ্য ব্যবস্থায় বিপদ-নিবারণ হবে না।

আমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই প্রচুর ফসল, তা হলে গোড়াতেই এ কথা মনে রাখতে হবে— এ ফসল বালিতে উৎপন্ন হয় নি, হয়েছে মাটিতে। মরুভূমিতে দেখা যায় উদ্ভিদ দূরে দূরে বিশ্লিষ্ট, তারা কাঁটার দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে রক্ষা করেছে। তাদের জননী ধরণী এক রসের দাক্ষিণ্যে সকলকে পরিপোষণ করে নি, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের ঐক্যে কার্পণ্য। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মাটির কণায় কণায় বন্ধন আছে, বালির কণায় কণায় বিচ্ছেদ। আমরা যখন সমৃদ্ধিবান জাতির ইতিহাস চর্চা করি তখন ভরা ফসলের দিকে চোখ পড়ে, এবং কৃষিপ্রণালীর বিবরণও যত্ন করে মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে থাকি; কেবল একটা কথা মনে রাখি নে, এই ফসলের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ অসম্ভব, যদি তার ভূমিকাতেই থাকে বিচ্ছিন্নতা। কৃষির যত্নকেও আমরা দাবি করি, ফসলেরও প্রত্যাশা করে থাকি, কিন্তু আমাদের ভূমির প্রকৃতিতেই যে বিচ্ছেদ তাকে চোখ বুজে আমরা নগণ্য বলেই জ্ঞান করি এবং ধর্মের নামে তাকে নিত্যরূপে রক্ষা করবার চেষ্টায় সতর্ক হয়ে থাকি। আমরা ইতিহাসের

উপরকার মলাটটা পড়ি, ভিতরকার পাতাগুলো বাদ দিয়ে যাই, ভুলে যাই কোনো দেশেই সমাজগত বিশ্লিষ্টতার উপর রাষ্ট্রজাতিগত স্বাতন্ত্র্য আজ পর্যন্ত সংঘটিত ও সংরক্ষিত হয় নি। প্রজারা যেখানে বিভক্ত সেখানে ব্যক্তি-বিশেষের একাধিপত্য তাদের বাইরের বন্ধনে বেঁধে রাখে। তাও বেশি দিন টেঁকে না, কেবলই হাতবদল হতে থাকে। যেখানে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ সেখানে কেবল রাষ্ট্রশক্তি নয়, বুদ্ধিবৃত্তিও শিথিল হয়ে যায়। সেখানে মাঝে মাঝে প্রতিভাশালীর অভ্যুদয় হয় না তা নয়, কিন্তু সেই প্রতিভার দান ধারণ ও পোষণ করবার উপযুক্ত আধার সর্বসাধারণের মধ্যে না থাকাতে কেবলই তা বিকৃত ও বিলুপ্ত হতে থাকে। ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মানুষের সত্যধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।

ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয় নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে, 'বিদ্বান্ ইতি সর্বান্তরস্থঃ স্বসংবিদ্রূপবিদ্ বিদ্বান্'— নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ ক'রে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্। অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহীন বিধিবিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয় পৃথিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই। সুতরাং এ কথা বলতে হবে ভারতবর্ষে এমন একটা বাহ্যস্থূলতা রয়ে গেছে, যা ভারতবর্ষের অন্তরতর সত্যের বিরুদ্ধ, যার মর্মান্তিক আঘাত দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে।

এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদের অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুষের অতন্দ্রিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিনন্দন-গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের ঊর্ধ্ব আকাশে। তাঁরা সেই মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ যাকে সম্বোধন করে বলেছেন 'ব্রাত্যস্তং প্রাণ'— হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও। সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক ব'লে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদূ। তিনি বলেন—

অংশ। আর-এক দিকে তার আলোক, তার নিহিতার্থ, তার চিরসত্য; এই দিকটাই ভাবার্থক, প্রকাশাত্মক। এই দিকে তার পরিচয় যদি ম্লান না হয়, নিঃশেষিত না হয়, তবেই সর্বকালে সে গৌরবান্বিত।

য়ুরোপের সকল দেশেই একদিন ডাইনীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করত। শত শত স্ত্রীলোক সেখানে নিরপরাধে পুড়ে মরেছে। কিন্তু এই অন্ধতার দিকটাই আন্তরিকভাবে য়ুরোপের একান্ত ছিল না। তাই লোকগণনায় এই বিশ্বাসের প্রসার পরিমাপ ক'রে এর দ্বারা য়ুরোপকে চিনতে গেলে অবিচার হবে। একদিন য়ুরোপের ধর্মমূঢ় বুদ্ধি জিয়োর্ডানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল, কিন্তু সেদিন চিতায় জ্বলতে জ্বলতে একলা জিয়োর্ডানো দিয়েছিলেন য়ুরোপীয় চিত্তের পরিচয়, যে চিত্তকে সে যুগের সাম্প্রদায়িক জড়বুদ্ধি দলবেঁধে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু যাকে আজ সর্বমানব সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। একদিন ইংরেজের সাহিত্যে তার ইতিহাসে, ইংরেজের পরিচয় আমরা পেয়েছিলুম, দেখেছিলুম মানুষের প্রতি তার মৈত্রী, দাসপ্রথার 'পরে তার ঘৃণা, পরাধীনের মুক্তির জন্যে তার অনুকম্পা, ন্যায়বিচারের প্রতি তার নিষ্ঠা। আজ যদি ভারতের রাষ্ট্রাসন জুড়ে তার এই স্বভাবের নিষ্ঠুর প্রতিবাদ অজস্র দেখতে পাই, তবু তার থেকে ইংরেজের চরম পরিচয় গ্রহণ করা সত্য হবে না। যে কারণেই হোক তার অভাবার্থক দিকটা প্রবল হয়ে উঠেছে, এ-সমস্ত তারই দুর্লক্ষণ। আজও ইংলণ্ডে এমন মানুষ আছে ইংরেজ-স্বভাবের বিরুদ্ধগামী সমস্ত অন্যায় যাদের হৃদয়কে পীড়িত করছে। বস্তুত সব ইংরেজই যে ইংরেজ এ কথাটা মনে করাই ভুল। খাঁটি ইংরেজের সংখ্যা স্বল্প যদি-বা হয়, আর নিজের সমাজে তারা যদি-বা লাঞ্ছনা ভোগ করে, তবুও তারা সমস্ত ইংরেজেরই প্রতিনিধি।

তেমনি একদা যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন। তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বতঃপ্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলাদেশের অখ্যাত কোণে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিল। এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলবার দিন এসেছে যে, যে আতিথ্যভ্রষ্ট আসন কৃপণঘরের রুদ্ধ কোণের জন্যে সে আসন নয়, যে আসনে সর্বজন অবাধে স্থান পেতে পারে সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষের স্বরচিত; লক্ষ লক্ষ আচারবাদী তাকে যদি সংকুচিত

1. What characteristic do you admire most in a man? ... *Love of truth*
2. What characteristic do you admire most in a woman? *Love of creature*
3. What, do you consider, is your best quality? *Inconsistency.*
4. What, do you consider, is your greatest failing? *The same.*
5. What is your favourite pastime? *Doing nothing.*
6. What gives you most [illegible]? *Spiritual arrogance.*
7. What foreign land [illegible] *All parts of [illegible]*
8. Whom do you consider has the greater brain power—man or woman? *I decline to answer.*
9. Do you think women should take part in public life? *Certainly – but their part is distinct*
10. Do you consider dress influences character? *Yes, when we are conscious of it.*
11. Describe the "girl of the period." *She is like the girl of the other period when truly known*
12. Describe the "young man of the day" *He has lost his youth*
13. What is your favourite motto? *Can't stick to one favourite, so I have no motto*
14. Which is your favourite flower, and what is its meaning? *Have too many favourites to specify one and I love them because they have no meaning.*

15. Whom do you consider is the best Sovereign in Europe? *The people*
16. Whom do you consider is the greatest living Politician of Great Britain? *His name is not known.*
17. Whom do you consider is the greatest Artist of the present age?
18. Whom do you consider is the greatest Musician of the present age?
19. Whom do you consider is the greatest Orator of the present age?
20. Whom do you consider is the greatest Author of the present age?
21. Whom do you consider is the greatest Poet of the present age?

Nature hates superlatives. We can be sure of the great but not of the greatest.

22. Name two poems that have given you much pleasure.
23. Name the two books of fiction, that have given you most profit *I don't read books of fiction for profit.*
24. Name your hero or heroine in life *Rammohan Roy.*
25. Name your hero or heroine in fiction.
26. Name the composer whose music you most enjoy

Your Autograph *Rabindranath Tagore*

অটোগ্রাফের খাতায় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

করে, খণ্ড খণ্ড করে, সমস্ত পৃথিবীর কাছে স্বদেশকে ধিক্কৃত ক'রে ভারত-সভ্যতার প্রতিবাদ করে, তবু বলব এ কথা সত্য। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল— তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃস্টানকে ভারতের সর্বজনকে, হিন্দুর এক পঙ্ক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

> যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
> সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।
> যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে
> দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না।

তাঁর মৃত্যুর পরে আজ এক শত বৎসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই— তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়। বায়ুপোতে অত্যূর্ধ্ব আকাশে যখন ওঠা যায় তখন দৃষ্টিচক্র যতদূর প্রসারিত হয়, তার এক দিকে থাকে যে দেশকে বহুদূরে অতিক্রম করে এসেছি, আর একদিক থাকে সম্মুখে যা এখনো আছে বহুযোজন দূরে। রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল তেমনি অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

আজ আমার অধিক বলবার শক্তি নেই, কেবল এই কথা মাত্র বলতে এসেছি যে, যদিও অজ্ঞানের অশক্তির জগদ্দল পাথর ভারতের বুকে চেপে আছে, লজ্জায় আমরা সংকুচিত, দুঃখে আমাদের দেহমন জীর্ণ, অপমানে আমাদের মাথা অবনত, বিদেশের পথিক আমাদের কলঙ্ক কুড়িয়ে নিয়ে দেশে দেশে নিন্দাপণ্যের ব্যাবসা চালাচ্ছে, তবু আমাদের সকল দুর্গতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এ দেশে জন্মেছেন, তাঁর মধ্যে ভারতের

পরিচয়। তাঁকে দেশের বহুজনে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন বলে স্বীকার না করে, তবুও চিরকালের ভারতবর্ষ তাঁকে গভীর অন্তরে নিশ্চিত স্বীকার করেছে। বর্তমান যুগ-রচনায় আজও তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশালী, আজও তাঁর নীরব কণ্ঠ ভারতের অমর বাণীতে আহ্বান করছে তাঁকে—

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।

প্রার্থনা করছে—

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

১৪ পৌষ ১৩৪০। রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিকীতে সভাপতির অভিভাষণ

রামমোহন রায়

শিবনাথ শাস্ত্রী

একটি তুঙ্গশৃঙ্গ গিরি যে জল বৃষ্টি ঝটিকা সহিয়া যুগ যুগ দণ্ডায়মান থাকে, তাহা কি শূন্যকে আশ্রয় করিয়া? কখনোই নহে। তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং যে-সকল আভ্যন্তরীণ ধাতুপুঞ্জের সংঘাত দ্বারা তাহার দেহ গঠিত সে-সকল ধাতুপুঞ্জও ঘননিবিষ্ট— এইজন্য। তদ্‌ভিন্ন গিরি কখনোই দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না।

ও গিরি যে দাঁড়াইয়া আছে তাহা নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া। নিরন্তর বর্ষার জলধারা তাহার অঙ্গসন্ধিকে শিথিল করিতেছে, তাহার দৈহিক ধাতুসকলকে ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছে, বহুল শিলাখণ্ড অশনি-নিনাদে শৃঙ্গ হইতে পাদদেশে পাতিত করিতেছে, চক্ষের নিমেষে তরুলতা শ্রীসৌন্দর্য সকলই হরণ করিয়া লইতেছে; আবার কখনো বা ভীষণ ভূকম্পে ঐ গিরিদেহ বিদারিত হইয়া জ্বালামুখী প্রকাশ পাইতেছে, শত শত বনপ্রদেশ ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া নেত্রের অগোচর হইয়া যাইতেছে; কোথাও বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অবিশ্রান্ত জ্বলিয়া সুদূর-প্রসারী অরণ্যানী-সকলকে ভস্মীভূত করিতেছে। গিরির জীবন কী সংগ্রামের জীবন! কিন্তু এই সংগ্রামের মধ্যেও গিরি দণ্ডায়মান আছে, শীতাতপ সহিয়া বিধাতার কাজ করিতেছে— গিরির ভিত্তি দৃঢ়, গিরির দেহের বন্ধন দৃঢ় বলিয়া।

এ জগতে একজন মহামনা ব্যক্তিকে আমার এই গিরির সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। কোন্ গিরি এমন আছে যাহার শীতাতপের সঙ্গে সংগ্রাম নাই? তেমনি কোন্ মহৎ চরিত্র এমন আছে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার সহিত যাহার সংঘর্ষণ নাই? আবার কোন্ গিরি এমন আছে যে, নিজের আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার গুণে দণ্ডায়মান নয়? তেমনি কোন্ মহৎ চরিত্রই বা এমন আছে যাহা আভ্যন্তরীণ উপাদান-সকলের গুণেই মহৎ নয়?

এ জগতে যিনি উঠেন তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মিয়া, সাধারণের মধ্যেই বাড়িয়া, সাধারণের উপরে মস্তক তুলিয়া দাঁড়ান। তিনি আভ্যন্তরীণ মালমশলার সাহায্যেই বড়ো হইয়া থাকেন। কুষ্মাণ্ড যেমন যষ্টির সাহায্যে মাচার উপরে উঠে, তেমনি কোন্ কাপুরুষ, কোন্ অলস শ্রমকাতর মানুষ,

কোন্ হীনতেজা নতজানু মানুষ, কোন্ অবিশ্বাসী ক্ষীণশক্তি মানুষ কেবলমাত্র অপরের সাহায্যে এ জগতে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে? এ জগতে উঠিয়া পড়িয়া, বহিয়া সহিয়া, ভাঙিয়া গড়িয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া মানুষ হইতে হয়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"— মনুষ্যত্ব বা মহত্ত্ব লাভের অন্য রাস্তা নাই। ঈশ্বর মানুষের সহিত চুক্তি করিয়া অল্প আয়াসে মহত্ত্ব প্রদান করেন না।

আমি এরূপ একটি মহৎ চরিত্রের আলোচনা করিতে যাইতেছি। তিনি রামমোহন রায়। নচিকেতা তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "শতানামেমি প্রথমঃ"— আমি শতজনের মধ্যে প্রথম হইতে চাই। রামমোহন রায় যে কালে জন্মিয়াছিলেন সে সময়ে এদেশবাসীদিগের মধ্যে লক্ষের মধ্যে— লক্ষের কেন কোটির মধ্যে— তিনি প্রথম হইয়াছিলেন বলিলে কি অত্যুক্তি হয়? সে কালের লোকের কথাই বলি বা কেন? তাঁহার জন্মের পর এই তো শত বৎসর অতীত হইয়াছে, কে তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে? কে প্রকৃত মহত্ত্বগুণে তাঁহার ত্রিসীমা-মধ্যে আসিতে পারিয়াছে?

বলিতে কি, শংকরের পর এরূপ মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ আর এ দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত দিবালোকের নিকটে আমরা কি খদ্যোত নহি? আমরা কি সেই প্রদীপ্ত ধূমকেতুর পুচ্ছলগ্ন জ্যোতিঃকণিকা মাত্র নহি?

কিন্তু রামমোহন রায় যে লক্ষের মধ্যে এক হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহা কিরূপে? যেরূপ ক্ষুদ্র গিরিরাজির মধ্যে অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনি যে তিনি সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে উন্নতশিরা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা কোন্ গুণে? তাহাও পূর্বোল্লিখিত গিরিদেহের ন্যায় আভ্যন্তরীণ উপাদান-সকলের সাহায্যে। এইরূপ কতকগুলি চরিত্রগত উপাদানের উল্লেখ করিব।

প্রথম উপাদান তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান।

মানুষের আত্মাকে তিনি অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। মনে করিতেন, এই মানবাত্মা সেই বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত, তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহা দ্বারা বিধৃত; এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই ইহার নিয়তি, ইহার আশা ও শক্তি অসীম। সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও দাসত্বকে তিনি এইজন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন যে, তদ্দ্বারা মানবাত্মাকে শৃঙ্খলিত, শক্তিহীন ও আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞানে বঞ্চিত করে।

এই কারণে পৃথিবীর যে-কোনো বিভাগে লোকে স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করিত, তাহারই সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ হইত; এবং স্বাধীনতা-লাভ প্রয়াসে কোনো জাতি অকৃতকার্য হইতেছে জানিলে তিনি মর্মাহত হইতেন। ইটালিয়ানগণ অনেক চেষ্টার পর যখন অষ্ট্রিয়াবাসিগণের নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেই সংবাদে রামমোহন রায় কলিকাতাতে শয্যাস্থ হইলেন, নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে পারিলেন না। অপর দিকে স্পেনে যখন নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তিনি আনন্দে কলিকাতার টাউন হলে ভোজ দিলেন।

তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ডিগ্‌বি সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট কর্ম করিবার সময় ডিগ্‌বি অনেকবার দেখিয়াছেন যে, রামমোহন রায় ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, যদি দেখিতেন যে স্বাধীনতা-পক্ষের পরাজয় হইতেছে, তাহা হইলে দরদর-ধারে তাঁহার দু কপোলে অশ্রুধারা বহিত। কুমারী কলেট বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড গমনকালে গুড হোপ অন্তরীপে গিয়া জাহাজে পড়িয়া গিয়া রামমোহন রায়ের পা ভাঙিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছে, তখন সেই ভগ্ন পদ লইয়া সেই জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার জাহাজের কাপ্তেন অনেক নিষেধ করিলেন; সে নিষেধ তিনি কোনো মতেই শুনিলেন না, ভগ্ন পদে অতি কষ্টে ফরাসী জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন। আসিবার সময় ফ্রান্সের জয়ধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন।

তাঁহার ইংলণ্ড-বাসকালে, ১৩৮১ সালে, পার্লেমেণ্ট মহাসভাতে সুপ্রসিদ্ধ Reform Bill-এর বিচার উপস্থিত হয়। ঐ আইনের দ্বারা ইংলণ্ডের প্রজাবর্গের স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার প্রস্তাব হয়। রামমোহন রায় সেই প্রস্তাবে আপনাকে এত দূর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন যে, ঐ আইন বিধিবদ্ধ না হইলে তিনি ইংলণ্ডের অধিকারে আর থাকিবেন না, তাঁহার পৈতৃক ও স্বোপার্জিত সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমি আমেরিকাতে গিয়া বাস করিবেন। কী স্বাধীনতাপ্রিয়তা! কী মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান!

এই মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান আর-এক দিকে অসাধারণ আত্মমর্যাদা-জ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের এমনি একটা প্রভাব ছিল,

এমনি একটা মহাপুরুষোচিত গাম্ভীর্য ছিল যে, তাঁহাকে কোনো ছোটো কাজের অনুরোধ করতে সাহস। হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহার সমীপে ছোটো কথার অবতারণা করিতেও সাহসী হইতেন না। তাঁহার বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম একদিনের একটি ঘটনার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। ঘটনাটি এই—

একদিন রামমোহন রায় জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময় অপরাহ্নে হঠাৎ অ্যাডামের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অ্যাডাম দেখিলেন তাঁহার মুখে ভয়ানক উত্তেজনার চিহ্ন। দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। রামমোহন রায় বলিলেন, "তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমার গায়ের উপরকার পরিচ্ছদ খুলি।" পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "জল। জল!" ত্বরায় জল দেওয়া হইল। জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, "আমার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও সর্বপ্রধান দুঃখ আজ পাইয়াছি। বিশপ মিড্‌লটন আজ আমাকে এই বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছেন যে, খৃস্টধর্ম অবলম্বন করিলে আমার পদ আরো বড়ো হইবে। ছি! ছি! আমাকে এত ছোটোলোক মনে করে!"

অ্যাডাম বলিয়াছেন, "ইহার পরে রামমোহন রায় আর মিড্‌লটনের মুখদর্শন করেন নাই।" বৈষয়িক সুখের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্মে প্রবৃত্ত করা — ইহা তাঁহার চক্ষে অমার্জনীয় অপমান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

কেবল ইহাও নহে, মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ছিল বলিয়া তাঁহার স্বাবলম্বনশক্তি অপরিসীম ছিল। নিজের গূঢ় আত্মশক্তিতে এত দূর বিশ্বাস ছিল যে, কিছুতেই তাঁহাকে কেহ দমাইতে পারিত না, কোনো বিঘ্ন বা বাধা তাঁহাকে স্বকার্যসাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না। যাহা একবার করণীয় বলিয়া অনুভব করিতেন, বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিতেন, এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা না করিয়া নিরস্ত হইতেন না।

ইংরাজী বুলডগ নামক কুকুরের এইরূপ খ্যাতি আছে যে, সে একবার যে প্রাণীকে কামড়াইয়া ধরে, নিজের দেহকে মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও সে কামড় ছাড়ে না। রামমোহন রায়ের বজ্রমুষ্টি বুলডগের কামড়ের ন্যায় ছিল: তাঁহার অভীষ্ট কার্য হইতে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। বরং সে পথে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হইত ততই তাঁহার বীর-হৃদয় আনন্দিত হইত। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন সম্মুখে বেড়া দেখিলে আনন্দিত হয় যে, উল্লম্ফন ও উল্লঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু পাওয়া গিয়াছে, তেমনি তাঁহার নির্ভীক

দুর্দম বিঘ্নবাধা দেখিয়া আনন্দিত হইত যে উল্লম্ফন ও উল্লঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু আছে। বিঘ্ন দেখিয়া হটিয়া যাওয়া, ভয়-প্রদর্শনে ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতা-বশত সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা তিনি কাপুরুষতা ও নিজশক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করিতেন।

ব্যাপ্টিস্ট মিশনের মিশনারিগণ যখন তাঁহার প্রণীত 'Third Appeal to the Christian Public' তাঁহাদের ছাপাখানায় মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন তিনি নিজে মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া, মানুষদিগকে কম্পোজিটরের কাজ শিখাইয়া, নিজের গ্রন্থ তাহাতে মুদ্রিত করিয়া তবে ছাড়িলেন।

স্কচ মিশনারি অ্যালেকজাণ্ডার ডফ্ যখন তাঁহার আহ্বানে কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন এবং প্রথম মিশনারি স্কুল স্থাপনের পথে সুমহৎ বিঘ্ন দেখিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, যখন শহরের ভদ্রলোকেরা এমনি বিরোধী হইলেন যে স্কুলের জন্য দেশীয় বিভাগে একটি বাড়ি ভাড়া করা ও পড়িবার জন্য বালক সংগ্রহ করা ডফের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, তখন রামমোহন রায়কে এই বিঘ্নবাধার কথা জানাইলে তিনি ডফের স্কুল বসাইবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তিনি তো কিছুতেই পিছুপা হইবার লোক ছিলেন না, স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাশ্রিত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ি ডফের স্কুলের জন্য স্থির করিয়া দিলেন, এবং আপনার বন্ধুবান্ধবের পরিবার হইতে প্রথম ছয়টি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন। ইহা করিয়াও নিরস্ত হইলেন না : স্কুল খুলিবার দিন নিজে উপস্থিত হইয়া বালকদিগকে উৎসাহিত করিলেন, এবং তৎপরে সর্বদা স্কুলে গিয়া স্কুলের কার্য পরিদর্শন দ্বারা ও পরামর্শ দানাদি দ্বারা ডফ্‌কে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

তিনি বিলাত-গমনার্থ উদ্যত হইলে তাঁহার প্রতিপক্ষগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার ও পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় অভীষ্ট সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া নিজের সহিত যাইবার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করিলেন। যে সময়ে সমুদ্রে পা বাড়াইলেই জাতিচ্যুত হইবার ভয় ছিল, সে সময় বিলাত-গমনের জন্য পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করা কিরূপ কঠিন কাজ ছিল, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। যিনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে পিতা-কর্তৃক গৃহতাড়িত হইযাও স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার পক্ষে ইহার কিছুই বিচিত্র ছিল না।

মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না স্বাবলম্বন-শক্তি তার আসে না। এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড়ো হইয়া দাঁড়াইবে কি ছোটো হইয়া থাকিবে তাহা তোমারই হাতে। বিঘ্ন বাধা, পাপ প্রলোভন, জীবনের সমস্যা সকলেরই পথে উপস্থিত হয়; তাহার উপরে উঠা বা নীচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড়ো বা ছোটো হওয়া নির্ভর করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি বড়ো; আর তুমি আমি নীচে পড়িয়া যাই, এইজন্য আমরা ছোটো। তিনি যে উপরে উঠিয়াছিলেন, তাহারও ভিতরকার কথা নিজের শক্তিসামর্থ্যে ও মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাস।

কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে কী বিরুদ্ধ গুণ-সকলের সমাবেশই ছিল! এই উৎকট মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান ও তজ্জনিত স্বাধীনতাপ্রবৃত্তির পার্শ্বেই প্রগাঢ় সাধুভক্তি বিদ্যমান ছিল। তিনি মানবাত্মার মহত্ত্ব-ঘোষণার জন্য ধর্মবিষয়েও মানবের বিচারশক্তিকে পূর্ণ অধিকার দিলেন; কিন্তু তাহা করিতে গিয়া অতীত হইতে একেবারে পা তুলিয়া লইতে পারিলেন না। যুক্তিকে শাস্ত্রানুসারিণী করিবার জন্য, অথবা শাস্ত্রকে যুক্তির অনুগামী করিবার জন্য কতই না শক্তি ও শ্রম ব্যয় করিলেন।

তিনি যে কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সে সময়ে ফরাসী বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতে সমুদয় দেশ কম্পিত হইতেছিল। সে সময়ে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল যাহারা শাস্ত্রবিধি গুরু-পুরোহিত প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মানবের চিন্তাকে স্বাধীন ভাবে ও অসংকোচে জীবনের সর্ব বিভাগে প্রসারিত হইতে দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। ইহারা ধর্মে সংশয় ও নাস্তিকতাবাদ অবলম্বন করিয়াছিল। রামমোহন রায় ইংলণ্ডে ও ফ্রান্স দেশে এই শ্রেণীর অনেক মানুষ দেখিয়াছিলেন। তাহাদের নমুনা এ দেশেও কিছু কিছু দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগকে দেখিয়া অবজ্ঞাতে মুখ ফিরাইয়াছিলেন। প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছিলেন, "আমি যদি কখনো পরিবার-পরিজনকে ইউরোপে আনি, এই শ্রেণীর লোকের সহিত কখনোই আমার পুত্রকন্যাদিগকে পরিচিত হইতে দিব না।" তিনি স্বাধীন চিন্তাকে অনেক দূরে ছুটিতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাহা বল্‌গাবিহীন অশ্বের ন্যায় নহে, পরন্তু "সদশ্বা ইব সারথেঃ"— সারথির সদশ্বের ন্যায়, ভক্তির লাগাম মুখে দিয়া, শাস্ত্র ও সাধুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখিয়া।

এই সাধুভক্তি বা Reverence তাঁহার চরিত্রের দ্বিতীয় উপাদান ছিল।

তৃতীয় উপাদান, সকল মহাজনের কার্যের মূলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারও কার্যের মূলে ছিল। তাহা এই "যতোধর্মস্ততোজয়ঃ" এই বিশ্বাস। অর্থাৎ ইহা অনুভব করা যে, এই ভৌতিক জগৎ যেমন দুর্ভেদ্য কার্যকারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তেমনি মানবের জীবন ও মানবসমাজ দুর্লঙ্ঘ্য ধর্ম-নিয়মের দ্বারা শাসিত। এক মহাশক্তি বা মহতী ইচ্ছা হইতে মানবজীবন ও মানবসমাজ উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মহতী ইচ্ছার দ্বারা বিধৃত হইতেছে, সেই ইচ্ছা ও সেই শক্তির দ্বারা মঙ্গলের পথে নীত হইতেছে। "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়"— তিনিই সেতুস্বরূপ হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন। মানবজীবন তাঁহারই দ্বারা বিধৃত এবং তাঁহারই শাসনাধীন, সুতরাং এখানে ধর্মের জয় অনিবার্য। যাহা সত্য বলিয়া বুঝি, ধর্ম বলিয়া যাহা অনুভব করি, তাহার অনুসরণ করা আমাদের একমাত্র কর্তব্য, ফলাফল সেই ধর্মাবহ পুরুষের হস্তে।

এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, এই মহৎ ভাব হইতেই সকল ধর্মবীরের বীরত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। রামমোহন রায়ের বীরত্বও ইহা হইতে উঠিয়াছিল। সে বীরত্বের কথা যখন স্মরণ করি তখন হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

বর্তমান কালে যাঁহারা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারই বাণী ধরিয়া সংস্কারকদলে নাম লিখাইয়াছেন, তাঁহাদের মুখ কত সময় বিষাদে ম্লান দেখিতেছি, তাঁহাদের মুখে নিরাশার ভাষা কতবার শুনিতেছি। কেহ বলিতেছেন, "কই, একেশ্বরের অর্চনা তো দেশে স্থাপিত হইল না।" কেহ বলিতেছেন, "আমরা কয়জন মরিয়া গেলে আর ইহার নামগন্ধও থাকিবে না" ইত্যাদি। যেন তাঁহারাই ধর্মবিধানের হর্তা কর্তা বিধাতা!

যখন এই সব ভাবি, অমনি রামমোহন রায়ের কথা স্মরণ হয়। দুই ছবিতে কী প্রভেদ! ইহারা সহস্র সহস্র সমভাবাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও সাহসকে রাখিতে পারিতেছেন না, আর রামমোহন রায় একাকী দণ্ডায়মান হইয়া কী সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ শত্রু হইল; সঙ্গিগণ ছাড়িয়া গেল; অনুগত ব্যক্তিগণ বিশ্বাসঘাতক হইয়া বৈরীদলে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইল; এরূপ অবস্থাতেও যে দুই-চারিজন ইউরোপীয় প্রচারক তাঁহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন; ধর্মসভার সভ্যগণ তাঁহার প্রাণনাশ পর্যন্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; তাঁহাকে সশস্ত্র হইয়া বেড়াইতে হইল; অধিক

কি, তাঁহার নিজের জননী কুচক্রী লোকের পরামর্শে তাঁহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন, বর্ধমানের রাজা তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমার পর মোকদ্দমা তুলিয়া কষ্ট দিলেন; বিপক্ষগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে মিথ্যা মোকদ্দমা তুলিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইলেন। বলো আমাদের কাহার জীবনে এরূপ নির্যাতন ঘটিয়াছে? কে এরূপ একাকী ও অশরণ হইয়াছি? অথচ ইহাতে তাঁহাকে একদিনের জন্য ভীত অথবা স্বীয় কার্য হইতে পরাঙ্মুখ করিতে পারে নাই। তিনি এই-সকলের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া বলিলেন, "এমন দিন আসিতেছে যখন আমার নির্যাতনকারিগণের বংশধরগণ আমাকে দেশের হিতৈষী বন্ধু বলিয়া ধন্যবাদ করিবে – ধর্মের জয় হইবেই হইবে।"

এরূপ অবস্থাতে এরূপ বলিতে পারাই মহত্ত্ব। সকল প্রতিকূলতার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারাই মহত্ত্ব। অসংখ্য গোলাগুলির মধ্যে অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হইয়া সত্যের নিশান প্রোথিত করিতে পারাই বীরত্ব। এই বীরত্বের পশ্চাতে ধর্মরাজ্যের বিধাতা ধর্মাবহ পরমপুরুষের ধর্মশাসনে অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। তদ্‌ভিন্ন এরূপ বীরত্ব জীবনে আসে না।

ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর-একটি উপাদান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা আপনার জীবনকে ও শক্তি-সকলকে ঈশ্বরের ন্যস্ত সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করা; আমার মানসিক বৃত্তি, দেহের বল, লৌকিক ও সামাজিক সুবিধা সমুদয় সেই মঙ্গলময় পুরুষের গচ্ছিত ধন, তাঁহার ইচ্ছানুসারে ব্যয় হইবার জন্য, তাঁহারই প্রিয়কার্য সাধনের জন্য— এই ভাব। ইহা ব্যতীত কোনো মহাজনের জীবন মহৎ হয় নাই, কোনো মানুষ এ জগতে মহৎ কার্য করিতে সমর্থ হন নাই।

সকল মহামনা মানুষের জীবনে এক অপূর্ব বাধ্যতার ভাব দেখা গিয়াছে। কে যেন তাঁহাদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া কাজ করাইয়া লইয়াছে, বাধ্য করিয়া খাটাইয়াছে। তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা না করিয়া পার নাই। সেণ্ট পল এক স্থলে বলিয়াছেন, "The love of Christ constraineth me"— অর্থাৎ যীশুর প্রেম আমাকে বাধ্য করিতেছে। কেবল পল-ই যে এইপ্রকার বাধ্যতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রত্যেক মহামনা মানুষ এইরূপ বাধ্যতা অনুভব করিয়াছিলেন।

এই যে জীবনের ভিতরে দায়িত্ব জ্ঞান, এই অস্ফুট কিন্তু নিরন্তরোদ্‌বেলিত

বাধ্যতা -জ্ঞান— ইহা ভিন্ন কে কবে বড়ো হইয়াছে ? কে কবে বজ্রমুষ্টিতে কার্য করিয়াছে ? কে কবে বীরের ন্যায় সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে ? রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন, যে যা বলে বলুক, যে যা করে করুক, লোকে দেখুক আর না দেখুক, আমার জীবনের পূর্ণতা আমি লাভ করি, আমার প্রতি যে কার্যভার পড়িয়াছে তাহা আমি সাধন করিয়া যাই। তুমি আমি যদি বিশ্বাস বা প্রেমে এতটা ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে তুমি আমিও বীরের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতে পারিতাম।

এই দায়িত্ব-জ্ঞান হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি গুণ ফুটিয়াছিল। তিনি যে কাজে হাত দিতেন তাহা পূর্ণাঙ্গ না করিয়া ছাড়িতেন না। যাহা করিবেন বলিয়া ধরিতেন তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। বালকের ন্যায় লঘু ভাবে কাজে হাত দেওয়া, অর্ধেক মন দিয়া সে কার্য করা, স্বল্প প্রতিবন্ধক দেখিলেই নিরস্ত হওয়া, ইহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

তিনি ১৮১৭[১] সালে সহমরণের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন। সভা-সমিতিতে সেই বিচার চলিল, গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল; সহমরণ-স্থলে বলপ্রয়োগাদি করে কি না দেখিবার জন্য বন্ধুবান্ধবকে শ্মশানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক্‌কে বিধিমতে সাহায্য ও উৎসাহ দান দ্বারা সবল করিতে লাগিলেন; বহুজনের স্বাক্ষর করাইয়া সহমরণ-নিবারণার্থ আবেদনপত্র রাজগোচরে প্রেরণ করিলেন; অবশেষে ১৮২৯ সালে রাজবিধি দ্বারা সহমরণ নিবারিত হইলে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক্‌কে ধন্যবাদ করিয়া এক অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করিলেন; এবং সহমরণের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত আইনের বিরোধীদের আপত্তি খণ্ডন করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন; পরিশেষে পাছে তাঁহাদের প্রার্থনা ইংলণ্ডে গ্রাহ্য হয় সে পথে বাধা দিবার জন্য ঐ আইন-পক্ষীয়দিগের এক ধন্যবাদপত্র পকেটে লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। কিছু করিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না।

দ্বিতীয়ত, এদেশীয়দিগের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন এই বিশ্বাস যখন জন্মিল, তখন ১৮১৬ সালে বন্ধুবর ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপনের আয়োজন করিলেন। ১৮১৭ সালে স্কুল[২] স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু নানা ঘটনাচক্রে তাহার পরিচালন-কার্য

---

১. ১৮১৮। 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' প্রকাশ

২. হিন্দু কলেজ

তাঁর হস্তের বাহিরে গেল। তিনি বাহিরে থাকিয়াও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। তৎপর যখন জানিলেন ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির ফল আশানুরূপ হইতেছে না, তখন ১৮২২ সালে তিনি নিজের ব্যয়ে নিজের মনের মতো ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটি ইংরাজী স্কুল[৩] স্থাপন করিলেন এবং প্রধানত নিজের ব্যয়ে চালাইতে লাগিলেন। ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের গভর্নমেণ্ট একটি শিক্ষা-কমিটি নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের হস্তে কলিকাতাতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন-পূর্বক প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের ভার দিলেন। তখন রামমোহন রায় স্থির থাকিতে পারিলেন না। গভর্নমেণ্টের প্রাচ্য নীতির ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া গভর্নর জেনারেলকে এক পত্র লিখিলেন। এইরূপে তাঁহার সাধ্যে যতটুকু ছিল করিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না।

ধর্মসংস্কারের চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইয়া কী করিয়াছিলেন তাহার তো কথাই নাই। ১৬ বৎসর বয়সের সময় যে পতাকা উড্ডীন করিলেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাহা উড্ডীন রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহাকেই তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কার্য করিয়াছিলেন। ইহার জন্যই উপনিষদ অনুবাদ, ইহার জন্যই আত্মীয় সভা স্থাপন, ইহার জন্যই বাইবেলের অনুবাদ, ইহার জন্যই খ্রীষ্টীয় পাদরীদিগের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ, ইহার জন্যই খ্রীষ্টীয়দিগের প্রতি তিন নিবেদন, ইহার জন্যই ইউনিটেরিয়ান কমিটি সংগঠন, ইহার জন্যই অ্যাডাম সাহেবের উপাসনালয় স্থাপন; অবশেষে ইহার জন্যই ১৮২৮ সালে ব্রহ্মসভা স্থাপন, তাহার গৃহ নির্মাণ, সেই গৃহ ট্রাস্টী-হস্তে অর্পণ, ও ১৮৩০ সালের জানুয়ারি মাসে তাহাতে ব্রহ্মোপাসন প্রতিষ্ঠা। কোনো কাজে হাত দিয়া তিনি আধখানা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই।

তৎপরে, যেমন তাঁহার ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, তেমনি মানবের প্রতি উদার প্রেম ছিল। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরপ্রীতি অপেক্ষা মানব-প্রীতিই অধিক পরিমাণে তাঁহার কার্যের চালক ও পোষক ছিল।

বর্তমান সময়ে যত উদার তত্ত্ব মানব-হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে তন্মধ্যে মানবজাতির একত্ব একটি অদ্ভুত তত্ত্ব। যতই বিভিন্ন জাতির ইতিবৃত্ত ও সাহিত্যাদি আলোচিত হইতেছে, যতই যাতায়াতের সুবিধা হইয়া বিভিন্ন

৩. অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল

দেশভ্রমণ ও বিভিন্ন জাতির সহিত সংমিশ্রণ বৃদ্ধি পাইতেছে যতই বাণিজ্য-সূত্রে জগতের জাতিসকল পরস্পরের সহিত স্বার্থ ও আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, ততই এই তত্ত্বটি মানব-চিত্তে জাগিয়া উঠিতেছে। জগতের জাতিসকল জানিতে পারিতেছেন, সমস্ত জগতের মানবকুল এক সূত্রে গ্রথিত।

রামমোহন রায় আর এক দিক দিয়া এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ অনুশীলন করিয়া জানিয়াছিলেন যে, জগতের জাতিসকলের বিভিন্নতার মধ্যে প্রকৃতিগত একতা প্রচ্ছন্ন আছে এবং বিধাতা সকল জাতির মধ্যে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার অভিব্যক্তি কোনো এক বিশেষ জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে।

এই উদার সার্বভৌমিক ভাব হইতে তাঁহার উদার সার্বজনীন প্রেম উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বজাতি, স্বদেশ ও সমগ্র জগতের নরনারীর দুঃখ সহিতে পারেন নাই, সেইজন্য দুষ্কর নরসেবা-ব্রতে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার জীবনের একটি মূল মন্ত্র উঠিয়াছিল। সেটি এই : The service of man is the service of God— অর্থাৎ মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এইটি সর্বদা তাঁহার মুখে শুনা যাইত।

তবে তাঁহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহার মানব-প্রীতি অপরাপর অনেক মহাজনের মানব প্রীতির ন্যায় সংকীর্ণ আকার ধারণ করে নাই। তিনি যে সর্ব দেশের ও সকল জাতির নরনারীর দুঃখে দুঃখী হইতেন, সকল দেশের রাজনীতির প্রতি এত দৃষ্টি রাখিতেন, যে-কোনো জাতির যে-কোনো উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইলে যে এত আনন্দিত হইতেন, তাহার ভিতরকার কথা এই ছিল যে, তাঁহার প্রেম সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।

এই কারণেই তিনি এরূপ ধর্মের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন যাহা সমগ্র জগতের সমুদয় মানবসমাজকে এক সূত্রে বাঁধিবে। এই সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক ধর্মের চিন্তা নিরন্তর তাঁহার হৃদয়ে বাস করিত। তিনি যখনই কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের ক্রিয়া দেখিতেন তখনই এই আধ্যাত্মিক মহাধর্মের ভাব তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইত। দুর্গোৎসবের সময় যখন বিবিধ সাজে প্রতিমা সাজাইয়া লোকে বিসর্জন করিতে যাইত, তখন তাঁহার বন্ধুবর্গের কেহ যদি বলিতেন, "দেওয়ানজী! দেখুন, দেখুন, কেমন প্রতিমা সাজাইয়াছে!" অমনি তিনি বলিতেন, "Brother, brother, ours is Universal Religion"— অর্থাৎ ভাই, ভাই, আমাদের ধর্ম সার্বভৌমিক ধর্ম। বিশ্বস্ত

লোকের মুখে শুনা গিয়াছে, এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিত।

ইংলণ্ড-বাসকালে যখন খৃষ্টীয়দিগের ভজনালয়ে যাইতেন, এবং তাঁহারা যখন ভজনা করিতেন, তিনি একান্তে বসিয়া কাঁদিতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "দেশের লোকের কথা মনে হইয়া কাঁদিতেছি। কতদিনে তাহারা ভ্রম কুসংস্কার দূর করিয়া উদার বিশ্বজনীন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।"

আমার বোধ হয়, এই স্বাভাবিক মানবপ্রেমের জন্যই তাঁহার সন্ন্যাস-ধর্মের প্রতি এত বিরাগ ছিল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অদ্বৈতবাদী হন নাই। তিনি তাঁহার ধর্মকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে গৃহীর ধর্ম করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

তাঁহাতে ধর্মসাধকের অস্বাভাবিকতা কিছুমাত্র ছিল না। সর্বদা দেখিতে পাই, প্রচলিত ধর্মের সাধকগণ—বিশেষত ধর্মপ্রচারকগণ—আপনাদিগকে ধার্মিক দেখাইবার জন্য কতই ব্যগ্র হন। গৈরিক ধারণ করিয়া, মালা কমণ্ডলু লইয়া গৃহ পরিবার ত্যাগ করিয়া কতরূপে মানুষকে বলেন, "তোমরা যেরূপ আমরা সেরূপ নই। তোমরা সংসারী আমরা বিরাগী, তোমরা ভোগী আমরা যোগী, তোমরা আসক্ত আমরা ত্যাগী" ইত্যাদি। রামমোহন রায়ের মতিগতি যেন ঠিক ইহার বিপরীত ছিল।

তিনি উপদেশ লিখিয়া অপরকে দিয়া পড়াইতেন; গ্রন্থ লিখিয়া কোনো শিষ্যকে পড়াইয়া তাহার নামে ছাপিতেন; একদিনও আচার্যের আসনে বসেন নাই; আহার ব্যবহার আলাপে সামান্য মানবের ন্যায় থাকিতে প্রয়াস পাইতেন। ইংলণ্ড-বাসকালে পদস্থ বন্ধুদিগের অনুরোধে রঙ্গভূমিতে নাট্যাভিনয় দেখিতে যাইতেন; সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী Fanny Kemble-এর অভিনয়ে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ ও আপনার প্রণীত ধর্মগ্রন্থসকল উপহার দিয়াছিলেন। এক ইংরাজ দম্পতি তাঁহার নামে আপনার শিশুপুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন; রাজা শতপ্রকার বড়ো বড়ো কার্যের ব্যস্ততার মধ্যে সেই শিশু বন্ধুকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার খেলার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেন। কলিকাতা-বাসকালে বালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া গাছে দোলা টাঙাইয়া তাঁহাদের সহিত দোল খাইতেন। এ-সকল কেমন স্বাভাবিক! কেমন সুন্দর! কেমন মানবীয় ভাব সম্পন্ন!

ইহাতে প্রচলিত ধর্মসাধকের মুখভঙ্গি, বিরস ও তিক্ত বদন, নির্দোষ আমোদের প্রতি ভ্রূকুটি – এ-সকল কিছুই নাই।

অপর দিকে মানব প্রেম হইতেই তাঁহার চিত্তে নারীজাতির প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা উঠিয়াছিল। সেই ধর্মবীর ও কর্মবীর নারীগণের সমক্ষে বালকের ন্যায় নম্র ও প্রেমে আর্দ্র হইতেন। যেখানেই যাইতেন স্ত্রীগণ তাঁহার পক্ষপাতিনী হইতেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিব্বতের নারীগণ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। শেষ দশায় মৃত্যুশয্যায় কুমারী হেয়ার— একজন ইংরাজরমণী— কন্যার ন্যায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। প্রাণবায়ু যখন তাঁহার শ্রান্ত কলেবরকে পরিত্যাগ করিল, তখন ডাক্তার এস্‌লিন ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন কুমারী হেয়ার পড়িয়া অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন। মানুষকে যিনি এত ভালোবাসিতেন, মানুষ কেন তাঁহাকে ভালোবাসিবে না? প্রেমে প্রেম চেনে; নারী-হৃদয় স্বভাবত প্রেমিক, সুতরাং নারীগণ প্রেমিক মানুষকে চিনিতে পারেন।

জীবনের মহালক্ষ্য-সাধনের জন্য রামমোহন রায়ের ব্যগ্রতার কথা বলিয়াছি, সে বিষয়ে তাঁহার চিত্তের একাগ্রতার বিষয় এখনো বলিতে বাকি আছে। তাহা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। সে কী একাগ্রতা।

যে সময়ে তিনি জন্মেছিলেন সে সময়ে সর্ব বিভাগে ভাঙিয়া গড়িবার চেষ্টা চলিতেছিল। ইংরাজগণ তখন প্রায় সকল বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং সর্ব বিভাগে সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে এদেশীয় চতুর সহকারীদের উপর নির্ভর করিতে হইত। এই কারণে সেই সময়ে চতুর মানুষের পক্ষে প্রভূত ধন উপার্জনের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এই কারণে তৎকালে দেশীয় সমাজে দেখিতে দেখিতে ক্রোরপতি হওয়ার একটা দৈনিক ঘটনার মধ্যে হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ধনাগমের বাসনা প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় শত শত হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। 'বিষয়-সম্পত্তি, বিষয়-সম্পত্তি' এই লোকের ধ্যানে জ্ঞানে প্রবেশ করিয়াছিল। অতৃপ্ত ও অতর্পণীয় ভোগলালসা সর্বত্র অনির্বাণ অনলের ন্যায় বাড়িতেছিল।

ইহার মধ্যে রামমোহন রায় দেখা দিলেন। যিনি ১৮০৩ সাল হইতে ১৮১৪[4] সাল পর্যন্ত ইংরাজ গভর্নমেণ্টের অধীনে বিষয়কার্য করিয়াছিলেন।

৪. ১৮১৫। ডিগ্‌বির রংপুর ত্যাগের পরও ১৮১৫ সালের শেষের দিক পর্যন্ত রামমোহন রংপুরে সরকারী পদে আসীন ছিলেন। দ্র Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, p. 40.

তাহার মধ্যেও দেখা যায় যে, বিষয়কার্যে থাকিয়াও অবসর-কাল তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য যে ধর্ম-সংস্কার তাহারই চিন্তা ও আয়োজনে যাপন করিতেন। রংপুরে নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সহিত বিচার উপস্থিত করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন তুলিয়া দিলেন।

১৮১৪ সালে যেই ডিগ্‌বি সাহেব ছুটি লইয়া ইংলণ্ড গেলেন, অমনি তিনিও চাকুরি ছাড়িলেন।[৭] কলিকাতাতে আসিয়া বসিয়া কি নিজের শ্রমোপার্জিত অর্থ সুখে ভোগ করিতে পারিতেন না? তাহা করিলেন না। করিলেন কী— না বেদান্তের অনুবাদ, পৌত্তলিকতা নিরাকরণ, সত্যধর্মের প্রচার, সহমরণ-নিবারণ প্রভৃতি কার্যে মুক্ত হস্তে সেই ধন রাশি রাশি ব্যয় করিতে লাগিলেন। কোনো কোনো গ্রন্থ তিনি তিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ১৮৩০ সালের মধ্যে তিনি এমন নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন যে, দিল্লীর সম্রাটের উকিল হইয়া ইউরোপে যাইতে হইল।

ইংলণ্ডে গিয়াও তাঁহার গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রিত করিতে ও এদেশীয় প্রজাদিগের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার জন্য গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে একেবারে নির্ধন হইয়া পড়িলেন। কুমারী কলেট বলিয়াছেন, দারিদ্র্যের তাড়না তাঁহার অকাল-মৃত্যুর অন্যতম কারণ হইয়াছিল। স্বকার্যসাধনে কী চিত্তের একাগ্রতা!

কেবল তাহা নহে। শুনিলে কৌতুকবোধ হয়, তিনি রঙ্গভূমিতে, নৃত্যাগারে, সুহৃদ-গোষ্ঠীতে যেখানে গিয়াছেন, লোকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছে যে, কিয়ৎক্ষণ পরেই অন্যমনস্ক হইয়া তিনি এক কোণে কোনো বন্ধুর সহিত ধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গ ও বিচার উপস্থিত করিয়া তাহাতেই মগ্ন আছেন। স্বীয় লক্ষ্য-সাধনে কী আবেশ! কী নেশা! সর্বত্র একই চিন্তা, সর্বত্র একই প্রধান প্রসঙ্গ, সর্বত্র একই প্রধান আলোচনা— তাহা মানবের ধর্মভাবের ও ধর্মজীবনের উন্নতি।

এই একাগ্রতা তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বের আর-একটি উপাদান ছিল।

মহাত্মা রামমোহন রায়*

পূর্ণচন্দ্র বসু

আধুনিক বঙ্গদেশের গৌরবই মহাত্মা রামমোহন রায়। এই মহাত্মাকে সম্মান করিলে বাঙালিজাতি সম্মানিত হয়। ইঁহাকে সম্মান করা অগ্রে বাঙালিজাতির কর্তব্য। তিনি জীবিতকালে অনাদৃত ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে যখন আমরা তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব ও গৌরব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তখন তাঁহার যথোচিত সম্মান ও আদর না করিলে আমরা নিতান্ত নিন্দনীয় হইব। সর্বসাধারণে যাহাতে রামমোহন রায়ের জীবনের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন তজ্জন্য সর্বাগ্রে তাঁহার জীবনী প্রকাশ করা উচিত। নগেন্দ্রবাবু সেই কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতকাল যে তাঁহার অমূল্য জীবনী প্রচারিত ছিল না, ইহা বাঙালিজাতিরই কলঙ্ক। নগেন্দ্রবাবু সেই কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছেন। সেইজন্য গ্রন্থকার অনেক কারণে আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন। বাঙালিজাতি যে রামমোহন রায়ের নিকট কতপ্রকার ঋণে আবদ্ধ নগেন্দ্রবাবু তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ করিয়া রামমোহন রায়ের প্রতি বাঙালিজাতির কী কর্তব্য তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের জীবনী অতি সরল বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নানাস্থান হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 'আর্যদর্শনে' শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন তাহাতে গ্রন্থকারের অনেক সাহায্য হইয়াছে। গ্রন্থকারের একটি চমৎকার গুণ এই, তিনি বক্তব্য বিষয় বেশ সাজাইয়া বলিতে পারেন। সে গুণ সমালোচ্য গ্রন্থেও বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের জীবনী আলোচনায় যে স্থলে যেরূপ চিন্তা সহজে উদয় হয়, সেইরূপ চিন্তায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ এবং গ্রন্থকার অনেক স্থলে যে-সমস্ত মত ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ ও ন্যায্য।

জীবনীলেখকের যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবশ্যক করে নগেন্দ্রবাবুর তাহা

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮৮ সাল।

আছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এমত প্রতীতি হয় যে, তিনি রামমোহন রায়কে অত্যন্ত ভক্তি করেন। সেই ভক্তিভাজনের জীবনী লিখিতে উৎসাহিত হইয়া তিনি বিলক্ষণ পরিশ্রমও করিয়াছেন। পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তিনি এমত অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যাহা পূর্বে অল্প লোকেরই বিদিত ছিল। তিনি সমস্ত বিষয় অতি শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের বিশুদ্ধ নামে যে অপকলঙ্ক ছিল, যে অপকলঙ্ক তাঁহার সমগ্র জীবনের ঘটনাবলির সহিত কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না; যাহা কেবল তাঁহার শত্রুগণের বিদ্বেষভাবের পরিচায়ক মাত্র বলিয়া উপলব্ধ হইতে থাকে, সেই দুই অপকলঙ্কের নগেন্দ্রবাবু অতি সুন্দররূপে অপনয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক সমগ্র গ্রন্থখানি ভক্তির উপহারস্বরূপ এবং যিনি ইহা পাঠ করিবেন তিনি রামমোহন রায়কে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

রামমোহন রায় যে একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনীতে বিলক্ষণ প্রকাশিত হয়। অতি তরুণবয়সে যখন তিনি হিন্দুশাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে সহসা একদা একেশ্বরবাদে উপনীত হন, তখন তাঁহার প্রতিভার প্রথম আলোক পরিদৃশ্য হয়। বহুকাল ধরিয়া হিন্দুরা শাস্ত্রালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু কেহ কখনো সেই শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া রামমোহনের মত অতি তরুণ বয়সেই একেশ্বরবাদে উপনীত হইতে পারেন নাই। যদিও রামমোহনের সময়ে খৃষ্টীয় পাদরিগণ এখানে আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা খৃস্টের বিশেষ মতামত প্রচারে এত ব্যস্ত যে তাহাতে ঠিক প্রকৃত একেশ্বরবাদ কখনো প্রকাশিত হয় নাই। তৎকালে খৃস্টান পাদরিগণের মতামতও বিশেষরূপে সকলের শ্রবণযোগ্য হইত না এবং সাধারণ জনেরা অবগত ছিলেন না। বিশেষত রামমোহন রায় যে অল্পবয়সে একেশ্বরবাদে উপনীত হন, তখন তিনি খৃষ্টীয় মত বোধ হয় অবগত ছিলেন না। যদি থাকেন, তাহা হয়তো খৃষ্টীয় মত বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু রামমোহন রায়ের বিশেষ গৌরব এই, তিনি সেই একেশ্বরবাদ হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে নিহিত দেখিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি শাস্ত্রের অশেষ মতামত ভেদ করিয়া এই মহান্ সত্য উপলব্ধি করিয়াছিল। রামমোহন রায় প্রথমে ইহা হিন্দুশাস্ত্রের সারমাত্র বলিয়া দেখিলেন, এবং তাহা প্রচার করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি এই মত প্রচার করিতে এত উদ্যোগী হইলেন, ইহার সত্য তাঁহার মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল, যেন তিনি হঠাৎ কী অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যেন কোন্ দিব্যালোক তাঁহার মনে সহসা প্রভাসিত হইয়াছিল। তিনি সে আলোকে মোহিত হইয়া তাহা জগৎময় প্রকাশিত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রামমোহনের প্রতিভা সকল অবস্থায় তাঁহাকে প্রচালন করিত। তিনি এই প্রতিভাবলে অতি জটিল তর্কসকল ভেদ করিয়া সত্য প্রকাশিত করিতেন। এই প্রতিভাবলে সকল শাস্ত্রালোচনায় অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল নির্ধারণ করিতেন। বাক্‌-বিতণ্ডায় ও তর্কযুদ্ধে এই প্রতিভাবলে তিনি সকলের উপর জয়লাভ করিতেন। তাঁহার বিপক্ষে যে-কেহ উদয় হউন-না কেন, তিনি কাহারও সহিত বিচার করিতে শঙ্কা করিতেন না। যেরূপ তর্কজাল হউক-না কেন সে তর্ক না পড়িতে পড়িতে রামমোহন রায় তাহার অসারতা সুন্দর দেখাইয়া দিতে পারিতেন। যেন তাঁহার নিকট সকল কুতর্কের অস্ত্র ছিল। কুতর্ক উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহা খণ্ডন করিতেন। একটু কালবিলম্ব হইত না। ইহাই উপস্থিত বুদ্ধি, ইহাই প্রতিভা। এই প্রতিভা যেন আন্তরিক আলোক রূপে তাঁহার মনোমন্দিরে বিরাজিত ছিল। কুতর্ক-জালের কুজ্ঝটিকা বিস্তৃত হইবামাত্র তাঁহার আভ্যন্তরিক আলোকদ্বারা তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত।

যাঁহারা প্রতিভাসম্পন্ন লোক হন, তাঁহারা এক এক যুগের অগ্রণীস্বরূপ হন। রামমোহন রায় এক্ষণকার কালের অগ্রগামী লোক ছিলেন। তাঁহার কালের পূর্বে তিনি উদয় হইয়াছিলেন। অথবা তিনি এক নূতন যুগের প্রারম্ভ করিয়া যান। এদেশীয় দেশাচার সম্বন্ধে আজকাল অনেক তর্কের পর যে-সমস্ত সত্য নির্ণীত হইতেছে, রামমোহন রায় বহুকাল পূর্বে তাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন। বলিতে গেলে আমরা আজি কালি তাঁহারই মতাগতের অনুসারী হইয়াছি মাত্র। রামমোহন রায় তাঁহার পরিষ্কার বুদ্ধিতে সকল বিষয় বহুকাল পূর্বে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক্ষণকার কালের উজ্জ্বল শুকতারা-রূপে বঙ্গগগনে উদয় হইয়াছিলেন।

যে-সমস্ত অসাধারণ গুণে রামমোহন রায়কে উচ্চগৌরবে উত্তোলিত করিয়াছিল, প্রতিভা তাহার অন্যতম। প্রতিভা তন্মধ্যে সামান্য গুণ। কারণ প্রতিভা অনেকেরই থাকিতে পারে। রামমোহন রায় যদি অন্যান্য গুণের আধার না হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনোই একজন অসাধারণ লোক হইতে পারিতেন না। তাঁহার অপরাপর গুণের মধ্যে তাঁহার সাহসকে আমরা একটি শ্রেষ্ঠতম গুণ বলি। যে সাহস থাকিলে মানব উচ্চে উঠিতে পারে, রামমোহন

রায়ের সেই সাহস ছিল। সকল সময়েই মনুষ্যসমাজ এক এক স্থির অবস্থায় অথবা স্তরে স্থাপিত থাকে। রামমোহন রায়ের যে-সময় অভ্যুদয় হয়, তখনকার কালে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ কিরূপ জঘন্য অবস্থায় সংস্থাপিত ছিল, তাহা সমালোচ্যগ্রন্থমধ্যে সুন্দর বর্ণিত আছে। মনুষ্যসমাজের ধর্ম এই যে, লোকে এই স্তরে সর্বসাধারণকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। ইহাই সামাজিক শাসন ও বন্ধন। মানবজাতির অবস্থা কখনো একভাবে থাকিতে পারে না। সমাজ কখনো একভাবে দাঁড়াইতে পারে না। হয় তাহা ভিতরে ভিতরে উন্নতিপথে উঠিতেছে, না-হয় তাহা অবনতির দিকে অবনত হইতেছে। মানবসমাজের নিশ্চেষ্টতায়ও তাহার অপকার সাধন হয়। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ নিশ্চেষ্টতায় ক্রমশই অধঃপাতে যাইতেছিল। দিন দিন তাহার অবনতি হইতেছিল। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ এখন এইরূপ নিশ্চেষ্ট স্থিরভাবে অবস্থিত ছিল। ভিতরে ভিতরে তাহার অবনতিসাধন হইতেছিল। তাহার গতি অধোদিকেই অভিমুখী ছিল। রামমোহন রায় এই সমাজের গতি ফিরাইয়া দিলেন। সামাজিক তরঙ্গে বিপরীত বল নিক্ষেপ করিলেন। সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যে বল রামমোহন রায়ের হৃদয়ে; সেই বল, সেই সাহস, সেই অধ্যবসায়, সেই বিদ্যাবুদ্ধি, সেই প্রতিভা, সেই মহান্ আভ্যন্তরিক বলে রামমোহন রায় এই সামাজিক তুফানে দণ্ডায়মান হইলেন। বলিতে গেলে একাকীই দণ্ডায়মান হইলেন। যে বলে, যে সাহসে তিনি আত্মস্বজন, ভাইবন্ধু, জনকজননীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী দেশে দেশে ফিরিয়াছিলেন, সেই বল রামমোহন রায়কে আবার স্বদেশীয় জনসমাজের প্রতিকূলমুখে সংরক্ষা করিল। সমুদায় সমাজ তাঁহার বিপক্ষে। রামমোহন রায় একাকী বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। শুদ্ধ দাঁড়াইয়া নয়, মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে যেরূপ অস্ত্রবিক্ষেপ করিতেছে, রামমোহন রায় তাহা সেইরূপ বলে কাটাইতেছেন। যাহা সহ্য করিবার তাহা সহ্য করিতেছেন যাহা কাটাইবার তাহা কাটাইতেছেন। ইহাই বীরত্ব, ইহাই সাহস। এই সাহসে রামমোহন রায় সামাজিক গতি উন্নতির দিকে বিক্ষেপ করিয়াছেন। রামমোহন যখন প্রথম সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান; যখন নদ, নদী, বন, পর্বত, সিংহ, শার্দূল এবং মানবের ভয়ংকর শত্রুতা প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই, তখন তাঁহার হৃদয়বল একদিন দেখা গিয়াছিল। তখন তাঁহার সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় কত, একদিন দেখা

গিয়াছিল। তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রথম আলোক প্রভাসিত হইয়াছিল। এই হৃদয়বলে কয়জনকে বলীয়ান্ দেখা যায়? এই মহান্ হৃদয়বলে কয়জন লোক সর্বত্যাগী হইয়াছেন, সত্যের জন্য, প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধানের জন্য সর্বত্যাগী হইয়াছেন। আবার যখন আমরা ভাবি, রামমোহন রায়ের বয়স তখন কত তরুণ, সম্পত্তি ও সহায় কেমন বিহীন, তখন তাঁহার হৃদয়বলের যে কতদূর গৌরব তাহা একদিন উপলব্ধি হয়। তখন তাঁহাকে আমরা ভবিষ্যৎ রামমোহন রায় বলিয়া চিনিতে পারি। চিনিতে পারি, তিনি দেশের উদ্ধারের জন্য উদয় হইতেছেন, তিনি দেশের উন্নতিকল্পে সজ্জিত হইতেছেন। চিনিতে পারি, এই হিমালয়-অতিক্রমী তিব্বতভ্রমী রামমোহন রায় একদিন সাতসমুদ্র পার হইয়া আবার বিলাতে যাইবেন, ফ্রান্সে সম্মানিত হইবেন, বিলাতে আবার ফিরিয়া আসিবেন, বিলাতের সর্বস্থানে পূজিত হইবেন এবং সেই সাত সমুদ্র পারে বিদেশীয় শোভাময়ী ব্রিস্টলনগরীতে পূজার সহিত দেহত্যাগ করিবেন। চিনিতে পারি, রামমোহন রায়ের এই হৃদয়বল এক স্থানে আবদ্ধ থাকিবার নহে, বঙ্গদেশে তাহা ধরিবে না, তাহা বিস্তীর্ণ হইয়া সমুদায় পৃথিবী একদা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবে। একস্থানে আবদ্ধ হইলে ইঁহার তেজ কত, তাহা বঙ্গদেশ জানিয়াছে। বিস্তীর্ণ হইলে, ইঁহার প্রসার কত, তাহা বিদেশীয়গণ বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছেন।

সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য সন্ন্যাসিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী হইতে রামমোহন রায়ের অনেক প্রভেদ। এই প্রভিন্নতা না থাকিলে রামমোহন রায় যে তরুণবয়সে সংসারধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে তিনিও হয়তো একজন সন্ন্যাসী হইতেন। আর যে সময়ে রামমোহন রায় সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সে সময়ে সন্ন্যাসধর্মেরও বিশেষ গৌরব ছিল। সেই গৌরব রামমোহন রায়ও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। তখন সন্ন্যাসী হওয়ার দৃষ্টান্তেরও বঙ্গধামে অভাব ছিল না। ঈশ্বরোপাসনার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তখন গৌরবের বিষয় বলিয়া লোকে জ্ঞান করিত। সে কালের অনেক সন্ন্যাসীও হয়তো আজিও জীবিত আছেন। দুই কারণে রামমোহন রায়কে সন্ন্যাসী করে নাই।

প্রথম কারণ এই: যেজন্য সন্ন্যাসিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যান, রামমোহন রায় সে কারণে যান নাই। সন্ন্যাসিগণ ঈশ্বরের উপাসনার জন্য প্রলোভনপূর্ণ, মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে যান। রামমোহন রায়

সংসার পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু সংসার তাঁহাকে দাঁড়াইতে স্থল দেয় নাই। সংসার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সংসারের বহির্দেশে যান নাই। কিন্তু তিনি তত্ত্বানুসন্ধায়ী ছিলেন। সকল ধর্মের সার কী, তিনি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সকল ধর্মের দোষগুণ বিচারোদ্দেশে তিনি দেশে দেশে বেড়াইতেছিলেন। এইরূপে তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ না হইলে তাঁহাকে ধর্মসংস্কারক মহাত্মা রামমোহন করিতে পারিত না। সংসার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপকারসাধন করিয়াছিল। তাঁহাকে ভবিষ্যৎ রামমোহন রায় করিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ, রামমোহন রায়ের হৃদয়। রামমোহন রায়ের হৃদয় সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ের মতো যদি শুষ্ক, নির্মম হইত, রামমোহন রায় হয়তো তত্ত্বানুসন্ধানের পর ঈশ্বরোপাসনার জন্য সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায় হৃদয়শূন্য লোক ছিলেন না। যে নির্মম জনসমাজমধ্যে রামমোহন রায় বাস করিতেন, সেই সমাজের জন্য রামমোহনের তরল হৃদয় অতি তরুণ বয়সেই কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারই পরিবারমধ্যে যখন সতীদাহের দৃষ্টান্ত ঘটে, তখনই তাঁহার হৃদয় একেবারে ওতপ্রোত হইয়া আলোড়িত হইয়াছিল। তিনি তখনই যে উচ্চরবে কাঁদিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাতেই তাঁহার হৃদয়-ব্যথার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার মমতা লোকের জন্য ছিল না, তাহা ব্যক্তিগত মমতা ছিল না, কিন্তু তাঁহার মমতা মানবজাতির প্রতি ছিল। তিনি একজনের জন্য যত না কাঁদিতেন, সমাজের জন্য ততোধিক কাঁদিতেন।

রামমোহন রায় একজন বিশেষরূপে সামাজিক লোক ছিলেন। সমাজের রোদন তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিত। সমাজের অমঙ্গল তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিত। তিনি বঙ্গসমাজের দুরবস্থা দেখিয়াছিলেন মাত্র নহে, সেই দুরবস্থার জন্য অহরহঃ মনে মনে কাঁদিতেন। তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে সেই দুরবস্থার ভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছিল; তাঁহার সহৃদয়তা সেই দুরবস্থা অপনয়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তিনি ভারতের দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় স্বদেশে আকৃষ্ট ছিল, স্বদেশের দুঃখের জন্য কাঁদিত। তাঁহার হৃদয় যে প্রকৃতপক্ষে কাঁদিত, স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি তাহার দুঃখমোচনের জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়াছিলেন, কায়মনোবাক্যে তাহার হিতকামনায় নিরত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই হৃদয়ব্যথার একদা

পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি আত্মস্বজনের জন্য তত ভাবিতেন না, কিন্তু সমগ্র বঙ্গসমাজ ও জাতির জন্য ভাবিতেন। এ প্রবৃত্তি কি সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করে? সন্ন্যাসিগণ কেবল আত্মোন্নতির জন্য ব্যস্ত। আপনার মুক্তি-সাধনের জন্য দিনরাত অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা সংসারের মায়া মমতা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ফেলেন। হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তি ও বাসনা বিসর্জন দেন। আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহ মমতা ভুলিয়া যান। সংসারের কেহই তাহাদিগের ভাবনার বিষয় নহে। কাহারও প্রতি দয়া নাই, শ্রদ্ধা নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই। কাহারও জন্য এবং কিছুরই জন্য তাহাদিগের হৃদয়ে কখনো ব্যথা উপস্থিত হয় না। যদি হয়, তাহা তাহারা দমন করে। তাহারা হৃদয়কে ক্রমশ শুষ্ক ও নীরস করিয়া ফেলে। প্রথমেই যখন তাহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখনই তাহারা একদা তৎসঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল মায়া বিসর্জন দিয়াছিল। সেই মন, সেই হৃদয় তাহারা বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতে থাকে। কোনো কোমল প্রবৃত্তির অঙ্কুরমাত্র তাহাতে জন্মিতে পারে না। অঙ্কুরোৎপত্তি হইবামাত্র তাহা বিনষ্ট করে। কারণ তদ্রূপ অঙ্কুরকে স্থান দেওয়াই তাহাদিগের পক্ষে মহাপাতক। এ হৃদয় কি মানবোচিত? এ ব্যক্তিগণকে কি সংসারে স্থান দেওয়া উচিত? তাহারা সংসারের জন্য নহে, সংসারও তাহাদিগকে চাহে না। তাহারা যত শীঘ্র সংসার হইতে দূরীকৃত হয়, যত শীঘ্র তাহাদিগের পাপদৃষ্টান্ত সংসারকে স্পর্শ না করে, ততই সংসারের পক্ষে মঙ্গল ও শ্রেয়স্কর। রামমোহন রায় এ ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি এরূপ হৃদয়ে সংসারধাম পরিত্যাগ করেন নাই। এরূপ হৃদয়ে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করেন নাই। এরূপ হৃদয় লইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। এরূপ হৃদয়ে তিনি স্বদেশের মঙ্গলকার্যে ব্যাপৃত হন নাই। যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার হৃদয়কোষ স্বদেশের মমতায় ও স্বজাতির হিতকামনায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি গৃহে আসিয়া সেই পরিপূর্ণ হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হৃদয়বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সকল সম্পত্তি বিসর্জন দিয়াছিলেন, সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন এবং সকল নিন্দার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারই জন্য তিনি বিদূর বিদেশবাসে প্রাণপরিত্যাগ করিলেন।

আশ্চর্য এই, রামমোহন রায়ের হৃদয়ে এইপ্রকার সামাজিক প্রবৃত্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? যে অপবিত্র, ঘোর স্বার্থপর জনসমাজক্ষেত্রে রামমোহন

রায় বাস করিতেন, সে গগনে এ প্রবৃত্তির সুখস্পর্শ বায়ু কখনো বহিত না। যে লোকমণ্ডলীমধ্যে তিনি বাস করিতেন, সে লোকমণ্ডলীর স্বপ্নেতেও কখনো এ প্রবৃত্তির বিষয় উদয় হয় নাই। তখন ইউরোপীয় ভাব দেশমধ্যে প্রবেশলাভ করে নাই। তখন ইংরেজী সাহিত্যে রামমোহন রায় শিক্ষিত হন নাই। সাহিত্য অধ্যয়ন করিলেই এরূপ ভাব তন্মধ্য হইতে গ্রহণ করা বড সহজ লোকের কার্য নহে। রামমোহন রায় এই প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয় ছিলেন। দেশের দুরবস্থা তাঁহার এই প্রবৃত্তিরই স্ফূর্তিসাধন করিয়াছিল। এই প্রবৃত্তি ক্রমশ প্রবল হইয়া তাঁহার হৃদয়কে বলীয়ান করিয়াছিল। এই প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তাঁহার সমস্ত জীবন উত্তেজিত হইয়া কার্যময় হইয়াছিল। তিনি নিশ্চেষ্ট ও নিরীহ বাঙালি ছিলেন না। তাঁহার হৃদয়বল ও চেষ্টায় দেশশুদ্ধ আলোড়িত হইয়াছিল। তিনি স্বদেশের প্রবৃত্তিস্রোতকে ভিন্ন দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবৃত্তি তাঁহাকে একজন অসাধারণ লোক করিয়াছিল। একজন মহাজনের যশোগৌরবে উত্তেজিত করিয়াছিল। তিনি ইহারই জন্য সমগ্র বাঙালিজাতি হইতে পৃথক হইয়াছেন।

রামমোহন রায় স্বদেশহিতৈষী সন্ন্যাসী ছিলেন। ঐশ্বরিক ধ্যান ও জ্ঞানে তাঁহার সন্ন্যাস নিয়োজিত ছিল না; কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাস ঐশ্বরিক সর্বাঙ্গীণ উপাসনা। যে উপাসনা কেবল ঐশ্বরিক ধ্যানে নিঃশেষিত হয় না; যাহার প্রধান কার্য ঈশ্বরের প্রিয় কার্যসাধন করা, রামমোহন রায় সেই কার্যময় উপাসনায় বিশেষরূপে নিরত ছিলেন। এই উপাসনায় নিরত হইয়া রামমোহন রায় যেরূপ কঠিন যোগসাধন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য হইতে হয়। তিনি দিবারাত্র এই সাধনায় অনুরক্ত থাকিয়া আহার, নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি বিব্রত হইয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কার্যময় জীবনে বিশ্রান্তি ছিল না। এক কার্য সমাধা করিয়া অন্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। স্বদেশের মঙ্গল যখন যেরূপে তাঁহার নিকট উদয় হইয়াছিল, তখন তিনি সেইরূপে তাহা সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি অনেক মঙ্গল অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, অনেক মঙ্গলকার্য সাধন করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য লোক আজি পর্যন্ত জন্মে নাই বলিয়া তাঁহার প্রারব্ধিত অনুষ্ঠান-প্রণালী অবলম্বিত হইল না। তাঁহার জীবন অগ্নিময় অনুরাগে পরিপূর্ণ ছিল। এখন সে অগ্নিরাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে রাশির তাপ ও তেজঃ ক্ষুদ্র অগ্নিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক্ষণকার স্বদেশহিতৈষী কতিপয় বাঙালির

জীবনে ইহাই প্রমাণিত করে মাত্র। আমরা আজি পর্যন্ত কোনো বাঙালির জীবন রামমোহন রায়ের মতো কার্যময় ও উদ্যোগপূর্ণ দেখি নাই। সমুদায় জীবন কেবল মঙ্গলময় উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানে উৎসর্গিত দেখি নাই। কার্যের পর কার্য, অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান, ব্রতের পর ব্রতে কাহারো জীবন অবিশ্রান্তভাবে নিয়োজিত হয় নাই। বিশ্রাম কাহাকে বলে রামমোহন রায়ের জীবনে তাহা লক্ষিত হয় নাই। এই কঠিন কার্যময় যোগসাধনায় রামমোহন রায় জীবনকে উৎসর্গিত করিয়াছিলেন। বাঙালির মধ্যে এরূপ যোগী তো কখনো জন্মে নাই, অপর জাতিমধ্যেও এরূপ যোগী প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। দুঃখের বিষয় ইহার দৃষ্টান্ত আজি পর্যন্ত কোনো বাঙালি অবলম্বন করেন নাই।

যে দেশের দুরবস্থা যত, সে দেশের সন্তানগণের কার্যভার তত গুরুতর। ভারতের দুরবস্থা যত, ভারতের সন্তানগণের কর্তব্য তত কঠিনতর। এরূপ কর্তব্যজ্ঞান ভারতসন্তানগণের মধ্যে কাহার আছে? বোধ হয় রামমোহন রায়ের এই জ্ঞান অন্তরে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি ছিল। তিনি জানিতেন আমার স্বদেশ যতদূর দুরবস্থাগ্রস্ত, তাহার মঙ্গলোদ্দেশে ততদূর উদ্যোগী হওয়া আমার কর্তব্য। কিন্তু শুদ্ধ কর্তব্যজ্ঞানে রামমোহন রায় তাঁহার সদনুষ্ঠানব্রতে উত্তেজিত হন নাই। সেই জ্ঞান যে অনুরাগ আনিয়া দিয়াছিল, তাহা একটি প্রবল রিপুরূপে পরিণত হইয়াছিল। তিনি সেই রিপুবশবর্তী হইয়াছিলেন; যতক্ষণ না লোকে কোনো রিপুর বশবর্তী হয়, ততক্ষণ তাহার সমস্ত জীবনকে ব্যাপৃত করিতে পারে না। রামমোহন রায়ের জীবনে এই রিপু ক্রমশই প্রবল হইতেছিল। তিনি সেই প্রবল রিপুর বশবর্তী হওয়াতে তাঁহার সমুদায় জীবন দেশের মঙ্গলময় কার্যাবলীতে ব্যাপৃত হইয়াছিল। এই রিপু তাঁহাকে স্বদেশহিতৈষী রামমোহন রায় করিয়াছিল। আশ্চর্য রামমোহন রায়ের কার্যশক্তি, আশ্চর্য তাঁহার যোগসাধনা।

রামমোহন রায় একজন অধ্যয়নশীল লোক ছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিস্তর গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন; ইংরেজিভাষা সুন্দর জানিতেন। তদ্‌ব্যতীত তিনি চারিটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার যখন যে গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন হইত, একদিনে তাহা অধ্যয়ন করিতেন। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ তিনি এইরূপ একদিনে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নকালে তাঁহার আহার নিদ্রা মনে থাকিত না। যখন যে গ্রন্থের আবশ্যক হইত, তিনি কলিকাতাময় তজ্জন্য অন্বেষণ করিতেন, কিন্তু তিনি যে শুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য

এতদূর অনুরক্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি সুধীগণের মতো শুদ্ধ বিদ্যার প্রতি অনুরাগী হইয়া অধ্যয়নশীল হয়েন নাই। তিনি যে মহৎ লক্ষ্যে সমুদায় জীবনকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন, অধ্যয়নশীলতা ও জ্ঞানলাভ তাহার অন্যতর উপায়মাত্র ছিল। ইহা তাঁহার একটি প্রধান উপায় ছিল। তাঁহার শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করিবার এই প্রধান উপায় ছিল। তিনি ইহা দ্বারা প্রতিবাদিগণকে পরাস্ত ও নীরব করিয়া সত্যজ্ঞান ও ধর্মের প্রচার করিতেন। পৃথিবীতে সত্যের পতাকা দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিতেন।

রামমোহন রায়ের জীবনে একটি সুন্দর শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত আছে। হৃদয়ভাব ক্রমশ কেমন প্রসারিত হয়, প্রীতি ক্রমশ কেমন বর্ধিত হয়, স্বদেশহিতৈষণা ও স্বজাতিপ্রেম ক্রমশ কেমন বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয় ইহা রামমোহন রায়ের জীবনে সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে। রামমোহন রায় প্রথমে স্বদেশের ধর্মসংস্করণে প্রবৃত্ত হন। সেই ধর্মসংস্করণকার্যে তাঁহাকে যে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার হৃদয়ানুরাগ ক্রমশ প্রগাঢ় হইয়াছিল। সেই কার্যে তিনি আরো দৃঢ়রূপে ব্রতী হইয়াছিলেন। যাহাতে সামান্য জনগণকে নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যোগী করে, তাহাতে রামমোহন রায়কে দ্বিগুণতর উদ্যোগ ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছিল। মহজ্জনগণের জীবনের এই একটি সুন্দর ভাব। উৎপীড়নে তাঁহাদিগের সদনুরাগ ক্রমশ বর্ধিত হইতে থাকে। রামমোহন রায়ের এই বর্ধিত অনুরাগ শুদ্ধ স্বদেশীয় ধর্মসংস্করণে নিঃশেষিত হয় নাই। ইহা ক্রমে স্বদেশহিতৈষণায় উত্থিত হইয়াছিল। যাহা প্রথমে ধর্মে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সামাজিক মঙ্গলমাত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। ধর্মসংস্কারক ক্রমে স্বদেশহিতৈষী পেট্রিয়টের মহৎকার্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। স্বদেশের সর্ববিধ মঙ্গল রামমোহন রায়ের আলোচ্য হইয়াছিল। ধর্মীয় হিতকামনা সামাজিক হিতকামনায় উন্নত হইল। তাঁহার হস্ত স্বদেশের সর্ববিধ মঙ্গলকার্যে প্রসারিত হইল। যে হৃদয়াকাশে সন্ধ্যাকালে কেবল একটিমাত্র উজ্জ্বল তারকা ফুটিয়াছিল, সেই হৃদয়াকাশে ক্রমশ সহস্র তারকা একে একে প্রস্ফুটিত হইল। অবশেষে তাহা বিশ্বপ্রেমের চন্দ্রালোকে আলোকিত হইয়া গেল। যে রামমোহন রায় একদিন শুদ্ধ স্বদেশের মঙ্গলোপায় ভাবিতেন, সেই রামমোহন রায় পরে ইংরেজ ও ফরাসীসমাজের উন্নতিকল্পনায় একদিন মস্তক আলোড়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যখন রামমোহন রায়ের বিশ্বপ্রেমপ্রবৃত্তি কেবলমাত্র সঞ্জাত হইতেছিল তখনই তিনি

কালগ্রাসে পতিত হইলেন। আমরা তাঁহাকে স্বদেশহিতৈষী বলি, বিদেশীয়গণ তাঁহাকে বিশ্বপ্রেমিক বলেন। বিদেশীয়গণ অবশ্য তাঁহার বিশ্বপ্রেমের বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইয়াছেন। যদিও স্বদেশ তাঁহার মনকে এত অধিকার করিয়াছিল যে, তজ্জন্য তাঁহার বিশ্বপ্রেম স্ফূর্তি পাইতে পারে নাই, তথাপি আশ্চর্য এই, বিদেশীয়গণের নিকট তাঁহার সার্বভৌমিক প্রীতির এতদূর পরিচয় হইয়াছিল যে, তাঁহারা তাঁহাকে একজন বিশ্বপ্রেমিক নামে অভিহিত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

আমরা রামমোহন রায়ের অনেকগুলি গুণের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এই সমস্ত গুণ তাঁহার জীবনীতে সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই তাহা দেখিতে পান। এক্ষণে রামমোহনের নাম প্রধানত যে জন্য এদেশমধ্যে সুপ্রচারিত আছে তাহারই বিষয় আলোচনা করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। দুই কারণে রামমোহনের নাম ভারতমধ্যে সুবিখ্যাত হইয়াছে। তিনি এদেশে প্রকৃত ও বৈদিক হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা প্রবর্তিত করেন এবং তৎপরে একেশ্বরের সার্বভৌমিক সামাজিক পূজার পরিস্থাপনা করিয়া যান। এই দুই কার্যে তিনি যে শুদ্ধ এতদ্দেশীয় ধর্মীয় জগৎকে আলোড়িত করিয়াছেন এমত নহে, সেই জগতের প্রবৃত্তিস্রোতকে বিভিন্ন দিকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া দিয়াছেন। বলিতে গেলে, তিনি এদেশের ধর্মীয় জগতে এক মহাবিপ্লবসাধন করিয়াছেন।

বৈদিকসাহিত্যের আলোচনা এদেশে বহুকাল হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিরূপে ও কোন্ সময় হইতে এরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা আজি নিরূপণ করা একপ্রকার অসাধ্য কার্য। পূর্বে যাহা-কিছু ছিল, কিন্তু মুসলমানরাজত্বকালে ত্রয়ীবিদ্যার আলোচনা একেবারে প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেও বলা যাইতে পারে। ধর্মানুষ্ঠানে যে-সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের আবশ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শুদ্ধ সেই শাস্ত্রের আলোচনা করিত। এমত কি, মনুর স্মৃতিশাস্ত্র যে ক্রিয়াকাণ্ডের নিদানভূত, সেই স্মৃতিরও মতামত সর্বসময় পরিগৃহীত হইত না। সুতরাং তাহারও আলোচনা ক্রমশ বিলোপ হইয়াছিল। এ-সমস্ত শাস্ত্রের স্থানে, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্য এবং কথঞ্চিৎ বৈষ্ণবগ্রন্থাদির আলোচনা প্রবর্তিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় যে সময়ে উদিত হন, তখনকার কালে বঙ্গদেশে শাস্ত্রালোচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সময়কার অবস্থা সমালোচ্য গ্রন্থের একস্থানে সুন্দর বর্ণিত আছে। আমরা

সে স্থলটি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠকগণ, তখনকার অবস্থার সহিত এখনকার সামাজিক অবস্থা তুলনা করিয়া দেখুন।

"রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে-সকল ধর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই-সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদিদ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থিরবিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাকহবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশঃ সর্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্যালয়ে যাইবার পূর্বেই সন্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন; এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন; তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তখন সংবাদ-পত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশবিদেশের ভালোমন্দ সকলপ্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন। বিশেষত কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্বত্র কীর্তন এবং ধনদাতাদিগের যশঃ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসালাভের আশ্বাসে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র

ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্য-বিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে, নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন, কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যে তো কোনপ্রকার বিদ্যাচর্চা ছিল না। চলিত বাঙালা-ভাষায় ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক, কাহারও বর্ণাশুদ্ধিজ্ঞান ছিল না। বিষয়কর্মের উপযোগী পত্র লেখা ও অঙ্ক জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারসী পড়িতে ও ইংরেজি অক্ষর ভালো করিয়া লিখিতে পারিতেন, তাঁহারা বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙালা পুস্তকের মধ্যে কেবল চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ; এ সকলই পদ্যের, গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না। বুলবুলি ও ঘুড়ির খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বিন্ সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবিরখেলার ন্যায় নন্দোৎসবের গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকী-প্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই।"

বঙ্গদেশের যখন এইরূপ অবস্থা, রামমোহন রায় তখন জন্মগ্রহণ করেন। দেশ যখন অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ, রামমোহন রায় তখন শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করেন। অতি তরুণ বয়সেই পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ জন্মে এবং সেই পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হয়েন। ইহার ফলাফল যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সকলেরই বিদিত আছে। যাহাতে তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারেন এরূপ গ্রন্থাদি তিনি নানাদেশে গিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহারই সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি স্বদেশীয়গণের মন সেই-সকল এক ব্রহ্ম-

প্রতিপাদক গ্রন্থাদির প্রতি প্রথম আকৃষ্ট করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন পুরাণাদির অলীক মতামতসমূহ দেশমধ্যে এতদূর সুপ্রচারিত যে, তাহাতে ধর্ম ও ঈশ্বরসম্বন্ধীয় প্রকৃততত্ত্ব সমুদায় একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যে মূল বৈদিকশাস্ত্রে, উপনিষদে ও দর্শনাদিতে সেই প্রকৃততত্ত্ব সমুদায় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার আলোচনা দেশমধ্যে কিছুই নাই। অথচ হিন্দুজাতির তাহাই প্রধান ও মূল শাস্ত্র। এজন্য তিনি সেই শাস্ত্রের প্রতি যাহাতে সাধারণ জনগণের মন আকৃষ্ট হয় এমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা যে বিফল হইয়াছে এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। যেহেতু তাঁহারই সময় হইতে বেদ ও দর্শনাদির আদর বৃদ্ধি হইয়াছে।

মাস্টার ফেয়ারবেয়ার্ন (Fairbairn) বলেন* যে, আর্যজাতির শাস্ত্রমধ্যে যে একেশ্বরবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সহিত সেমেটিকজাতীয় ধর্মশাস্ত্র-নিহিত একেশ্বরবাদের একটু বিভিন্নতা আছে। তিনি কহেন, আর্যজাতীয় ধর্মশাস্ত্রের মূল প্রকৃতিপূজা। আদিতে এই প্রকৃতিপূজাই প্রচলিত ছিল। প্রকৃতিপূজা হইতে আর্যজাতি একেশ্বরবাদে উত্থিত হয়েন। এজন্য তিনি বলেন যে, যদিও আমরা দেখিতে পাই যে, আর্যজাতীয় একেশ্বরবাদে ঈশ্বরে একত্ব ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু যে সেমেটিকজাতীয় ধর্মশাস্ত্রে যেমন বলে যে, সেই এক ঈশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই, দেব, দেবতা সকলই মিথ্যা, একেশ্বরবাদের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব আর্যজাতীয় ধর্মে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর্যশাস্ত্রে যেমন একদিকে বলিয়াছে ব্রহ্ম একমাত্র, অন্য দিকে বলিয়াছে তাঁহার সহস্র অবতার। কিন্তু সেমেটিকজাতীয় ধর্মে এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় দেবতার অস্তিত্ব ও অবতারণ অসম্ভব। জিসস এই একেশ্বরবাদ শিক্ষা দেন। মহম্মদ ইহার প্রধান উপদেশক।† ফেয়ারবেয়ার্নের এ-সমস্ত কথা কতদূর সত্য তাহা এ-স্থলে আলোচিত হইতে পারে না। তাহা একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবের বিষয়। কিন্তু

* In his *Studies on the Philosophy of Religion*

† Mr. Fairbairn traces upwards Indo-European religion from its more complete to its simpler forms until he finds it in that condition which is generally understood by the word Monotheism, but which, it must be admitted is more accurately designated as Heuotheism, the affirmative belief in one God without the sharply defined exclusive line, which makes it a belief in Him as the only God. This latter form of Monotheism proper may be rather the semetic than the Aryan Conception —W. E. Gladstone,

রামমোহন প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আর্যজাতির ধর্মেও ফেয়ারবেয়ার্ন যাহাকে সেমেটিকজাতীয় একেশ্বরবাদ বলেন, তাহা সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। তিনি এক নিরাকার ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাই এই বৈদিক মতদ্বারা পৌত্তলিকতার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাঁহারা সেই বেদাদি হইতেও দ্বিতীয় ব্রহ্ম অথবা দেবতার কল্পনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহাদিগের বিপক্ষে আপন মত সমর্থন করিয়াছেন। তবে রামমোহনের যুক্তি সমুদায় কতদূর শাস্ত্রসংগত তাহা এখনো সমালোচ্য হইতে পারে। এমত হইতে পারে যে, রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় মত মহম্মদীয় অথবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম হইতে প্রথমে গৃহীত হইয়া থাকিবে; তৎপরে তিনি সেই মত হিন্দুধর্মে আরোপ করিয়া তাহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক শাস্ত্রে একমাত্র অদ্বিতীয়ের স্বরূপনিরূপণ যেরূপই হউক-না কেন, উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্রে ঐশ্বরিক কল্পনা যে অতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু দার্শনিক ঈশ্বর যত কেন পরিস্ফুট-রূপে পরিব্যক্ত হউক না, তাহা কেবল কল্পনা ও নীরস চিন্তার বিষয়মাত্র ছিল, তাহা কেহ কখনো পূজার বিষয় করেন নাই। পাতঞ্জলের ঈশ্বরভক্তি কখনো পূজাতে পরিণত হয় নাই। তাহা কেবল শুদ্ধ ঈশ্বরকল্পনা করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু দার্শনিক ঈশ্বরকল্পনা ও পূজার ঈশ্বর এ দুই বিভিন্ন ভাব। দার্শনিকতত্ত্বে ঈশ্বরের অনেক স্বরূপ নিরূপণ হইয়াছে বটে, কিন্তু কোনো মুনি, ঋষি আজি পর্যন্ত ভারতবর্ষে ঐশ্বরিক পূজাপ্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। ঈশ্বরকে কেহ ব্যক্তিস্বরূপ দর্শন করে নাই। দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বরের একত্ব অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহা কেবল মতখণ্ডনমাত্র। কোনো উপনিষদ বা দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতা ঐশ্বরিক ধর্মস্থাপন করিয়া যান নাই। ধর্মের ঈশ্বর পূজার বিষয়, কিন্তু দর্শন ও তত্ত্ব বিদ্যার ঈশ্বর কেবল চিন্তার ফলমাত্র।*

রামমোহন রায় এই বৈদিক ও দার্শনিক ঈশ্বরকে পূজার বিষয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি উপনিষদ ও দর্শনের ঐশ্বরিক তত্ত্ব কেবল নিরূপণ ও

* Mr. Fairbairn recognises the tendency of the semetic races to Monotheism, and considers that Indo-European man not only has been tolerant of the different gods of different nations, but has conceived the Divine Unity as abstract, while the semite holds it as personal. The Indo-European tendency was to religious multiplicities, but to philosophic unities. The God of a religion is an object of worship, the deity of philosophy is product of speculation. —W. E. Gladstone.

উৎঘোষণ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সেই শুষ্ক ও নীরস চিন্তার বিষয়কে পূজার সামগ্রী করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি দর্শনশাস্ত্র হইতে ঈশ্বরকে বিমুক্ত করিয়া দেবালয় ও মন্দিরে বেদীর উপর তাঁহাকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "রামমোহন রায় নূতন কি করিয়া গিয়াছেন? নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কি নূতন? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে ভক্তিভাজন মহর্ষিগণ নিরাকার ব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ অনুভব করিয়াছিলেন।" অনুভব করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে তাঁহার অর্চনাপ্রণালী কেহ স্থাপন করিয়া যান নাই। এদেশে দেবাদির অর্চনাপ্রণালী যেমন প্রবর্তিত আছে একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী সেরূপ প্রবর্তিত করিতে কোনো মুনি ঋষি কখনো যত্ন করেন নাই। বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর ছিল। অথবা তাহা বৌদ্ধদের উপাসনা-প্রণালী মাত্র। রামমোহন যথার্থ একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী প্রবর্তিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। ভারতে এই তাঁহার নূতন কার্য। আশ্চর্য এই, যে ভারতে ঐশ্বরিকতত্ত্বের চরম সীমায় মানবচিন্তা উত্থিত হইয়াছে সে ভারতে কখনো ঐশ্বরিক পূজা বিদ্যমান ছিল না। যদি থাকে, তাহা সাধারণ্যে প্রচলিত হয় নাই। আশ্চর্য এই যে, ভারতে ঈশ্বর-চিন্তা এতদূর উন্নত হইয়াছে যে, আজিও ইউরোপীয় দর্শন তদূর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই, সেই ভারত চিরকাল পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ ছিল! আশ্চর্য এই, যে মুনিঋষিগণ ঐশ্বরিক ভাবে ততদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনো নিজ নিজ নবভাবে মোহিত হইয়া দেবপূজাস্থলে একেশ্বরের অর্চনা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। সে কার্যের জন্য যে একজন রামমোহনের আবশ্যক হইবে এই আশ্চর্য। দুইসহস্র বৎসর মধ্যে ভারতে কি এমত কেহ জন্মেন নাই যে এই কার্য সম্পন্ন করিয়া উঠেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্মে প্রকৃত ঐশ্বরিক পূজা নাই। নিজে জিসস ও তদীয় শিষ্যগণ যে ঐশ্বরিক পূজা প্রতিষ্ঠা করিতে মানস করিয়াছিলেন, খ্রীস্টানেরা সে ঐশ্বরিক পূজাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। মহম্মদীয় ধর্মে কেবল ঐশ্বরিক পূজা আছে। কিন্তু সে ঐশ্বরিক পূজায় নিতান্ত অনুদার মুসলমান ভিন্ন অন্য কেহ অধিকৃত নহে। মহম্মদীয় ঐশ্বরিক কল্পনাও তত বিশুদ্ধ নহে। তদপেক্ষা জিষুসের ও হিন্দুশাস্ত্রীয় ঐশ্বরিক কল্পনা অধিকতর বিশুদ্ধ ও পবিত্র। রামমোহন যে ঐশ্বরিক কল্পনা গ্রহণ করেন তাহা সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রসংগত। তিনি দেখিয়াছিলেন, আমাদিগের উপনিষদ ও দর্শনেও যখন সে কল্পনা অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্ররূপে পাওয়া যায়, তখন অন্য ধর্মের কল্পনা গ্রহণ করা অন্যায়।

তিনি এই উপনিষদের ঈশ্বরের উপাসনা জন্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এক্ষণকার ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায়ের সুমহৎ কীর্তিস্তম্ভ।

ভারতে ঐশ্বরিক উপাসনা প্রণালী প্রতিষ্ঠা করা নূতন কার্য হইলেও জগতে তাহা নূতন কার্য নহে। জগতের মধ্যে রামমোহন রায় কি নূতন কার্য করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায়-প্রবর্তিত একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী মধ্যেও একটি নূতন ভাব বিদ্যমান আছে। আমাদিগের গ্রন্থকার রামমোহন রায়ের সেই প্রধান ভাবটি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:

"মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, নানা মহৎ ভাবের মধ্যে একটি ভাব প্রধান হইয়া তাঁহাদিগের জীবনপথের নেতাস্বরূপ হয়। তাঁহারা যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন, সেই ভাবটি তন্মধ্যে মধ্যবিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে। 'আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন' উপনিষদকারদিগের ইহাই প্রধান ভাব। 'বিশ্বব্যাপী মৈত্রী' বুদ্ধদেবের ইহাই প্রধান ভাব। 'আপনাকে আপনি জান,' সক্রেটিসের ইহাই প্রধান ভাব। 'একমাত্র ঈশ্বরের পূজা, অপর সকল দেব পূজার প্রতিবাদ' মহম্মদের ইহাই প্রধান ভাব। 'ধর্ম-চিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' লুথরের ইহাই প্রধান ভাব। 'ভক্তিতেই মুক্তি' চৈতন্যের ইহাই প্রধান ভাব। 'মানব-প্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি' থিওডোর পার্কারের ইহাই প্রধান ভাব। সেইরূপ রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব 'সার্বভৌমিক উপাসনা।' কেবল তাহাই নহে, সেই সার্বভৌমিক উপাসনার জন্য সমাজপ্রতিষ্ঠা, এটিও জগতের পক্ষে নূতন। দ্বিতীয় ভাবটী প্রথম ভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ভাবের মৌলিকত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।"

রামমোহন রায়ের এই উদার ভাব তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ট্রস্টডীডে প্রকাশিত আছে। তিনি এইরূপ উদারভাবে এক ব্রহ্মের প্রকাশ্য উপাসনালয় স্থাপন করিয়া ভারতে অক্ষয়কীর্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। আজি সেই ব্রাহ্মসমাজ নানা শাখাবিশাখায় বিস্তৃত হইয়া ঈশ্বরের যশোঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের সুমহৎ জীবনের পরিচয় দিতেছে। এই ব্রাহ্মসমাজের সহিত রামমোহন রায়ের নাম পৃথিবীতে চিরদিন অবস্থান করিবে।[১]

১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (প্রথম সংস্করণ) গ্রন্থের সমালোচনা। অধ্যাপক শ্রীনিখিলেশ গুহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

যুগ-প্রবর্তক রামমোহন

বিপিনচন্দ্র পাল

রাজা রামমোহন হইতেই বাংলার নবযুগের সূচনা, অনেকে এ কথা কহিয়া থাকেন। কথাটা সত্য বলিয়া মনে হয়। রাজাই প্রথমে বাংলার সনাতন স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি ও মানবতাকে বর্তমানের উপযোগী করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন। জীব যেমন জাগে ও ঘুমায়, সমাজও সেইরূপ এক-একবার জাগিয়া উঠিয়া আপনার লক্ষ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার সেই লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়ে। নিদ্রাটা তমোগুণের প্রাবল্যহেতু আমাদিগকে আসিয়া আচ্ছন্ন করে। কোনো জাতি যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন এই তমোগুণের দ্বারাই সে একান্ত অভিভূত হয়। আলস্য, অজ্ঞানতা, এ-সকলই তমের লক্ষণ। তম-অভিভূত হইলে সমাজ যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাতেই গা ঢালিয়া দেয়। ধর্ম এবং কর্ম উভয়েই তখন প্রাচীন নেমি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া একান্ত গতানুগতিক হইয়া পড়ে। শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য তখন বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেখানে জিজ্ঞাসাই জাগে না সেখানে বিচারের অবসর কই? আমাদের সমাজও রাজা রামমোহনের সময়ে এই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ লোকে ধর্মটাকে অন্তরের অনুভবের উপরে গড়িয়া না তুলিয়া বাহিরের আচার-বিচার দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্র যে বেদ, পণ্ডিতেরা এবং জনসাধারণ মুখে ইহা মানিতেন, কিন্তু বেদের অধ্যয়ন দেশে লোপ পাইয়া গিয়াছিল; স্মৃতি এবং পুরাণই ধর্মের প্রামাণ্য-শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই-সকল স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা আছে। এই-সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া পুরাণের স্মৃতির উদ্‌ঘাটন ও মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা কেহ করিতেন না, নিজেদের সুবিধামত শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিতেন মাত্র। রাজা রামমোহনের সঙ্গে যে-সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার হয় তাহা পড়িতে পড়িতে দেশের সেকালের লোক-চিন্তার ও লোক-প্রবৃত্তির এই ছবিটাই চক্ষের উপরে পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠে।

এই অবস্থায় রাজা রামমোহন বাংলার সেই চির-প্রাচীন এবং চিরপরিচিত, কিন্তু সম্প্রতি বিস্মৃত, স্বাধীনতা ও মানবতার মন্ত্র জপিতে জপিতে কর্মক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইলেন। রাজার এই চৈতন্য ইংরাজি শিক্ষার প্রেরণায় জাগে নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সঙ্গে বিচারে, কিংবা তিনি যে বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার করেন তাহার ভূমিকায়, অথবা অন্যান্য ধর্মপুস্তিকায় এমন-কি তাঁহার সামাজিক আলোচনাতেও ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ সকল ক্ষেত্রে রাজা সর্বত্রই স্ব-জাতির পুরাগত শাস্ত্র প্রামাণ্যের উপরেই আপনার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইংরাজি শিক্ষা আমাদিগকে এই পথ দেখাইয়া দেয় নাই।

যে ইংরাজি শিক্ষা এদেশে প্রথম প্রবর্তিত হয় তাহার উপরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ফরাসি যুক্তিবাদের ছাপ পড়িয়াছিল। এই শিক্ষা যুক্তিকেই বস্তুজ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা বলিয়া আমাদের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজিনবিশেরা প্রায় সকলেই এই যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা এরূপ যুক্তিবাদ অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু যুক্তি এবং শাস্ত্রের পরস্পরের বিরোধ মিটাইয়া যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রার্থকে নিষ্কাশিত ও শাস্ত্র দ্বারা যুক্তিকে সুদৃঢ় করিয়া, যুক্তি এবং শাস্ত্র – উভয়ের সমন্বয়ের উপরে আপনার সিদ্ধান্ত ও মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।

শাস্ত্র তো কথা; কথা তো বস্তুর অর্থাৎ যাহা আছে বা হইয়াছে তাহার সাংকেতিক চিহ্ন মাত্র; যাহা আছে বা হইয়াছে তাহা আছে কি নাই, হইয়াছিল কি না, ইহার প্রমাণ মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভব। সুতরাং শাস্ত্রীয় কথার প্রামাণ্য প্রকৃতপক্ষে সে নিজে নয়, কিন্তু সাধকের অনুভূতি। যতক্ষণ না শাস্ত্রোপদেশ সাধকের অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ হইয়া ফুটিয়া উঠে ততক্ষণ তাহার সত্য এবং প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, ততক্ষণ শাস্ত্র অজ্ঞাত-অর্থ ধ্বনির মতো পড়িয়া থাকে। যাজ্ঞিকেরা কর্মকাণ্ডে শাস্ত্রের প্রামাণ্য এইরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে জ্ঞান-সাধনার মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। যতক্ষণ না বস্তুর অনুভব হয় ততক্ষণ তাহা জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না। কারণ "অনুভূতি পর্যন্তম্ জ্ঞানম্"— অনুভূতিতে যাহা শেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহাই জ্ঞান। এইজন্যই জ্ঞানকাণ্ডের পথ – শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। কেবল শ্রবণ নহে, শাস্ত্রের শব্দ শুনিলেই জ্ঞান জন্মে না। শ্রবণের পরে মনন চাই। মনন অর্থ, বিচারপূর্বক শ্রুত শাস্ত্রের বা উপদেশের অর্থের ধারণা লাভ করা। এখানেই জ্ঞান-সাধনে বিচারের প্রতিষ্ঠা হইল। বিচারের বাহন যুক্তি।

সুতরাং জ্ঞানের পথে যে চলিবে সে যুক্তি ছাড়িয়া এক পা'ও অগ্রসর হইতে পারে না। এই বিচারের লক্ষ্য, শাস্ত্রে যাহা শোনা গেল, অনুভবেতে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করা।

রাজা এই প্রাচীন পথ ধরিয়াই শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়সাধন করিয়া বাঙালি হিন্দুর ধর্মকে তাহার অনুভবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজার যুক্তিবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের অনুকরণে গড়িয়া উঠে নাই। রাজা আমাদের প্রাচীন মীমাংসার পথ ধরিয়া য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা ও অসম্যক দৃষ্টি নষ্ট করিতেই চাহিয়াছিলেন। রাজার বিচার-পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তাদি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই, আধুনিক ইংরাজিশিক্ষা যে তাঁহাকে সংস্কার-ব্রতে উদ্‌বুদ্ধ করে নাই, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলত, ইংরাজি বর্ণমালার প্রথম অক্ষরের জ্ঞানলাভ করিবার পূর্বেই রামমোহন আপনার জীবন-ব্রত গ্রহণ করেন।

তাঁহার জীবনের প্রথম প্রেরণা আসে মুসলমান যুক্তিবাদী মোতাজেলা সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি পড়িয়া। রামমোহন তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকমাত্র বলিলেও হয়। পাটনায় পারসী বা আরবী পড়িতে যাইয়া মুসলমান সাধনার সংস্পর্শে তাঁহার অন্তরে দেশের প্রচলিত দেব-বাদ ও প্রতিমা-পূজার বিরোধী ভাবের সঞ্চার হয়। 'তুফাতুলমহাউদ্দীন' নামক পুস্তিকায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাটনা হইতে রাজা সংস্কৃত পড়িবার জন্য কাশীতে যান। এইখানেই উপনিষদ্‌ ও মীমাংসাশাস্ত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইহার বহুদিন পরে রাজা ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করেন। রাজা বাংলাদেশে ইংরাজি শিক্ষার একজন আদি প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তখনো য়ুরোপীয় সাধনার পূর্ণজ্যোতিঃ এ দেশে ফুটিতে আরম্ভ করে নাই। রাজার অলোকসামান্য মনীষা তাহার কতকটা আভাস পাইয়াছিল সত্য। লর্ড আমহার্স্ট‌কে তিনি যে পত্র লেখেন তাহাতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার পূর্ব হইতেই রাজা নূতন করিয়া বাংলাদেশে আমাদিগের পুরাতন স্বাধীনতা ও মানবতার দুন্দুভিনাদ করিতে আরম্ভ করেন। এই-সকল তলাইয়া দেখিলে রামমোহন যে যুগের প্রবর্তনা করেন, তাহাকে কিছুতেই ইংরাজযুগ বা ফেরঙ্গযুগ বলা যায় না। যে সূত্র অবলম্বনে রাজা প্রচলিত হিন্দুধর্মের জঞ্জাল কাটিতে আরম্ভ করেন সেই সূত্র অবলম্বনেই শ্রীরামপুরের পাদরিদের সঙ্গে বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে তাঁহার Three Appeals to the Christian Public গ্রন্থে প্রচলিত খৃষ্টীয়ান

ধর্মেরও জঞ্জাল কাটিতে চেষ্টা করেন। এদিকে প্রচলিত হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং অন্য দিকে প্রচলিত খৃস্টধর্মের পৃষ্ঠপোষক পাদরি— এই উভয় দলের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া রাজা সত্যপ্রতিষ্ঠার ও শাস্ত্রার্থনির্ণয়ের যে-সকল মূলসূত্র স্থাপন করেন তাহাতে কেবলই যে তাঁহার অলৌকিক মৌলিকতাই প্রমাণিত হয় তাহা নহে, কিন্তু রাজা ভারতের প্রাচীন সাধনা ও অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়াইয়াই যে এই সংস্কারকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহাও প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা এ-সকল তলাইয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা কিছুতেই রাজা রামমোহনকে পরবর্তী ইংরাজিনবিশ বাঙালিদিগের মতন বিদেশীয়ের অনুকরণশীল, বিদেশী প্রভাবের দ্বারা অভিভূত, আপনার স্বদেশের সনাতন-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানশূন্য, মামুলী ধর্ম বা সমাজসংস্কারক বলিতে পারেন না। রাজা বর্তমান যুগের যুগসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং একদিকে প্রাচীনের সূত্র দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া, অন্যদিকে নিজের স্বজাতির সাধনার সনাতন কষ্টিপাথরে য়ুরোপের আগন্তুক সাধনাকে কষিয়া, উভয়ের সম্মিলন ও সমন্বয়ের উপরে এ দেশে বর্তমান নূতন যুগের, নূতন সাধনার গোড়াপত্তন করিয়া যান। এইজন্যই রাজা রামমোহনকে বাংলার নবযুগের প্রবর্তক বলিতেছি।

২

যে বেদশাস্ত্রের উপরে হিন্দু আপনার ধর্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করে সেই বেদই যে জগতের সনাতন সত্যকে মানবের অনুভবসাপেক্ষ করিয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্যই, মনে হয়, রাজা রামমোহন উপনিষদ্ ও বেদান্ত-সূত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। রাজা ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক, ও মাণ্ডুক্য— এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ও বাংলা অনুবাদ প্রচার করেন। আর এই ক'খানি উপনিষদেই মোটের উপরে বিশ্বের পরমতত্ত্ব ব্রহ্মবস্তুকে সাধারণ মানবের সাধারণ অনুভবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; শাস্ত্রপ্রামাণ্যের উপরে করে নাই। অন্য পক্ষে 'কেন' উপনিষদ্ সুস্পষ্ট ভাষায় বেদাদিশাস্ত্রকে নিকৃষ্ট বিদ্যা এবং যাহা দ্বারা ব্রাহ্মণকে জানা যায় তাহাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়াছেন। সুতরাং তত্ত্ববস্তুর প্রামাণ্য বেদ নহে, কিন্তু তাহা, যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়। ব্রহ্মকে জানা যায় দুই উপায়ে—এক, জগৎকার্য দেখিয়া; অপর, সমাধি-যোগে। সৃষ্টি আলোচনা করিয়া ব্রহ্মকে জগৎরূপ কার্যের কর্তারূপে দেখিতে পাওয়া

যায়। সাধারণের পক্ষে ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশস্ত পথ। বেদান্ত-সূত্র এই পথই প্রথমে নির্দেশ করিয়াছেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" জগতের জন্ম, স্থিতি এবং লয় যাহা হইতে তাহাই ব্রহ্ম— বেদান্ত এই বলিয়াই ব্রহ্মমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উপনিষদ্ কহিয়াছেন যে সাধকের ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন এবং বুদ্ধি ইহাই ব্রহ্ম-সাধনের পথ। ভৃগু-বারুণী সংবাদে এই পথই নির্দেশ করা হইয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয়-সকলের দ্বারা আমরা সর্বদাই ইহা দেখি যে যাহা ছিল না, তাহা হইল, যাহা হইল তাহা রহিল, আর যাহা রহিল তাহাও ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই তিন অবস্থাকেই বেদান্ত জন্মাদি কহিয়াছেন। এই যে সার্বজনীন অভিজ্ঞতা, মন এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহার বিশ্লেষণ করিতে করিতেই বরুণ-পুত্র ভৃগু ক্রমে ব্রহ্ম-তত্ত্বে উপনীত হন।

একটু ভাবিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ভৃগু বারুণী সংবাদে উপনিষদ্ ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের যে প্রশস্ত পথ নির্দেশ করিয়াছেন সে পথে, ভারতের প্রাচীন ব্রহ্ম-তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার জড়-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের আশ্চর্য মিল হইয়াছে। বরুণ-পুত্র ভৃগু ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সে বস্তু কী, যাহা হইতে জগতের জন্ম আদি হইতেছে, তপস্যা দ্বারা তাহার সন্ধান করিতে যাইয়া সর্ব প্রথমে অন্নই ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই অন্নের সত্য অর্থাৎ অনুভবপ্রতিষ্ঠ অর্থ কেবল প্রাকৃত অন্ন বা খাদ্য নহে, কিন্তু এই বিশ্বের প্রত্যক্ষ জড় উপাদানসমূহ। সূক্ষ্ম জড় হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, এই জড়ের দ্বারাই বিশ্বের স্থিতি, এই সূক্ষ্ম জড়েতেই বিশ্বের পরিণতি বা লয়, অন্ন-ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের ইহাই নিগূঢ় মর্ম। এই সিদ্ধান্ত জড় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। আমাদিগকে বর্তমানে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের জন্য প্রথমে বরুণ পুত্র ভৃগুর ন্যায় এই জড়-বিজ্ঞানের পথই অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকল জড়কে গ্রহণ করে, জড়েতেই সঞ্চরণ করে, জড়কে পাইয়া আনন্দ উপভোগ করে। এই জড়-জগৎ একান্ত মিথ্যা নহে। এই জড়-জগতেই আমরা ব্রহ্মকে বিশ্বের অনাদি-আদি কারণরূপে, আদ্যাশক্তি-রূপে, জগদম্বা-রূপে, কারণজলে ভাসমান ব্রহ্মাণ্ডের মূল অণ্ডরূপে, প্রত্যক্ষ করি। এই কারণব্রহ্মই ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রথম বনিয়াদ। অন্ন-ব্রহ্মকে প্রথমে না জানিয়া প্রকৃতপক্ষে একেবারে বিজ্ঞান-ব্রহ্মকে জানা যায় না।

কিন্তু ভৃগু যেমন এই সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ, যাহার দ্বারাই অন্নের সার্থকতা

সম্পাদিত হয়, সেই প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ জড়-বিজ্ঞানের ভূমি হইতে উঠিয়া জীব-বিজ্ঞানের ভূমিতে ব্রহ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভৃগু প্রাণ-ব্রহ্মের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া, ক্রমে যে মনেতে প্রাণের প্রামাণ্য, সেই মনকে ব্রহ্ম বলিয়া ধরেন। এ পথ মনোবিজ্ঞানের পথ। কিন্তু মন এবং তাহার অধীন জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল প্রকৃতপক্ষে বস্তুর খণ্ড জ্ঞানই লাভ করে, সমগ্র বস্তুকে যুগপৎ গ্রহণ করিয়া তাহার একত্ব ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। এই একত্ব অনুভব করা মনের অধিকারের বাহিরে। যে বৃত্তি-দ্বারা আমরা মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে অখণ্ড বস্তু রূপে গাঁথিয়া তুলি, তাহার নাম বিজ্ঞান। ভৃগু মনই ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া, ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেই বিশ্ব-সমস্যার শেষ মীমাংসা হইল না। এই বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদিগের অভিজ্ঞতার সকল প্রকোষ্ঠই খুলিতে পারি, কেবল একটিমাত্র প্রকোষ্ঠ বিজ্ঞানের চাবি দিয়া খোলা যায় না। সেই প্রকোষ্ঠটি আনন্দের প্রকোষ্ঠ। এইরূপে পরিণামে জড় হইতে আরম্ভ করিয়া ধাপে ধাপে ভৃগু ব্রহ্মানন্দের যে অভিজ্ঞতা তাহাতে যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ভৃগু-বারুণী সংবাদের ব্রহ্ম সাধনের সংকেতটি ভালো করিয়া ধরিতে পারিলে এখানে আধুনিক যুরোপীয় সাধনার সঙ্গে ভারতের সনাতন ব্রহ্ম সাধনার অদ্ভুত সম্মিলন ও সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভৃগুর অন্ন-ব্রহ্ম আধুনিক যুরোপের physico-chemical group of the sciences-এর চরম সিদ্ধান্ত মাত্র। এই সংবাদের প্রাণ-ব্রহ্ম যুরোপের biological group of the science-এর চরম সিদ্ধান্তের নামান্তর মাত্র। সেইরূপ ভৃগুর মনো-ব্রহ্ম আধুনিক Psychological group of the sciences-এর শেষ সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভৃগুর বিজ্ঞান ব্রহ্ম এবং আনন্দ-ব্রহ্ম আধুনিক সাধনার philosophy এবং art-এর চরম সিদ্ধান্তেরই নামান্তর মাত্র। রাজা এ-সকল কথা কোথাও খুলিয়া বলিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু একদিকে তাঁর বেদান্ত শাস্ত্র প্রচার এবং অন্য দিকে এ দেশে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা এ দুয়ের মধ্যে সংগতি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে, এই সূত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তিনি বারংবার কহিয়াছেন, "ব্রহ্মকে জগতের কর্তা-রূপে ভজনা করো, কার্য দেখিয়া কর্তা মানো।" তলাইয়া দেখিলে ইহাই ভৃগু-বারুণী সংবাদের প্রথম শিক্ষা। বিশ্বের প্রকৃতি অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করিয়াই জগৎ-কার্যের

সম্যক্ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। আর বিশ্বপ্রকৃতির অনুসন্ধান করিতে গেলেই জড়-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানাদির পরীক্ষিত পথের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই পথে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের সাধনার মিলন সহজ ও অবশ্যম্ভাবী। রাজার জীবনের সমগ্র চেষ্টা এই লক্ষ্য ধরিয়াই চলিয়াছিল। ভারতের মধ্যযুগের ঐকান্তিক অন্তর্মুখী ব্রহ্ম-সাধনকে মানুষের দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জুড়িয়া রাজা সংযোগেত ও বস্তুতন্ত্র করিতে চাহিয়াছিলেন।

উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বে কোনো অতিপ্রাকৃতের কথা নাই, কোনো অলৌকিক ব্যাপার নাই কোনো প্রকারের অনুভূতির অনধিগম্য শাস্ত্র-প্রামাণ্যের উল্লেখ নাই। যাহা হইতে এই-সকল ভূতগ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা এই-সকল ভূতগ্রাম জীবিত থাকিতেছে, যাহার প্রতি এই-সকল ভূতগ্রাম গমন করিতেছে ও অন্তিমে যাহাতে প্রবেশ করিতেছে— তাহাই ব্রহ্ম, বেদান্তের "জন্মাদ্যস্য" সূত্র এই শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাজার উপনিষদ ও বেদান্ত-প্রচারের মূল লক্ষ্যটি এখানেই ধরা পড়ে। এই ব্রহ্মই হিন্দুর সাধনায় জীবের একমাত্র সাধ্য। এই ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে জীব কখনোই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। দেবতারা পর্যন্ত এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য লালায়িত, ব্রহ্মের নিকটে তাঁহারাও মুক্তিকামী হইয়া ব্রহ্মের ভজনা করেন। শাস্ত্র-প্রমাণে এ-সকল কথা দেখাইয়া রাজা বাংলার ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে সকল হিন্দুকে ডাকিয়া এই ব্রহ্মসাধনার পথ নির্দেশ করিলেন। ইতিপূর্বে বেদাদি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সংস্কৃতেই আবদ্ধ ছিল। সুতরাং অতিশয় পণ্ডিত লোক ব্যতীত আর কেহই,— কি ব্রাহ্মণ কি অন্য জাতি— এই শাস্ত্রের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেন না। কিন্তু মুক্তি তো কেবল পণ্ডিতেরই সাধ্য নহে, জীবমাত্রেরই সাধ্য। মুক্তি সাধনের অধিকার যেমন ব্রাহ্মণের সেইরূপ চণ্ডালের, যেমন বিদ্বানের সেইরূপ অজ্ঞজনের। মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্রগুলিকে অতিশয় কঠিন যে সংস্কৃত ভাষা তাহার আবরণ দিয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিলে চলিবে কেন? সকল শাস্ত্র যাহাতে সকল লোকে পড়িতে ও বুঝিতে পারে, তাহার জন্যই রাজা এ-সকলের বাংলা অনুবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে বাংলার হিন্দু সাধারণের স্বাধীন চিন্তা জাগাইয়া যাহাতে তাহারা বুঝিয়া শুনিয়া বিচারপূর্বক শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করিয়া ধর্মসাধনে সমর্থ হয়, তিনি তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।

ইহা কেবল ধর্মসংস্কার নহে। কিন্তু উপনিষদাদির বাংলা অনুবাদ প্রচার করিয়া রাজা বাংলাদেশে বাঙালী হিন্দু-সমাজে এক অভিনব চিন্তার খাত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আবার নূতন করিয়া ভগীরথের মতন বাঙালীর মুক্তি-কামনায় এক অভিনব গঙ্গা ডাকিয়া আনিলেন। আমরা আজ বাংলার হিন্দু সমাজ চিন্তা ও সাধনায় যে এক নূতন প্রাণতা ও সমন্বয় চেষ্টা দেখিতেছি তাহার মূল নির্ঝর রাজা রামমোহনের শাস্ত্র-প্রচারে।

৩

রাজা কেবল স্বদেশবাসীগণের চিত্ত ও চিন্তাকে অন্ধ শাস্ত্রানুগত্যের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যেখানে বন্ধন সেখানেই তাঁহার শাণিত খড়্গ গিয়া পড়িয়াছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুকে স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইলে সকলের আগে তাহার ধর্মকে স্বাধীন করিতে হয়। ধর্মের এই স্বাধীনতা একভাবে এদেশে চিরদিনই ছিল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মতবাদ বা সিদ্ধান্ত বা সাধনার উপরে সমাজ কখনো হস্তক্ষেপ করে নাই. কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে ও ধর্মসাধনে মানুষ যে পরিমাণে স্বাধীনতা পাইয়াছিল সেই পরিমাণেই সমাজ আচারের ও কর্মের বন্ধনে তাহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ।
তথাপি লৌকিকাচারঃ মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ॥

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং যোগবলে সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমও হয়েন তথাপি চিন্তাতেও তিনি লৌকিকাচারকে লঙ্ঘন করিবেন না। এই লৌকিকাচারই ধর্মের শাসন-দণ্ড হাতে লইয়া মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। শাস্ত্র ও উচ্চতর সাধনের কথা কেই বা জানিত। যদি কচিৎ কেহ জানিতেন, তাহা জনমণ্ডলীকে জানাইবার চেষ্টা করিতেন না। সমাজের এই অবস্থায় রাজা এক দিকে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তিসাধনাকে জনসাধারণের অনুভূতির উপরে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেইরূপ অন্য দিকে তাহাদের আচার-ব্যবহারকেও প্রচলিত সংস্কারের ও রীতিনীতির বন্ধন হইতে অনেকটা মুক্ত করিয়া দেন; এবং যেমন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে সেইরূপ এ-সকল ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের বাহিরের কার্যেও তিনি একান্তভাবে যুরোপীয়দিগের মতন কেবলমাত্র যুক্তির পথ ধরিয়া চলেন নাই, কিন্তু শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়কে মিলাইয়া সমাজ-সংস্কার ব্রতে ব্রতী হয়েন।

রাজা দেশ-প্রচলিত "ছোটোমার্গের" পক্ষপাতী ছিলেন না, ইহাকে নষ্ট করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রানুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা কহিয়াছেন— ব্রহ্মজ্ঞান যে সাধনা করিবে তাহার আবার শুচি অশুচি কী? যে সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি সাধন করিবে সে বাহিরের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার করিবে কেন? মহানির্বাণতন্ত্রের পঞ্চম উল্লাসের ব্রহ্মসাধনের বিধানে এই ছোৎমার্গের নামগন্ধও নাই। স্নাত হউক বা অস্নাতই হউক, শুচিই বা অশুচিই হউক, সকল অবস্থাতেই পরব্রহ্মের উপাসনা প্রশস্ত। এইরূপে তিনি দেশবাসীর আচারকেও প্রাচীন সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন।

৪

তার পর আরো খোলাখুলিভাবে রাজা মানুষের মানুষ বলিয়াই যে একটা অধিকার আছে, ধর্ম-সাধনের বা সমাজ-শাসনের অজুহাতে কিছুতেই যে এই অধিকারকে নষ্ট করিতে পারা যায় না, এই মহা সত্য নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সত্যের প্রেরণাতেই রাজা সতীদাহ নিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। হিন্দু স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিলাতে গিয়া পার্লামেণ্টের ভারত-শাসন-সম্বন্ধীয় কমিটির নিকট তিনি যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহার ভিতরেও তাঁর এই মানবতার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ভারতের প্রত্যেক কৃষক যাহাতে তাহার নিজের চাষের জমির উপরে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করেন। রাজার বিলাত-প্রবাসকালে আরনল্ড নামে একজন ইংরাজ তাঁহার সেক্রেটারি ছিলেন। আরনল্ডের কথায় জানা যায় যে রাজা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশের আধিপত্য থাকিবে, এইরূপ মনে করিতেন। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের লোকেরা সম্পূর্ণরূপে যুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলাদি শিক্ষা করিয়া দেশের শাসন নিজেদের হাতে গ্রহণ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের লোকেরা চিরদিন বা সুদূর অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিদেশীদের শাসনাধীনে বাস করিবে, এ চিন্তা রাজার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অন্য দিকে তিনি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকুশলাদি সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে না পারিলে বর্তমান সময়ে কোনো জাতি দুনিয়ার মাঝখানে

মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। এইজন্য ইংরাজ-শাসনের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তিনি স্বীকার করিতেন। এইজন্যই ইংরাজ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ভারতের রাজদণ্ড ধারণ করিয়া থাকুক, ইহাতে রাজার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এত বড়ো একটা প্রাচীন জাতি এরূপ একটা সার্বজনীন ও উদার সভ্যতা ও সাধনার অধিকারী হইয়া জগতের বিশাল কর্মক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না, এমন দুর্ঘটনা রাজার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই। এই দিক দিয়া দেখিলে রাজা রামমোহনকে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেরও প্রবর্তকরূপে প্রত্যক্ষ করি। ফলত যে-সকল শাসনসংস্কারের কথা বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমরা কহিয়া আসিতেছি তাহার প্রায় সকলগুলির আলোচনাই রাজা রামমোহন প্রায় শতবর্ষ পূর্বে করিয়া গিয়াছেন।

যেমন ধর্মে ও সমাজ-সংস্কারে সেইরূপ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও রাজা কেবল ভেদ-বিরোধকেই জাগাইয়া তুলেন নাই, কিন্তু পরস্পরবিরোধী মতের, শক্তির বা স্বার্থের একটা সমন্বয়ের পথ আবিষ্কার করিতে গিয়াছেন। ব্রিটিশ-শাসনের সাময়িক প্রয়োজন ও উপকারিতা স্বীকার করিয়া ইংরাজ ভারতবর্ষে যে স্বার্থের জাল পাতিয়াছিল, বিশ্বমানবের কল্যাণের মুখ চাহিয়া তাহাকে একদিন সেই জাল গুটাইতে হইবে এবং সেই বৃহত্তর স্বার্থের ভূমিতে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের ক্ষুদ্রতর স্বার্থের সমন্বয় সাধিত হইবে, ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই রাজা স্বদেশের এবং জগতের কল্যাণ কামনায় এই শাসনের ভ্রম, ত্রুটি, অভাব এবং অভিযোগ যাহাতে দূর হইতে পারে পার্লামেণ্টের কমিটিকে সেই পথ দেখাইয়াছিলেন। রাজা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে এবং খৃষ্টিয়ান পাদরিদিগের সঙ্গে একাকী তিনি কী অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে কতদিন ধরিয়া যে আত্মমতপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যার প্রাণে বলবতী সে সংগ্রাম-বিমুখ হইতে পারে না; মানুষের উপর মানুষ অযথা আধিপত্য করুক, রাজা ইহা সহিতে পারিতেন না। ইংরাজ পার্লামেণ্টে যখন ১৮৩২ খৃস্টাব্দে রিফর্ম (Reform) বিলের আলোচনা হয়, রাজা তখন বিলাতে। সে সময় তিনি তাঁহার ইংরাজ

বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন যে পার্লামেণ্ট যদি এই পাণ্ডুলিপি অগ্রাহ্য করে তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ইংলণ্ডে বাস করা অসাধ্য হইবে।

৬

রাজার এই মানবতা তাঁহার রক্তের মধ্যে ছিল। সকল বাঙালির রক্তের মধ্যেই ইহা আছে। ভাগ্যবানের মধ্যে ফুটিয়া উঠে, অন্যে এই দেবদুর্লভ বস্তুকে অজ্ঞাতসারে নিজের প্রকৃতির ভিতরে লুকাইয়া রাখে। রাজার অন্তর্নিহিত এই উদার মানবতার আদর্শ উপনিষদের শিক্ষা ও ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার দ্বারা আশ্চর্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যে আত্মাতে সকলকে দেখে ও সকলের মধ্যে আত্মাকে দেখে, সে কি জাতি ধর্মের বিচার করিয়া মানুষে মানুষে কোনো কৃত্রিম ভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? রাজা তাঁহার গ্রন্থে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনার একটা অপূর্ব শ্লোক তুলিয়া জীবের শিবত্ব প্রচার করিয়াছেন। সন্ধ্যাবন্দনার সময় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ কহেন :—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥

আমিই দেবতা, অন্য কেহ নহি; আমিই ব্রহ্ম, শোকের ভোক্তা নহি; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্ত স্বভাবসম্পন্ন।

ইহাই মানবের মূল প্রকৃতি। এই প্রকৃতির ভূমিতেই জীব ও শিব এক। সেখানে মানুষ— তার জাতি, বর্ণ, ধর্ম, দেশ, যাই হউক না কেন - সেই যে শিবস্বরূপ, কিন্তু অজ্ঞতাবশত আপনাকে আপনি জানে না বলিয়া এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ মানুষ দুঃখে ম্রিয়মাণ, শোকে মুহ্যমান, পাপে তাপে নিয়ত জর্জরিত এবং আপনাকে বদ্ধ ভাবিয়া কল্পিতবন্ধনে পড়িয়া হাহাকার করে। এই জীবের শিবস্বরূপের সাক্ষাৎকার যে সাধক ঈষৎ পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, তিনি যেখানে মানুষের মধ্যে আনন্দধারা প্রবাহিত সেখানেই অকুতোভয়ে আপনাকে ডুবাইয়া দেন, যেখানে মানুষের জ্ঞান চেষ্টা প্রকাশিত, সেখানেই উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, যেখানেই মানুষ আপনার জীবনের বহিরঙ্গে নিজের নিত্যসিদ্ধ মুক্তস্বভাব বা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই তিনি নিজের আরাধ্য দেবতার প্রকাশ দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হয়েন।

রাজা রামমোহনের মধ্যে ইহার অনেকটা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজের ভোগবিলাস তাঁহাকে বিরক্ত করে নাই, কিন্তু সেই ভোগবিলাসের

মধ্যে তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে আত্মা তাহার আনন্দ উপলব্ধির বহিঃচেষ্টা দেখিয়া সম্পূর্ণভাবে এ-সকল ভোগবিলাসে যোগদান করিতেন। আর, ঠিক সেই হেতুতেই রাজা বিলাত যাইবার সমুদ্রপথে ফরাসী জাহাজের দেখা পাইয়া ফরাসী গণতন্ত্রের পতাকাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন।

রাজার এই মানবতার আদর্শকে ঠিক ফরাসী-বিপ্লবের 'Humanity'র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ফরাসী চিন্তার Humanity বা মানবতা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ বৈষম্য আছে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া একটা কৃত্রিম সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। সকল মানুষই শক্তিতে বা সাধনায় সমান, এ কথা সত্য নহে। আর মানুষের মধ্যে শক্তির ও সাধনার তারতম্য যখন আছে তখন সকলের সমান অধিকার, এমন কথাও বলা যায় না। কারণ, যার যে কার্য করিবার শক্তি বা শিক্ষা নাই সে অধিকারও তাহার হয় না। হিন্দু চিরদিন মানুষের শক্তি, সাধ্যের দ্বারাই তাহার অধিকার নির্ণয় করিয়া আসিয়াছে। এই অধিকার-ভেদ হিন্দু সাধনার একটা প্রধান কথা। এই অধিকার-ভেদের উপরেই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পন্থার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর, এই বিভিন্ন পন্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াই হিন্দু আপনার ধর্মের অপূর্ব উদারতা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। রাজা এই অধিকার-ভেদ মানিতেন এবং অধিকার-ভেদ মানিয়াই তিনি বৈষম্যের মধ্য দিয়া সাম্য এবং স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়াই একতাপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রামমোহনের পক্ষে য়ুরোপের নিরাকার বা একাকার মানবতার আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ফরাসী-বিপ্লবের মাদকতার উত্তেজনায় য়ুরোপ যে মানুষকে তার জন্ম, ধন, পদ বা অন্য কোনো উপাধির বিচার না করিয়া কেবল মানুষ বলিয়াই বড়ো করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল ইহাতেই রাজার চিত্তকে আকর্ষণ করে। ইহার অন্তরালে তিনি আপনার স্বদেশের সনাতন আদর্শের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন। আমাদের দেশে ব্রহ্ম-সাধনের ভিতর দিয়া যে ভাবটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেই ভাবই য়ুরোপের এই সাম্যবাদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা য়ুরোপের সাম্য, মৈত্রী এবং বিশ্বমানবতা বা Humanity-কে আপনার পরিচিত বৈদান্তিক সাধনের ভিতর দিয়াই দেখিয়াছিলেন। আর এইজন্যই তাঁর মানবতার আদর্শ শূন্যগর্ভ এবং বস্তুতন্ত্রহীন ছিল না। তিনি প্রত্যক্ষ বৈষম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া সকল মানুষকে একাকার করিতে চাহেন নাই।

মানুষ নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ নহে, সে সাকার। তার চিন্তা সাকার, ভাষায় এবং জীবনের কর্মে প্রকাশিত। তার ধর্ম সাকার অর্থাৎ বিশিষ্ট মতবাদ, বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত ও বিশিষ্ট সাধনার পূজা-পদ্ধতিতে গঠিত। তার সামাজিক সম্বন্ধগুলিও সাকার, বিশিষ্ট অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানাদির ভিতর দিয়া চরিতার্থতা লাভ করে। এ-সকল বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে, মানুষ বলিয়া একটা ভাববাচক শব্দমাত্র প্রাপ্ত হই কিন্তু মানুষ বস্তুটিকে ধরিতে ছুঁইতে পাই না। অথচ অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় মানবতার আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও সাধনার ভেদ-বৈষম্যকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া একটা নির্বিশেষ মনুষ্যত্বের এবং ধর্মের সন্ধানে ছুটিয়াছিল। রাজা য়ুরোপের এই বস্তুহীন আদর্শ গ্রহণ করেন নাই।

৭

করেন নাই বলিয়াই রাজা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা সম্মিলন এবং ক্রমে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ব্রহ্ম-সভা'র আদর্শের মধ্যে ইহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজার সে আদর্শটি বর্তমান ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া রাজা ভারতবর্ষের আধুনিক ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির যে পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন আমরা তাহা ভালো করিয়া ধরিতে পারি নাই। রাজা দেখিয়াছিলেন যে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা ধর্মসম্প্রদায়কে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া য়ুরোপে যেভাবে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেভাবে একটা ঘননিবিষ্ট ভারতীয় Nation বা জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সম্ভব হইলেও সমীচীন হইত না। এ-সকল ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ও সম্প্রদায়ের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইলে কেবল যে তাহাদেরই ক্ষতি হইবে এমন নহে, ইহাতে সমগ্র মানবমণ্ডলী বা বিশ্বমানব, ইংরাজিতে যাহাকে Universal Humanity কহে তাহারও সমূহ ক্ষতি হইবে। এই বিশ্বমানব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মের মতন বিভিন্ন আধারের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই বিশ্বমানবের প্রকৃত সত্তা, শক্তি ও সৌন্দর্য প্রকাশিত। বিশ্বমানব অঙ্গীস্বরূপ, জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই বিরাট পুরুষের অঙ্গস্বরূপ। বিশ্বমানব কিংবা Universal Humanity এবং জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা Nation,

এতদুভয়ের মধ্যে একটা জীবন্ত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। জীবের সকল অঙ্গ যদি নষ্ট হইয়া একমাত্র অঙ্গে পরিণত হয়, তাহাতে যেমন সে পঙ্গু হইয়া পড়ে, সেইরূপ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসকল যদি একাকার হইয়া যায়, তাহা হইলে বিশ্বমানব পঙ্গু হইয়া পড়িবে। রাজা এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, ধর্ম এবং সাধনাকে ভাঙিয়া চুরিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা করেন নাই। হিন্দুকে তিনি হিন্দু রাখিয়া বড়ো করিতে চাহিয়াছেন, মুসলমানকে মুসলমান রাখিয়াই বিশ্বমানবের অভিমুখীন করিতে চাহিয়াছেন, খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই সেই-সকল সিদ্ধান্ত এবং সাধনের মধ্যে যে সনাতন সত্যের এবং কল্যাণের ধারা প্রবাহিত, যুগে যুগে সাধক এবং সিদ্ধ মহাজনপরম্পরায় যে সত্য ও কল্যাণের আশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়াই নিজেদের সাম্প্রদায়িক ধর্মকে উদার বিশ্বধর্মের প্রতি উন্মুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সত্য এবং কল্যাণ যে আকারেই প্রকাশিত হউক না কেন, মূলে এক। সত্যে এবং প্রকৃত কল্যাণের পথে কোনো ভেদ, বিরোধ নাই। যে ভেদ দেখিতে পাই, তাহা কেবল ভাষাগত ও আকারগত, পুরাতন সংস্কারের আবরণে আবৃত বলিয়া। এ-সকল বাহিরের ভেদ-বিরোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলেই সাধক সেই মহামিলনক্ষেত্রে উপনীত হন, যেখানে—

"মিটে যায় সব ধন্দা
যাঁহা রাম রহিম এক বান্দা,
কাফেরে মুসলমানা।"

সেই মহামিলনক্ষেত্রের পথ গড়িয়া তুলিবার আশাতেই রাজা 'ব্রহ্ম-সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা দেখিলেন, ভারতবর্ষ আপনার বৈচিত্র্যে একটা ক্ষুদ্র বিশ্বের মতন। এই ভারতে যাহা নাই, জগতেও তাহা নাই বলিলে চলে। এখানে বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহুবিধ সামাজিক রীতিনীতি, বহু আচার, পদ্ধতি, বহু সাধনা এবং সভ্যতা আসিয়া মিলিয়াছে। এই ভারতে যদি এক মহাজাতির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে এই-সকল বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যকে যথাযোগ্য-ভাবে বজায় রাখিতেই হইবে। ভারতের লোক পুরাকাল হইতেই ধর্মপ্রাণ, তাঁহারা ধর্ম ছাড়িয়া যে কখনো একান্তভাবে আধুনিক য়ুরোপের Secularist-দিগের মতো নিজেদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হইবে,

ইহা সম্ভব নহে। আধুনিক জগতে ভারতবর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে তাহার এই প্রকৃতিগত ধর্মানুরাগকে নষ্ট করিলে চলিবে না। ধর্ম যেখানে সংস্কারবদ্ধ হইয়া নিজের প্রাণতা হারাইয়াছে, সেখানে তাহাকে সংস্কারমুক্ত করিয়া সজীব করিতে হইবে; যেখানে সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে উহাকে উদার হইতে হইবে, কিন্তু, ভারতের ধর্মপ্রাণতাকে নষ্ট করা তো দূরের কথা, উপেক্ষা করিয়াও একটা ভারতীয় জাতিগঠন করা সম্ভব নহে। আর অন্য দিকে হিন্দুকে মুসলমান কিংবা মুসলমানকে হিন্দু অথবা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া এবং জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সেই সঙ্ঘভুক্ত করিয়া ভারতে একটা ধর্মের প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নহে। যে উচ্চতর সাধনার ভূমিতে ভক্ত, সাধক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষেরা সকল ধর্মের সমন্বয় প্রত্যক্ষ করেন, সেই ভূমিতেও জনসাধারণকে লইয়া যাওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে। অন্যপক্ষে এ-সকল ধর্মের মধ্যে যে ভেদ ও বিরোধ আছে, তাহার তীব্রতা যদি নষ্ট না হয়, তাহা হইলেও হিন্দু, মুসলমান খৃস্টিয়ান প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ সমাজের এবং সমষ্টিভূত ভারতীয় জীবনের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে বিরোধ আছে তাহা দূর না হইলে ভারতে আধুনিক আদর্শের একটা নূতন জাতির গঠন কিছুতেই হইতে পারে না। রাজা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং ভারতের জাতীয়তার মূল অন্তরায় দূর করিবার উদ্দেশ্যেই, মনে হয়, তিনি তাঁহার 'ব্রহ্ম-সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা ব্রাহ্মধর্ম নামে কোনো নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, ব্রাহ্মসমাজ নামে কোনো সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন নাই। নিজের সিদ্ধান্তে ও সাধনে রাজা বৈদান্তিক হিন্দুই ছিলেন, পরমহংসাচার্য হরিহরানন্দ স্বামী রাজার গুরু ছিলেন। বাংলার তান্ত্রিক সাধন অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তের আশ্রয়েই গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজা এই তান্ত্রিক সাধনেরই লোক ছিলেন। কিন্তু এই সাধনকে তিনি লোকসমাজে প্রচার করেন নাই। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন বেদান্তাদি শাস্ত্র; তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন প্রাচীন ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত; তিনি প্রাচীন শাস্ত্র ও মহাজন-পথ অবলম্বন করিয়াই হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতাকে নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রাচীন আচার্যরা যেভাবে শাস্ত্র ও সমাজ-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই এগুলিকে নিজ নিজ সময়ের উপযোগী ব্যাখ্যার দ্বারা পরিবর্তিত, সংশোধিত, ও সংবর্ধিত করিতে চাহিয়াছিলেন, রাজা রামমোহনও তাঁহাদেরই

পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আধুনিক ভারতে সেই কাজটিই করিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য শ্রীযুক্ত রানাডে বলিতেন— Raja Rammohun is one of the Fathers of the great Hindu Church. He is not the founder of a new religion.

৮

রাজা ব্রহ্ম সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কেবল লোকের ধর্মসাধনের সহায় হইবে বলিয়া নহে। এখানে তিনি যে প্রণালীতে জগতের স্রষ্টা, পাতা, পরিত্রাতার ভজনার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ধর্মসাধনের ক খ বলিলেই চলে— অতিশয় বাল্যাবস্থার কথা। এইরূপ ভজনাতে সংস্কারবদ্ধ ধর্মকে উপাসকের অনুভবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু, গভীরতর ধর্মজীবন এইরূপ একটা নির্বিশেষ ভজনার দ্বারা গড়িয়া উঠিতে পারে না। রাজা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-সভায় যে ভজনা-প্রণালী প্রবর্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে জগৎকর্তাকে কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারাই ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে, স্বরূপ লক্ষণের সাক্ষাৎকারের কোনোপ্রকারের প্রয়াস হয় নাই। স্বরূপ উপাসনা নিম্নতম অধিকারীর জন্য নহে। যাঁহাদের সমাধির অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহারাই কেবল স্বরূপ উপাসনা করিতে পারেন। কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা যে ভজনা হয়, তাহাতে সাধকের চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে, ভক্তিরও সামান্য উন্মেষ সম্ভব, কিন্তু মুক্তিলাভ বা ভক্তিমার্গের উচ্চতর শিখরে আরোহণ কখনোই সম্ভব হয় না। ব্রহ্মাত্মৈকত্ব অনুভূতি ব্যতীত জীবের মুক্তিলাভ হইতেই পারে না, আর এই ব্রহ্মাত্মৈকত্বানুভূতি স্বরূপ উপাসনার অধিকারের কথা। তটস্থ লক্ষণার দ্বারা যে উপাসনা হয়, তাহাতে এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার আদৌ সম্ভব নহে। ইহাই রাজার সিদ্ধান্ত ছিল। সুতরাং 'ব্রহ্ম-সভা' প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তিনি যে একটা উচ্চতর সাধনক্ষেত্র গড়িতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা সংগত নহে। ব্রহ্ম-সভার মূল লক্ষ্য ছিল— উচ্চতর ধর্মসাধন নহে। কিন্তু ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি মর্যাদাশীল করিয়া ভারতের জাতীয় একতার প্রধান অন্তরায় দূর করাই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজা জানিতেন যে, তাঁহার এই 'ব্রহ্ম-সভা'তে কখনোই জনসাধারণে আসিয়া যোগদান করিবে না। তিনি জানিতেন, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন

সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী এবং ধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনায় অল্পবিস্তর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই মহামিলন মন্দিরে আসিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জ্ঞানী সাধকেরা যদি এভাবে সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত ও সাধনার কথা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে এ-সকল ধর্মের মধ্যে যে সনাতন ও সার্বজনীন সত্য আছে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। এভাবে হিন্দু দেখিবেন যে, মুসলমানের মধ্যেও তাঁহার নিজের শাস্ত্র ও সাধনার অনেক সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুসলমানও দেখিবেন যে হিন্দুর সঙ্গে তাঁহার শাস্ত্র ও সাধনার অনেক মিল আছে। সেইরূপ খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ প্রভৃতিও অপরাপর ধর্মে ও সাধনে নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠতম আভাস পাইয়া সে-সকল ধর্মের প্রতি মর্যাদাশীল হইয়া উঠিবেন। ধর্মে ধর্মে যে ভেদ-বিরোধ তাহা বহিরঙ্গের, আচার-বিচারের, সাধনের অতি নিম্নস্তরের। ধর্ম বস্তু যখন অনুভবে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং সাধক যখন সাধনার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন, তখন এ-সকল ভেদ-বিরোধ তাঁহার দৃষ্টি হইতে আপনি ঝরিয়া পড়ে। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের চিন্তানায়ক এবং উদার সাধকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাহাতে একে অন্যের ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের ও কল্যাণের সন্ধান পাইতে পারেন এবং এই সন্ধান পাইয়া একে অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন, ইহাই রাজার 'ব্রহ্ম-সভা' প্রতিষ্ঠার নিগূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়াই মনে হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডীড পড়িয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ট্রাস্টডীডের অন্য কোনো সমীচীন ব্যাখ্যা হয় না। আর এখানে এই ব্রহ্ম-সভাতে যদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের চিন্তানায়ক এবং সাধকগণের একটা মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে এই-সকল ধর্মের জনসাধারণের মধ্যেও একে অন্যের প্রতি একটা শ্রদ্ধা, অন্তত পরস্পরের আচার-অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে যে সকল প্রভেদ আছে সে-সকল উদারভাবে গ্রহণ করিবার একটা শক্তি জন্মিত। এইরূপে ভারতের জনসমূহের ধর্ম ও আচারগত ভেদ ও বিরোধের অন্তরায়কে ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া, এ-সকল ভেদের ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষে একটা বিরাট জাতীয় একতার প্রতিষ্ঠা করিবার আশাতেই মনে হয়, রাজা রামমোহন তাঁহার 'ব্রহ্ম-সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন।

এইরূপে রাজা ভারতের নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। বাংলার এই নবযুগে আমরা যে পূর্ণতম মনুষ্যত্ব সাধনের জন্য লালায়িত হইয়া

উঠিয়াছি এবং যে মনুষ্যত্ব লাভের জন্যই আমরা ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে নানা দিক দিয়া নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই আদর্শ সর্বপ্রথমে রাজা রামমোহনের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এইজন্যই তাঁহাকে বাংলার এই নবযুগের যুগ-প্রবর্তক বলিয়া অভিবাদন করি।

রামমোহন ও ইঙ্গ-ভারতীয় আইন

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

রাজা রামমোহন যে যুগের লোক ইংরেজের ভারতশাসনের বিধি-বন্ধ তখনো শক্ত হয়ে দানা বাঁধে নি। তার কতকটা ছিল তরল আকারহীন; আর যা আকার পেয়েছিল তারও অনেকটা ছিল কাঁচা, যা বারবার ভেঙে ফেলে নূতন আকার দিয়ে গড়ে তুলতে হচ্ছিল। এমন অবস্থায় আইনকানুনের বিধি-ব্যবস্থা ব্যবহারজীবী বিশেষজ্ঞের একচেটে থাকে না। সে সময় আসে, যখন মূলসূত্রগুলি স্থির হয়ে যায়, এবং টীকা-ভাষ্য করে অল্পস্বল্প নূতন, কি একটু বেশি রকম জটিল অবস্থার সঙ্গে তাদের খাপ খাওয়াতে হয়। কিন্তু প্রথম গড়ার যুগে বিশেষজ্ঞের সংস্কারবদ্ধ বুদ্ধির চেয়ে সংস্কারমুক্ত সাধারণ বুদ্ধি কাজ দেয় বেশি। সেইজন্য যে-সব ইংরেজ যুবক ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কেরানিমাত্র হয়ে এদেশে এসে কোম্পানির নানা কাজে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, রাজ্যশাসন ও আইন-আদালত সম্বন্ধে তাদের অনেকের অনেক মতামতের যাথার্থ্য ও উপ-যোগিতা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। সুতরাং রামমোহন রায়ের মতো বিচিত্র প্রতিভাশালী, এবং দেশবাসীর স্বার্থ ও উন্নতির সমস্ত রকম কাজে অক্লান্তকর্মা লোক যে ইংরেজের রাজ্যশাসন প্রণালীর ও তার বিধিব্যবস্থার বিচারপরায়ণ হবেন— এটা নিতান্ত স্বাভাবিক। এবং যেমন অন্য বিষয়ে, তেমনি এ-বিচারেও তাঁর বুদ্ধির অসাধারণ দীপ্তি, তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তার, তাঁর মনের ঔদার্য আমাদের বিস্মিত করে।

অষ্টাদশ খৃস্টাব্দের দেশব্যাপী অরাজকতা, ও জাতির পরম দৈন্যের দিনে ইংরেজ ছিল যুগের যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানপন্থী, ধর্মকুশল পশ্চিম-ইউরোপের যোগ্য প্রতিনিধি। এই ইংরেজের ভারতবর্ষ-বিজয় এবং -শাসন অনেক চিন্তাশীল লোকের, বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুর মনে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব বড়ো আশার সঞ্চার করেছিল। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে খবরের কাগজের স্বাধীনতা খর্ব করে অস্থায়ী গভর্নর-জেনারাল শ্রীযুক্ত অ্যাডাম যে নিয়ম জারি করেন, তার বিরুদ্ধে কলিকাতা শহরের ছয়জন বিশিষ্ট হিন্দু অধিবাসী কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে এক দরখাস্ত দিয়েছিলেন। সে সময় পার্লামেন্টের এক আইন অনুসারে গভর্নর-জেনারালের কোনো কানুন (regulation) সুপ্রিম কোর্টে অনুমোদন ও রেজেস্ট্রি

না করলে কার্যকরী হত না। এই দরখাস্তের এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'It is manifest as the light of day. that the general subjects of observation and the constant and the familiar topics of discourse among the Hindoo Community of Bengal,. are the literary and political improvements which are continually going on in the State of the Country under the present System of Government, and a comparison between their present auspicious prospects and their hopeless conditions under their former rulers'। রামমোহন রায় এই ছয়জন দরখাস্তকারীর একজন ছিলেন, এবং এই দরখাস্ত রচনায় তাঁর হাত থাকাই সম্ভব। কিন্তু সে-সময়কার আশা-ভরসা ও অবস্থাই যে এ শাসনের চরম বিচার নয়, এর প্রকৃত হিতাহিত বিচার করবে ভবিষ্যবংশীয়েরা, এ-বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। এক বছর পূর্বে ১৮২২ খৃস্টাব্দে রামমোহন *Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance* নাম দিয়ে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তাতে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মত তিনি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন : 'At present the whole empire (with the exception of a few provinces) has been placed under the British Power, and some advantages have already been derived from the prudent management of its rulers, from whose general character a hope of future quiet and happiness is justly entertained. The succeeding generation will, however, be more adequate to pronounce on the real advantages of this Government.'

২

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ-বদল উপলক্ষে কমন্স-সভার অনুসন্ধান-কমিটির কাছে কোম্পানির বিচার ও রাজস্ব-ব্যবস্থার স্বরূপ ও সংস্কার সম্বন্ধে ১৮৩১ খৃস্টাব্দে রামমোহন রায় যে দুই প্রশ্নোত্তরমালা দাখিল করেন, আজ একশো বছরের নানা পরিবর্তনের পরও তার অনেক প্রস্তাব তেমনি কার্যকরী

রয়েছে— এখানেই রামমোহনের দূরদর্শিতা এবং ইংরেজের ভারত-শাসন-সংস্কারের কূর্মগতির প্রমাণ। বহু উদাহরণের মধ্যে একটা তোলা যেতে পারে। তখনকার দিনে কোম্পানির সিবিলিয়ন যুবকেরা অত্যন্ত অল্প বয়সে, কোনো আইনকানুনের শিক্ষা না পেয়ে, ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে এসে শাসন ও বিচারের কাজ আরম্ভ করত। এর পক্ষে একটা যুক্তি ছিল এই যে, অল্প বয়সে এ-দেশে আসলে এই কর্মচারীরা খুব সহজে এ-দেশবাসীদের ভাষা শিখতে পারবে। এ ব্যবস্থার সমালোচনায় রামমোহন বলেছিলেন : 'Young men sent out at an early age, before their principles are fixed, or their education fully matured, with the prospect of the highest power, authority and influence before them, occupying already the first rank in Society immediately on their arrival ...and surrounded by persons ready, in the hope of future favours and patronage, to flatter their vanity... are evidently placed in the situation calculated to plunge them into many errors, make them overstep the bounds of duty to their fellow creatures and subjects ....।' ১৮৩১ সালের এই সমালোচনা ১৯৩৩ সালের শ্বেতাশ্বেত নবীন সিবিলিয়ানদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে বেশিকিছু রঙ-বদল করতে হয় না। তার পর ভাষাশিক্ষার সুবিধার যুক্তি সম্বন্ধে রামমোহন লিখেছেন : 'The excuse made for so injudicious an arrangement, that it is favourable to the acquisition of the native languages, is of no weight; for it may be observed that the missionaries, who are usually sent out at the age of from 25 to 35 years, acquire generally in two or three years so thorough a knowledge of the languages as to be able to converse freely in them and even to address a native audience with fluency in their own tongue. In fact the languages are easily acquired at a mature as well as at an immature age by free communication with the people'। এবং কোনো আইনে-অনভিজ্ঞ সিবিলিয়ানদের দিয়ে বিচারকার্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে রামমোহনের মত : 'No Civil Servant... should be

admitted into the judicial line of the Service, unless he can produce a certificate from a professor of English Law to prove that he possesses a competent knowledge of it. Because, though he is not to administer English Law, his proficiency therein will be a proof of his capacity for legal studies, and a knowledge of the principles of jurisprudence as developed in one System of Law will enable him to acquire more readily any other System ; just as the study of the ancient and dead languages improves our knowledge of modern tongues. This is so important, that no public authority should have the power of violating the rule, by admitting to the exercise of judicial functions any one who has not been brought up a lawyer.'

এক দেশ ও এক কালের ব্যবহারশাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান যে অন্য দেশ ও ভিন্ন কালের ব্যবহারশাস্ত্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেয়— রামমোহন রায়ের এ-কথার প্রমাণ ইংলণ্ডের নাম-করা বিচারপতিরা প্রিভি-কাউন্সিলে হিন্দু-আইনের বিচারপ্রসঙ্গে বারবার দিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষা না জেনে, এবং স্মৃতিকর্তা ও নিবন্ধকারদের পুঁথির অতি সামান্য অংশ মাত্র অনুবাদের মারফত পরিচয় পেয়ে এই ইংরেজি ও রোমক আইনে অভিজ্ঞ ইংরেজ জজেরা স্মৃতি ও নিবন্ধকারদের মর্মকথা ও মূল সূত্রগুলি এমন চমৎকার ধরেছেন যে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। পক্ষান্তরে অনেক ইউরোপীয় 'ইণ্ডলজিস্ট' সংস্কৃত ভাষা ভালো শিখে এবং বহু স্মৃতি ও নিবন্ধগ্রন্থ মূলে আদ্যোপান্ত প'ড়ে ওদের মধ্যে যে সর্বব্যবহারশাস্ত্র-সাধারণ মূলতত্ত্বগুলি নিহিত রয়েছে— অনেক জায়গাতেই তা বুঝতে পারেন নি, কারণ কোনো ব্যবহারশাস্ত্রের জ্ঞানই তাঁদের নেই, নিজের দেশেরও নয়, পরের দেশেরও নয়। যে লোক 'has not been brought up a lawyer' তাকে যে বিচারক সাজানো উচিত নয়, এ অভিযোগের আজও প্রতিকার হয় নি, ইঙ্গ-ভারতীয় আইনের বিপুলতা ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে অভিযোগের মাত্রাটা প্রবলতর হয়েছে।

এই দুই প্রশ্নোত্তরমালায় রাজা রামমোহন তাঁর দেশবাসীদের তৎকালীন দুর্দশা ও হীনতার কথা বিন্দুমাত্র গোপন করেন নাই, এবং সে-দশা ও হীনতা

যে কয়েক শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় দুর্বাবস্থা ও অরাজকতার ফল তা-ও নির্দেশ করেছেন। শিক্ষা ও সুযোগ পেলে যে তাঁর দেশবাসীরা সে-সময়কার সভ্যতায় অগ্রবর্তী ইউরোপীয় জাতিদের সঙ্গে সব বিষয়ে সমকক্ষ হয়ে উঠবে সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল না। ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন ছিল, 'What capability of improvement do they possess ?' রামমোহন এক লাইনে এর উত্তর দিয়েছিলেন 'They have the same capability of improvement as any other civilized people.' অর্থাৎ ইউরোপীয় মানুষের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিভায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। এবং তাঁর নিজের হিন্দুজাতি যে অন্যান্য সভ্য জাতির মধ্যে একটি সভ্য জাতি না হয়ে অলৌকিক রকম একটা নূতন কিছু এ-ও তিনি বিশ্বাস করতেন না।

আজকের দিনের 'কম্যুনাল' ঝগড়া ও পদ চাকরি ভাগাভাগির দিনে রাজা রামমোহনের সত্যভাষণ ও সত্যপথনির্দেশের একটা নমুনা তোলা যেতে পারে। ফৌজদারি আদালতের বিচারব্যবস্থাপ্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন ছিল 'Are the native law assessors generally competent ?' রামমোহনের উত্তর 'They are generally so some of the Muftis (Musalman law assessors) are men of such high honour and integrity, that they may be entrusted with the power of a Jury with perfect safety.' রামমোহন রায় ছিলেন হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ। এই প্রসঙ্গেই আর-একটা প্রশ্ন ছিল 'Should not the jury be selected from persons of all religions, sects and divisions ?' রামমোহনের উত্তর 'Since the Criminal Law has hitherto been administered by the Mohammedans, to conciliate this class, the assessors should still be selected from among them, until the other classes may have acquired the same qualifications, and the Mohammedans may become reconciled to co-operate with them.' রাজভক্তির আধিক্য ও সংখ্যার অনুপাত দেখিয়ে নির্গুণ ও স্বল্পগুণ স্বধর্মী হিন্দুর পক্ষে রামমোহন ওকালতি করেন নি।

৩

কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের বাঙালি হিন্দুর উত্তরাধিকার নিয়ে বিচার-বিভ্রাটে একবার রামমোহন রায়কে কলম ধরতে হয়েছিল। ইংরেজের আদালতে উত্তরাধিকার, বিবাহ প্রভৃতি ব্যক্তি- ও পরিবার-গত বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান তাঁদের নিজেদের পূর্বপ্রচলিত হিন্দু- ও মুসলমান-ব্যবহারশাস্ত্র দিয়ে শাসিত হয়। ইংরেজ যখন এদেশের রাজা হলেন তখন ইংরেজ বিচারকদের অবশ্য ও-দুই আইনের কিছুই জানা ছিল না। সুতরাং তাঁদের আদালতে হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবি নিযুক্ত থাকত, যাদের 'ফতোয়া' অনুসারে ইংরেজ জজেরা বিচারকার্য চালাতেন। ক্রমে অনুবাদের মারফত ইংরেজ জজেরাও, দুই ব্যবহার-শাস্ত্রের কিছু কিছু জানতে আরম্ভ করলেন। মুসলমান-আইন নিয়ে বিশেষ গোল হল না; কারণ ভারতবর্ষে প্রচলিত ও-আইনের মতভেদ ও শাখাভেদ বেশি ছিল না, এবং প্রামাণ্য গ্রন্থের সংখ্যাও কম ছিল। কিন্তু হিন্দু-আইন নিয়ে মুশকিল বাধল। এ আইনের উৎপত্তি দু-তিন হাজার বছর পূর্বে, এবং এই দীর্ঘকাল নানা পরিবর্তন ও নানা মতভেদের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এর ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তি হয়েছে। এবং বাংলার শাখার সঙ্গে অন্যান্য স্থানের প্রচলিত শাখার তফাত খুব বেশি। হিন্দু আইনে কিছু জ্ঞান লাভ করেই ইংরেজ জজেরা দেখলেন যে, সব শাখার প্রবর্তয়িতা ও ভাষ্যকারেরা একই স্মৃতিকারদের মান্য করেন, এবং তাঁদের বচন তুলে নিজেদের মতের সমর্থন করেন, কিন্তু অনেক স্থানে একই বচনের ভিন্ন অর্থ করে বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন রকমের আইন প্রচলিত হয়েছে। এই ব্যাপার দেখে কোনো কোনো বিচারকের ধারণা হল যে, যদি তাঁরা ঐ সর্বশাখামান্য স্মৃতিবাক্যগুলির যথার্থ অর্থনির্ণয় করতে পারেন, এবং তাদের শাখাগত ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করে ঐ প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করেন, তবেই মূল হিন্দু-আইন অনুযায়ী বিচার করা হবে। বাংলাদেশের প্রচলিত হিন্দু-আইনের সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হল জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ'। ঐ গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাঙালি হিন্দুর পৈতৃক ও স্বোপার্জিত সম্পত্তিতে সমান অধিকার ছিল। ঐ উভয় রকমের সম্পত্তিই বাঙালি হিন্দু যথেচ্ছা দান-বিক্রয় করতে পারেন, এবং ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালি, বিশেষ করে কলিকাতাবাসী বাঙালি হিন্দুরা, ও-দুইরকম সম্পত্তি সম্বন্ধেই 'উইল' করতে আরম্ভ করেছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি সম্বন্ধে যে এই অবাধ অধিকার এটা— বাঙালি হিন্দু-আইনের বিশেষত্ব। বাকি

ভারতবর্ষে প্রচলিত হিন্দু-আইনের অন্যান্য শাখায় ছেলেরা জন্মেই বাপের পৈতৃক সম্পত্তিতে বাপের সঙ্গে সমান স্বত্ব পায়, সুতরাং সে-সম্পত্তিতে বাপের যথেচ্ছা দান-বিক্রয়-উইলের অধিকার থাকে না। ১৮১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে বাঙালি পণ্ডিতদের 'ফতোয়া' অনুযায়ী বাঙালি হিন্দুর পৈতৃক সম্পত্তিতে এই অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু ঐ সালে এক মকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্ট বিচার করলেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাদেশেও পৈতৃক সম্পত্তির উপর পুত্র থাকতে পিতার অধিকার অবাধ নয়। এবং ১৮২৯ ও ১৮৩০ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার চার্লস এডওয়ার্ড গ্রে কয়েকটি মকদ্দমায় পুনঃ পুনঃ এই মত প্রকাশ করলেন। কলিকাতাবাসী বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে উদ্‌বেগ দেখা দিল, এবং ১৮৩০ খৃস্টাব্দে প্রধান বিচারপতির এই মতের প্রতিবাদ করে রামমোহন রায় *Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal* নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করলেন।

এই প্রবন্ধে রাজা রামমোহন 'দায়ভাগে'র প্রকৃত অর্থ, এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত হিন্দু-আইনের বহু বিষয়ে পার্থক্য অতি নিপুণতার সঙ্গে ব্যাখ্যা ক'রে, এ-পার্থক্য যে বাঙালি-হিন্দুর জাতীয় জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে উঠেছে, ও এ-পার্থক্য যে সেই জীবনের অনুকূল— তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এবং স্মৃতিকারদের বচনের 'দায়ভাগে' জীমূতবাহন যে-ব্যাখ্যা করেছেন তা ভুল হোক শুদ্ধ হোক কোনো বর্তমান আদালতের যে সে-ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা নেই তা পরিষ্কার দেখিয়েছেন। আইনের সঙ্গে জাতীয় জীবনের এই সম্বন্ধবিচার আজকের দিনে খুব চলতি হয়েছে। কিন্তু রামমোহনের এই পুস্তিকা প্রচারের সময় ইউরোপেও তা ভালো করে আরম্ভ হয় নাই এবং ইংলণ্ডে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। রাজার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ইংরেজ ব্যবহারতত্ত্ববিদ্‌ জেরেমি বেন্টাম প্রচার করেছিলেন যে, যে-কোনো দেশ তাঁর কাছে আবেদন করলেই তিনি সে-দেশের আইন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সূত্রাকারে তৈরি করে দেবেন। অর্থাৎ দেশের ও জাতির আইন যে তার পূর্ব-ইতিহাস ও বর্তমান পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নাড়ীর যোগে যুক্ত এবং সেই অনুসারে অনেক অংশে গ'ড়ে ওঠে— সে ধারণা বেন্টাম-এর স্পষ্ট করে ছিল না।

এক বচনের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারবিধির সৃষ্টি যে হিন্দু-আইনের

একটা-কিছু আশ্চর্য বিশেষত্ব নয় তা ইউরোপীয় পাঠকদের ঘরের কথার উদাহরণে রামমোহন প্রথমে বুঝিয়েছেন :

'An European reader will not be surprised at the differences I allude to, when he observes the discrepancies existing between the Greek, Armenian, Catholic, Protestant and Baptist Churches, who, though they all appeal to the same authority, materially differ from each other in many practical points owing to the different interpretations given to the passages of the Bible by the commentators they respectively follow.'

বাঙালি হিন্দুর বহুকালপ্রচলিত উত্তরাধিকার আইন উলটে দিলে যে ক্ষতি ও বিভ্রাট ঘটবে সে সম্বন্ধে রামমোহন লিখেছেন :

'The principles of the law as it exists in Bengal having been for ages familiar to the people, and alienations of landed property by sale, gift, mortgage or succession having been for centuries conducted in reliance on the legality and perpetuity of the system, a sudden change in the most essential part of those rules cannot but be severely felt by the community at large, and alienations being thus subjected to legal contests the courts will be filled with suitors, and ruin must triumph over the welfare of a vast proportion of those who have their chief interest in landed property !' এবং এ রকম আইন-বদলানো বিচারকের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে : 'We are at a loss to understand how to reconsider this arbitrary change with reason ; because, any being capable of reasoning would not, I think, countenance the investiture, in one person, of the power of legislation with the office of Judge. In every civilised country, rules and codes one found proceeding from one authority, and their execution left to another. Experience shows that unchecked

power often leads the best men wrong, and produces general mischief।' আইন যেখানে অস্পষ্ট সেখানে বিচারক অবশ্য নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী তার ব্যাখ্যা করবেন, কিন্তু আইন যেখানে স্পষ্ট সেখানে তার নিজের ভালো লাগুক কি মন্দ লাগুক ঐ স্পষ্ট আইন অনুসারেই বিচার করতে হবে: 'A Judge, although he is obliged to consult his own understanding, in interpreting the law in many dubious cases submitted to his decision, yet is required to observe strict adherence to the established law, where its language is clear।' 'দায়ভাগে'র গ্রন্থকার তাঁর পূজ্য অনেক ঋষির বাক্য অগ্রাহ্য করেছেন এই অজুহাতে তাঁর মত অমান্য করে ইংরেজ জজের ঋষিবাক্য-অনুমান-বিচার-কার্যের প্রস্তাবে উপভোগ্য পরিহাসের সঙ্গে রামমোহন লিখেছেন: 'It is however evident the author of the Dayubhaga gives here an apparent preference to the authority of one party of the saints over that of the other, though both have equal claims upon his reverence. But admitting that a Hindu author, an expounder of their law, sin against some of the sacred writers, by withholding a blind submission to their authority, and likewise that the natives of the country have for ages adhered to the rules he has laid down, considering them reasonable, and calculated to promote their social interest, though seemingly at variance with some of the sacred authors: it is those holy personages alone that have a right to avange themselves upon such expounder and his followers; but no individual of mere secular authority, however high, can, I think, justly assume to himself the office of vindicating the sacred fathers, and punishing spiritual insubordination, by introducing into the existing law an overwhelming change in the attempt to restore obedience।' প্রবন্ধের উপসংহারে রামমোহন লিখেছেন: 'In foregoing pages my endeavour has been to show that the

Province of Bengal, having its own peculiar language, manners and ceremonies, has long enjoyed also a distinct System of law. That the author of this System has greatly improved on the expositions followed in other provinces of India, and therefore well merits the preference recorded to his exposition by the people of Bengal... that in following those expositions which best reconcile law with reason, the author of the Bengal System is warranted by the highest sacred authority,... and that he has been eminently successful in his attempt at so doing, more particularly by unfettering property, and declaring the principle, that the alienator of an hereditary estate is only morally responsible for his acts, so far as they are unnecessary, and tend to deprive his family of the means of support... If I have succeeded in this attempt, it follows that any decision founded on a different interpretation of the law... is not merely retrograding in the social institution of the Hindoo Community of Bengal... but a violation of the charter of justice, by which the administration of the existing law of the people in such matters was secured to the inhabitants of this country।'

কৌতূহলী লোকদের কুতূহল নিবৃত্তির জন্ম বলা প্রয়োজন হয়, এই পুস্তিকা প্রকাশের এক বছর পর, ১৮৩১ খৃস্টাব্দে, বিচারপতি স্যার চার্লস এডওয়ার্ড গ্রে এই প্রশ্নসংক্রান্ত একটি মকদ্দমায় সদর দেওয়ানি আদালতের জজদের মত নিয়ে, তাঁর রায়ে লিখলেন: 'I have frequently expressed my opinion on this very point, both in the present, and in other cases within the last two years, but the opinion I am now prepared to retreat।' রামমোহন রায়ের যুক্তির প্রতিধ্বনি ক'রে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার উত্তরাধিকার-প্রকরণের প্রভেদ সম্বন্ধে তিনি বললেন: 'The district of Benares being situated far inland, is more agricultural than Bengal in which is the conflux of all the

great rivers with the sea, and where consequently the persuits of the more wealthy part of the population are of a mercantile character; consequently there are many important differences between the doctrines of the Benares and the Bengal Schools, the latter generally favouring alienation of property, and thereby facilitating mercantile speculations.'

৪

কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিকারদের কল্পিত ব্যবহারের পরবর্তী নিবন্ধকারদের পরিবর্তন যে সবসময় মঙ্গলকর হয় নি, কোনো কোনো জায়গায় যে তাঁরা পুরাতন ন্যায়ব্যবস্থার বদলে অর্বাচীন অন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন তা রামমোহনের অজ্ঞাত ছিল না। হিন্দু-আইনে স্ত্রীলোকের স্বামী ও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে এই ব্যাপার ঘটেছে তা পূর্বে উল্লিখিত ১৮২২ খৃস্টাব্দের *Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance* নামক সন্দর্ভে রাজা প্রমাণ দিয়ে বিশদ করে দেখিয়েছেন। ঐ সম্পর্কে স্মৃতিকারদের বচন এবং নিবন্ধকারদের ব্যাখ্যা তুলে তিনি দেখিয়েছেন যে স্মৃতিকারেরা যেখানে স্বামী ও পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রী ও কন্যার ছেলে ও ভাইদের সঙ্গে প্রথম পক্ষে সমান ও দ্বিতীয় পক্ষে এক-চতুর্থ অংশ উত্তরাধিকার স্পষ্ট নির্দেশ করেছিলেন, নিবন্ধকারদের ব্যাখ্যায় তা সম্পূর্ণ, না হয় কার্যত, রদ হয়েছিল। রামমোহন মত প্রকাশ করেছিলেন যে, স্ত্রীলোকের এই উত্তরাধিকারহীনতা হিন্দুসমাজে তার নানা দুরবস্থা এবং কুলীনের বহুবিবাহ প্রভৃতি নানা কুপ্রথার জন্য অনেকটা দায়ী। এবং তিনি আশা করেছিলেন: 'The humane attention of the Government will be diverted to those evils which are the chief sources of vice and misery and even suicide among women.' অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন রামমোহনের এ আশা সফল হয় নাই। বরং ইংরেজ আদালতের বিচারে যেখানে মিতাক্ষরা-আইনে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি উত্তরাধিকার ও স্বত্ব সম্বন্ধে কতকটা সুব্যবস্থা ছিল তাকেও উপেক্ষা করা হয়েছে।

১৮২২ সালের এই সন্দর্ভ এবং ১৮৩০ সালের পূর্ববর্ণিত পুস্তিকা— এই দুইটি একসঙ্গে নিলে বোঝা যায় যে যেখানে নিবন্ধকারদের হাতে প্রাচীন স্মৃতি পরিবর্তিত হয়ে কালোপযোগী ও ন্যায়োপযোগী হয়েছে, রামমোহন রায় সেখানে নিবন্ধকারদের মত বর্তমানকালে চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন। আর যেখানে সে-মত পূর্ব স্মৃতির তুলনায় ন্যায়ে ও উপযোগিতায় পিছিয়ে গিয়েছিল, সেখানে নূতন আইন করে হিন্দু-আইন পরিবর্তনে তাঁর মত ছিল। বর্তমান যুগেও রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথ ছাড়া হিন্দু-আইনকে কালোপযোগী করে রাখবার অন্য পন্থা নেই।

'তত্ত্বকৌমুদী', মাঘোৎসব সংখ্যা, ১৩৭৩।

১৯৩৩ খৃস্টাব্দে রামমোহনের মৃত্যুশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ছাত্রগণ *The Students' Rammohun Centenary Volume* নামে যে প্রবন্ধসংকলন প্রকাশ করেন, তাহার বাংলা অংশ ('রামমোহন প্রতিভা') হইতে বর্তমান প্রবন্ধটি গৃহীত। গ্রন্থখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, রচনাটিও অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ

অজিতকুমার চক্রবর্তী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যে সময় তিনি উৎপন্ন হইযাছিলেন, সে সময় তিনি ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মধর্মকে এই সংসারে আনিতে পারিত না— তাঁরই প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্নভিন্ন হইল, তাঁরই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল।" কিন্তু কুসংস্কাররূপ অরণ্য বলিতে কেবল তখনকার দেশপ্রচলিত কুসংস্কার বুঝায় না, ধর্ম সম্বন্ধে যত রকমের কুসংস্কার থাকিতে পারে সমস্তই বুঝায়। কারণ এ সমস্তই রামমোহন রায়কে একাকী উচ্ছেদ করিয়া বিশুদ্ধ ভিত্তির উপর তাঁহার ব্রহ্মোপাসনাটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। সাকার উপাসনা সত্য কি না, বৈদিক বহুদেববাদ সত্য কি না, অমূর্ত ঈশ্বরের পক্ষে ইচ্ছা করিলে মূর্তি ধারণ করা সম্ভব কি না, সগুণ ঈশ্বর মানিলে সাকার ঈশ্বর মানা হয় কি না, ব্রহ্ম ভিন্ন যখন অন্য বস্তু নাই তখন যে-কোনো বস্তুর সাহায্যে ব্রহ্মের উপাসনা চলে কি না, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার কি না, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ কোন্ মার্গ শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থের ব্রহ্ম-বিদ্যায় অধিকার আছে কি না, মধ্যবর্তিবাদ, গুরুবাদ ও অলৌকিকত্ব মানা চলে কি না— ইত্যাদি প্রত্যেকটি প্রশ্নের বিচার করিতে গিয়া রামমোহন রায়কে একেবারে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দর্শনশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র, সকল শাস্ত্রের অর্থবিচার করিতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন যে, তাঁহার জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্নভিন্ন হইল— সে সামান্য ছোটোখাটো অরণ্য নয়। সে একেবারে যুগ-যুগান্তব্যাপী কত বিচিত্র ধর্মসম্প্রদায়ের শাখাপ্রশাখায় বিস্তারপ্রাপ্ত নানা-রকমের সংস্কারের অরণ্য। এত অরণ্য কাটিয়া কুটিয়া তিনি ব্রহ্মোপাসনার পুষ্পকাননটিকে দেশের মর্মের মধ্যে রাখিয়া গেলেন; এ কাজ তিনি ভিন্ন আর কাহার দ্বারা সম্ভাবনীয় ছিল? এখনই কি সে-সকল সংস্কারের জড় মরিয়াছে? তাহাদের মূল যে গভীরভাবে এ দেশের মাটির মধ্যে নিহিত। আবার জঙ্গল হইতেছে, আবার নব নব জ্ঞানাস্ত্রের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে।

বেদে যে বহুদেববাদ দেখা যায়, নানা দেবতাকে যে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, রামমোহন রায় দেখাইলেন যে, তাহা কেবল ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপীত্ব বুঝাইবার

জন্য। কারণ বেদেই ব্রহ্মকে আবার নির্বিশেষ ও এক বলিয়াছে। বেদান্তে তেমনি আবার ব্রহ্মকে অরূপী বলা হইলেও, তিনি যে নামরূপাদির আশ্রয়, ইহা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই নির্গুণ ও সগুণ দুইদিক্‌কেই রামমোহন রায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি শাঙ্কর-ভাষ্যকেই অবলম্বন করিয়া বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শঙ্কর যদিচ নির্গুণ ব্রহ্মবাদের দিকে ষোল আনা ঝোঁক দিয়াছেন। সেই কারণে সাধারণের মধ্যে এই সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, তিনি শঙ্করের চেলা, ঘোর বৈদান্তিক। জ্ঞানের পন্থায় এ যেমন তিনি করিয়াছেন, তেমনি ভক্তির পন্থায় সাকারবাদ ও অবতারবাদ সম্বন্ধে ভক্তিপন্থীদের যত রকমের জ্ঞান-বিরুদ্ধ যুক্তি থাকিতে পারে, সমস্তই তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে তিনি লিখিয়াছেন, "ভট্টাচার্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন, সেরূপ উপাসনা পরমাত্মার হইতে পারে না, যে কাল্পনিক উপাসনাতে উপাসকের কখন মনেতে, কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্মাণপূর্বক সেই উপাস্যের ভোজন-শয়নাদির উদ্‌যোগ করিতে এবং তাহার জন্মাদি তিথিতে ও বিবাহ দিবসে উৎসব করিতে তাহার প্রতিমূর্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করাইতে হয়।"— অবতারবাদ সম্বন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে বেদে, স্মৃতিতে পুরাণে কোথাও বলা হয় নাই যে পরমাত্মার অবতার আছে। পুরাণে কেবল দেবতাদের অবতার হওয়ার কথা আছে। এক গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবগ্রন্থেই পরমাত্মার অবতারের কথা পাওয়া যায়। ভক্ত বৈষ্ণবেরা বলেন যে, ভগবানের আনন্দ-নির্মিত কৃষ্ণমূর্তি, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, কেবল ভক্তের চক্ষুগোচর হয়, আর কাহারও নয়। বৈষ্ণব গোস্বামীর সঙ্গে এ-বিষয় লইয়া বিচারে রামমোহন রায় এই-সব অলৌকিক ব্যাপারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রাকৃত বস্তু ছাড়া যে আর-কোনো জিনিস কখনোই মানুষের চক্ষুগোচর হইতেই পারে না এবং সেই কারণে আনন্দমূর্তির ব্যাপারটা যে নিছক রূপকমাত্র, এ কথা তিনি গোস্বামীকে বেশ ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ভক্ত, পৌত্তলিক সকল সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে লড়াই করিয়া রামমোহন রায় ১৮২৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের যে ট্রাস্টডীড্‌ নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মতো এমন উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাবের একখানি লিপি আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়

কি না সন্দেহ। তাঁহার ধর্মমন্দিরের উপাস্য দেবতা— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা, অনাদি, অনন্ত, অগম্য, অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর। তাঁহার উপাসক – যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন তিনিই— যে জাতি, যে সম্প্রদায়, যে ধর্মেরই লোক তিনি হৌন্ না কেন। তাঁহার উপাসনা-প্রণালীতে কোনো জীব, পদার্থ, ছবি, মূর্তি, এ-সকলের স্থান নাই। যাহাতে নিরাকার, অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা হয়, প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া ও সাধুতার চর্চা হয় এবং সকলের চেয়ে বড়ো কথা— সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন বেশ দৃঢ় হয়— সেই রকমের উপদেশ, বক্তৃতা, গান ও প্রার্থনা হওয়ার নির্দেশ আছে।

কিন্তু রামমোহন রায় এমন অসাম্প্রদায়িক ও সার্বভৌমিক হইয়াও জাতীয় ভাব ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সমাজকে তিনি হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, "স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়" এবং "আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।" এ জায়গায়ও আবার— তিনি যদি কেবলমাত্র সার্বভৌমিক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন, তাহার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের যোগ কোথায় তাহা তলাইয়া না দেখিতেন, তবে তিনি জাতীয়-ভাবে সার্বভৌমিক হইতে পারিতেন না এবং এইখানেই আবার ফরাসী এন্সাইক্লোপিডিস্ট্দের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য। কারণ, তাঁহাদের সার্বভৌমিকতা জাতীয়তার ঐতিহাসিক বিকাশের পথে ফোটে নাই, সেই বিকাশের পথটি তাঁহাদের চোখেই পড়ে নাই। তাঁহারা সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে ব্যক্তি-তন্ত্রতাকে (Individualism) অধিনায়ক করিয়াছিলেন। রামমোহন সেই ব্যক্তিতন্ত্রতার কর্তৃত্বের জন্য জাতীয় শাস্ত্রের একটা শাসনের প্রয়োজন অনুভব করিতেন, কিন্তু শাস্ত্রকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে কষিয়া তবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

অতএব, এই নবযুগের প্রবর্তক রামমোহনের ভিতর হইতে আধুনিক যে যুগস্বভাবটি ফুটিয়া উঠিল, তাহার প্রধান লক্ষণ সংক্ষেপে বলিতে গেলে দুইটি :—

ক. ধর্মের সঙ্গে সমাজের যোগ অবিচ্ছেদ্য যোগ। সেইজন্য আত্মতত্ত্বের অনুশীলন বা শ্রবণমননাদি জ্ঞানযোগের সাধন কিম্বা লোকশ্রেয়ঃ প্রভৃতি কর্মযোগের সাধন, এ কোনো সাধনই নিরপেক্ষভাবে ধর্মসাধন নয়। ব্রহ্মো-

পাসনাই সকল সাধনার উৎস বা কেন্দ্রের মতো। সেই উৎসে পৌঁছিলে, কি কর্মে, কি জ্ঞানে, কি প্রেমে, ব্রহ্মই সর্বময় হন। তখন আর কিছুই বাহ্য থাকে না, সমস্তই আন্তরিক হয়। রামমোহন রায় তাঁহার 'ব্রহ্মোপাসনা' নামক একটি চটি বইয়ে এই কথাই বলিয়াছেন :— "পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে, তাঁহাকে ··· সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপূর্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্বদা তাঁহার সমীহা করা, অর্থাৎ এই অনুভব সর্বদা কর্তব্য যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।"

খ. জাতীয়ভাবে সার্বজনীন বা সার্বজনীনভাবে জাতীয় হইতে হইবে। ধর্ম যেমন দেশকালের অতীত, তেমনি দেশকালের ভিতর দিয়া ইতিহাসের ভিতর দিয়াই তাহার প্রকাশ। ধর্ম স্বরূপত সার্বভৌমিক, কিন্তু ইতিহাসের মধ্য দিয়া তাহার বিশেষ প্রকাশ বলিয়া ধর্ম ক্রমাগতই নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আপনার সার্বভৌমিক স্বরূপটিকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্মের ভিতরে যেমন এই চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, সমাজেরও ভিতরে তেমনি এই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ, ধর্মে ও সমাজে অবিচ্ছেদ্য যোগ। দেশকালের সঙ্গে ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন সার্বজনীন ধর্ম বা সমাজ আকাশকুসুমমাত্র; আবার যে ধর্মে বা সমাজে সার্বজনীনতার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহাও সংকীর্ণ ও প্রাণহীন।

কবি বলেন যে, কেন্দ্রের অভিমুখী ও কেন্দ্রের প্রতিমুখী এই দুই শক্তির একটি ছন্দ যেমন বিশ্বসৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায়, মানুষের ইতিহাসেও তেমনি একটি সংকোচন ও প্রসারণের সামঞ্জস্যের তত্ত্ব আছে। তবে "বিশ্বের গানে তালটি সহজ, মানুষের গানে তালটি বহু সাধনার সামগ্রী।" মানুষের ইতিহাস "অনেক সময়ে দ্বন্দ্বের একপ্রান্তে আসিয়া এমনি ঝুঁকিয়া পড়ে যে, অন্য প্রান্তে ফিরিতে বিলম্ব হয়, তখন তাল কাটিয়া যায়, প্রাণপণে ত্রুটি সারিয়া লইতে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিতে হয়।"

আমার মনে হয় যে, বাংলাদেশের অত্যন্ত কোমল মাটি, ভিজে আবহাওয়া, অজস্র শ্যামল গাছপালা এবং অসংখ্য নদীনালা এদেশের মানুষের মানসিক প্রকৃতিকে বড়ো বেশি রসপ্রবণ, কল্পনাপ্রিয় ও বেদনাশীল করিয়াছে। তাহার উপর যদি রিজ্‌লি সাহেবের নৃ-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত মানিতে হয়, তবে তো বাঙালি

জাতি অনার্য দ্রাবিড জাতি হইতে উৎপন্ন, এই কথা বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে দেখা যায় যে, দ্রাবিড় জাতির মানসিক প্রকৃতির ঠিক উপরি-উক্ত বিশেষত্বগুলিই ছিল। দ্রাবিড় দেশে দক্ষিণাপথেই ভক্তিধর্মের উৎপত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে গীতার শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট সমন্বয়তত্ত্বকে দেখিবার জো নাই। অনার্য গোপজাতির কৃষ্ণরাধালীলার নানা কথা জীব ও ভগবানের সম্বন্ধে রূপকের হিসাবে সেই ধর্মে গ্রহণ করা হইয়াছে। বোধ করি, সেই গৌডীয় বৈষ্ণবধর্মে জ্ঞানেব সঙ্গে রসের তেমন সংযোগ নাই। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কবীর-নানক-পন্থীদের ধর্মে যেমন জ্ঞানের সঙ্গে রসেব একটা চমৎকার যোগ দেখা যায়, গৌডীয় বৈষ্ণবধর্মে তাহা দেখা যায় না। কবীব, নানক, দাদূ প্রভৃতির ধর্মপন্থায় মুসলমানধর্মেব তত্ত্ব ও সাধনার সঙ্গে বিশেষত সুফী সাধনার সঙ্গে আব ভারতবর্ষীয় রসতত্ত্ব ও রসসাধনার একটা জৈব সংযোগ ঘটিয়াছে। এমন-কি, বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বও সেই আধ্যাত্মিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাদ পডে নাই, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সে রকমের আদানপ্রদানেব কোনো কাজকারবারই নাই।

সুতরাং, কবির ভাষায় বলিতে গেলে, বাংলার ইতিহাসে এই আত্ম-সংকোচনক্রিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে অত্যন্ত বেশিদূর পর্যন্ত গিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় রামমোহন রায় অন্য প্রান্তে বিশ্বেব অভিমুখে আত্ম-প্রসারণের দিকে আবার একেবারে চরমতম সীমা পর্যন্ত গিযাছিলেন। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' গ্রন্থে রামমোহন রায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং বিশেষত বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর যে একেবারে সাকার, এ কথা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিতে ক্রটি করেন নাই। ভাগবতের তেত্রিশ অধ্যাযে চতুর্দশ শ্লোকে আছে যে, নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে কুণ্ডল দুইটি আর তাহার শোভাতে সাজিয়াছে যে গণ্ড—সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে যে গোপী অর্পণ করিতেছেন, তাঁহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিতেন। এই রকম সব শ্লোক তুলিয়া রামমোহন রায় প্রশ্ন করিয়াছেন যে, এ বর্ণনা কোন্ বেদান্তে পাওয়া যায়? যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলিতে চায়, তাহারা বেদান্তের ঈশ্বরসম্বন্ধে এই-সকল রূপগুণের বর্ণনা কোথায় পাইয়াছে? 'প্রার্থনাপত্র' নামক পুস্তিকায় রামমোহন গুরু নানকের সম্প্রদায়, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বীদিগকে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসকশ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়াছেন। অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে ধরেন নাই।

রাজা রামমোহন রায়ের পরে আমাদের সমাজের আত্মপ্রসারণের শক্তি সকল দিক হইতে জাগিয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের চিত্ত যে একটা বিশাল বিশ্বব্যাপক ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিত, সে ছিল তাঁহার ধ্যানের ক্ষেত্র। জাতীয় চিত্তের পক্ষে সে জায়গায় পৌঁছিতে দীর্ঘকালের সাধনার দরকার আছে। ধ্যানদৃষ্টিতে তিনি সবটা যেন দেখিয়াছিলেন, এ যুগের সমস্তটা ভাব এবং ভাবীকালের সমস্তটা রূপ। যেমন করিয়া চিত্রকর তাহার টুলের উপর বসিয়া তাহার সামনের পটের উপর তুলি চালায়, তিনি যেন তেমনি করিয়া সমস্ত গোটা পৃথিবীটাকে তাঁহার টুলের মতো ব্যবহার করিয়া ভাবীকালের পটের উপর তুলি চালাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যতটা ধ্যানে দেখিয়াছিলেন, ততটা'কে উপলব্ধিতে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলা তাঁহার পরবর্তীকালের কাজ ছিল। সেই কাজ করিতে আসিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

রামমোহন রায়ের ভিতর হইতে আধুনিক যে যুগভাবটি ফুটিয়া উঠিল তাহার প্রধান দুইটি লক্ষণ আমি বলিয়াছি :—১. ব্রহ্মোপাসনাই সকল সাধনার মূল বা কেন্দ্রস্বরূপ, ২ জাতীয়ভাবে সার্বজনীন বা সার্বজনীনভাবে জাতীয় হওয়া এ কালের আদর্শ। এই দুইটি লক্ষণই দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ফুটিয়াছিল। ব্রহ্মোপাসনায় যে অবস্থায় পৌঁছিলে জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে ব্রহ্মই সর্বময় হন, কিছুই আর বাহ্য থাকে না—সে অবস্থা রামমোহন রায় তাঁহার অপূর্ব অধ্যাত্মদৃষ্টির সাহায্যে ধ্যানমাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অবস্থায় তিনি নিজে পৌঁছিতে পারেন নাই। কারণ, সে অবস্থার কথা শেষাশেষি তাঁহার চিত্তের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়াছিল। তখন বেদান্ত অদ্বৈতবাদের প্রভাব, মতাজাল ও মওয়াহেদ্দীন সুফীদের প্রভাব, ইউরোপীয় ডীস্‌ট্‌ ও এন্‌সাইক্লোপিডিস্‌ট্‌দের প্রভাব, অনেকটা পরিমাণে কাটাইয়া ধর্মের দার্শনিক ভিত্তিই যে তাহার মূল ভিত্তি নয়, মূল ভিত্তি যে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মের সহিত নিবিড় মুখোমুখি যোগ (communion), এ কথাটা তিনি বুঝিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের চিত্তের প্রসার কখনোই রামমোহন রায়ের মতো অমন ব্যাপক ছিল না। রামমোহন রায়ের মতো বিশ্বমানবপ্রেম তাঁহার অধ্যাত্মবোধের উৎসও ছিল না। কিন্তু ঐ ব্রহ্মের সহিত নিবিড় মুখোমুখি যোগ তাঁহার চিরজীবনের সাধনার বিষয় ছিল। উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে ব্রহ্ম ছিলেন তাঁহার এক লক্ষ্য এবং তাঁহার আত্মা শরবৎ সেই ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাতেই তন্ময় হইয়াছিল। ভিতরের দিক হইতে দেখিতে গেলে

তাঁহার সমস্ত জীবনের ইতিহাস এই ব্রহ্মের সহিত যোগের ইতিহাস! কিন্তু বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে বিশ্বমানবপ্রেম তাঁহার সকল কর্মের উৎস ছিল না বলিয়া তিনি ধর্মে, সমাজে, নীতিতে, সকল দিকে মানুষের সমস্যাকে বড়ো জায়গায় দেখিতেও পান নাই। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারার বাঁকে বাঁকে বিশ্বমানবের তটস্থ রূপ যেমন করিয়া রামমোহন রায় দেখিয়াছিলেন, তেমন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার জীবনের ইতিহাস বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া জাতীয়ভাবে সার্বজনীন এবং সার্বজনীনভাবে জাতীয় হওয়ার আদর্শকে সমাজে অনুষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার নানাবিধ কর্মচেষ্টার ইতিহাস। আমি এ পরিচ্ছেদের আরম্ভেই বলিয়াছি, এই বাহিরের ইতিহাসটি সমস্ত যুগের ইতিহাসের ভিতর হইতে দেখানো সহজ। কিন্তু ভিতরের অধ্যাত্ম যুগের ইতিহাসটি দেখাইতে গেলে যে বিরল ভাবলোকের পর্দার পর পর্দা খুলিয়া দেখাইতে হয়, তাহা সকলের চেয়ে কঠিন কাজ।

অবশ্য রামমোহন রায়ের মধ্যে আমাদের দেশের আত্মপ্রসারণশক্তির যে-রকম অসামান্য স্ফূর্তি দেখা যায়, এমন এ যুগে আর কোনো একজন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় না— তাহা তো পূর্বেই বলিয়াছি। রামমোহন রায় তো আর এক মানুষ ছিলেন না, তাঁর এক মানুষের মধ্যে দশটা মানুষ কাজ করিত। গঙ্গা যেমন শতধারায় বিচ্ছিন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িয়াছে, এ যুগে তেমনি রামমোহন রায়ের জাতীয়তামূলক বিশ্বজনীনতার আদর্শ নানা লোক ও নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ সেই ভাবটিকে ঠিকমত ধরিলেও তাঁহার চিত্তক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ছিল। রামমোহন রায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান সভ্যতার ধর্মতত্ত্ব, সমাজনীতি, আইন প্রভৃতি সকল বিভাগের জ্ঞানলাভ করিয়া যেমন তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং যেমন যে গভীরতর মূলে তাহারা এক, সেই অখণ্ড ঐক্যভূমিটিকেও তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তেমনি করিয়া এক হিন্দুসভ্যতা ছাড়া অন্যান্য সভ্যতার বিশিষ্টতাকে দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। বাস্তবিক রামমোহন রায়ের পরে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির প্রণালী আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের— শুধু ধর্মের কেন— ভিন্ন ভিন্ন সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আমাদের

দেশে যথেষ্ট হয় নাই। ইংরাজি শিক্ষার জন্ম খৃস্টান সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা কতক কতক কথা আজকাল জানিয়াছি; কিন্তু মুসলমান সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা সামান্য পরিমাণেই জানি। সুফীধর্ম সম্বন্ধে কোনো আলোচনা, সুফীভক্তদের কবিদের কোনো গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশ হয় নাই। দেবেন্দ্র-নাথ সুফী ভক্তকবিদের গ্রন্থের অনুরাগী ছিলেন; পারস্যভাষায় তাঁহার সুন্দর অধিকার ছিল। সুতরাং রামমোহন রায়ের পর মুসলমান সাধনাকে কতক পরিমাণে আত্মসাৎ করার কাজ তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল। তার পর খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব তিনি আলোচনা না করিলেও পশ্চিমের দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্র-গুলি তিনি রীতিমতো অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দেকার্ত হইতে কান্ট এবং ভিক্তে ও কুজ্যাঁর দর্শনগুলি তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এ-সকল শাস্ত্র তিনি অধ্যাত্মজীবনের ক্ষুধার তাড়নায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের পথের সামনে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তাহাদের মীমাংসার জন্য ভারতবর্ষের এবং ইউরোপের তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এই গভীরতর প্রয়োজনের ভিতর হইতেই তাঁহাকে তত্ত্বসৃষ্টি করিতে হইয়াছে, এবং সেই সৃষ্টির উপকরণস্বরূপ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের নানা তত্ত্বকে ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায়। তাঁহার জীবনের ছাঁচে ঢালাই করিয়া তিনি নূতন নূতন তত্ত্বের ও চিন্তার ছাঁচ এ যুগের জন্য গড়িয়া গিয়াছেন— এই হিসাবে তাঁহাকে বর্তমান যুগসমন্বয়ের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। যুগসমস্যাগুলি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা হইয়া তাঁহার ভিতর হইতে সমাধান লাভের চেষ্টা করিয়াছে।

রামমোহন রায় সকল শাস্ত্র মীমাংসা করিয়া তাহাদের মূল সত্যগুলি আমাদিগকে দিয়া গেলেন— বেদান্ত ধর্মের মূল সত্য কী তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া গেলেন। কিন্তু "ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস" (Dogmas and Beliefs) একটি একটি করিয়া স্থির ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি যান নাই। তাঁহার পরে দেবেন্দ্রনাথকেই সে কাজ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ধর্মতত্ত্ববিৎ (Theologian) হিসাবে দেবেন্দ্রনাথের স্থান সামান্য নয়। এই ধর্মতত্ত্বের মীমাংসা ব্যাপারে, তিনি উপনিষদ্‌-বেদান্তের মূলসত্যগুলিকে মত ও বিশ্বাসের আকার দান করিতে গিয়া পশ্চিমের দেকার্ত হইতে কাণ্টের দর্শন, 'ন্যাচারল থিয়লজি' প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের উপাদান উপকরণের সাহায্যে

ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। রামমোহন রায়কে খৃস্টধর্মের আধুনিক আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোগী বলিয়া আজও পশ্চিম দেশের লোক সম্মান করিয়া থাকে এবং তাঁহাকে বলে খৃস্টান একেশ্বরবাদের একজন জনক। অথচ সেই রামমোহন রায়ের পন্থার পথিক হইয়া দেবেন্দ্রনাথ যে কেন খৃস্টধর্মের দিকে মুখ ফিরাইলেন, তাহার কারণ আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

রামমোহন রায়ের সময়ে খৃস্টান ধর্মের আন্দোলন এ দেশে ঠিক জাগে নাই। তখন সবে ডফ্‌সাহেব এ দেশে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীরামপুরের পাদ্রী মার্সম্যান প্রভৃতি, যাঁহাদের সঙ্গে রামমোহন রায়ের বাইবেল শাস্ত্র লইয়া তুমুল তর্কবিতর্ক হইয়াছিল. তাঁহারা তেমন করিয়া দেশের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করিতে তখনো পারেন নাই। ডিরোজিয়োর প্রভাবে হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুসমাজকে ভাঙিবার জন্য যে তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, যে ভয়ংকর স্বজাতি-বিদ্বেষ তাহাদের মনকে অধিকার করিল, তাহার ফলে দলে দলে শিক্ষিত যুবকেরা খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

দুর্গতি যে নানাদিক দিয়াই তখন দেখা দিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তখন ইংরাজিশিক্ষাও ভালো করিয়া দেশে চলতি হয় নাই, প্রাচীন শাস্ত্র রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিরও আলোচনা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বারো মাসে তেরো পার্বণ লইয়াই লোকে ব্যস্ত— মেলা, স্নানযাত্রা, দোল, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের আমোদে মাতাই প্রধান ধর্মকর্ম ছিল। এই-সকল আমোদ যে বিশুদ্ধ ছিল তাহা নয়। নানা দুর্নীতি ও কুৎসিত ব্যাপার ইহাদিগকে দূষিত করিয়াছিল। ধর্মানুষ্ঠানসকল যেমন কলুষিত হইয়াছিল, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতিও সেইরকম অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ও গ্রাম্যতাদুষ্ট হইয়াছিল। কবির লড়াই ও পাঁচালী ছিল প্রধান সাহিত্য। কবিওয়ালারা যে যত অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তি করিতে পারিত, সে ততই প্রতিষ্ঠা পাইত। পাঁচালী সাহিত্যে দাশরথি রায় তো স্বনামধন্য; তাহার অনুপ্রাসের প্রলাপ শুনিলে এখন হাসি পায়, অথচ সেকালে লোকে তাহাই বিশেষ করিয়া তারিফ করিত।

সমাজের এমনি দুর্দশার ও অবনতির সময়ে রামমোহন রায় বাংলাদেশের বন্ধনমোচনের জন্য ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে রাধানগরে জন্মগ্রহণ করিলেন। মুসলমান-রাজত্বকালে আরবী ও পারসী ভাষা তো কত লোকেই শিখিয়াছিল, কোরানের

বচনও যে এ দেশের লোকে জানে নাই তাহা নয়। কিন্তু রামমোহন রায় অল্প বয়সেই সেই কোরান পড়িয়া প্রচলিত পৌত্তলিক উপাসনার প্রতি বিদ্রোহী হইলেন। সে বিদ্রোহকে ঘরের লোক থামাইবে, এমন সাধ্য তাহাদের ছিল না। ঘরের লোক কেন, সমস্ত বাংলাদেশেও তাঁহাকে কুলাইল না। ঘর হইতে তাড়িত হইয়া ষোলো বছর বয়সে সেই বালক অজানা বিশ্বজগতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং একাকী উত্তুঙ্গ হিমগিরি লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত পর্যন্ত চলিয়া গেলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কাশীতে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িলেন এবং বাইশ বছর বয়সে ইংরাজি শিখিতে শুরু করিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ভালো করিয়া পড়িয়া বেদান্তের ব্রহ্মবিদ্যাকে তিনি শাস্ত্র সমুদ্রের গর্ভস্থিত শ্রেষ্ঠমণি স্থির করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন এবং যে দেশ গ্রাম্য খেলাধুলা লইয়া ব্যস্ত ছিল, তাহাকে ডাক দিয়া বলিলেন— তুমি দরিদ্র নও, তুমি রাজসম্পদের অধিকারী। তুমি বিশ্বকে অসংখ্য পরিমিত দেবদেবীর দ্বারা শাসিত জানিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়াছ এবং তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া তাহাদের তুষ্টির জন্য কত কদর্য অনুষ্ঠানের আচরণ করিতেছ। অনেক দেবদেবী এই বিশ্বের অধিপতি নহেন, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা। তিনি পরিমিত নহেন ; তিনি অসীম। তিনি দেশকালে বদ্ধ ক্ষুদ্র দেবতা নহেন ; তিনি অনন্ত দেশ ও অনন্তকালব্যাপী বৃহৎ দেবতা পরব্রহ্ম।

"ভাব সেই একে
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।"

আমরা ছিলাম গ্রামে, রামমোহন রায় আমাদিগকে শুধু বড়ো রাজ্যের রাজধানীতে লইয়া গেলেন যে তাহা নয়। তিনি একেবারে বিশ্বের চৌমাথায় দাঁড়াইলেন— যেখানে বড়ো বড়ো সভ্যতার পথ দিকে দিকে প্রসারিত। যেমনি তিনি নিজের দেশের প্রাচীন ধর্মের মধ্যে সার্বভৌমিকতার আদর্শকে আবিষ্কার করিলেন, অমনি তাঁহার উদার দৃষ্টি হইতে সমস্ত সংস্কারের আবরণ দূর হইয়া গেল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মুসলমান ও খৃস্টানধর্মের মধ্যেও সার্বভৌমিক আদর্শ বিরাজ করিতেছে। মুসলমান মৌলবী সে কথা মানিল না ; খৃস্টান মিশনারি সে কথা স্বীকার করিল না। রামমোহন রায় ধর্মের সাম্প্রদায়িক গণ্ডি ভাঙিয়া তাহার বিশ্বজনীনতার যে উদার চৌমাথায় গিয়া দাঁড়াইলেন, সেখানে কোনো সম্প্রদায় পৌঁছিতে না পারিয়া তাঁহাকে নিজেদের শত্রু মনে করিয়া লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিল।

সহমরণপ্রথা দূর করিবার জন্য যখন রামমোহন রায় তাহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ইংরাজিতে ও বাংলাতে চটি বই-সকল বাহির করিতেছেন এবং আন্দোলন করিতেছেন, তখনই দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে বন্ধুতায় দ্বারকানাথের মন সে কালের সমাজের বহু সংস্কারকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেকালের ধনীসমাজের যে-সকল বিলাসিতা, আড়ম্বরপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ ছিল, তাহা হইতে দ্বারকানাথ নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। রামমোহন রায়ের সংসর্গে তাঁহার অন্তরে প্রকৃত দেশানুরাগ জাগিতে পায়। দেশের সকল হিতকর অনুষ্ঠানে সেইজন্য তাঁহার উৎসাহ ও দানের কিছুমাত্র কার্পণ্য ছিল না। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, পাশ্চাত্য দেশহিতৈষণাকে তিনি অনুকরণযোগ্য মনে করিতেন বলিয়া ইংরাজিশিক্ষার প্রবর্তনব্যাপারে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দেবেন্দ্রনাথের জীবনের পরিবেশ তৈরি হইয়াছিল এই ভালোমন্দ নানা জিনিসের দ্বারা। তাঁহার চারি দিকে যেমন সেকালের বিলাসিতা ও ধনাড়ম্বর ছিল, তেমনি বদান্যতা, সামাজিকতা প্রভৃতি সেকালের ভালো দিকও ছিল। নিজের দেশের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রীতি ও হৃদয়ের টান তিনি তাঁহার পিতার ভিতরে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এ-সকলের চেয়েও আর-একটি বড়ো জিনিস তাঁহার জীবনটিকে ঘিরিয়া ছিল— রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তি ও আদর্শ। ছেলেবয়সে আমরা কোনো বড়োলোকের সংসর্গে আসিয়া যখন তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখি, তখন না বুঝিয়াই ভক্তি করি বটে, তবু সেই অবুঝ ভক্তির স্বচ্ছ দর্পণে সেই বড়োলোকের ভিতরকার প্রকৃতিটি এমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয় যে, তাহা আর কোনো কালে মন হইতে মোছে না।

রামমোহন রায় যখন ১৮১৪ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিলেন, তখন এ দেশের লোককে ভালোরকম করিয়া ইংরাজিশিক্ষা দিবার জন্য একটা ভালো বিদ্যালয় খোলার প্রয়োজন তিনি অনুভব করিলেন। তাহার চৌদ্দ বছর আগে, ডেভিড হেয়ার নামে একজন ঘড়ির ব্যবসায়ী স্কচ্ ভদ্রলোক এ দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত না হইলেও, তাঁহার আশ্চর্য বদান্যতা ও সহৃদয়তার দ্বারা তিনি এ দেশের লোকের মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব জমিয়া গেল। হেয়ার

ও রামমোহন রায়ের চেষ্টায় একটা ভালো ইংরাজি কালেজ খোলার প্রস্তাব তখনকার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড ইস্ট গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মুশকিল বাধিল রামমোহন রায়কে লইয়া! তিনি কালেজ কমিটিতে থাকিবেন ইহা শুনিয়া অনেক পৌত্তলিক হিন্দু ভদ্রলোক কালেজের সহিত কোনো সংস্রব রাখিবেন না স্থির করেন। রামমোহন রায় একথা শোনামাত্র কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে ২০ জানুয়ারি হিন্দু কালেজ বা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

রামমোহন রায় এক ইংরাজি ইস্কুল খুলিলেন। তাহার ব্যয়ভার রামমোহন রায় সম্পূর্ণরূপে নিজেই বহিতেন। নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি কয়েকজন রাজার ইস্কুলের প্রথম ছাত্র ছিলেন। এই ইস্কুলেই দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "রামমোহন রায় নিজে গাড়ি করিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া আপনার ইস্কুলে ভর্তি করিয়াছিলেন। রাজার সঙ্গে যাইবার সময়. তিনি বিমুগ্ধচিত্তে রাজার সুন্দর, গম্ভীর, ঈষৎ বিষাদমিশ্রিত মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইস্কুলে গিয়াছিলেন।"

অবশ্য রামমোহন রায় হিন্দুকালেজের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে খুশি ছিলেন না। তাহার কারণ ডেভিড হেয়ার বা মেকলে বা ডিরোজিয়োর মতো পাশ্চাত্য শিক্ষাই এ দেশের সকল রকমের উন্নতির নিদান হইবে, এমন মুগ্ধ ধারণা রামমোহন রায়ের মতো লোকের থাকিতেই পারে না। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন-তরফে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র-শিক্ষাকে নিন্দা করিয়াছিলেন—অথচ নিজে সেই বেদান্তদর্শনের ভাষ্য বাংলায় প্রকাশ করিয়াছেন। রামমোহন রায় পরিষ্কার বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের ধর্মশাস্ত্রকে আমরা না পড়িতে পারিলে, কোনো কালেই তাহার নিত্য তত্ত্ব এবং খণ্ডকালের হিসাবেও তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য আমরা ধরিতে পারিব না। তখনি জীবনের হিসাবে তত্ত্বের মূল্য যাচাই না করিয়া শুষ্ক তর্কের হিসাবে তাহার মূল্য কষিবার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যাইবে। আমাদের দেশে এ চেষ্টা কি দেখা দেয় নাই? রামমোহন রায় তাই পশ্চিমের দিকে দেশের মুখ ফিরাইয়াছিলেন যাহাতে দেশের দিকেই সেই মুখখানা ভালো করিয়া ফেরে। হেয়ার, মেকলে বা ডিরোজিয়োর মতো তিনি স্বপ্নেও মনে

করেন নাই যে, হিন্দুসভ্যতার মধ্যে শিখিবার জিনিস কিছুই নাই, যাহা-কিছু আছে তাহা পশ্চিমের সভ্যতার ভাণ্ডারে।

গল্প আছে যে, হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু পরে একজন লোক তাঁহার কাছে আসিয়া গল্প করিতেছিল যে, অমুক ব্যক্তি আগে ছিল Polytheist. তার পর হইল Deist, এখন সে Atheist হইয়াছে। রামমোহন হাসিয়া বলিলেন, "ইহার পরে বোধ হয় সে beast হইবে।" ধর্মশিক্ষা বাদ দিয়া বিদ্যাশিক্ষা (Secularisation of Education) রামমোহন রায় কখনোই কল্যাণকর মনে করিতেন না। অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ধর্মশিক্ষাও থাকে, সেজন্য তিনি নিজে যেমন একটি ইস্কুল করিয়াছিলেন, তেমনি খৃষ্টান মিশনারি ডফসাহেবকে একটি ইস্কুল খুলিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। "প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা পূর্বক বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয়, দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন।" যে-কোনো ধর্মশাস্ত্র হোক-না ছাত্ররা ধর্মালোচনা করিতে শিখুক এবং অন্যান্য শিক্ষাকে সেই বড়ো শিক্ষার অঙ্গীভূত বলিয়া জানুক, ইহাই ছিল রামমোহন রায়ের শিক্ষার আদর্শ। বেদান্তের অনুরাগী বলিয়া তিনি প্রাচীনকালের তপোবনের শিক্ষার মতো বিদ্যামন্দিরে অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা এ দুয়েরই চর্চা হয়, ইহাই ইচ্ছা করিতেন। হিন্দুকালেজের ধর্মহীন নাস্তিকতার শিক্ষা সেইজন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিত।

রামমোহন রায়ের সময় হইতেই খৃস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে এ দেশের লোকের ঝগড়া চলিয়া আসিয়াছে। শ্রীরামপুরের পাদ্রী কেরী ও মার্সম্যানের সঙ্গে রামমোহন রায়কে রীতিমতো যুঝিতে হইয়াছিল। খৃস্টান কাগজ 'সমাচার-চন্দ্রিকা' হিন্দুশাস্ত্রকে আক্রমণ করিত, রামমোহনকে সেইজন্য 'ব্রাহ্মণসেবধি' ও *Brahminical Magazine* নামে বাংলায় ও ইংরাজিতে এক কাগজ চালাইয়া সেই আক্রমণ ঠেকাইতে হইত। তবে রামমোহন রায় যুঝিবার চেয়ে খৃস্টান ধর্মকে বুঝিবার দিকে মন দিয়াছিলেন। ১৮২০ খৃস্টাব্দে তিনি বাইবেল হইতে খৃস্টের উপদেশ বাছিয়া *Precepts of Jesus, Guide to Peace and Happiness*, খৃস্টের উপদেশ, শান্তি ও আনন্দপথের নেতা — এই নাম দিয়া এক বহি বাহির করেন। শুধু খৃস্টের নীতি-উপদেশগুলি বাঁটিয়া এবং খৃস্টের ঈশ্বরত্ব, অলৌকিক ক্রিয়া, তাঁর রক্তে জগতের পরিত্রাণ ইত্যাদি খৃস্টান ধর্মের মতবাদ (dogmas) অংশের কথাগুলি ছাঁটিয়া দেওয়ায় পাদ্রী মার্সম্যান

রামমোহন রায়কে ভারি নিন্দা করেন। তখন রামমোহন রায় যে পাল্টা গাহিয়া আসর জমাইলেন তাহা নয়। তিনি হিব্রু শিখিয়া পুরানো বাইবেলের মূল গ্রন্থ ও গ্রীক শিখিয়া নূতন বাইবেলের মূল গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া এক "আপীল" বা আবেদন বাহির করিলেন। তার নাম *An Appeal to the Christian Public*। ঐ-সব মতামত যে বাইবেল গ্রন্থের জিনিস নয়, বাইবেলের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে লাগিয়া গেলেন। এক আপীলে কুলাইল না, আরো দুই আপীল বাহির হইল।

আমাদের দেশে যেমন বেদের কোনো কো'নো অংশকে অভ্রান্ত বলিয়া ভাবা হইত, পশ্চিম দেশে বাইবেলকে তার চেয়ে বেশি— একেবারে অক্ষরে অক্ষরে অভ্রান্ত মনে করা হইত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে "ফ্রী থিঙ্কার" স্বাধীন চিন্তাশীল একদল লোক ইউরোপে দেখা দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে বাইবেল শাস্ত্র ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত ইহা লইয়া পণ্ডিতেরা বিচারে বসিয়া যান। তখনো বাইবেলের Higher Criticism যাহাকে বলে, তাহা পাকিয়া উঠে নাই। গস্‌পেলগুলির রচনার তারিখ স্থির করা, মূলের সঙ্গে অনুবাদের পাঠান্তর মেলানো, কবে কোন্ নূতন মত তাহাতে সন্নিবেশ হয় তাহার খোঁজ— এই রকমে বিশ্লেষ করিয়া বাইবেলশাস্ত্রের সমালোচনা-পদ্ধতির নাম Higher Criticism। এই সমালোচনার ফলেই খৃস্টানদের মধ্যে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় (Unitarians) দেখা দিয়েছিল এবং রামমোহন রায় এই সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন বলিয়া পশ্চিমদেশে আজও তাঁহার সম্মান আছে। রামমোহন রায়ের আপীলগুলি এই ধরনের সমালোচনা। তবু সেগুলি কী রকমের, বোধ হয় একটুখানি খুলিয়া বলিলে ভালো হয়।

খৃস্টানেরা তিন ঈশ্বর মানেন। এক ঈশ্বর পিতা, অন্য ঈশ্বর পুত্র, আর তৃতীয় ঈশ্বর 'হোলিঘোস্ট' বা পবিত্রাত্মা। এই তিনই এক। সুতরাং খৃস্টে আর ঈশ্বরে সমান। রামমোহন রায় বলেন যে, বাইবেলে খৃস্টের উপদেশে খৃস্ট কোনো জায়গায় ঈশ্বরের সমান আসন গ্রহণ করেন নাই। এই ত্রীশ্বরবাদের'ও কোনো কথা বাইবেলে নাই। তিনি বাইবেল হইতে খৃস্টের নানা বাক্য তুলিয়া ও মূল গ্রন্থের সঙ্গে তাহার অর্থ বিচার করিয়া দেখাইলেন যে, খৃস্ট তাঁহার পিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার কথাই পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন— নিজেকে কোথাও তাঁহার সমান বলেন নাই। "পুত্র নিজে হইতে কিছু করিতে

পারে না, পিতার ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা"— এই তো তাঁহার সকল উপদেশের মর্ম। যেখানে তিনি বলিয়াছেন, "I and my Father are one" আমি ও আমার পিতা এক, সেখানে তিনি এই ইচ্ছার সম্পূর্ণ যোগের কথাই বলিয়াছেন। খৃস্টের আর-একটি কথা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়, যখন তিনি প্রার্থনা করিতেছেন— তাঁহাব শিষ্যরাও যেন সেই ইচ্ছার যোগে পিতার সঙ্গে তাঁহারি মত যুক্ত হইয়া এক হয়। "They may be one as we are"। এমনি কবিয়া মূল বাইবেল অবলম্বনে বাইবেলের বিচাব কবিয়া রামমোহন রায় খৃস্টান ধর্মের অনেক মতবাদ (dogmas) খণ্ডন করেন। তিনি Mosheim-এর খৃস্টান ধর্মমত ও সম্প্রদায়েব ইতিহাস (Ecclesiastical History) হইতে প্রমাণ করিয়া দেন যে, চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে ত্রি-ত্রীশ্বরবাদ মোটে দেখাই দেয় নাই। আলেকজান্দ্রিয়াতে ইহা লইয়া এক মস্ত ঝগড়া ও গোলযোগ হয়— এরিয়াস্ প্রভৃতি এই ত্রীশ্বরবাদেব বিপক্ষে ছিলেন। অবশেষে সম্রাট কন্‌স্টান্টাইন্ মাঝে পড়িয়া ঝগড়া মেটান ও ত্রীশ্বরবাদের মতটাই চর্চে বাহাল হয়। রামমোহন দুঃখ কবিয়া বলিয়াছেন যে, এই-সব মতের লড়াইতে খৃস্টান ধর্মটা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভাগ হইয়া কেবল বিচ্ছেদ ও অনৈক্যেব সৃষ্টি করিয়াছে। আর প্রাচীনকালে কত যে যুদ্ধ আব রক্তসেচন এজন্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না। খৃস্টধর্ম গ্রীক আব রোমান পৌত্তলিকদেব মধ্যে গিযা পডিয়াছিল বলিয়াই তাহাদের কুসংস্কারের সঙ্গে জড়িত হইয়া বিকৃত হয়। এইজন্য রামমোহন রায় একেবারে মূল উৎসে গিয়া অর্থাৎ স্বয়ং খৃস্টের কী বাণী তাহাই বিচাব করিয়া সেই উৎসের ধারায় বিকার ও জঞ্জালগুলি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার পরামর্শ দেন। একজন ভারতবাসী যে ভারতবর্ষে বসিয়া এবং কাহারও সাহায্য না লইয়া বাইবেলেব এই নূতন আলোচনা-পদ্ধতির গোড়াপত্তন করিয়া যাইবে ইহা কি কম বিস্ময়, কম গৌরবের কথা!

রামমোহন রায় ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে ১৮৩০ খৃস্টাব্দে পাদ্রী আলেকজান্দার ডফ্ সাহেব তাঁহাব আশ্রয় লন। রামমোহনের চেষ্টাতেই ডফ্ এ দেশে আসেন। বোধ হয় রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন যে, স্কচ্ মিশনারিরা শ্রীরামপুরের ইংরাজ মিশনারিদের মতো অতটা গোঁড়া হইবে না। ডফ্‌কে রামমোহন নানা রকমে সাহায্য করিলেন— তাঁহার ইস্কুলের বাড়ি ঠিক করিয়া দিলেন এবং ইস্কুলের ছাত্র জুটাইয়া দিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, ডফের সুশিক্ষায় এ দেশের ছাত্রদের উপকার হইবে। কিন্তু তখন

তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে যাঁহাকে তিনি তাঁহার "গদি" দিয়া গিয়াছিলেন, ডফ্ সেই দেবেন্দ্রনাথেরই মহা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবেন।

ডফ্ সাহেব তো ইস্কুল খুলিয়া হিন্দুকলেজের কাছেই বাসা বাঁধিলেন এবং কালেজের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। পাদ্রী ডফ্ এবং পাদ্রী ডিয়ালট্রির বক্তৃতার হাওয়ায় কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই ধর্ম সম্বন্ধে সংশয়ের মেঘ একটু একটু করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল। অথচ তাহাদের ডিরোজিয়ো-গুরুর প্রভাবে তাহাদের মনে হিন্দুবিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া তাহারা কেহ কেহ খৃস্টান ধর্মের দিকেই স্বভাবত ঝুঁকিল। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে ডিরোজিয়োর একজন প্রধান শিষ্য মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। সেই একই বছরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও খৃস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। কলিকাতা শহরে একটা হৈ-রৈ পড়িয়া গেল। এমন জনরব উঠিল যে, হিন্দুকালেজের সকল ভালো ভালো ছাত্র খৃস্টান হইয়া যাইবে।

ডফ্ সাহেব ১৮৩০ হইতে ১৮৬৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ৩৩ বছর এ দেশে মিশনের কাজে ছিলেন। ইহার মধ্যে দুইবার তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়া মিশনের কাজের জন্য টাকার জোগাড় করেন। প্রথমবার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া *India and India's Missions* * নামে এক বই প্রকাশ করেন এবং তাহাতে হিন্দুধর্মকে, বিশেষভাবে বেদান্তকে, খুব কড়া রকমে আক্রমণ করিয়া নিতান্ত অর্থহীন ও নীতিহীন একটা ধর্ম বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার তরফ হইতে ঐ বইয়ের প্রতিবাদ ১৭৬৬ শকের (১৮৪৪ খৃস্টাব্দ) আশ্বিনের পত্রিকায় বাহির হয়। এই সমস্ত লেখাগুলি হইতে পরে *Vedantic Doctrines Vindicated* অর্থাৎ বেদান্ত-মতের সমর্থন নামে এক চটি বই দাঁড় করানো হয় :— সে বই আমি দেখিতে পাই নাই।

ডফ্ সাহেব বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মের বিরুদ্ধে যে দুটি বড়ো আপত্তি তুলিয়াছিলেন, প্রায় সকল খৃস্টান লেখকই আজও পর্যন্ত সেই আপত্তি দেখান এবং সেই আপত্তির সমর্থনে সেই একই উপপত্তিও খাড়া করেন।

ডফের সমালোচনার পর খৃস্টানী কাগজের প্রতিবাদের যে উত্তর ১৭৬৬

---

* ***India and India Misiosns* (1840).**

শকের (১৮৪৫ খৃ.) 'তত্ত্ববোধিনী'র মাঘের কাগজে বাহির হয়, তাহাতে খৃস্টান একজন প্রতিবাদকারীর এক মজার অভিযোগের উল্লেখ ও উত্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অভিযোগ আনেন যে, তত্ত্ববোধিনীর লেখক নিও-প্লেটনিক মতের, অর্থাৎ খৃস্টান ধর্মমতবিশেষের নিকট ঋণী হইয়া সেই মতের সাহায্যে বেদান্তের স্থূল ও ঘোলাটে মতগুলিকে সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ বেদান্তের সমস্তই misty metaphysics— ধোঁয়াল তত্ত্ব-কথা। 'তত্ত্ববোধিনী' এই অভিযোগের উত্তরে লিখিলেন যে, বেদান্তবাক্যগুলিকে ব্যাখ্যা করিবার সময়ে Natural Theology-র পন্থা অনুসরণ করা হইয়াছে ও বিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে বটে। কিন্তু খৃস্টান লেখকেরা বেকন প্রভৃতি তত্ত্ববিদ্‌দের প্রণালী অবলম্বনে করিয়া ইহুদী জ্ঞানীদের বাক্যসকল ব্যাখ্যা করেন না। বেকনের প্রণালীর সঙ্গে কি হিন্দুধর্মের চেয়ে খৃস্টান ধর্মেরই বেশি খাতির আছে নাকি? সুতরাং কোনো বিশেষ যুক্তিপ্রণালী গ্রহণ করিলেই খৃস্টান ধর্মের কাছে ঋণ স্বীকার করা বোঝায় না।

তখন রামমোহন রায়ের বেদান্ত মত যে ব্রাহ্মসমাজ সর্বাংশেই মানিতেন, তাহারও বেশ পরিচয় এই দ্বিতীয় রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। খৃস্টান প্রতিবাদকারীরা রামমোহন রায়ের বেদান্তের আখ্যাকে একপেশে বলিয়াছিলেন। কারণ রামমোহন রায় যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে ব্যবস্থা মাত্র বলিয়াছেন, তাহা বেদান্তের শ্রেষ্ঠ উপদেশ নয় বলিয়াছেন এবং বেদের বহুদেববাদকে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব বুঝাইবার উপায় হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং অস্বীকার করিয়াছেন। 'তত্ত্ববোধিনী' রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে এই-সকল অভিযোগের উত্তর রামমোহন রায়ের নিজের কথা দ্বারাই দিয়াছেন।

খৃস্টান হওয়াটাই যে একটা ভয়ানক অন্যায় এবং সেই সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই যে দেবেন্দ্রনাথ মিশনারিদের বিরুদ্ধে লাগিয়াছিলেন, এমন কথা মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। রামমোহন রায় তাঁহার *Appeal to the Christian Public*-এ যে যে কারণে মিশনারিদের এদেশীয় লোককে খৃস্টান করিবার চেষ্টাকে নিন্দা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাদের প্রতিকূল হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় দুইটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন :— (আমি এখানে তাঁহার কথা অনুবাদ করিয়া দিই) : ১. "খৃস্টানরা নিজেদের চেষ্টা নিজেরাই প্রতিহত

করেন, কারণ তাঁহারা যে-সমস্ত জাটিল খৃস্টান চর্চের মতামত (dogmas) এবং অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা (mysteries) গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয় — তাহাদিগের উপর সেইগুলিই চাপান।···· তাহার ফল হইয়াছে এই যে, এ দেশের লোকেরা সাধারণত বাইবেল পড়িয়া কোথায় উপকৃত হইবে তা নয়, অনেক সময় বিনামূল্যে প্রাপ্ত বাইবেল গ্রন্থগুলি তাহারা সাদা কাগজের মতো ব্যবহার করিয়া থাকে, আর কথাবার্তা বলিবার সময় খৃস্টানী মতামতের ভাষা অত্যন্ত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে।" ২. "এ পর্যন্ত যাহারা খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে তাহারা প্রায়ই অশিক্ষিত শ্রেণীর লোক। সুতরাং তাহাদের অধিকাংশই খৃস্টানী ডগ্‌মার সত্য সম্বন্ধে বিশ্বাসী হইয়া যে এ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা নয়— অন্যান্য আকর্ষণই তাহাদের কাছে প্রবলতর ছিল। তাহারা হয় চাকুরি, নয় আহারের প্রলোভন পাইয়াছে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহ যদি অবহেলা পায়, তবে সে স্বভাবতই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে।"*

* প্রবন্ধটি অজিতকুমার চক্রবর্তী-র রাজা রামমোহন গ্রন্থ হইতে সংকলিত। গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

রামমোহন রায়

কাজী আবদুল ওদুদ

বাল্যজীবন

১৭৭২ খৃস্টাব্দের মে মাসে রামমোহনের জন্ম। মিস্ কলেটের এই মত মেনে নেবার যোগ্য।

তাঁর বালক-কালের দুইটি ব্যাপার বেশ চোখে পড়বার মতো: একটি, তাঁর মেধাশক্তি, অপরটি, গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে ভক্তি। প্রথমটির বাঞ্ছিততম পরিণতি তাঁর পরবর্তী জীবনে ঘটেছিল এ কথা সবাই জানেন; দ্বিতীয়টির পরিণতি কিছু অদ্ভুত। কোনো কোনো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষের জীবনে এমন পরিণতি দেখতে পাওয়া গেছে, যেমন, বাল্যের চঞ্চল ও তার্কিক নিমাই হয়েছিলেন ভক্তিরসাপ্লুত শ্রীচৈতন্য, কিন্তু অনেকের জীবনে এমন পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় না। বালক-বুদ্ধদেবকে আমরা দেখতে পাই সহানুভূতিসম্পন্ন ও পর্যবেক্ষণশীল; বালক-মোহম্মদ সম্বন্ধে যে-সব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সমসাময়িক উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভিতরে তাঁর স্বাতন্ত্র্য; আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নাকি পুরোহিতের সন্তান হয়েও দেবতার সম্মুখে নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারতেন না।— তবে রামমোহনের বাল্যের এই ভক্তিপ্রবণতা উত্তরকালে একটি সুন্দর পরিণতিও লাভ করেছিল। রামমোহনের যোদ্ধবেশ বন্ধুর চোখে এত মহিমময় ও শত্রুর চোখে এত নিষ্করুণ যে তাঁর অন্তরের পরমাশ্চর্য কোমলতা তাঁদের চোখে পড়বার অবকাশ পায় না। একটি অন্তঃপ্রবাহী ভক্তিধারা তাঁর ভিতরে ছিল, শুষ্ক জ্ঞানমার্গী তিনি ছিলেন না, এ কথা আজ সুবিদিত; তার সঙ্গে এ কথাও আমরা জানি যে এই পুরুষসিংহ অভিনয়ের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি; বিগতজীবন বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে অশ্রু-তর্পণ তাঁর জন্য ছিল অতি স্বাভাবিক। ইংলণ্ডের লোকদের তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছিল— the oriental gentleman, versatile, emotional yet dignified,* এটি যথার্থ ধারণা।

* (তিনি) একজন প্রাচ্যদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি— বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, ভাবপ্রবণ, কিন্তু প্রভাববান্।— কথাটি মিস্ কলেটের লিখিত জীবনীতে আছে।

এই মেধাবী বালকের ভবিষ্যৎ যাতে গৌরবোজ্জ্বল হয় পিতা রামকান্তের সে-কামনা ছিল। তৎকালের শ্রেষ্ঠশিক্ষা লাভের জন্য বাল্যশিক্ষা সমাপনান্তে রামমোহন পাটনায় প্রেরিত হন নয় বৎসর বয়সে।

রামমোহন ও মুসলিম-সাধনা

পাটনায়* কিশোর-রামমোহনের অবস্থিতিকাল সুদীর্ঘ নয়, কিন্তু তাঁর জীবনের উপরে এর প্রভাব গভীর। এই প্রভাবের স্বরূপ একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

হিন্দু ও খৃস্টান শাস্ত্রের যে-সব আলোচনা রামমোহন করেছিলেন সৌভাগ্যক্রমে সে-সবের অধিকাংশই আমাদের জন্য রক্ষিত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে-সব সুসম্বদ্ধ ও বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছিলেন, অথবা করবেন আশা করেছিলেন, তার কিছুই আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয় নি। তুহ্‌ফাতুল্-মুওহ্‌হিদীন গ্রন্থে অবশ্য কোরানের কয়েকটি বচন ও হাদিস সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আছে; কিন্তু সে আলোচনা তিনি করেছেন শাস্ত্র বিসর্জন দিয়ে, শাস্ত্র স্বীকার করে নয়। তবু এই তুহ্‌ফাতুল্-মুওহ্‌হিদীন গ্রন্থ ও তাঁর রচনার নানাস্থানে ইসলাম ও মুসলমান সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত উক্তি আভাস ইঙ্গিত ইত্যাদি থেকে মুসলিম সাধনা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব, অথবা তাঁর চিত্তের উপরে মুসলিম সাধনার প্রভাবের স্বরূপ, অনেকখানি বুঝতে পারা যায়।

অনেকেই বলেছেন, তাঁর স্বসম্প্রদায়ের প্রতীক-উপাসনার প্রতি তাঁর যে বিতৃষ্ণা, তার মূলে রয়েছে কোরানের শিক্ষা।— শুধু এইই নয়। খৃস্টান সমাজের ত্রিত্ববাদ, যিশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, এ-সমস্তের প্রতি তাঁর যে বিরূপতা, অথচ যিশুখৃস্টের প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা, এ-সমস্তেরও মূলে রয়েছে কোরানের শিক্ষা। যথা—

> তারা বলে, আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁরই প্রশংসা! তিনি পরম সমৃদ্ধ। আকাশে ও মাটিতে যা কিছু আছে সব তাঁর। এর সমর্থক কিছু তোমাদের নেই। এমন কথা কি বলছ তোমরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে যা তোমরা জান না? (১০ : ৬৮)

> আর আমরা মেরি-তনয় যিশুকে পরিচ্ছন্ন নির্দেশ দান করেছিলাম।

* 'রামমোহনের বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য' দ্রষ্টব্য।

তাকে "রুহুল কুদ্‌স" (Holy Spirit) দ্বারা বলীয়ান করেছিলাম (২ : ৮৭)। যিশুর প্রার্থনা নামে কোরানে একটি আয়াত আছে, তার অর্থ এই—

"তুমি যদি তাদের শাস্তি বিধান কর (তবে)— তারা তোমারই দাসানুদাস আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর (তবে)— তুমি মহান ও জ্ঞানময় (৫ : ১১৮)।"

প্রসিদ্ধি আছে যিশুখৃস্টের এই কোরানোক্ত পরম নির্ভরতার প্রার্থনাটি একদা হজরত মোহম্মদ সমস্ত রাত্রি আবৃত্তি করেছিলেন।

শুধু এই-ই নয়। কোরানের আরো বহু বাণী রামমোহনের মর্ম স্পর্শ করেছিল। কোরানের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন প্রকৃতির দিকে, মানুষের ইতিহাসের দিকে, কোরান বার বার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পরমকবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলা হয়েছে— সূর্য চন্দ্র মেঘ বৃষ্টি বসন্ত-বায়ু কেমন করে আল্লাহ্‌র মহিমাকীর্তন করছে, মানুষের সেবায় সে-সবের নিয়োগ হয়েছে, ফলে জলে শস্যে মানুষের কেমন পরিতোষ-সাধন হচ্ছে, এবং এই-সব বিশ্বপাতার অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রামমোহন তাঁর তুহ্‌ফাতুল্‌-মুওহ্‌হিদীন গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই-সব যুক্তি যথেষ্ট অনুরাগের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

বিধর্মীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধেও কোরানে কয়েক জায়গায় সুন্দর উপদেশ আছে, যথা—

আল্লাহ্‌ ভিন্ন তারা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে তাদের গালি দিয়ো না, পাছে তারা অজ্ঞানতাবশত সীমা অতিক্রম করে আল্লাহ্‌কে গালি দেয়·· (৬ : ১০৯)।

যারা · ভালোর দ্বারা মন্দ বিদূরিত করে, তারা সুখকর আশ্রয় লাভ করবে (১৩ : ২২)।

আমার ভৃত্যদের বলো যা উত্তম তাই তারা বলুক (১৭ : ৫৩)।

তারাই পরমকারুণিকের দাস যারা বিনম্র হয়ে ধরণীবক্ষে বিচরণ করে, আর অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম' (শান্তি) (২৫ : ৬৩)।

নারীজাতির পক্ষ রামমোহন আজীবন সমর্থন করেছেন। নারীর প্রতি সুবিচার ও সদয় ব্যবহার করবার উপদেশ কোরানে বিস্তৃতভাবে আছে। যথা—

হে বিশ্বাসিগণ, এটি তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবে, আর তোমরা তাদের যা

দিয়েছ তার কিছু অংশ ফিরে পাবার জন্য তাদের বিপন্ন কোরো না অবশ্য যদি তারা জলজ্যান্তভাবে অন্যায়াচরণ না করে, আর তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো, এর পর যদি তোমরা তাদের ঘৃণা কর তা হলে, হতে পারে, তোমার এমন একটি জিনিস অবজ্ঞা করলে যার ভিতরে আল্লাহ্ পর্যাপ্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন (৪ : ১৯)।

নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ব্যবহার হজরত মোহম্মদের নিজের চরিত্রেও লক্ষণীয়। যখন তিনি মদিনার রাজা তখন তাঁর ধাত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁকে দেখেই তিনি গাত্রোত্থান করলেন ও নিজের উত্তরীয় বিছিয়ে দিলেন তাঁর বসবার জন্য।

কিন্তু কোরান থেকে সবচেয়ে বড়ো জিনিস যেটি রামমোহনের লাভ হয়েছিল সেটি মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। তাঁর ব্রহ্মসংগীতের অল্প কয়েকটিতে ঈশ্বরের মহিমা অতি সুন্দর রূপ লাভ করেছে, সে-সবের পাশে পাশে কোরানের কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করা যাচ্ছে —

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়
ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায় কেমনে সম্ভবে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে।

কোরান :—

…তাঁর তুলনা ব্যক্ত করবার মতনও কোনো কিছু নেই (৪২ : ১১)।
আকাশ ও পৃথিবীর অপূর্ব স্রষ্টা,— আর যখন তিনি কোনো কিছু সংকল্প করেন তিনি শুধু সেটিকে বলেন, হোক, আর তা প্রকাশ পায় (২ : ১১০)।

ভাব সেই একে জলে স্থলে শূন্যে যে সমভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার
আদি অন্ত নাহি যার
যে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।

কোরান :—

তিনি জানেন তাদের অগ্রে কী আছে ও তাদের পশ্চাতে কী আছে, তাঁর যেটুকু অনুগ্রহ সেটুকু ভিন্ন তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারণা করতে

পারে না, তাঁর সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত, আর এই উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না…(২ : ২৫৫)।

কে বুঝিবে তার মর্ম
ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম
গুণাতীত পরব্রহ্ম সকল কারণ।

কোরান :—

দৃষ্টি তাঁকে দর্শন করতে পারে না, কিন্তু তিনি (সব) দৃষ্টি দর্শন করেন। তিনি সূক্ষ্মের পরিজ্ঞাতা— সদাজাগ্রত (৬ : ১০৪)।

ঈশ্বর, আত্মা বা প্রত্যাদেশ, ইত্যাদির স্বরূপ-চিন্তায় মানুষ বিব্রত হবে এ কোরানের অভিপ্রেত নয়, যথা—

"তারা তোমাকে প্রেরণা (প্রত্যাদেশ, আত্মা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে : বল আমার প্রভুর হুকুমে প্রেরণা আসে, আর জ্ঞানের অতি অল্প অংশই তোমাদের দান করা হয়েছে" (১৭ : ৮৫)।

ব্রহ্ম স্বরূপত দুর্জ্ঞেয়, তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে বুঝতে হয়, এ কথা রামমোহন বারবার বলেছেন।

অনেকের ধারণা— কোরানের আল্লাহ্ এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ অধীশ্বর, তাঁর ভয়ে সমস্ত প্রাণী ভীত, দণ্ড বা পুরস্কার যা খুশি তাই তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকে প্রদান করেন। এ-সব ভাব যে কোরানে নেই তা বলব না। কিন্তু কোরান একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়লে বুঝতে পারা যায়— কোরানের আল্লাহ্ অনন্তমহিমান্বিত সদাজাগ্রত আর প্রেমপ্রবণ। এই আল্লাহ্‌র বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য কোরানে বারবার বলা হয়েছে— "আমানু ও আমালুস্ সালেহাত"— বিশ্বাস করো ও সৎকর্মশীল হও। এই সৎকর্ম বলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সৎকর্মের কথাই ভাবা হয়েছে, যদিও অনেক মুসলমান-ধর্মাচার্য সৎকর্মের এই সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যার উপরে বেশি জোর দেন না। সৎকর্ম (লোকশ্রেয়ঃ) বলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সৎকর্মের কথাই যে রামমোহন বুঝতেন সে কথা সর্ববাদিসম্মত।

মুসলমানের চিন্তায় কোরানের স্থান সর্বোচ্চে, কিন্তু এই কোরান কিভাবে বুঝতে হবে সে-সম্বন্ধে সব মুসলমান নিশ্চয়ই একমত নন। মানুষের অন্তর্নিহিত বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে-সব মুসলমান কোরান বুঝতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মোতাজেলা-দল সুবিখ্যাত। মানুষের অন্তরের

অনুভূতি বিশেষভাবে তার সত্যোপলব্ধির সহায়ক, এই মত যে-সমস্ত মুসলমান পোষণ করতেন তাঁদের মধ্যে সুফী-সম্প্রদায়ের কোনো কোনো শাখা সুবিখ্যাত। রামমোহনের চোখে যে-ইসলাম মহিমা বিস্তার করেছিল সে-ইসলাম সর্ব-সাধারণ মুসলমানের ইসলাম তেমন নয়। ইসলামের সেই পরিচিত রূপে তিনি যে তৃপ্ত হতে পারেন নি, তা বুঝতে পারা যায় তাঁর *Second Appeal to the Christian Public* - এর এই উক্তি থেকে

> Disgusted with the puerile and unsociable system of Hindoo idolatry, and dissatisfied at the cruelty allowed by Mussalmanism against Non-Mussalmans, I, on my searching after the truth of Christianity, felt for a length of time very much perplexed with the difference of sentiments found among the followers of Christ (I mean Trinitarians and Unitarians, the grand division of them) until I met with the explanation of the unity given by the divine Teacher himself as a guide to peace and happiness. (Panini Office Edition, 1906, p. 580).*

তিনি যে ইসলাম থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে-ইসলাম মোতাজেলাদের ও শ্রেষ্ঠ সুফীদের ইসলাম।

সাদী হাফিজ প্রমুখ সুফী-সাহিত্যিকদের রচনা তাঁর চিত্তের সন্তোষসাধন করেছিল। তাঁর কয়েকটি অতি প্রিয় বচনের মধ্যে একটি হচ্ছে হাফিজের একটি গজলের এই দুই চরণ :

> ইহকাল ও পরকালের আরাম এই এক কথায় —
> বন্ধুদের নিয়ে উৎসব করো, শত্রুদের সঙ্গে আপস করো।

তাঁর তুহ্ফাতুল্-মুওহ্হিদীন-এ হাফিজের আরো দুইটি বাণী উদ্ধৃত হয়েছে :—

* হিন্দুর অসামাজিক ও বালকোচিত পৌত্তলিকতায় বিরক্ত হয়ে আর অমুসলমানদের প্রতি মুসলমান-ধর্মের নির্মমতায় দুঃখিত হয়ে আমি খৃস্টধর্মের সত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হই, কিন্তু খৃস্ট-অনুবর্তীদের মধ্যে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদী ও একত্ববাদী এই দুই বড়ো দলের মধ্যে যে-মতভেদ তা দেখে বহুদিন আমার দ্বিধাসন্দেহে কাটে। অবশেষে শান্তি ও আনন্দের নির্দেশ স্বরূপ সেই স্বর্গীয় আচার্যের প্রদত্ত একত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

বায়ান্তর দলের ঝগড়া নিরর্থক,
সত্য না বুঝে তারা খেয়াল ও মূঢ়তার পথে চলেছে ॥
কারো অনিষ্টাচারী হোয়ো না, আর যা খুশি কর,
আমাদের পন্থায় এ ভিন্ন আর কোনো পাপ নেই ॥

আর সাদীর এই বাণীটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল :

জীবের সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়।
তস্‌সবহ্‌, জায়নামাজ (আসন) ও আলখাল্লায় ধর্ম নাই ॥

তিনি নাকি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপ্রকাশ করতেন, এই রচনাটি যেন তাঁর সমাধি-গাত্রে উৎকীর্ণ হয়। আর ভারতীয় কৃষকদের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য East India Company-র কর্মকর্তাদের তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন সাদীর এই বাণীটি উপহার দিয়ে—

প্রজাদের সঙ্গে প্রীতিবদ্ধ হও ও (এই ভাবে) তোমার
শত্রুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও।
কেননা ন্যায়পরায়ণ নরপতির সৈন্য হচ্ছে তার প্রজা ॥

সুফীদের যে-সব বাণী তিনি উদ্‌ধৃত করেছেন সে-সবের ভিতর দিয়ে তাঁর চিত্ত সুস্পষ্টভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সবাই জানেন, ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ সম্পর্কে সুফী-সাহিত্যে অনেক তত্ত্বপূর্ণ কথা আছে। মৌলানা জালালুদ্দিন রুমির কবিতায় অদ্বৈত-তত্ত্ব আশ্চর্য সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ করেছে। সে-সবে রামমোহন কতখানি আনন্দিত হতেন তা তেমন জানতে পারা যাচ্ছে না, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সুফীদের সুগভীর মানব প্রেম বা জীব-প্রেম যে তাঁর পরম আনন্দের বিষয় ছিল সেটি অতি সুন্দরভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে।— বিশেষজ্ঞেরা আজ এ বিষয়ে একমত যে, বিশ্বমানবের একত্বের ধারণা রামমোহন সুস্পষ্টভাবে করেছিলেন। সেই বিশ্বমানবের একত্ব সম্বন্ধে সাদীর এই বাণীটি সুবিখ্যাত—

আদম-সন্তানরা একে অন্যের অঙ্গস্বরূপ
কেননা তাদের উৎপত্তি একই মূল থেকে।
যদি এক অঙ্গে বেদনা বাজে
তা হলে অন্য অঙ্গও শান্তিতে থাকে না।
মানুষের দুঃখ যদি তুমি না বোঝো
তা হলে মানুষ নাম নেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে।

সুফী-সাহিত্য রামমোহনের অন্তরকে আনন্দিত করেছিল, কিন্তু তাঁর অন্তর

ও বাহির উভয়কে বীর্যবন্ত করেছিল মোতাজেলা-বাদ। তাঁর যুক্তিবাদের কয়েকটি প্রধান সায়ক গৃহীত হয়েছিল মোতাজেলাতূণ থেকে। যথা—

১. ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, কিন্তু তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না, তাঁর সমকক্ষ আর একজন ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন না।

২. ঈশ্বরের গুণ তাঁর সত্তা থেকে পৃথক নয় গুণের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করলে ঈশ্বরের একত্ব নষ্ট হয়। প্রধানত এই যুক্তির দ্বারা রামমোহন বিভিন্ন দেবদেবীর ঈশ্বরত্বের দাবি খণ্ডন করেছেন।

৩ রামমোহন বলেছেন, বেদ নশ্বর। মোতাজেলারা বলতেন, কোরান সৃষ্টবস্তু, স্রষ্টার মতো চিরন্তন নয়। প্রধানত এই মতের জন্য মোতাজেলারা সর্বসাধারণ মুসলমানের বিরাগভাজন হন।

তবে মোতাজেলাদের সঙ্গে রামমোহনের বড়ো পার্থক্য হয়তো এই—মোতাজেলারা সাধারণত বিচারপন্থী পণ্ডিত, রামমোহনের পাণ্ডিত্য অনন্য-সাধারণ, কিন্তু বিচারপন্থী পণ্ডিত তিনি যতখানি তার চাইতে বেশি তিনি বিচারপন্থী কর্মী— স্বদেশ-প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক।

মুসলমান নৈয়ায়িকদের কাছে রামমোহন যে বিশেষভাবে ঋণী সে কথা সবাই স্বীকার করেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত তর্ক-বিজ্ঞানের 'যথেষ্ট হেতুবাদ' "তর্‌জি বেলা মুরাজ্জেহ্" (Principle of sufficient reason) আধুনিক বিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

রামমোহন মুসলিম সাধনাকে যে-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সেই দৃষ্টি তাঁর সমকালে কোনো মুসলমানের ভিতরে ছিল কি না, তার পরিচয় পাওয়া যায় না।* শুধু তাঁর জীবন-চরিতে পাওয়া যাচ্ছে, মুসলমানরা তাঁর কোনো কোনো মন্তব্যের জন্য এক সময়ে বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কলিকাতা-বাসকালে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মেছিল। এমন-কি, মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব বেশি ছিল বলেই তাঁর স্বসম্প্রদায়ের লোক তাঁর উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন—তাঁরা সন্দেহ করতেন, হয়তো মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর পানভোজনও চলে। তৎকালের উচ্চশ্রেণীর মুসলমান রাজকর্মচারীরা

* সিয়ারুল্ মোতা আখেরীন-এর লেখক সৈয়দ গোলাম হোসেন রামমোহনের অব্যবহিত পূর্বের লোক। তাঁর স্বদেশ-প্রেম ও কাণ্ডজ্ঞান প্রশংসার্হ, কিন্তু ধর্মে তিনি রামমোহনের মতো উদারহৃদয় নন।

যে কৃতবিদ্য ও দক্ষ ছিলেন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রবলে শারীরিক কার্যে পোশাকে পরিচ্ছদে তৎকালের মুসলমান যে তৎকালের হিন্দুর চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিলাতে সাক্ষ্যদান-কালে স্পষ্টভাবেই তিনি সে কথা বলেছিলেন।

কিন্তু তবু মনে হয়, মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর এই যে সম্প্রীতি, সমমতের সম্প্রীতি এ নয়, সম-বৈদগ্ধ্যের এ সম্প্রীতি। মুসলিম সাধনা ও তৎকালের মুসলিম-প্রকর্ষ তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু এ-সবের প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। তাই পার্শীর পরিবর্তে ইংরেজিকে রাজভাষা করবার পরামর্শ তিনি শাসকদের দিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য, এর ফলে দেশের জনসাধারণ বিচারালয়ে কিছু সুবিচার পাবে, আর দেশবাসীর পক্ষে ইয়োরোপীয় বিদ্যালাভের পথ সুগম হবে।

রামমোহন ও হিন্দু-সাধনা

পাটনা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে পিতার সঙ্গে রামমোহনের মতান্তর ঘটে। তার ফলে তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেন ও তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতে গমনের বাসনা হয়তো পাটনা-বাস-কালেই তাঁর হয়েছিল, তাতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল, পার্বত্য জাতিদের বিচিত্র পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়-লাভও তাঁর অবাঞ্ছিত ছিল না। এই ভাবে নরপূজা পিশাচ-পূজা ইত্যাদি বিচিত্র অজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়েই নিরাকার একেশ্বর-বাদের দিকে তাঁর অত প্রবণতা জন্মেছিল মনে হয়।

তিব্বত প্রভৃতি ভ্রমণের পরে তাঁর জীবনের বড়ো ঘটনা হচ্ছে কিছুকাল কাশীবাস ও হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা। এই চর্চা তিনি যে গভীরভাবে করেছিলেন পণ্ডিতেরা সে-কথা স্বীকার করেন। আর রামমোহন যত শাস্ত্রের চর্চা করেছিলেন তার মধ্যে হিন্দু-শাস্ত্রের চর্চাই এ পর্যন্ত বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে। হিন্দু-সমাজও তাঁকে আশানুরূপভাবে গ্রহণ করেন নি, তবু তাঁরাই যে তাঁকে বেশি গ্রহণ করেছেন এ সত্য।

নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কৃত রামমোহন-চরিতকথায় তাঁর হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য অবলম্বন করলেও রাম-মোহন জোর দিয়েছেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের উপরে, আর শঙ্করাচার্য জোর দিয়েছেন সন্ন্যাসের উপরে, এ-সব কথা বলা হয়েছে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে পূর্ণ অদ্বৈতবাদ না বলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা দ্বৈতবাদ বলতে চান। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রাধাকৃষ্ণন শঙ্করদর্শনের

যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মনে হয়, হিন্দু-মনীষার এই শ্রেষ্ঠ উপার্জন অদ্বৈত-বাদ রামমোহন যেভাবে বুঝেছিলেন সেইভাবেই তা বোঝা হয়তো সংগত। যথা—

Sankara does not assert an identity between God and the world but only denies the independence of the world. ···If we raise question as to how the finite rises from out of the bosom of the infinite, Sankara says that it is an incomprehensible mystery, maya. We know there is the absolute reality, we know that there is the empirical world, we know that the empirical world rests on the absolute; but the how of it is beyond our knowledge. ····The greatest thinkers are those who admit the mystery (of the relation of God to the world) and comfort themselves by the idea that the human mind is not omniscient. Sankara in the East and Bradley in the West adopt this wise attitude of agnosticism. (*Hindu View of Life*. pp. 65-68).*

অন্যত্র

No theory has ever asserted that life is a dream and all experienced events are illusions. One or two late followers of Sankara lend countenance to this hypothesis.

* শঙ্করের মত এ নয় যে ব্রহ্ম ও জগৎ অভেদ, তিনি শুধু জগতের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করেন।··· অসীম থেকে সসীমের উৎপত্তি কেমন করে হয় এ প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলেন—এ এক দুর্জ্ঞের রহস্য, মায়া। আমরা জানি, শুদ্ধ সত্তা আছেন আর ব্যবহারিক জগৎ আছে, আর এই শুদ্ধ সত্তার উপরে ব্যবহারিক জগৎ নির্ভরশীল; কিন্তু কেমন করে, সেটি আমাদের জ্ঞানের বাইরে।··· শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলেরা ব্রহ্ম ও জগতের এই রহস্যময় সম্বন্ধের কথা স্বীকার করেন। তাঁরা জানেন যে মানবমন সর্বজ্ঞ নয়। প্রাচ্যের শঙ্কর ও পশ্চিমের ব্র্যাডলি জ্ঞানিজন-সুলভ এই অজ্ঞেয়তাবাদের সমর্থক।

but it cannot be regarded as representing the main tendency of Hindu thought (p. 69).†

রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্রের বিচার তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের চিরবিস্ময়ের সামগ্রী। হিন্দুর অতলস্পর্শ অতীতের অন্তহীন শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করে তিনি যেভাবে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ও লোকশ্রেয়ঃ-তত্ত্ব তাঁদের উপহার দিয়েছেন, সেটি যে কত বড়ো দান সে সম্বন্ধে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের সর্বসাধারণ এ পর্যন্ত তেমন অবহিতচিত্ত হন নি এইজন্য যে তাঁর সিদ্ধান্তকে তাঁরা হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে বাস্তবিকই একটি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বলে ভাবতে পারেন নি। যে কারণেই হোক প্রতীক-উপাসনার সঙ্গে হিন্দু-সাধনা বহুকাল ধরে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে। এই প্রতীক-উপাসনাকে কোনো কোনো হিন্দু সাধক অপকৃষ্ট সাধনা জ্ঞান করেছেন; কিন্তু এটি যে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য (অথবা জীবনের জন্য) হানিকর এমন নির্মম কথা রামমোহনের মতো এতখানি জোর দিয়ে আর কোনো হিন্দু সাধক বলেছেন মনে হয় না। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে শিবনারায়ণী সম্প্রদায় বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু এ রকম প্রতীক-উপাসনার বিরোধী একেশ্বরবাদী-দল হিন্দু সমাজে এত কম যে এঁদের গণনার ভিতরে না আনলেও চলে। প্রতীক-উপাসনার প্রতি এরূপ বিরূপতার জন্যই যে রামমোহন তাঁর সমকালে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের দ্বারা তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন ও বর্তমান কালেও অনেকখানি অবহেলিত হচ্ছেন এ সত্য। এর সঙ্গে তাঁর অপ্রিয় হবার আর একটি বড়ো কারণ হচ্ছে— তাঁর বেশভূষা হিন্দুর চিরপরিচিত চিরশ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর বেশভূষা নয়। রামমোহন তাঁর বেশভূষা ও আহারাদি প্রবলভাবেই সমর্থন করেছেন, তিনি তাঁদের বোঝাতে চেয়েছেন— সুরুচিপূর্ণ বেশ মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয়, আর মাংস-আহারাদির দ্বারা তাঁদের নষ্ট বীর্যের পুনরুদ্ধার হতে পারবে।

রামমোহনের হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের শিক্ষিতদেরও তেমন শ্রদ্ধার বস্তু হয় নি হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে পরমহংস রামকৃষ্ণের সিদ্ধান্তের ফলে। তাঁর সুবিখ্যাত বাণী "যত মত তত পথ" দেশের লোকদের অনেক বেশি

† এমন কোনো মত নেই যাতে বলা হয়েছে যে জীবন স্বপ্ন, আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা অলীক। শঙ্করের বহু পরের দুই-একজন শিষ্যের ভিতরে এই মতের কিছু সমর্থন পাওয়া যায়, কিন্তু এই দিকেই যে হিন্দু-চিন্তার বিশেষ প্রবণতা তা বলা যায় না।

স্বস্তি দিয়েছে রামমোহনের "লোকশ্রেয় ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র" এই মন্ত্র থেকে। আর "যত মত তত পথ" বাণীতে দেশের লোক শুধু স্বস্তিলাভই করে নি, একালের কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল, যেমন ফরাসী ভাবুক রোমাঁ রোলাঁ ও ভারতের স্বনামধন্য মহাত্মা গান্ধী, এই বাণীকে বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁর যুক্তি এই—

> I have never seen anything fresher or more potent in the religious spirit of all ages than this enfolding of all the Gods existing in humanity, of all the faces of truth, of the entire body of human Dreams, in the heart and the brain, in the Paramahangsa's great love and Vivekananda's strong aims.··· But you must not suppose that this immense diversity spells anarchy and confusion. ···Each note has its own part in the harmony. No series of notes must be suppressed, and polyphony reduced to unison with the excuse that your own part is most beautiful! Play in your own part perfectly and in time, but follow with your ear the concert of the other instruments united to your own··· And this teaching condemns all spirit of propaganda, whether clerical or lay that wishes to mould other brains on its own model (the model of its own God or of its own Non-god who is merely God in disguise).*

* পরমহংসের মহান্ প্রেমে ও বিবেকানন্দের বীর্যে যেমন মিলন ঘটেছে বিশ্বমানবের সমস্ত উপাস্য দেবতার সত্যের সর্ববিধ প্রকাশের, মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমস্ত কল্প-রূপের, যুগযুগান্তের ধর্মভাবের ইতিহাসে এর চাইতে সজীবতর ও সতেজতর কোনো কিছু আমার চোখে পড়ে নি।··· কিন্তু এ কথা মনে করবার হেতু নেই যে এই বিরাট বৈচিত্র্য একটি বিরাট অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা মাত্র।··· এই সুর-সামঞ্জস্যে প্রত্যেক সুরেরই বিশিষ্ট স্থান আছে। কোনো সুর-সমষ্টিকেই এই বলে নীরব করে দেওয়া চলবে না। (তাতে বহু সুর পরিণত হবে এক সুরে)। যে-কোনো একজনের বাজানো সুর সবচাইতে ভালো। যার যা বাজাবার তা চমৎকার করে বাজাক, কিন্তু তার সেই সুরের সঙ্গে অন্যান্য যে-সব সুরের সঙ্গত হচ্ছে তা সে কান পেতে শুনুক।··· এই মতে সর্বপ্রকার প্রচারব্রত—তা ধর্ম-বিষয়ক হোক বা কোনো জাগতিক বিষয়ক হোক—নিন্দনীয়; কেননা এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের বুদ্ধি-বিচার নিজেদের ছাঁচে গড়া। এক্ষেত্রে সেশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী দুইই তুল্যমূল্য—নিরীশ্বরবাদ ছদ্মবেশী সেশ্বরবাদ মাত্র।

এই সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অভিমত উদ্ধৃত করেছেন :

> "My veneration for other faiths is the same as for my own faith. Consequently the thought of conversion is impossible.···· Our prayer for others ought never to be : "God, give them the light thou hast given to me !"—but "God, give them all the light and truth they need for their highest development."*

মানুষে মানুষে মৈত্রীকামী রোলাঁ ও গান্ধী যে গভীর বেদনা থেকে এ-সব কথা বলেছেন তা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য নয়। রোলাঁ স্পষ্টই বলেছেন—

> At this stage of human evolution wherein both blind and conscious forces are driving all natures to draw together for "co-operation or death", it is absolutely essential that the human consciousness should be impregnated with it until this indispensable principle becomes an axiom : that every faith has an equal right to live, and there is an equal duty incumbent upon every man to respect that which his neighbour respects. (*Life and Gospel of Vivekananda*, pp. 353-55.)†

কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু হলেই সব সময়ে যে কার্যসিদ্ধি হয় তা নয়। মানুষে মানুষে যে মৈত্রীর কামনা করে এই-সব মনীষী এই ব্যবস্থা সমীচীন মনে

* স্ব-ধর্মের প্রতি আমার যে-শ্রদ্ধা পর-ধর্মেরও প্রতি আমার সেই শ্রদ্ধা। সেইজন্ত ধর্মান্তর-গ্রহণ আমার চিন্তায় অসম্ভব। আমরা যেন অন্যের জন্ত এই প্রার্থনা না করি— ভগবান্ আমাকে যে-আলোক তুমি দান করেছ সে-আলোক তুমি তাদের দাও; এর পরিবর্তে আমাদের প্রার্থনা যেন এই হয়—ভগবান্, শ্রেষ্ঠ পরিণতির জন্য যার যে-আলোক ও যে-সত্যের প্রয়োজন তুমি সেই সব তাকে দাও।

† মানব-সমাজের ক্রম-অভিব্যক্তির এই অবস্থায় অন্ধ ও সচেতন শক্তি দুইই সমস্ত মানুষকে একত্র করেছে 'সহযোগিতার জন্ত অথবা ধ্বংসের জন্ত'। এ সময়ে শ্রেষ্ঠতম প্রয়োজন হচ্ছে মানবের অন্তর্লোকে এই বিশ্বাসের আবির্ভাব ঘটা— প্রত্যেক ধর্মেরই বেঁচে থাকবার তুল্য অধিকার আছে, আর প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তার প্রতিবেশীর ধর্ম-বিশ্বাস শ্রদ্ধা করে চলা। এটিকে একটি স্বতঃসিদ্ধান্তরূপে পরিণত করা চাই।

করেছেন এর প্রবর্তনের ফলে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি না, অথবা মানুষের জন্য এই ব্যবস্থার সত্যকার প্রয়োজন আছে কি না, সে-সবও বিচার্য।

ধর্ম যদি ললিতকলার মতো মুখ্যত মানস ব্যাপার হত তা হলে জগতের সমস্ত ধর্মকে এমন পরম আদরে সঞ্জীবিত রাখবার চেষ্টা হত মানুষের সভ্যতার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু সাধারণত জীবনে ও ললিতকলায় যে প্রভেদ, ধর্মে ও ললিতকলায়ও সেই প্রভেদ। ধর্ম ও জীবনেব অভেদত্বের কারণ, ধর্ম একই-সঙ্গে জীবনের নিয়ামক ও জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু ললিতকলাকে তেমনিভাবে জীবনের নিয়ামক বলা যায় না। জীবন অস্থির অপূর্ণাঙ্গ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, ললিতকলা অচঞ্চল, পূর্ণাঙ্গ, সৌন্দর্য-লোকে অবিনশ্বর: জীবন সত্য, ললিতকলা স্বপ্ন। ধর্ম কখনো কখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অথবা ব্যক্তি-বিশেষের এমন মানস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সেটি স্বাভাবিক বা সাধারণ ব্যাপার নয়। স্বভাবত ধর্ম মানুষের মানস ব্যাপার যতখানি তার চাইতে বেশি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার। তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যেমন পূর্ণস্বাতন্ত্র্য অসম্ভব ও অসত্য, ধর্মের ব্যাপারেও তেমনি নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য অবাঞ্ছিত, তাতে ধর্মের যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য— মানুষের বৃহত্তর সমাজ-জীবনে কল্যাণের আয়োজন—তাহাই ব্যাহত হয়। মানুষের বয়স কম হয় নি, অভিজ্ঞতাও কম হয় নি। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আজ এ কথা সে বুঝেছে যে জ্ঞান ও সত্যের অভিমানের মতো বিড়ম্বনা আর নেই। কিন্তু এই নূতন জ্ঞান লাভ করে সে যদি ধর্মে ধর্মে *Laissez-faire** নীতি অবলম্বন করে তা হলেও কম ভুল সে করবে না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের চিত্ত বিকশিত হয়। তার কর্মজীবনও বিকশিত হয়। এই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই বিরাট জগতের সাহচর্য যে তার লাভ হয়, সেটি তার জন্য অমূল্য। বোলাঁ ও গান্ধীর এই নূতন ব্যবস্থার যে শান্তি ও স্বস্তি, লোক-সমাজে সতেজ ও সন্ধান-তৎপর মানসিকতা সৃষ্টির সহায়ক না হবার সম্ভাবনাই তার বেশি।

হয়তো বলা হবে, অন্তত বিভিন্ন জাতীয় বা সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা

* *Laissez-faire (Let alone)*—যে যার পথে চলুক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই নীতির সমর্থিত ব্যক্তিত্ববাদ অচিরেই সমষ্টি-বাদের দ্বারা পরাভূত হয়।

তো চাইই, নইলে মানুষ পরস্পরকে চিনবে ও বুঝবে কেমন করে? এই চিন্তাধারার মূলেও রয়েছে একটি বড়ো ভুল— অতীত ও কতকাংশে বর্তমানকে এ ক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে চিরকালের পরিচায়ক বলে। অতীতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন দুর্লঙ্ঘ্য ভৌগোলিক ক্ষেত্রে লালিত হয়েছিল। কতকটা সেই ব্যবধানের প্রভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য হতে পেরেছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু আজ সে-ব্যবধান চূর্ণ হবার পথে দাঁড়িয়েছে. মানুষের কৌতূহলও বর্ধিত হয়ে চলেছে, জাতিতে জাতিতে আন্তর ও বাহ্য স্বাতন্ত্র্য তাই পরস্পরের অজ্ঞাতসারেও নিশ্চিহ্ন হবার পথে চলেছে। মানব-সভ্যতার এই এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও যদি বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা type-এর কথাই ভাবা হয়, তা হলে ভাবনার পরিচয় যা দেওয়া হয় তার চাইতে বেশি পরিচয় দেওয়া হয় অতীতপ্রীতির। কোনো কোনো চিন্তাশীল ভবিষ্যৎ মানবসমাজের একাকারত্বের কথা ভেবে আনন্দ পান না এই ধারণা থেকে যে তেমন একাকারত্ব হবে বর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন, সুতরাং অসুন্দর। কিন্তু কত অনাবশ্যক ও অর্থহীন বৈশিষ্ট্যের শৃঙ্খলে এখনো মানুষ বন্দী, এখনো কত অবিকশিত তার সৃষ্টিশক্তি, এ চিন্তা মনে স্থান দিতে পারলে সেই বর্ণ ও বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যের কথা ভেবেই তাঁরা আহ্লাদিত হবেন।

ধর্ম জ্ঞানেরই প্রকার-ভেদ, এই কথাটি তেমন স্পষ্টভাবে মনে না রাখার ফলেই ধর্ম-সমস্যা মানুষের জন্য এমন অশোভন ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যুগে যুগে ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের, অন্য কথায়, প্রত্যয়ীভূত জ্ঞানেরও, উৎকর্ষলাভ হয়েছে। একালে ধর্মের উপরে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির প্রভাবও সেই একই সত্যের পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে যেমন অপ্রতিহত সন্ধানপরতা ও কল্যাণের আয়োজন ভিন্ন আর কোনো দিকে লক্ষ্য রাখলে শেষ পর্যন্ত বিড়ম্বিতই হতে হয়, ধর্মের ব্যাপারেও তেমনি সত্য ও কল্যাণ-জিজ্ঞাসাকে কিছুমাত্র শিথিল করবার প্রয়োজন আছে তা মনে হয় না। রামকৃষ্ণ ও গান্ধীর কর্মজীবনের দিকে চাইলে দেখা যায় তাঁরাও যথাসম্ভব অভিমান-বিবর্জিত হয়ে তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যপথ অনুসরণ করে চলেছেন, তাতে অন্যের অন্তরে কতখানি বেদনা বাজল সেটি তাঁদের চিন্তার মুখ্য বিষয় নয়।

তাই মনে হয় মানব-সভ্যতার নব সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পেরে রামমোহন যে তাঁর দেশবাসীকে অতীত বা বর্তমান-প্রীতির পরিবর্তে লোকশ্রেয়ঃ ও বিচার-বুদ্ধির মন্ত্র দান করেছিলেন, সে-মন্ত্রের যথাযোগ্য সমাদর হয় নি সেই মন্ত্রের

অন্তর্নিহিত কোনো ত্রুটির জন্য নয়— তাঁর দেশবাসীর সত্যপ্রীতির ও বৃহত্তর দেশের কল্যাণ-কামনার অভাবের জন্যই।

রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্র-বিচারে এত চমৎকারিত্ব রয়েছে, পাণ্ডিত্য ও বিচার-বুদ্ধির এমন স্ফুরণ সেখানে হয়েছে যে, সে-সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালির তেমন কৌতূহল না থাকা তার মনন-শক্তির উৎকর্ষের পরিচায়ক হয়তো নয়। এই-সব বিচারে তাঁর কোনো কোনো শাস্ত্র-ব্যাখ্যা খুবই নূতন, যেমন গীতার এই সুবিখ্যাত শ্লোকের ব্যাখ্যা -

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
> যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

গীতার গান্ধীভাষ্যে এর অর্থ লেখা হয়েছে এই— "কর্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিকে জ্ঞানী যেন ওলটপালট না করে, বরং সমত্ব রক্ষাপূর্বক ভালো রকমে কর্ম করিয়া তাহাকে যেন সর্বকর্মে প্রেরণা দেয়।"— এইটি এর প্রচলিত ব্যাখ্যা, আর এই ব্যাখ্যার দ্বারা প্রচলিত আচারপদ্ধতি (প্রতিমাপূজা ইত্যাদি) মান্য করিতে বলা হয়। কিন্তু রামমোহন এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই—

> "জ্ঞানবান ব্যক্তি আপনি কর্ম করিয়া অজ্ঞানী কর্মসঙ্গিকে কর্মে প্রবর্তক হইবেন, যেহেতু জ্ঞানীর নিষ্কাম কর্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও সেই প্রকার কর্ম করিবেক। সুতরাং জ্ঞানীর কদাপি কাম্য কর্মে অধিকার নাই, তাঁহার নিষ্কাম কর্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম করিবেক। কর্ম-সঙ্গিদের কি প্রকার কর্ম কর্তব্য তাহা ভূরি স্থানে ঐ গীতাতে লিখিয়াছেন। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।... যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ॥ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ ফল কামনা করিয়া কর্ম করিলে সে কর্ম দ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। এবং স্মার্ত্তধৃত ষষ্ঠস্কন্ধ বচন॥ ...স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্মহি। ন রাতি রোগিণে পথ্যাম্ বাঞ্ছতেপি ভিষকৃতমঃ॥ আপনি জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অজ্ঞানকে সকাম কর্ম করিতে উপদেশ করেন না, যেমন রোগী মনুষ্য কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না।" (গ্রন্থাবলী - পৃ. ২১৫)।

রামমোহন ও খৃস্টধর্ম

রামমোহন তাঁর *Precepts of Jesus—a guide to peace and happiness*-এর ভূমিকায় বলেছেন, খৃস্টের এই যে উপদেশ, অন্যের প্রতি

তেমন আচরণ কর যেমন আচরণ তুমি প্রত্যাশা কর, মানুষের নৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক এমন পূর্ণাঙ্গ উপদেশ তিনি আর কোনো ধর্মগ্রন্থে পান নি, ধর্মশাস্ত্র হিসাবে বাইবেলের স্থান তাই অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের চেয়ে উচ্চে তিনি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর সেই বাইবেল ত্রিত্ববাদ, খৃস্টের রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব-বিবর্জিত বাইবেল। বলা বাহুল্য, বাইবেলের এই ধরনের ভক্তের প্রতি বাইবেলের ভক্ত-সাধারণের সন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব। খৃস্টানসমাজের এই অসন্তোষের ফলেই বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষা নির্ণয়ে তিনি দীর্ঘ তিন বৎসর কাল সুকঠোর পরিশ্রম করেন। তিনখানি সুবিস্তৃত গ্রীক-ও-হিব্রুবচন-কণ্টকিত *Appeal to Christian Public* তাঁর এই কঠোর পরিশ্রমের ফল। তাঁর এই পাণ্ডিত্য দর্শনে তৎকালীন খৃস্টান-জগৎ চমৎকৃত হয়েছিলেন।

আধুনিক খৃস্টান-জগৎ তাঁর এই খৃস্টানশাস্ত্র বিচারের কী মূল্য দেন দুর্ভাগ্যক্রমে সে-বিষয়ে কিছু জানি না। কিন্তু তাঁর দেশবাসীর কাছে এর মূল্য কম হওয়া উচিত নয়। তাঁর এই খৃস্টানশাস্ত্র-বিচারের ভিতর দিয়ে এই কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ জীবনকেই তিনি কাম্যজীবন জ্ঞান করতেন।

রামমোহনের সাধনা

রামমোহনের খৃস্টান-শাস্ত্রের বিচারে দেখা যায়, তিনি নিজেকে খৃস্ট-অনুবর্তী বলে প্রচার করেছেন। তাঁর 'তুহ্‌ফাতুল্‌ মুওহ্‌হিদীন' গ্রন্থে কিন্তু দেখা যায়, তিনি "ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ" "প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ" এ-সবের কিছুই মানেন নি। এজন্য তাঁর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা প্রায় একমত যে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত যুক্তিবাদী, কিন্তু পরে তাঁর সেই শাস্ত্রনিরপেক্ষ স্বাধীন যুক্তিবাদ ধর্মাশ্রিত যুক্তিবাদে পরিণত হয়েছিল; আর মানুষের জন্য এই ধর্মাশ্রিত যুক্তিবাদই তিনি কাম্য জ্ঞান করতেন।

কিন্তু রামমোহন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার অবসর আছে। তাঁর হিন্দুশাস্ত্রের বিচারেও দেখা যায়, তিনি নিজেকে শাস্ত্রানুগামী হিন্দু বলে প্রচার করেছেন ও সেইভাবে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ-গ্রন্থ বেদান্ত আশ্রয় করে হিন্দুর জন্য প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান আহরণের চেষ্টা করেছেন। অথচ তাঁর দেশবাসীর জন্য ইয়োরোপীয় জ্ঞানলাভের পথ সুগম করবার অনুরোধ জানিয়ে লর্ড আমহার্স্টকে তিনি যে পত্র লেখেন তাতে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভের

দুরূহতার কথা বলেছেন, আর বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় প্রভৃতির শিক্ষাকে বেশ উপহাস করেছেন। বলা যেতে পারে, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় প্রভৃতির প্রচলিত ব্যাখ্যাকে তিনি উপহাস করেছেন, প্রকৃত বেদান্ত, মীমাংসা ও ন্যায়কে নয়। তা হলেও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত মধ্যযুগীয় জ্ঞানচর্চার চাইতে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান-দর্শন-চর্চাকে তিনি বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। বাইবেলের প্রতি তাঁর কিছু বেশি শ্রদ্ধা থাকলেও এর আলোচনা-কালেও তাঁর যুক্তিবাদ বাস্তবিকই যে শিথিল হয় নি তার প্রমাণস্বরূপ এই কয়েকটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে : প্রথমত —*Precepts of Jesus—a guide to peace and happiness* গ্রন্থখানি তিনি বাইবেল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে এই দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব-বিবর্জিত সহজ সরল উপদেশ-মালায় বিশ্ব-বিধাতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা উন্নততর হবে ও তাদের একের অন্যের প্রতি ও সমাজের প্রতি ব্যবহার সু-নিয়ন্ত্রিত হবে ; তাঁর 'তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন' গ্রন্থে বিচারবুদ্ধির কার্যকারিতা সম্বন্ধেও তিনি এই ধরনের কথা বলেছেন, যথা— সব ধর্ম আত্মা ও পরকালে বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত ; যদিও এই দুয়ের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় তবু এতে বিশ্বাস তেমন দোষার্হ নয় কেননা মানুষ দুষ্কর্ম থেকে নিরস্ত থাকে পরলোকের ভয়ে ও রাজভয়ে। কিন্তু এই দুই প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পান-আহার পবিত্রতা-অপবিত্রতা শুভ-অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে কত শত অকল্যাণকর ও বুদ্ধিনাশকর বিশ্বাস সম্মিলিত হয়েছে, ও তাতে মানুষের দুঃখ বেড়ে গেছে! তবু মানুষের অন্তরে এই শক্তি নিহিত আছে যে এই-সব বিশ্বাস সত্ত্বেও সে যদি নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন জাতির ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয় তা হলে কী সত্য আর কীই বা অসত্য, তা সে নিরূপণ করতে পারবে আশা করা যায় ; ও এইভাবে অর্থহীন ধর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এক অদ্বিতীয় মঙ্গলবিধাতার প্রতি ও সমাজ-কল্যাণের প্রতি মনোযোগী হতে পারবে। দ্বিতীয়ত, রামমোহনের প্রতিপক্ষ এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, খৃস্টধর্মের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী না হলে প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী হওয়া যায় না : রামমোহন দেখিয়েছিলেন, খৃস্টের ভিতরে যা কিছু অলৌকিক বা অসাধারণ সব ঈশ্বর-প্রসাদে, তাঁর একান্ত নির্ভর ঈশ্বরের উপরে, আর বাইবেল থেকেই প্রমাণ করা যায় যে ঈশ্বরের সমস্ত আদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পরস্পরের প্রতি কী কর্তব্য তাই শিক্ষা দেওয়া।

তাই আমাদের বলতে ইচ্ছা হয়, 'তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন' গ্রন্থে রামমোহন

যে অলৌকিকতানিরপেক্ষ একেশ্বরতত্ত্বে ও লোকশ্রেয়বাদে উপনীত হয়েছিলেন পরে পরে এই মতের কোনো বিশেষ পরিবর্তন তাঁর ভিতরে ঘটে নি। যাঁরা এই পরিবর্তন দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত তাঁরা বোধ হয় এই অদ্ভুত ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন নি, যে 'তুহ্ফাতুল্ মুওহ্হিদীন' গ্রন্থেও রামমোহন একদিকে যেমন প্রখরযুক্তিবাদী অন্যদিকে তেমনি সহজভাবে ঈশ্বরানুরাগী ও মানব-কল্যাণকামী।

বিলাতগমনের পূর্বে রামমোহন Unitarian (ঈশ্বরের একত্ববাদী) খৃস্টানদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও ত্রিত্ববাদী খৃস্টানদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে গমনের পরে উভয় শ্রেণীর খৃস্টানদের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা করেন ও উভয় দলেই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু লাভ হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো কোনো ধর্মযাজক মত প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি ত্রিত্ববাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন এবং আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে ত্রিত্ববাদ পূর্ণভাবেই গ্রহণ করতেন। মিস্ কলেট-লিখিত জীবনীর সম্পাদক এ সব কথা গণ্য করেন নি। তবে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে রামমোহনের ভিতরে ধর্ম-ব্যাকুলতা চিরদিনই অত্যন্ত প্রবল ছিল; সেই ব্যাকুলতার বশে প্রথম জীবনে তিনি স্বাধীন যুক্তিবাদ গ্রহণ করেন ও পরবর্তী জীবনে যুক্তি-বাদের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে "ধর্মবিশ্বাসে"র দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই মতের স্বপক্ষে তিনি এই প্রমাণটি দিয়েছেন— রামমোহন তাঁর সর্বশেষ রচনায় উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতিস্থাপন সমর্থন করেন। এই বসতিস্থাপনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু তর্ক তিনি উত্থাপন করেন, সে-সবের একটি এই— উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতি স্থাপনের ফলে ও তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ভারতবাসীদের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা: এই উন্নত ভারতবাসীরা ও ইয়োরোপীয়েরা সম্মিলিত হয়ে ব্রিটিশের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করতেও পারেন; তা হলেও তাঁদের ভিতরে বাণিজ্য-সম্পর্ক থাকবে ও এই নব-আলোকপ্রাপ্ত ভারতবর্ষ এশিয়ার শিক্ষাগুরু হবে। রামমোহনের মূল বক্তব্য এই—

Americans were driven to rebellion by misgovernment ....The mixed community of India, so long as they are treated liberally and governed in an enlightened manner, will feel no inclination to cut off its connection with

England ···yet if events should occur to effect a separation, still a friendly and highly advantageous commercial connection may be kept up between two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion and manners.*

এখানে সম্পাদক মহাশয় এই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রামমোহন তাঁর দেশবাসীদের খৃস্টান-ধর্মে দীক্ষিত হবার কথা ভেবেছেন, এটি সুসিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা যায় না কয়েকটি কারণে। প্রথমত, যে-সমস্ত গণ্যমান্য ইয়োরোপীয় ভারতবর্ষে বসতিস্থাপন করবেন তাঁরা খৃস্টধর্মাবলম্বী ও ভারতের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী হবেন, তাঁদের অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে রামমোহন খৃস্টান-ভারতবর্ষ বলতে পারেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রিয় খৃস্টান-নীতির (Do unto others as you like to be done by) দ্বারা প্রভাবান্বিত ভারতবর্ষকে তিনি খৃস্টান-ভারত বলতে পারেন। তৃতীয়ত, তাঁর দেশবাসীরা সোজাসুজি যিশুর উন্নততর ধর্মে দীক্ষিত হবে এ চিন্তা রামমোহনের জন্য একান্ত অপ্রীতিকর হয়তো ছিল না কেননা কোনো একমে তাঁর দেশবাসীর ভালোর দিকে একটু পরিবর্তন হোক এ কামনা তিনি করতেন, তবু এই চিন্তা যে তাঁর খুব প্রীতিকরও ছিল না তা বুঝতে পারা যায় আমেরিকার Bishop Ware-কে লিখিত তাঁর এই পত্রাংশ থেকে—

I am led to believe from reason, what is set forth in the scripture, that "in every nation he that feareth God and worketh righteousness is accepted with him," in whatever form of worship he may have been taught to glorify God.†

* আমেরিকা-বাসীরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল কুশাসনের ফলে।··· ভারতের এই মিশ্রিত জাতি যতদিন সদয় ব্যবহার ও উদার শাসন লাভ করবে ততদিন তারা ইংলণ্ডের যোগ সম্পর্ক ছেদন করবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করবে না।··· ঘটনাক্রমে সম্পর্ক যদি ভিন্নই হয় তবু এই দুই স্বাধীন ও খৃস্টান দেশের মধ্যে বন্ধুভাব ও পরস্পরের কল্যাণসাপেক্ষ বাণিজ্যসম্পর্ক থাকবে—ভাষা, ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের সাদৃশ্য তখন এই দুই দেশের ভিতরে যোগ রক্ষা করবে।

† (খৃস্টান) শাস্ত্রে এ-কথা আছে, আর বুদ্ধির সাহায্যেও আমি এই বিশ্বাসে উপনীত

Bishop Ware-কে লিখিত এই পত্রে আরো একটি লক্ষ্য করবার কথা আছে। রামমোহনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ভারতে খৃস্টধর্মের প্রসারের সম্ভাবনা কিরূপ; তাতে তিনি শেষ পর্যন্ত এই উত্তর দেন— বিজ্ঞান, ইংরেজি সাহিত্য ও ধর্ম-নিরপেক্ষ সুনীতি শিক্ষার আয়োজন যদি এদেশবাসীর জন্য তাঁরা করতে পারেন তবে সেইভাবেই তাঁরা এদেশবাসীর মনকে খৃস্ট-ধর্ম গ্রহণের উপযুক্ত করতে পারেন।

এই থেকে রামমোহনের সংস্কার-চেষ্টার অথবা সমগ্র সাধনার স্বরূপ জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন হয়। এই সম্পর্কে তাঁর সাধনার দুইজন শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ, যে মত প্রকাশ করেছেন তার মর্যাদা নিরূপণ প্রথমেই কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্বমানবের একত্ববোধ তাঁর সমকালে জগতে আর কারো ভিতরে এমন পূর্ণভাবে দেখা যায় না। বর্তমান জগৎ সহযোগিতার জগৎ, স্বদেশের প্রাচীন অবিনশ্বর যা-কিছু তা আয়ত্ত করে অন্যান্য সাধনার দিকে তিনি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই-সকল কথার প্রমাণ রামমোহনের বিরাট সাধনার ভিতরে নিশ্চয়ই আছে— যদিও রামমোহনের সমকালে শুধু তাঁকেই বিশ্বমানবের একত্ববোধের পূর্ণ অধিকারী বলে ভাবতে আমাদের কিছু আপত্তি, কেননা রামমোহনের সমকালে, অথবা কিছু পূর্বে, মহামনীষী গোটের আবির্ভাব; নবযৌবনেই তিনি নিজেকে বলেছিলেন Welt-Kind (বিশ্বসন্তান): আর পরিণত বয়সে তাঁর বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ বোধ সুবিদিত। তবু যিনি দূর স্পেনের জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার-লাভে উল্লসিত হয়ে নিজ ব্যয়ে এক বড়ো উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, ও Naples-এর পরাধীনতা-দুঃখের অবসান হয় নি জানতে পেরে জগতের অত্যাচারীদের উদ্দেশে এই অভিসম্পাত উচ্চারণ করেছিলেন—

> I consider the cause of the Neapolitans as my own and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be, ultimately successful.*

হয়েছি যে, প্রত্যেক জাতির ভিতরে যারা ঈশ্বরের ভয় রাখে ও ধর্ম আচরণ করে তারা তাঁর (বিশুর) করুণা লাভ করে, তা যে-ভাবেই তারা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে শিখুক।

* নেপল্‌স্‌-বাসীদের দুঃখ আমারও দুঃখ বলে আমি জ্ঞান করি— তাদের শত্রু আমাদেরও

মানুষের সঙ্গে তাঁর এই সহজ যোগ জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার যোগের চাইতে নিবিড়তর বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

রামমোহনের সাধনার স্বরূপ-নির্দেশ সম্পর্কে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের মন্তব্য পরম হৃদয়গ্রাহী, কল্পনার সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। তিনি রামমোহনকে দাঁড় করিয়েছেন জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মর্মোদ্‌ঘাটক রূপে। তাঁর মতে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা হচ্ছে বিশ্বজনীনতার এক-একটি রূপ, এর কোনোটি মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটির লক্ষ্য হওয়া উচিত তার সর্বোচ্চ পরিণতির দিকে। বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রের আলোচনা করে রামমোহন তাদের সেই সর্বোচ্চ পরিণতির পথ সুগম করতে চেষ্টা করেছেন। কিছু ভিন্ন বেশে এই চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে। এই চিন্তাধারা দার্শনিক-প্রবর রাধাকৃষ্ণনের লেখনীতে রূপ পেয়েছে এই ভাবে—

> If we believe that every type means something final, incarnating a unique possibility, to destroy a type will be to create a void in the scheme of the world. (*Hindu View of Life*) †

এই চিন্তাধারা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যও নিবেদন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মের যে-রূপ সহজভাবে প্রতিদিন আমাদের সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে সেই পরিচিত রূপের পানে এঁরা তাকান নি, এঁদের আলোচিত ধর্ম ভাবলোকের ব্যাপার—সেখানে কোনো type-কে পূর্ণাঙ্গ ও অবিনশ্বর ভাবলে আপত্তির কারণ তেমন ঘটে না।

এই সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা ভাববার আছে। আচার্য রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ "স্বাতন্ত্র্য"-বাদী চিন্তাশীলেরা ভারতের জাতিভেদে দেখেছেন প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা জাতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার একটি প্রয়াস। হয়তো

শত্রু। যারা স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের সমর্থক তারা কখনো সফলকাম হয়নি আর শেষ পর্যন্ত কখনো সফলকাম হবে না।—এইটি একটি পত্রাংশ। পত্রখানি বাকিংহাম্ সাহেবকে লেখা, তারিখ— ১১ই আগষ্ট, ১৮২১।

† যদি আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক সভ্যতা হচ্ছে এক একটি চরম পরিণতি এক অতুলনীয় সম্ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করেছে তার ভিতরে, তবে এর একটি ধ্বংস হলে জগদ্‌বিধানে অভাব দেখা দেবে।

তাঁদের এই অভিমতের মূলে সত্য আছে; কিন্তু এর ফল কী হয়েছে সেটিও বিচার্য। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিচ্ছিন্নতা ভারতের পতনের এক বড়ো কারণ অনেক মনীষী এই মত ব্যক্ত করেছেন; তারপর এই বিচ্ছিন্ন বা স্বাতন্ত্র্য-মণ্ডিত অংশসমূহ যে কালে অসুন্দর বৈ সুন্দর হয় নি তার পরিচয় পাওয়া যায় রামমোহনের সমসাময়িক ব্রাহ্মণ-সমাজের জীবনে— তাঁরা পূর্বপুরুষের সাধনা বিস্মৃত হয়ে রামমোহনের উদ্ধৃত উপনিষৎ-রচনাবলী ভেবেছিলেন রামমোহনের নিজের রচিত শ্লোক বলে।— আর হিন্দু সমাজের এই বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহে শক্তি-তরঙ্গ খেলেছে তখন যখন দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দের মতো স্বাতন্ত্র্য-ধ্বংস কারীর আবির্ভাব সেখানে ঘটেছে।

স্বাতন্ত্র্য-বাদের বড়ো অপরাধ হয়তো এই যে এর প্রভাবে মানুষে মানুষে অপরিচয়ের, সুতরাং অপ্রেমের, সৃষ্টি হয় – সৃষ্টিধর্মী কৌতূহলবৃত্তিরও খর্বতা সাধন হয়। সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যলোপভীতির কোনো সার্থকতা হয়তো নেই— পারস্য সর্বপ্রকারে আরবের বশ্যতা স্বীকার করেছিল কিন্তু জগতে পারস্যের বিলোপ সাধন হয় নি: ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায়, আমাদের মধুসূদন সর্বপ্রকারে স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বাঙালিত্ব ও মানবত্ব কিছুই পরিম্লান হয় নি— হয়তো বা উজ্জ্বলতর হয়েছে। রামমোহনকে বলা হয় প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষির যোগ্য বংশধর, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার প্রয়াস তিনি যা করেছেন তার চাইতে অনেক বেশি করেছেন স্বাতন্ত্র্য-ধ্বংসের ও সর্বঅভিমানশূন্য সত্যোপলব্ধির প্রয়াস।

বাস্তবিক, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ইত্যাদি প্রাচীন নামে রামমোহনকে পরিচিত করতে যাওয়া অসার্থক বলেই মনে হয়। তিনি ছিলেন সহজ ভাবে সত্যজিজ্ঞাসু— আর জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা হয়তো এই সহজ পরিচয়েই পরিচিত।— কিন্তু এই সহজ সত্য জিজ্ঞাসার প্রেরণায়ও মানুষ ধর্ম-সংস্কারক সমাজ সংস্কারক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি বহুকিছু হতে পারেন, রামমোহন এর কোন শ্রেণীর অন্তর্গত? বলা বাহুল্য, জীবন এক অখণ্ড ব্যাপার, তাই কোনো শক্তিমান একই সঙ্গে ধর্ম-সংস্কারক সমাজ-সংস্কারক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হতে পারেন। তবু বিশেষ বিশেষ দিকে শক্তিমানদের প্রবণতা দেখা যায়— রামমোহনের প্রবণতা কোন দিকে?

ইতিহাসে রামমোহনের পরিচয় এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা রূপে, যদিও তিনি নিজে বার বার বলেছেন কোনো নূতন ধর্মমতের প্রবর্তক তিনি নন।

কিন্তু চিন্তাশীল-মাত্রেই নূতন-কিছুর প্রবর্তক, কেননা জগৎ চিরনূতন কাজেই তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে এক নূতন মতের প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। একালের অনেক শিক্ষিত বাঙালীর অভিমত, রামমোহনকে ধার্মিক পুরুষরূপে না দেখে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাশালী সমাজ-সংস্কারক রূপে দেখাই সংগত; কেননা, তাঁদের মতে, ধর্মভাবের যে মূল কথা বিশ্বাতীত কোনো শক্তিতে একান্ত আত্মসমর্পণ, সেই অহমিকাপরিশূন্য আত্মসমর্পণ তাঁর বিচিত্র বাদ-প্রতিবাদের ভিতরে দুর্লভ। কিন্তু এই অভিমত তেমন মূল্যবান নয় বলেই মনে হয়, কেননা রামমোহনের সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের উৎস-স্বরূপ যে অবিচলিত মানবকল্যাণ-বোধ তার প্রতি এর দৃষ্টি নেই। রামমোহনের নিজের এই মন্তব্যটিও এই সম্পর্কে স্মরণীয় —"ধর্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের?"

যে-সম্প্রদায়ের তিনি নেতা তাকে বর্তমানে একটি ভক্ত-সম্প্রদায় বলা চলে; কিন্তু ধর্মজীবন সম্বন্ধে রামমোহনের নিজের ধারণা অনেক ব্যাপক, অভিনবত্বও তাতে কম নয়। প্রথমত, একটি বিশেষ ধর্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব উদ্‌ভাবনের দিকে তাঁর দৃষ্টি বেশ কম। সত্য বটে, তিনি এক নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনার কথা বলেছিলেন ও নাস্তিকতার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এ-সব বিষয়ে যে অনাবশ্যকভাবে ব্যস্ত তিনি ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই দুইটি ব্যাপার থেকে। হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতার তিনি বিরোধী হয়েছিলেন, কেননা তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল—

> Hindu Idolatry, more than any other pagan worship destroys the texture of Society (Introduction to the Vedanta).*

কিন্তু যখন তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বলেছিলেন তাঁরা প্রকৃতই মূর্তিপূজা করেন না, মূর্তির ব্যপদেশে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের পূজা করেন, রামমোহন তাঁদের এই উক্তি যথার্থ বলে স্বীকার করেন নি, তবু বলেছিলেন, হিন্দু-সমাজের লোকেরা মূর্তিপূজার যে এমন রূপক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেছেন এ শুভ লক্ষণ। আর বিলাতে গমন করে ত্রিত্ববাদী খৃস্টানদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশেছিলেন তার কারণ মনে হয় এরূপ ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁদের সমগ্র জীবনের উৎকর্ষ।

* অন্যান্য পদ্ধতির প্রতীক-উপাসনার চাইতে হিন্দু-পৌত্তলিকতা সমাজ-বিধানে সামাজিক ক্ষতিকর।

খ্রিস্টীয়মত, সুফীমত, যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মসাধন-প্রণালী তিনি ব্যবহার করেছিলেন দেহ ও মনের উৎকর্ষ বিধানের উপাদান রূপে। কিন্তু সেই উৎকর্ষ-সমন্বিত দেহমনের ব্যবহার করেছিলেন জ্ঞানান্বেষণে ও মানব-সেবায়, অর্থাৎ তাঁর চারপাশের লোকদের দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি বিধানে। দেশের প্রাচীন অকল্যাণকর প্রথা সমূহের বিলোপ-সাধন, উন্নততর শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অত্যাচারিত কৃষকদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান, দেশের সর্বসাধারণের জন্য উন্নততর বিচার-ব্যবস্থার প্রচলন, ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহনের অশেষ প্রয়াসের কথা সুবিদিত। শুধু দুঃখ এই, এই প্রাণপ্রদ চিরন্তন ধর্ম—ভাগ্যবান্ জাতির লোকেরা যার মর্যাদা উপলব্ধি করতে প্রায়ই ভুল করেন না—আমাদের দেশের ভাবুক ও কর্মীদের যথাযোগ্য অনুধাবনের বিষয় হয়েছে এ কদাচিৎ।

গোটে সম্বন্ধে কোচে বলেছেন, অল্প বয়সেই তাঁর চিত্তের আশ্চর্য বিকাশ-সাধন হয়েছিল, আর আমৃত্যু তা অক্ষুণ্ণ ছিল। রামমোহন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তাঁর যৌবনের 'তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন' গ্রন্থেই তাঁর মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর বিভিন্ন ধর্মের আলোচনাকে গণ্য করা যেতে পারে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে সমস্ত বক্রতা থেকে উদ্ধার করে ঋজু করবার প্রয়াস রূপে। "তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন"-এর মস্তিষ্ক ও বিভিন্ন জনহিত-প্রচেষ্টার মানব প্রেম ও কর্মশক্তি—রামমোহনের প্রতিভার মর্যাদা এ-সব ক্ষেত্রে অন্বেষণ না করলে তাঁর প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনাই বেশি।

কাজী আবদুল ওদুদ-প্রণীত 'শাশ্বত বঙ্গ' (১৯৫১) গ্রন্থ হইতে সংকলিত। জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক শ্রীহরিশচন্দ্র গুপ্ত-র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দেশাভিমানী রামমোহন

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অবিকল অর্থে না হলেও 'প্রাতঃস্মরণীয়' শব্দটি প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁদের সম্বন্ধে ব্যবহার করা সমুচিত, তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান হলেন 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়'— ত্রিশের দশক পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালির ঘরে ঘরে শোভা পেত এইভাবে বর্ণিত, লিথোগ্রাফে ছাপা রামমোহনের প্রদীপ্ত প্রতিকৃতি।

ভারতপথিক বলে রামমোহনের সংজ্ঞা এসেছে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। শতাধিক বর্ষ ধরে 'আধুনিক ভারতবর্ষের জনক', এই অভিহিতি রামমোহন সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়ে এসেছে। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর কিম্বা মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে-র মতো মিতবাক্, নিরুচ্ছ্বাস অথচ গভীরচেতা মনীষী রামমোহনকে ব্যক্তিমহিমার শীর্ষস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-এর মতো সর্ববিদ্যাবিশারদ শুধু যে বিভিন্ন যুগের জগদ্বরেণ্য চিন্তাবীরদের মধ্যে রামমোহনের তুলনা খুঁজে পেতেন তা নয়, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে রামমোহন হলেন নূতন জায়মান বিশ্বজনীনতারই প্রতীক।

কিছুকাল থেকে রামমোহন চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনায় কিছু বিরূপ বক্তব্যও দেখা দিয়েছে। একে ছিদ্রসন্ধান বলে তাচ্ছিল্য করা ঠিক হবে না। সুমিত সরকারের মতো গবেষক গভীর শ্রদ্ধা ও তথ্যনিষ্ঠা নিয়েই এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি দোষও আমাদের মজ্জাগত বহুকাল ধরে। গুরুবাদ এখনো পর্যন্ত এদেশে সুবিস্তৃত; অন্ধ ভক্তির উদাহরণ প্রায় সর্বত্র; পাদপূজার মতো ঘটনাও বিরল নয়। শিবাষ্টকে বলতে বাধে নি: 'বিধিবিষ্ণু শিরোধৃত পাদযুগম্'— শিবের স্তব করতে গিয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়কেই মহাদেবের দুই পা মাথায় রাখতে হয়েছে! সুখের বিষয় এই যে রামমোহন স্বয়ং সেযুগেই চেয়েছিলেন ধর্মের মতো বিষয়েও "ভক্তিবাহুল্য বর্জিত সুবিবেচনা" ("judicious irreverence")। সংসারে কোনো বস্তুই নিছক বিশুদ্ধির মোড়কে সুরক্ষিত নয়। নিখাদ, নিখুঁত, একান্ত অপাপবিদ্ধ অবস্থান মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। রামমোহনের জীবনে ও কর্মে কখনো কোথাও গলদ দেখা দেয় নি মনে করা হল মানবচরিত্রকেই অস্বীকার করা। ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত

না থেকে রামমোহনের মহিমার বিরাট, গভীর, সুপরিব্যাপ্ত মানবিক বৈশিষ্ট্য ও অবদান অনুধাবনে আমাদের মনের প্রকৃত জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত করে রাখারই সার্থকতা রয়েছে।

১৯২৫ সাল নাগাদ সময়ে মহাত্মা গান্ধী একবার রামমোহনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েই বলেছিলেন যে জনজীবন থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং সেজন্যই মহাত্মা কবির যেভাবে দেশকে নাড়া দিতে পেরেছিলেন তা রামমোহনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। গান্ধীজী ঐতিহাসিক বিচারে বসেন নি। স্থানকালপাত্রভেদ স্মরণে রেখে যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মহাজনের কীর্তি বিশ্লেষণ করতে হয় তা নিয়ে মাথা খাটান নি, সহজ সুরে সহজ কথাই বলতে চেয়েছিলেন। এতে অনেকে বিচলিত বোধ করেন। 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কিঞ্চিৎ বিরক্তিও প্রকাশ করেছিলেন। এটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু অতিরিক্ত বিচলিতির কারণ প্রকৃতপক্ষে ঘটে নি। কবির-এর যুগ থেকে রামমোহনের যুগের পার্থক্য ছিল স্পষ্ট; যে-ধরনের ভক্তি-আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে তদানীন্তন জীবনব্যবস্থায় মানুষের মনের আকুতি কয়েকশতাব্দী ধরে দেখা দিয়েছিল তাব অনুরূপ ঘটনা রামমোহনের কালে সম্ভব ছিল না, হয়তো কাম্যও ছিল না রামমোহনের বিচারে। কিন্তু দেশের মাটি আর দেশের মানুষকে দূরে রেখে চলবার মতো মন ছিল না রামমোহনের। ইংরেজদের ভারতে আগমনের পব থেকে যে পবিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তারই সঙ্গে গভীরভাবে মোকাবিলায় তিনি নেমেছিলেন, আর পরে যেমন রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন, তেমনই তিনিও উপলব্ধি করতেন যে সকল প্রয়াসকেই হতে হবে "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"।

এ রকম আলোচনায় হাজার কথা এসে মনে ভিড় করে। কিন্তু হয়তো সুবিধা হবে রবীন্দ্রনাথেরই আশ্রয় নিলে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে লেখা 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই, তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায়, তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না। এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়াছিলেন। এইজন্যই যেথান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা বিচার করিবার

নিত্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল ; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিলাইয়া দিয়া অঞ্জলি পূরণ করেন নাই।"

রবীন্দ্রনাথই সব চেয়ে মনোহর ভঙ্গিতে দেখিয়েছেন কিভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য এই ভারতবর্ষের ভূমি থেকেই তেজ ও জ্যোতিকে আত্মস্থ করতে পেরেছিল. পশ্চিম জগতের বহু সদ্‌গুণ সেজন্যই একান্ত সৌষ্ঠবের সঙ্গে তাঁর চরিত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের উক্তি যে তিনি "পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন" বলিয়াই তাঁর আসন "দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে।" বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে (১৯২১) রবীন্দ্রনাথ যখন 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্' এই বেদমন্ত্র দিয়ে বহির্বিশ্বকে ভারতবর্ষের আতিথ্য গ্রহণে আহ্বান করেন, তখন যেন রামমোহনের আশীর্বাণী বর্ষিত হয়েছিল। "হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি / দেখা দিলে আজ কি বেশে ? / দেখা দিলে তুমি পূর্বগগনে / দেখা দিলে তুমি স্বদেশে !"— লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ, তিনি রামমোহনেরই প্রকৃত উত্তরসূরী।

এদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী যে এক অন্ধকার যুগ ছিল আর ইংরেজ-কর্তৃত্ব কায়েম হওয়ায় পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাবে যে ক্রমশ আমাদের চোখ খুলল, এরকম একটা ধারণা এখনো অনেকের যায় নি। কথাটা অবশ্য সত্য নয়— আর যে-পরিমাণে এর মধ্যে আছে কিছু অর্ধ-সত্য সে-পরিমাণেই এটা হল কতকটা মারাত্মক। বিধির বিধানে ইংরেজ না এলে আমরা উদ্ধার পেতাম না, এ-ধারণা নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো কিছু বিদ্বানের মনের কথা হলেও প্রকৃত ইতিহাস-বিচারে এরকম সিদ্ধান্ত যে স্থূল এবং ভ্রান্ত তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজের বহুগুণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অবশ্যই অন্য অনেকের মতো রামমোহন রায় করে গেছেন, কিন্তু স্বক্ষেত্রে সগর্বে প্রোথিত থেকেই এই ভারতপ্রতিভা বিদেশীশাসন এবং তার আনুষঙ্গিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। নিজের মাটির ফসলে পুষ্ট মন আর মর্মে সজ্জিত ছিলেন বলেই রামমোহন পাশ্চাত্য প্রভাবকে অভ্যর্থনা জানিয়েও মোহাচ্ছন্ন হন নি। তাঁর নিয়ত সম্পদ ছিল যাকে বলা যায় প্রকৃষ্ট অর্থে 'দেশাভিমান', যা জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর 'সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দে' প্রকাশ পেয়েছে।

যতদূর জানা যায়, রামমোহনের ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হয় যখন তাঁর বয়স বোধ হয় বাইশ। ডিগ্‌বি নামে যে সাহেব বেশ কিছুকাল তাঁর বন্ধু এবং

মুরুব্বি ছিলেন তিনি বলেছেন যে ১৮০৫ সালেও রামমোহন "মাত্র বোঝাতে পারার মতো ইংরেজি বলতে পারতেন।" পরবর্তীকালে অবশ্য ইংরেজি ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখলের কথা জেরেমি বেন্থাম-এর মতো বিশ্ব-বিশ্রুত মনীষীর মুখে শোনা গেছে। যাই হোক, রামমোহনের শিক্ষার বনিয়াদ ছিল সম্পূর্ণ স্বদেশী। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, হিন্দুস্থানী, বাংলা, ইংরেজি, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী ইত্যাদি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ঘটে, কিন্তু মূলে ছিল সমসাময়িক সম্পন্ন বাঙালি ঘরের লেখাপড়া। ফারসী সেকালে শিখতেই হত সরকারী কাজকর্মের খাতিরে আর ফারসী আরবী পঠনপাঠনে উৎকর্ষের সন্ধানে ছোটোবেলাতেই তিনি যান পাটনা, যা ছিল হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি-সঙ্গম। কিছু পরে তাঁকে যেতে হয় কাশীতে, সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিতার সন্ধানে। ১৮০৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম প্রধান গ্রন্থ যা ছিল ফারসীতে লেখা 'তুহফাৎ-উল্-মুওয়াহিদ্দিন' ('ঈশ্বরবিশ্বাসীদের প্রতি উপহার')। ধর্ম ব্যাপারে রামমোহনের মুক্তমতির সমুজ্জ্বল উদাহরণ হল এই রচনা, যা নানা কারণে অনেকটা অবহেলিত হয়ে এসেছে। নিজের এবং দেশের চিন্তার ভিত্তিতেই রামমোহন এই গ্রন্থে "যুক্তি" এবং "সামাজিক স্বস্তি"-কে উপস্থাপিত করেন সকল বিচার্য বিষয়ের মানদণ্ড রূপে। একেশ্বরবাদের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর' ধরনের কথা তোলেন নি, মানুষের বাস্তব জীবন এবং সামাজিক শৃংখলার দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যুক্তিরহিত কুসংস্কার বাধানিষেধ ধর্মবিশ্বাসের সমর্থন পেলে তার নিন্দা করতে সংকোচ বোধ করেন নি। স্বকীয় অনুশীলন বলে মনের মুক্তির কোন্ স্তরে উপনীত হতে পেরেছিলেন তার একটি প্রমাণ হল যে সর্ববিধ গোঁড়ামির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে পেরেছিলেন যে "সকল ধর্মেই কিছু পরিমাণে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে—এদিক দিয়ে তফাৎ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।" অধ্যাপক সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন যে সম্ভবত তদানীন্তন অবস্থা বুঝে রামমোহন স্বয়ং এই বইটির অন্য ভাষায় অনুবাদ থেকে বিরত হয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে ১৮৮৪ সালে বেশ যেন একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই রাজনারায়ণ বসুর লেখা মুখবন্ধ-সমেত এর ইংরেজি তরজমা বেরিয়েছিল।

রামমোহনের কাজের পরিধি এত বিপুল ছিল আর তার মূল্য ছিল এত বিরাট যে সংক্ষেপে তার একাংশের পরিচয় দেওয়াই কঠিন। কলকাতায়

এসে কোম্পানির কাগজ নিয়ে কারবার উপলক্ষে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তখন এদেশে সদ্য আগত এই বিদেশীদের বহু গুণাগুণ তাঁর নজরে আসে —নিজে বিত্তাবত্তায় আগ্রহী বলে ইংরেজদের মধ্যে অল্প যে কয়েকজন গুণের মর্যাদা দিতে অপারগ ছিল না তাদের সঙ্গে নৈকট্যও ঘটে। মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে 'মৌলভি' (এমন-কি, 'জবরদস্ত্ মৌলভি') আখ্যা তাঁর জুটেছিল। যবন সংসর্গ থেকে দূরে ছিলেন না বলে গোঁড়া হিন্দুদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন; কলকাতায় 'হিন্দুকলেজ' প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যে কমিটি হয় তা থেকে রামমোহনকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এই 'জবরদস্ত মৌলভি' অবশ্য উপনিষদের বাংলা আর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন, 'বেদান্তসার'-এর ইংরেজি সংস্করণ বার করলেন, সমাজসংস্কার নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন (বিশেষ করে সতীদাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে), সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টধর্ম বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে লিখলেন *Precepts of Jesus*-এর মতো বই। রটনা হল যে রামমোহন খৃস্টান বনে গেছেন, মিড্‌ল্টন-এর মতো মস্ত পাদরী তাঁকে অনেক প্রলোভন দেখিয়ে দলে টানতে চাইলেন কিন্তু রামমোহন তেমন পাত্র ছিলেন না। সংসার বৈরাগ্য তাঁর কখনো ছিল না – প্রায় যেন প্রাচীন ভারতের নাগরিক-এর মতো জীবনযাপনে তাঁর অনীহা ছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'রাজর্ষি' প্রকৃতির মানুষ, ভারতবর্ষীয় সত্তারই এক দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত। কিছুকাল অর্থের সন্ধানে কাটিয়েছিলেন (যদিও বন্ধু অ্যাডম্স্-এর উপরোধ সত্ত্বেও কোম্পানির চাকরি করতে কিছুতেই রাজী হন নি)। কিন্তু নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াবার পর থেকেই সকল শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণকল্পে আর সঙ্গে সঙ্গে ঋষিনেত্রের অধিকারী বলে বিশ্বমানবের সঙ্গে যে-একাত্মতা ভারত-ইতিহাসের বিচিত্র পরম্পরা থেকে আহরণ করেছিলেন, সেই একাত্মতার সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

রামমোহনের বিশ্বদীক্ষা উদ্রিক্ত হওয়ায় কাহিনী থেকে শিক্ষা আর অনুপ্রেরণা নেবার অজস্র উদাহরণ অন্তত আমাদের কাছে মহামূল্য হয়ে বহুকাল ধরে বিরাজ করবে। ম্যাক্স্‌ মূলর আর মনিয়ের-উইলিয়াম্স্-এর মতো বিদ্বান তাঁকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করেছেন। হয়তো মাঝে মাঝে বিশ্বাসে একটু চিড় ধরার উপক্রম ঘটেছে, কিন্তু ধর্মের গুহানিহিত তত্ত্বের মহিমা ও মাধুর্য ও সামাজিক প্রয়োজন বিষয়ে তাঁর চিন্তায় দ্বিধা ছিল

না। সংস্কৃত, আরবী, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি জানার জোরে বিভিন্ন ধর্মের সাক্ষাৎ পরিচয় মেলায় তাদের মধ্যে মূলসূত্র সন্ধানে ব্রতী হয়ে প্রধানত উপনিষদের ভিত্তিতে 'আত্মীয় সভা' থেকে ক্রমশ 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি নামলেন। বিশেষভাবে অনুধাবন করা দরকার যে ব্রাহ্মসমাজের অভিষ্ট ঘোষণা করতে গিয়ে তাঁর নির্দেশ রইল যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' যে ব্রহ্ম তার উপাসনা করতে হলে যাদের বিশ্বাস হল ভিন্ন, এমন-কি যারা দেবদেবী কিংবা অপর চেতন বা অচেতন বস্তুর উপাসক, তাদের সম্পর্কেও যেন কটু কটাক্ষ কিংবা অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার হল নিষিদ্ধ। মহামতি রাণাড়ে এ-বিষয়ে বিশেষ করে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

রামমোহন সম্বন্ধে বহুপ্রচলিত কিম্বদন্তীর মধ্যে একটি বলে যে ফরাসী বিপ্লবের প্রখ্যাত চিন্তানায়ক কন্দর্সে-র (Condorcet) সঙ্গে নাকি তরুণ-বয়সে রামমোহনের পত্রালাপ হয়েছিল। কৈশোরে তিব্বত-পর্যটনের বৃত্তান্তের মতো এটিও অমূলক বলে মনে হয়। বিপ্লবের একজন পথপ্রদর্শক হয়েও ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার অপরাধে কারাগারে ১৭৯৪ সালে কন্দর্সে-র মৃত্যু ঘটেছিল। তখন রামমোহনের বয়স বাইশের বেশি হয় নি। ফরাসী মনীষীর সঙ্গে পত্রালাপের মতো ভাষাজ্ঞান এবং অন্যান্য অনুকূল অবস্থাই তখন ছিল না। তবে মনে হয় যে রামমোহনের চিত্তে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রথম থেকেই বেশ পড়েছিল প্রমাণ করার জন্যই হয়তো এ-ধরনের কিম্বদন্তীর উদ্ভব। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এর কোনো প্রয়োজন নেই। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিচয়কে আত্মস্থ করার পূর্ব হতেই রামমোহনের মনীষা আত্মপ্রকাশে প্রবৃত্ত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষ এমন ছিল না যে ইংরেজ পদার্পণ না করলে বুঝি এদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েই থাকত। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষে বহু বিরাট রূপান্তরের সূচনা সহায়তা পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু রামমোহনের জীবন ও কীর্তি হল আমাদের এই বহুবিড়ম্বিত এবং মুঘলশাসনের অধঃপতনকালে একান্ত দুর্গত দেশেরই অপরাজেয় প্রাণশক্তির অপরিম্লান সাক্ষ্য।

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন বিষয়ে রামমোহনের আগ্রহ ও অবদানের কথা সবাই জানি। জ্ঞানবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন সম্বন্ধে রামমোহনের উৎসাহের অন্ত ছিল না। লোভলোলুপ বণিকবেশে যে ইংরেজ এসেছিল তারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আনছিল নূতন শিল্পযুগের বিভিন্ন প্রকরণের প্রচলন— অত্যন্ত সীমিত ও স্বার্থসম্বন্ধ হলেও তার মধ্যে জ্ঞান থেকে উদ্ভূত শক্তি-

সম্ভাবনা রামমোহন দেখেছিলেন। এজন্যই তিনি ১৮২৩ সালে বড়োলাট লর্ড অ্যামহার্স্টকে লিখেছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য— কিন্তু বাংলা ভাষায় গদ্যরীতির জনক রামমোহন (বাংলা এবং ফরাসী ভাষায় সাংবাদিকতারও তিনি প্রবর্তক) কখনো ভোলেন নি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের অপরিহার্য গুরুত্ব। ইংরেজি থেকে শুধু সাহিত্যিক নয়, বৈজ্ঞানিক রচনারও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ ছিল তাঁর 'আত্মীয়-সভার' অন্যতম উদ্দেশ্য। রামমোহন- প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল'-এ ১৮৩৩ সালে সর্বতত্ত্বদীপিকা-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার সদস্যেরা সর্বদা কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় সমস্ত ভাব প্রকাশের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন। রামমোহন স্বয়ং লিখেছিলেন যে আমরা ইংরেজদের কাছে ঋণী হতে পারি "প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির ব্যবহার ব্যাপারে।" কিন্তু বিজ্ঞান সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে আমাদের মৌলিক সম্পদ রয়েছে—"আমাদের হাতে আছে এক বিপুল নিজস্ব ভাষা যা আমাদের গৌরব আর যার জোরে বিদেশ থেকে ধার না করে আমরা বিজ্ঞান এবং অন্যান্য তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করতে পারি।" এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় "আশার ছলনে ভুলি" বহু পরিক্রমার পর মাইকেল মধুসূদনের সানন্দ আবিষ্কার যে "সংস্কৃতের দুহিতা" হল যে বাংলা ভাষা তাতে সর্ববিধ ভাবপ্রকাশ ব্যাপারে দৈন্যের লেশমাত্র নেই।

১৮৩০ সালে বড়োলাট বেন্টিঙ্কের আপত্তি সত্ত্বেও মুঘল বাদশাহ্ রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে দিল্লীর দরবারের পক্ষ থেকে ইংলণ্ডের রাজসভায় দৌত্যকর্মে প্রেরণ করেন। মাথা উঁচু করে এই ভারতবর্ষীয় মহাজন তখন ইয়োরোপ গিয়েছিলেন। বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এ ঘটনাকেই অবাঙালি বিদ্বান, কে. এম. পনিক্কর *Asia and the Western Dominance* গ্রন্থে ভাস্কোদাগামা-র ১৪৯৮ সালে ভারতে আগমনের সঙ্গে পাশাপাশি রাখতে চেয়েছেন— পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের আদানপ্রদানের ইতিবৃত্তে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে। ইংলণ্ডে জেরেমি বেন্থাম-এর মতো বিশ্ববিদিত মনীষী তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। শোনা যায়, তদানীন্তন সদ্যোজায়মান 'ইউটোপিয়ন (আকাশচারী) সোশালিজ্‌ম্'-এর অন্যতম প্রধান প্রবক্তা রবার্ট ওয়েন-এর সঙ্গে রামমোহনের আলোচনা হয়েছিল— সমাজবাদের প্রতি রামমোহন আকর্ষণ বোধ করেন নি, হয়তো তা সমসাময়িক পরিস্থিতিতে সম্ভবও ছিল না। সোশালিজ্‌ম্ ইতিহাসের একটা বিশিষ্ট যুগের পূর্বে বিস্তার-লাভের সম্ভাবনা রাখে না আর সেই অনুকূল পরিস্থিতি ভারতবর্ষে তো নয়-ই,

জগতের অধিকাংশক্ষেত্রে তখনো অনুপস্থিত। এতে সোশালিজ্‌ম্‌-এর অনুরাগীরা যদি ক্ষুণ্ণ হন তো নাচার। আমরা রামমোহনকে ঋষি বলতে কুণ্ঠিত নই। কিন্তু বাস্তবিকই তো কেউ 'ত্রিকালদর্শী' হতে পারেন না, কল্পনার জগতে ছাড়া। ধনিকব্যবস্থার পূর্ণ রূপই তখন প্রকাশ পায় নি— সমাজবাদ-সাম্যবাদের চিন্তা যদি রামমোহনকে টানতে না পেরে থাকে তো আশ্চর্যের কিছু নেই।

কিন্তু রামমোহনকে দেশাভিমানী রূপে যে আমরা দেখি, তার গৌরব হল অপরিসীম। বিদেশেই তাঁর মৃত্যু ঘটে— হয়তো এটাই হল সংগত। তৎকালীন দুর্গত ভারতবর্ষের চেয়ে বিদেশেই এই অসামান্য মনীষীর ও কর্মবীরের সমাধি যেন সবচেয়ে সুশোভন। সর্বমানবের সংহতি সাধনের যে সংকল্প রামমোহনের জীবনের মূল কথা, তারই প্রস্ফুটন দেখা গেল প্রবাসে তাঁর জীবনাবসানে। বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্বও যে প্রোথিত থাকে তার স্বক্ষেত্রে, তারই বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন সাক্ষ্য দেখা যায় ইংলণ্ডে রামমোহনের জীবনযাত্রায়। ভারতীয় পরিচ্ছদ কখনো পরিত্যাগ করেন নি, দেশের রাঁধুনী ছিল তাঁর সঙ্গী, এমন-কি কৈশোরে পরিহিত যজ্ঞোপবীত আমরণ তাঁর দেহশোভা হয়ে ছিল। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে একে কেউ কেউ কথঞ্চিৎ বিকৃতির উদাহরণ ভাবতে পারেন। কিন্তু জীবনে ও কর্মে পরিপূর্ণ সুসংগতি সর্বত্র থাকে না। আর হয়তো বা বিদেশী পরিবেশে স্বদেশী কুসংস্কারকেও যেন দেশাভিমানের স্মারক-রূপে দেহে মনে একটু স্থান দিতে রামমোহন অস্বীকৃত হন নি।

ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিপ্লবের সুগভীর বিচার করেছিলেন রামমোহন— মুক্তি সংগ্রামে নিয়ত সমর্থন ছিল তাঁর মজ্জাগত। অপটু হলেও ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকাকে অভিবাদন জানাবার জন্য কেপটাউন বন্দরে ফরাসী জাহাজে গিয়েছেন তিনি। দেশদেশান্তরে বিপ্লবের সংবাদে আহ্লাদিত হয়ে বন্ধুদের ডেকে উৎসব করেছেন; ইংলণ্ডে থাকা কালে ১৮৩২ সালের 'রিফর্ম' আইন নিয়ে গণ-আন্দোলনকে অভ্যর্থনা করেছেন। বলেছেন জনগণের আকাঙ্ক্ষিত আইনটি গৃহীত না হলে তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করে যাবেন। এ-ধরনের ঘটনা অনেকেই আমরা জানি, কিন্তু আবার অনেকেরই মনে খট্‌কা যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ব্যাপারে বুঝি তাঁর আগ্রহ তেমন ছিল না। স্বাধীনতা অবশ্য সংগ্রাম-সাপেক্ষ, আর সে-সংগ্রাম যে কোনো সময়ে কারও ইচ্ছার প্রাবল্যে আরব্ধ হবার মতো কাণ্ড নয়। রামমোহনের

জীবনকালে দেশের পরিস্থিতি স্মরণে রাখলেই আমরা ভারতবর্ষের মুক্তি বিষয়ে রামমোহনের মনোভাব ও কৃতকর্মের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারব।

প্রথমেই বলে রাখতে হয় যে জাতিভিত্তিক স্বাধীনতার ধারণা এসেছে ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ে— তুলনায় সমুন্নত ইয়োরোপে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পত্তন হয় নি ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পূর্বে এবং তার বিস্তার ঘটেছে ইয়োরোপে উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত। গভীর আলোচনায় না নেমে বলা যায় যে রামমোহনের জীবদ্দশায় দিকে দিকে জনবিক্ষোভ দেখা গেছে নিশ্চয় আর বিদেশী অত্যাচারের বিপক্ষে মানুষের আক্রোশ নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে বটেই, কিন্তু যাকে বলে গোটা দেশ জুড়ে কিংবা দেশের গুরুতর অংশে স্বদেশী শাসন স্থাপনের সম্ভাবনা ঐতিহাসিক ক্ষেত্রেই তখন প্রস্তুত হয় নি। ইংরেজ-কর্তৃত্বের যুগে এদেশের দুর্গতি আর লাঞ্ছনা রামমোহনের কাছে নিশ্চয়ই অজানা ছিল না। কিন্তু সেই কর্তৃত্বের বিলোপ সাধনের রাস্তা তখন একেবারেই স্পষ্ট ছিল না— বরঞ্চ যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে এবং বিজ্ঞান বলে অর্থসম্পদের জোরে ইংরেজের শ্রেষ্ঠতা ছিল অকাট্য। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের কল্যাণ ঘটেছে, বিধির বিধানেই যেন ইংরেজ ভারতবর্ষে এসেছে— এমন ধরনের কথা রামমোহন যে বলেন নি তা নয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত এ-ভাবের মন্তব্য যে কতবার কত ভাবে বলেছেন তার বিবরণ দেখলে হয়তো লজ্জাবোধ করতে হবে। তবে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে রামমোহন থেকে গান্ধী পর্যন্ত সবাইকে নিন্দিত করতে পারলে আত্মতুষ্টি হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় কিন্তু সত্যের সন্ধান তাতে মেলে না। স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে যে বিচার তা অনবদ্য বলে কল্পনা করা যায় কিন্তু তা হল প্রকৃতই অবাস্তব, তা থেকে কার্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

যে ফরাসী পর্যবেক্ষকের মুখ থেকে রামমোহন সম্বন্ধে বহু সংবাদ আমরা পাই, সেই ভিক্তর জাকমঁ লিখে গেছেন (১৮২৯) যে ইংরেজ শাসনের কদর্যতায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা বোধ করে অল্প বয়সে কিছুকাল তিনি নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন --"তারুণ্যের অন্ধ দেশপ্রেম তাঁকে ইংরেজ এবং তাদের সম্পর্কিত সব কিছুকে ঘৃণা করিয়েছিল"। ১৯১৬ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় উল্লেখ করেন যে ফারসী ভাষায় লেখা রামমোহনের কতকগুলি চিঠিপত্র আছে যাতে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে দিল্লীর বাদশাহ্‌কে কেন্দ্রস্থলে রেখে সংঘর্ষের পরিকল্পনা বর্ণিত হয়েছিল। রামমোহনের

জীবনের এই দিকটি এখনো যত্ন করে অনুসন্ধানের চেষ্টা হয় নি— যদি হয় তো বোঝা যাবে কেন বর্তমান শতকের প্রথম দিকে এদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কাছেও রামমোহনের স্মৃতি জাগরূক ছিল, তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায়।

ইংলণ্ডে বাসকালে রামমোহন সেদেশের কর্তৃপক্ষ এবং সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের কাছে এক বিস্তারিত প্রস্তাব পাঠান ভারতবর্ষে স্বাধীন সংবাদপত্রের অধিকার স্বীকৃতির জন্য। ইংরেজদের তখন তিনি পরামর্শ দিতেন সে নিজের স্বার্থেই ইংলণ্ড যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বীকৃত হয়— নতুবা ভারতবর্ষ এক "দৃঢ়সংকল্প বৈরীর রূপ নিয়ে বহু অসুবিধা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে।" ১৮২৮ সালে একবার নাকি ভিক্তর জাকৃমঁ-কে তিনি বলেছিলেন যে ভারত-বর্ষের পক্ষে আরও কিছুকাল ইংরেজ শাসন প্রয়োজন, নইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কাড়তে গিয়ে ভারতবর্ষ অনেক কিছু হারিয়ে বসতে পারে। কথাটা অবশ্য জাকৃমঁ-র, কিন্তু রামমোহনের পক্ষে কোনো সময়ে এরকম বক্তব্য একেবারে অসম্ভব নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, যা বুঝি তিনি স্টাণ্ডফর্ড আর্নট্-কে একবাব বলেছিলেন— চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন হতে হবে-ই! এটা যদি ঠিক হয় তো যে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছে ১৯৪৭ সালে, তার প্রায় একশো বছর আগেই রামমোহনের হিসাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 'পাওনা' ছিল। গণসংগ্রামের যুগ তখনো আসে নি বলে রামমোহনকে স্বাধীনতার লড়াইয়ে বহুজনকে নিয়ে ব্যাপৃত হতে দেখা সম্ভব হয় নি। কিন্তু 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' এই বোধ রামমোহনের তেজস্বী মনে যে সর্বদাই ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

"ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায়, তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়াছিলেন" (রবীন্দ্রনাথ) বলেই রামমোহন এমন বিরাট বিশ্বজনীন ব্যক্তির বিভায় জ্যোতিষ্মান্ হয়ে ইতিহাসে বিরাজ করছেন। পাশ্চাত্য প্রভাব আয়ত্ত করতে আকুল অথচ তাতে আচ্ছন্ন হতে অস্বীকৃত এই মহাত্মার সমুজ্জ্বল দেশাভিমানকে আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই।

রাজা রামমোহন রায় ও ভারতীয় অর্থনীতি

ভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'ভারতপথিক'। যেরকম ভারতপথিক ছিলেন কবীর বা দাদূ সেরকম রামমোহনও ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্মচিন্তার পথ অবলম্বন করে সমসাময়িক দেশবাসীর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আস্বাদ তখনকার দিনে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এবং অল্প-সংখ্যক আরো কোনো কোনো শিক্ষার্থী পেতে আরম্ভ করেছে। এই নূতন আস্বাদের চমৎকারিতায় যারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাদের কাছে ভারতীয় চিন্তাধারার সম্পদ আবার জোর দিয়ে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন ছিল। রামমোহন এই কাজের ভার নিয়েছিলেন নিজের অন্তরের আগ্রহে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সমাজসংস্কার ইত্যাদি নানা দিকে পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহন শুধু ভারত-বর্ষের শাশ্বত পথের পথিকই ছিলেন না— যে পথে নিজে চলেছেন সে পথে অন্যকে আকর্ষণ করবার চেষ্টাও করেছিলেন, যেখানে পথ ছিল না সেখানে নূতন পথ খুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতপথিক রামমোহন বহু বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক, অনেক নূতন বিষয়ে আমাদের পথিকৃৎ।

স্বাভাবিক কারণেই দার্শনিক রামমোহন, আত্মীয় সভা, ইউনিটারিয়ান সোসাইটি, ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত কলেজের স্থাপয়িতা রামমোহন এবং সমাজ-সংস্কারক রামমোহনের দিকেই পরবর্তী কালের দৃষ্টি পড়েছে বেশি করে। স্কুলের ছাত্রও রামমোহনের নাম শুনলে ব্রাহ্মসমাজ ও সতীদাহ-নিবারণ প্রচেষ্টার উল্লেখ করতে পারে। রামমোহনের রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি সম্বন্ধে চিন্তাধারার সঙ্গে শিক্ষিত জনসাধারণের পরিচয় কম। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের বৃত্তি ইত্যাদির জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদনের জন্য রামমোহন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তাও অনেকেই জানেন। কিন্তু দুবছর ইংলণ্ডে থাকার সময়ে ভারতবর্ষের— বিশেষত পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে তিনি যে জ্ঞানগর্ভ ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন নিবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা অনেক সময় আমাদের বর্তমান যুগের আলোচনাতে অবহেলিত হয়।

অথচ, রামমোহনের রচনাবলী পড়লে এটা সহজেই বোঝা যায় যে ভারত-

বর্ষের আর্থিক সমস্যার বিশ্লেষণে এই ভারতপথিক অবিসম্বাদিত পথিকৃৎ। তথ্য সন্ধান ও বিশ্লেষণের যে দরজা তিনি খুলে দিয়েছিলেন, সে দরজা দিয়ে তাঁর পরে বহুদিন কেউ প্রবেশ করেন নি। উনিশ শতকের শেষ ভাগে যখন নওরোজী, রমেশ দত্ত ও রানাডের হাতে ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা নূতন জীবন লাভ করল তখন দেখা গেল যে, রামমোহনের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পঞ্চাশ বছর পরের চিন্তাধারার সাদৃশ্য অনেকখানি। দীর্ঘ ব্যবধানে চিন্তাধারার ইতিহাসে ধারাবাহিকতা অনায়াসেই ব্যাহত হতে পারত। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে হয় যে, রামমোহন থেকে দাদাভাই নওরোজীর বিবর্তন কোথাও বেশি অসংগত মনে হয় না।

রামমোহনের আগে কোনো ভারতীয় পণ্ডিত আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কিছু রচনা করেছিলেন বলে জানা নেই। প্রথম যুগের সংবাদপত্রে, বিশেষত 'সমাচারদর্পণে', অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধ থাকত। আর্থিক বিষয়ে বহু সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত বিশেষ প্রবন্ধ—'কৃষিকর্মের বৃদ্ধি', 'এতদ্দেশের বাণিজ্য', 'ক্লোনাইজেসিয়ান অর্থাৎ ইঙ্গরেজ লোকের এদেশে চাষবাস বিষয়ক', 'গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি','চরকাকাটুনির দরখাস্ত' ইত্যাদি নামাঙ্কিত প্রবন্ধের অনেক-গুলিই রামমোহনের নিবন্ধগুলির আগেই প্রকাশিত হয়েছিল— কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনো সুসম্বদ্ধ তাত্ত্বিক বা বিশ্লেষণী আলোচনা ছিল না। পরবর্তী যুগে ১৮৫০-এর কাছাকাছি সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে যে কয়েকটি অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, কিংবা তারও পরে 'সোমপ্রকাশ'-এর অসংখ্য আলোচনাতে যে সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, রামমোহনের যুগে সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় রামমোহনের কোনো ভারতীয় পূর্বসূরী ছিলেন না, এবং তাঁর উত্তরসূরীরা আত্মপ্রকাশ করেন তাঁর মৃত্যুর প্রায় চার দশক পরে। পথিক ও পথিকৃৎ রামমোহন তাঁর নিজের যুগে একাকিত্বে বিশিষ্ট।

অর্থনীতি বিষয়ে রামমোহনের যে রচনাগুলি আমরা পাই সেগুলি সবই ১৮৩১ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৮৩২-এর জুলাই মাস, এই এক বৎসর সময়ের মধ্যে লেখা। তখনকার নিয়ম অনুসারে প্রতি কুড়ি বৎসর পরে পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ নূতন করে পার্লামেণ্টে পাস করিয়ে নিতে হত— যে আইন দিয়ে সনদ নূতন করা হত তার নাম ছিল 'চার্টার অ্যাক্ট'। ১৮৩৩ সালে নূতন চার্টার অ্যাক্ট পাস করাবার আগে পার্লামেণ্ট থেকে একটি 'সিলেক্ট

কমিটি' নিযুক্ত হয়— গত কুড়ি বছরের কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সনদে কী কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে অভিমত দেবার জন্য। রামমোহন তখন লণ্ডনে উপস্থিত এবং তিনি সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার জন্য রামমোহন নিজে গিয়েছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে শ্রীমতী কলেট ও শ্রীমতী কার্পেণ্টার দুরকম মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অর্থনীতির গবেষকের সৌভাগ্যে রামমোহন কমিটির কাছে তাঁদের প্রেরিত দীর্ঘ প্রশ্নাবলীর লিখিত উত্তর পাঠিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন কয়েকটি পরিশিষ্ট প্রবন্ধ। এই প্রশ্নোত্তর ও নিবন্ধগুলি থেকেই আজকালকার পাঠক রামমোহনের অর্থনীতিচিন্তার স্বরূপ পরিষ্কার ভাবে অনুধাবন করতে পারেন।

এই প্রশ্নোত্তর ও নিবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩২ সালেই। এর কোনো-কোনোটি পরে পত্রপত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়, যেমন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়। ১৯৪৭-এ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলী প্রকাশ করেন। আরো সাম্প্রতিক কালে, ১৯৬৫ সালে কলকাতায় 'সোশিয়োইকনমিক রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট" এই-সব লেখা একত্র করে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের সম্পাদনায় 'রামমোহন রায় অন ইণ্ডিয়ান ইকনমি' প্রকাশ করেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই সংগ্রহটির উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করা হয়েছে— এবং যে সব উদ্ধৃতি বাংলা অনুবাদে দেওয়া হয়েছে তার মূল ইংরেজি এই সংগ্রহেই পাওয়া যাবে। এগুলি ছাড়া দু-একটি অন্য লেখারও খবর পাওয়া যায়— যেমন ১৮২৮ সালে জমিদারদের 'লাখেরাজ' সম্পত্তিগুলিকে কোম্পানির দখলে আনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্রগুলি। রামমোহনের লেখার সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলি -সম্পাদিত সোফিয়া ডবসন কলেট -রচিত রামমোহনের জীবনীগ্রন্থের পরিশিষ্টে। এই দীর্ঘ তালিকাতে অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনার সংখ্যা খুব কম।

সিলেক্ট কমিটির কাছে যে প্রশ্নোত্তর ও মন্তব্য-সংবলিত পরিশিষ্ট পাঠানো হয়েছিল সেগুলি হল : ১. ভারতের রাজস্ব সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর, ১৯ অগস্ট ১৮৩১ ; ২. রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিশিষ্ট, ১৯ অগস্ট ১৮৩১ ; ৩. বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ ; ৪. ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ ; ৫. বিচার ও রাজস্ব সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৮৩২ ; ৬. লবণের একচেটিয়া কারবার সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর, ১৯ মার্চ ১৮৩২ ; এবং ৭. ভারতে ইয়োরোপীয়দের বসবাস সম্বন্ধে নিবন্ধ, ১৪ জুলাই, ১৮৩২। শ্রীমতী

কার্পেণ্টারের মতে রামমোহন সিলেক্ট কমিটিতে মৌখিক সাক্ষ্যও দিয়েছিলেন, কিন্তু তার কোনো মুদ্রিত বা লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নূতন চার্টার অ্যাক্ট আইনে পরিণত হয় ১৮৩৩-এর ২০ অগস্ট। এই নূতন আইনের অনেক ব্যবস্থাই রামমোহনের মনঃপূত হয় নি। কিন্তু তাঁর বক্তব্য লিখে যাবার সময় তিনি পেলেন না। অল্পদিন পরেই, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজা রামমোহনের অর্থনৈতিক মতামতের মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমেই তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও সমকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর জন্ম-বৎসর সম্বন্ধে মতভেদের মধ্যে না গিয়ে আমরা যদি ১৭৭২ সালটিকেই গ্রহণ করি (১৭৭৪ হলে, সব হিসাব দু'বছর কম হবে), তা হলে দেখি যে, আমাদের দেশে রাজস্বব্যবস্থা নিয়ে যখন নানা রকমের পরীক্ষা চলেছে, তখন রামমোহন কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হচ্ছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রান্তকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম ফলাফল যখন দেখা যাচ্ছিল, রামমোহন তখন তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বৃদ্ধি করছেন। ১৭৭০ সালের (বাংলা সন ১১৭৬) 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' অসংখ্য শিশুমৃত্যুর ফলে কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে পূর্বভারতে পূর্ণবয়স্ক কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে জমিদারদের দেয় রাজস্ব হিসাবে যে টাকা স্থায়ী ভাবে স্থির করে দিলেন, সেটা তখনকার প্রজাদের দেয় মোট খাজনার প্রায় দশ ভাগের নয় ভাগ। কর্নওয়ালিসের আশা ছিল যে, জমির জন্য চাহিদা বৃদ্ধির ফলে জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা এবং নীট লাভ দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেখা গেল যে, জমিদাররা প্রজা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, খাজনা আদায় হচ্ছে না, বাকি রাজস্বের দায়ে জমিদারি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ১৭৯৯ সালে 'সপ্তম' ('হফ্‌তম') আইন তৈরি করে জমিদারদের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হল, যাতে তাঁরা সহজে প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারেন।

এই অবস্থাটা ছিল সাময়িক। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং তার ফলে চাষ-আবাদের প্রসারের ফলে জমিদাররা খাজনা বাড়াবার সুযোগ পেলেন। ১৮১২ সালে 'পঞ্চম' আইন পাস করে জমিদারদের ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করা হল এবং দশ বছর পরে, ১৮২২ এ, কোম্পানির সরকার রায়তদের সংগত খাজনা স্থির করে দেবার অধিকার গ্রহণ করলেন। কিন্তু রায়তের উপরে চাপ বেড়ে চলল বছরের পর বছর।

রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভূমিরাজস্ব বিভাগে কাজ করেন প্রায় দশ বছর। যতদূর জানা যায়, ডিগবি নামক একজন কালেক্টরের অধীনে তিনি কাজ আরম্ভ করেন হাজারিবাগ জেলার সদর রামগড়ে ১৮০৫ সালে— এবং পরে ডিগবির সঙ্গেই ভাগলপুর ও রংপুরে কাজ করেন ১৮১৫ পর্যন্ত। প্রথমে ছিলেন মুনসি, পরে সেরেস্তাদার এবং তারও পরে দেওয়ানের কাজে রংপুর জেলাতেই তাঁর দীর্ঘতম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ডিগবির কাছে রামমোহন ইংরেজি শেখেন এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই বিদেশী ভাষাতে এবং এই ভাষার মাধ্যমে নানা বিষয়ে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। ১৮১৬ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত কলকাতা শহরের সুপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক হিসাবে সমাজ-সংস্কারে, শিক্ষা-প্রসারে, ভারতীয় দর্শন-চর্চায়, নূতন ধর্ম-স্থাপনে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য হয়ে উঠল। এ-সবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি-চর্চা তিনি কিভাবে করেছিলেন তার কোনো নিদর্শন নেই, কিন্তু দু-একটি অনুমান বোধ হয় অসংগত হবে না।

রাজা রামমোহন যখন ডিগবির কাছে ইংরেজি শিখতেন তখন অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০)-এর 'ওয়েল্‌থ্‌ অভ্‌ নেশন্‌স্‌' প্রায় ত্রিশ বছরের পুরানো বই, কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের অবশ্যপাঠ্য। ম্যলথস (১৭৬৬-১৮৩৪) এবং রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩) ছিলেন রামমোহনের সমসাময়িক। ম্যলথসের জনসংখ্যা সম্বন্ধে বই প্রকাশিত হয় ১৭৯৮-তে এবং অর্থনীতির উপরে বইটি বেরোয় ১৮২০-তে; রিকার্ডোর প্রধান বই প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে। এ-সব লেখার সঙ্গে রামমোহন পরিচিত ছিলেন কি না তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই– কারণ গবেষকের পাদটীকা-কণ্টকিত রচনা তাঁকে করতে হয় নি এবং তাই অন্য কোনো লেখার উল্লেখও করতে হয় নি। কিন্তু, করনীতি বা মূলধন সঞ্চয় সম্বন্ধে যে দু-একটি মন্তব্য তিনি করেছেন এবং ইংলণ্ডের শিল্পজ্ঞান ও মূলধনের অংশভাগী হয়ে উত্তর-আমেরিকার উন্নতি সম্বন্ধে যে কথাগুলি মাঝে মাঝে বলেছেন তাতে মনে হয় স্মিথ ও রিকার্ডোর লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এটাও উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ এবং সামাজিক রীতিনীতি-সম্ভূত জনসংখ্যা-বৃদ্ধি এবং মহামারী ইত্যাদি কারণে সংখ্যাহ্রাস সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য তিনি করেছিলেন সেটা ম্যলথসেরই প্রতিধ্বনি।

১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ নূতন করে মঞ্জুর করার আগে ইংলণ্ডে একটি তথ্যানুসন্ধানী কমিটি নিয়োগ করা হয়— এই কমিটির পঞ্চম রিপোর্টে

(১৮১২) ভারতের ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছিল। এই রিপোর্ট রামমোহন নিশ্চয় সযত্নে পড়েছিলেন। ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে রামমোহন যে-সব মন্তব্য করেছিলেন তা থেকে মনে হয় ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত কোলব্রুকের 'হাজব্যানড্রি ইন বেঙ্গল' বইটিও তিনি পড়েছিলেন। ইংলণ্ডে বাসকালে জেরেমি বেন্থাম (১৭৮৪-১৮৩২)-এর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়েছিল এবং সম্ভবত সাক্ষাৎ আলোচনাও হয়েছিল। বেন্থামের লেখা চিঠিতে জেমস্ মিল-এর (১৭৭৩-১৮৩৬) উল্লেখ আছে– মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস ও তাঁর অর্থনীতি সম্বন্ধে বই রামমোহন পড়েছিলেন, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ী ও শিল্প-মালিকদের স্থায়ী বসবাস সম্বন্ধে রামমোহনের মতবাদে দ্বারকানাথ ঠাকুরের কিছু প্রভাব থাকতে পারে। এ-বিষয়ে ১৮২৯-এ দ্বারকানাথ যা লিখেছিলেন তার সঙ্গে ১৮৩১-এর রামমোহনের নিবন্ধের সাদৃশ্য অনেকখানি।

যে অর্থনৈতিক পটভূমিকাতে রামমোহনের মতবাদ গঠিত হয়েছিল তার সবচেয়ে বড়ো দিক ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা-সম্পর্কিত। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ১৮৩০ সালে ভারতের কুটিরশিল্প অবনতির পথে, কিন্তু আধুনিক শিল্প তখনো আরম্ভ হয় নি। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব ততদিনে প্রায় ষাট বছর ধরে চলেছে এবং বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে ইংলণ্ডের অগ্রগতি তখন চমকপ্রদ। ভারতবর্ষের কুটিরশিল্পজাত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির আমদানি ইংরেজ সরকার তখন বন্ধ করেছেন উঁচু হারে শুল্ক বসিয়ে— অন্য দিকে ভারতের বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় তখন আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। রেলপথ তখনো বহুদূরে—ষ্টিমার আসতেও কয়েক বছর দেরি। বহির্বাণিজ্য অবশ্য বাড়ছিল – বছরে পাঁচ বা ছয় কোটি টাকার রপ্তানি বা আমদানি তখনকার দিনের পক্ষে খুব কম ছিল না। আমদানি-রপ্তানির কাজে ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়েরাও লিপ্ত হয়ে উঠলেন— কেউ বিদেশী বণিকের মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ন রূপে, কেউ বা সরাসরি। দেশের অভ্যন্তর থেকে বন্দর পর্যন্ত এবং বন্দর থেকে বিদেশে চালান পর্যন্ত জিনিসের চলাচল সহজ করবার জন্য প্রয়োজন হল ব্যাঙ্কের এবং এজেন্সি হাউসের। বিদেশী ব্যাঙ্কের ধরনে দেশী ব্যাঙ্কও স্থাপিত হল, যেমন ১৮২৯-এ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বেশি দিন চলে নি, কিন্তু ১৮০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল' এখনো জীবিত আছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মধ্যে— ১৯২১-এ তিনটি 'প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক'কে

যুক্ত করে ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক গঠিত হয় এবং ১৯৫৫-তে সেই ব্যাঙ্কেরই নূতন নামকরণ হয় 'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'।

শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে কলকাতায়, যে নবজাগ্রত শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠল তারা কোম্পানির সরকারের চাকুরিয়া, নূতন ধরনের ব্যবসায়ী এবং গ্রামের জমিদারির 'অনুপস্থিত' শহরবাসী মালিক। রামমোহন এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যেই পড়েছিলেন, অন্তত ১৮১৬ সালের পর থেকে— যখন তিনি জমিদারি সম্পত্তি ক্রয় ক'রে রংপুরের চাকরি ছেড়ে কলকাতাতে বসবাস আরম্ভ করলেন। তাঁর লেখাতে আমদানি রপ্তানি, সরকারি ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা উল্লেখ থাকলেও, প্রধানত তিনি ভূমি ও কৃষির সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল যে, এই আলোচনাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কৃষকপ্রজার অনুকূলে, জমিদারদের নানা প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে। জমিদারের দেয় রাজস্ব কমাবার প্রস্তাব তিনি অবশ্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সহানুভূতি কোন্ দিকে ছিল সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সিলেক্ট কমিটির কাছে তাঁর প্রতিবেদনে রামমোহন তখনকার দিনের শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছিলেন, অনেক খুঁটিনাটি সহ। তাঁর দেওয়া হিসাব অনুসারে, কলকাতাতে তখন মিস্ত্রি-জাতীয় শ্রমিকের আয় ছিল মাসে দশ টাকা থেকে বারো টাকা, এবং সাধারণ শ্রমিকের সাড়ে তিন টাকা থেকে চার টাকা। অন্য শহরে এর চেয়ে কম, এবং গ্রামাঞ্চলে আরো অনেক কম। জিনিসপত্র অবশ্য শস্তা ছিল, কিন্তু রামমোহনের অভিজ্ঞতায় বঙ্গদেশের দরিদ্র শ্রেণী ভাত আর নুন ছাড়া আর কোনো আহার্য প্রায় পেতই না। একটি পূর্ণবয়স্ক লোকের দিনে প্রায় আধসের থেকে তিন পোয়া চাল প্রয়োজন হত। বাড়ি ছিল মাটি, খড় এবং নলখাগড়া দিয়ে তৈরি। পরিধেয় বস্ত্র ছিল নামমাত্র। শিক্ষা ধনীশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে নানা প্রকার সংস্কার থাকা সত্ত্বেও তারা সরল ও নীতিপরায়ণ ছিল।

এই বর্ণনার পটভূমিকায় রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তের দুর্গতির চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। জমিদারেরা তখন প্রজার খাজনা বাড়াতে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং কৃষকদের যে-সব অধিকার ১৭৯৩ সালের আগে সর্বত্র মেনে চলা হত সেগুলিও খর্ব করেছিলেন। যে-সব চাষী নিজের গ্রামের জমি চিরাচরিত ভাবে চাষ করত সেই-সব 'খুদকাশ্‌ত্‌' চাষীর

অধিকার সংরক্ষণের আশা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু জমিদারেরা সে আশা সফল করেন নি। রায়ত খাজনা দিতে দেরি করলে কিভাবে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা হত তার বর্ণনা রামমোহন দিয়েছিলেন। আর বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে জমিদারেরা চাষীর উৎপন্ন ফসলের দামের অর্ধেক নিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন, বাকি অর্ধেক থেকে চাষীকে বীজ ও কৃষির অন্য সব ব্যয় নির্বাহ করে জীবনযাত্রার সম্বল খুঁজতে হত। উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য-নির্ধারণে চাষী সুবিচার পেত না। এই ব্যবস্থায় চাষীর পক্ষে জীবন ধারণই শক্ত ছিল, সঞ্চয়ের তো কথাই ওঠে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করবার সময়ে আশা করা হয়েছিল যে, প্রথমত, জমিদারেরা পতিত জমিতে কৃষি সম্প্রসারণ করে উৎপাদন বাড়াবেন এবং নিজেরাও লাভবান হবেন; দ্বিতীয়ত, যে সব জমিতে চাষ হচ্ছিল, সেগুলিরও উন্নতি করা হবে; তৃতীয়ত, জমিদারেরা রাজস্বের পরিমাণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হবে; এবং চতুর্থত, কোম্পানি সরকারও রাজস্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকবেন। রামমোহন দেখালেন যে, তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দেশ্য যদিও সফল হয়েছিল, প্রথম দুইটি উদ্দেশ্য চার দশকের মধ্যে বিফল প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি আরো বললেন যে, কৃষির যেটুকু উন্নতি ও সম্প্রসারণ হয়েছিল তার কৃতিত্ব জমিদারের নয়, কিন্তু তার থেকে লাভটা পুরোপুরি ভাবেই জমিদারের ভোগে এসেছিল—কৃষক বা সরকার এই লাভের অংশ পান নি।

এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে রামমোহনের মত ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তাঁর মতে ভূমিব্যবস্থায় তিন পক্ষেরই অধিকার সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন—শান্তিরক্ষা ইত্যাদির বিনিময়ে রাজস্ব-প্রাপ্তিতে সরকারের অধিকার; স্থিরীকৃত রাজস্ব দেবার বিনিময়ে জমিদারের খাজনা আদায়ের অধিকার; এবং জমি চাষ করে উৎপন্ন আয়ের পর্যাপ্ত অংশ লাভে চাষীর অধিকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই তৃতীয় অধিকারটি স্বীকৃত হয় নি। রামমোহন তীব্র ভাষায় বলেছিলেন—'আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, যে অধিকার জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল, সে রকম অধিকার প্রজারা কেন পাবে না, তাদের দেয় খাজনা স্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত হবে না কেন, কেনই বা সহৃদয় সরকার এখনো রায়তের খাজনা বর্তমানে প্রদত্ত পরিমাণ অনুসারে স্থির করে দেবেন না, কেন ভবিষ্যতে খাজনা-বৃদ্ধি শক্ত-হাতে নিষিদ্ধ করা হবে না।'

রামমোহন যা চেয়েছিলেন তা অবশ্য তখন করা হয় নি—এবং কখনোই করা

হয় নি। খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রথম কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয় রামমোহনের মৃত্যুর ছাব্বিশ বছর পরে ১৮৫৯-এ— এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস করা হয় তারও প্রায় ৩৬ বছর পরে। রায়তের খাজনা বৃদ্ধির হার কমানোর চেষ্টা অবশ্য অনেক হয়েছিল, কিন্তু জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো প্রজার সঙ্গেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবার প্রস্তাব পরে কেউ গ্রহণ করেন নি। উনিশ শতকের শেষ দিকে গ্রন্থকারের নামহীন একটি বড়ো বই বেরোয় বঙ্গদেশের জমিদারি প্রথা সম্বন্ধে। এই বইটিতে রামমোহনের প্রস্তাব সমর্থন করা হয়েছিল, কিন্তু এ-প্রস্তাব নিয়ে আর বেশি অগ্রসর কেউ হয় নি। এর একটা সংগত কারণ ছিল, যেটা রামমোহনের সময়ে ঠিক পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি। রায়তকে কোনো রকমের স্থায়ী স্বত্ব দিলে পরিণামে অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে আইন অনুসারে যিনি রায়ত, তিনি আবার তাঁর নীচে অন্য রায়ত সৃষ্টি করেছেন এবং কখনো কখনো এইভাবে ধাপে ধাপে বহু স্তরের প্রজার সৃষ্টি হয়েছে (উনিশ শতকের শেষে বাখরগঞ্জ জেলায় প্রায় পঞ্চাশ ধরনের রায়ত বা প্রজা ছিল)। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত জমি যে চাষ করে সেই সর্বনিম্নস্তরের চাষীকে রামমোহন-প্রস্তাবিত স্থায়ী খাজনার সুবিধা যদি দিতে হয়, তা হলে প্রত্যেক স্তরেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। এর প্রশাসনিক জটিলতা যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয়। তাই পরবর্তী কালের ভূমিনীতি-নির্ধারকেরা প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে আরো অনেক ধাপের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যোগ না করে, কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থাটাকে তুলে দেওয়াই সহজ ও সংগত মনে করলেন। এতে রামমোহনের কৃতিত্ব কমে নি— যুক্তির দিক থেকে তাঁর বক্তব্যে কোনো ফাঁক নেই; আর ১৮৩১ সালে বসে ভবিষ্যতের ভূমিব্যবস্থা কী রূপ নেবে তা বুঝতে না পারাও অস্বাভাবিক নয়। রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব তদানীন্তন অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনে।

প্রজার দেয় খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন এ প্রস্তাবও করেছিলেন যে, জমিদারদের দেয় রাজস্বও অনেক ক্ষেত্রে কমানো উচিত, এবং পূর্বাঞ্চলের বাইরে যে-সব এলাকায় প্রজারা সরকারকে সরাসরি খাজনা দিত তাদের দেয় টাকাও কমানো সংগত; জমিদারের উপরে রাজস্বের বোঝা যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি ছিল তার প্রমাণ হিসাবে বর্ধমানের জমিদারির উল্লেখ করেছিলেন— ১৮৩০ সালেও বর্ধমান-রাজের আদায়ী খাজনার পরিমাণ ছিল ৪৮ লক্ষ টাকার অনধিক এবং সরকারকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। বর্ধমানের নজির অবশ্য অন্যত্র প্রযোজ্য ছিল না— যখন

এটা জানা ছিল যে, নানা কারণে কোম্পানির দেওয়ান এই জমিদারির রাজস্ব একটু বেশি করেই ধার্য করেছিলেন।

রায়তের দেয় খাজনা যদি আর না বাড়ানো হয় এবং জমিদারের দেয় রাজস্ব যদি কিছুটা কমানো হয়, তা হলে কোম্পানি-সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি পড়তে পারে, এ কথা রামমোহন স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানির সনদ কুড়ি বছরের জন্য নূতন করে মঞ্জুর করা হল তখন কোম্পানির ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির প্রশাসনিক ('টেরিটোরিয়্যাল') আয়-ব্যয় ও ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পূর্ণ পৃথক করতে বলা হয়েছিল। রামমোহন যখন সিলেক্ট কমিটির কাছে তাঁর বক্তব্য পাঠাচ্ছেন তখন কোম্পানি-সরকারের দেশ-শাসনের ব্যয় বছরে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা এবং তার মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ভূমিরাজস্ব থেকে পাওয়া। ভূমি-রাজস্ব কমানো হলে মোট সরকারি আয়ে ঘাটতি পড়ত সরাসরি। রামমোহন প্রস্তাব করলেন যে, সরকার আয় বাড়াতে পারবেন বিলাসদ্রব্য ও অন্যান্য 'অপ্রয়োজনীয়' জিনিসের উপর শুল্ক বসিয়ে এবং ব্যয় কমাতে পারবেন ইংরেজ কর্মচারীর জায়গায় ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত ক'রে। তখনকার দিনে শুল্ক বসানো হত সাধারণত লবণ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপরে— বেশি রাজস্বের আশায়। রামমোহনই সম্ভবত আমাদের দেশে প্রথম প্রস্তাব করলেন যে, বিলাসদ্রব্যের উপরে কর বসানো হোক। বিলাসদ্রব্যের ব্যবহারীর সংখ্যা কম, কিন্তু তাঁদের আয় অনেক এবং শুল্ক-জনিত মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাঁদের ব্যয় না কমাবারই সম্ভাবনা। আজকের দিনে অর্থনীতির ছাত্র লক্ষ্য করতে পারেন যে, ভারতবর্ষে সরকারি আয়ের সবচেয়ে বড়ো অংশ আসে নানাপ্রকার উৎপাদন ও বিক্রয়-শুল্ক থেকে। এ ক্ষেত্রে রামমোহন-প্রদর্শিত পথে আমরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছি।

রামমোহন অবশ্য বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সরকারি ব্যয় কমানোর উপরে। তাঁর মতে ব্যয় কমানোর সহজতম এবং একান্তভাবে প্রয়োজনীয় উপায় ইংরেজ কর্মচারীর বদলে যথাসম্ভব ভারতীয় নিয়োগ। একটি পরিসংখ্যান তালিকা তৈরি করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ১৮২৭ সালে উঁচু পদের প্রশাসনিক, সামরিক ও চিকিৎসা-বিভাগীয় ১৩০৬ জন ইংরেজ কর্মচারীর জন্য মোট খরচ হয়েছিল দুই কোটি টাকার একটু বেশি—অর্থাৎ, গড়পড়তা প্রতি কর্মচারীর জন্য বার্ষিক ১৫,৫০০ টাকা। তখনকার দিনের মূল্যমানের তুলনায় একজন কালেক্টরের

মাসিক এক হাজার থেকে পনেরো শত টাকা বেতন খুবই বেশি। পূর্বে উল্লিখিত শ্রমিকের মাসিক সাড়ে তিন টাকা বেতনের সঙ্গে তুলনা না করলেও বলা যায় যে, সমান স্তরের ভারতীয়দের থেকে ইংরেজ কর্মচারীর আয় অনেক বেশি ছিল এবং সমান স্তরের ইংরেজ কর্মচারীরাও তাঁদের স্বদেশে এর চেয়ে অনেক কম টাকা পেতেন।

কালেক্টররা যে কাজের জন্য বেতন পেতেন, রামমোহনের অভিজ্ঞতায় তার প্রায় সবটাই অধস্তন ভারতীয় কর্মচারীদের দিয়ে করানো হত। তাঁর মতে মাসিক তিনশো থেকে চারশো টাকা বেতনের সুযোগ্য ভারতীয় কর্মচারীদের হাতে এই-সব কাজের ভার দিলে কাজ ভালো হবে এবং ব্যয়ও শতকরা আশি ভাগ কমে যাবে। অবশ্য সামরিক বিভাগে বা খুব উঁচু পদগুলিতে ইংরেজ নিয়োগ কমানো সম্ভব হত না, কিন্তু রামমোহন জোর দিয়ে প্রস্তাব করেছিলেন যে, কালেক্টরের কাজ আর বিচারকের কাজ ভারতীয়দের হাতেই দেওয়া উচিত এবং কালেক্টরদের হাত থেকে বিচারের ক্ষমতা তুলে নেওয়া উচিত।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস রামমোহন-প্রস্তাবিত 'ভারতীয়করণ' তদানীন্তন আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি বলে গ্রহণ করেন— এবং অতি সাম্প্রতিক কালে প্রশাসন ও বিচারকে আলাদা করবার কর্মপন্থা আমরা গ্রহণ করেছি। ইংরেজ কর্মচারীর পেনসন ইত্যাদির আলোচনা করতে গিয়ে রামমোহন এমন আর-একটি বিষয়েও আলোকপাত করেন, যেটি পরবর্তী যুগের আলোচনাতে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। রামমোহন তখনকার একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের ও একজন অডিটর-জেনারেলের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে দেখান যে কোম্পানির ভারতীয় রাজস্ব থেকে বছরে প্রায় তিন কোটি টাকা ইংলণ্ডে খরচ হত— বোর্ড অভ্ কন্ট্রোল আর ইণ্ডিয়া হাউসের ব্যয় নির্বাহে, ইংরেজ কর্মচারীর ছুটির বেতন, পেনসন ইত্যাদির খরচ মেটাতে, লণ্ডনে ধার-করা টাকার সুদ দিতে এবং সরকারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। এ ছাড়া অন্য একটি হিসাব অনুসারে ভারতে কর্মরত ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁদের পারিবারিক ব্যয়-নির্বাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনে বছরে প্রায় দুই কোটি টাকা নিজেদের দেশে পাঠাতেন। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যে বিরাট লাভের টাকা দেশে পাঠাতেন কিংবা অবসর গ্রহণের সময় যে বিরাট সঞ্চয় সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন তার হিসাব রামমোহন দেন নি।

পরবর্তী যুগে দাদাভাই নওরোজি প্রমুখ অনেকে এই জাতীয় 'ইকনমিক ড্রেন'

বা আর্থিক বহিঃস্রোতের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। নওরোজির বিশ্লেষণ রামমোহনের বিশ্লেষণেরই পুনরুজ্জীবন। ড্রেন-সম্বন্ধীয় যুক্তিতে কিছু ফাঁক থাকলেও এটা রামমোহনের যুগ থেকে আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত ঠিকই বলা যেত যে, আমাদের দেয় 'হোম চার্জ' এবং বিলাতের অন্যান্য খরচের মধ্যে অনেকটা অংশই পরাধীনতার দাম— নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করতে পারলে এই বহিঃস্রোত অনেকটা কম হতে পারত। অবশ্য, বহির্বাণিজ্যে সমতা রক্ষা বা টাকা ও পাউণ্ডের মধ্যে বিনিময়ের হার সম্বন্ধে আলোচনা রামমোহন করেন নি; তাঁর যুক্তির সবটা জোরই দেওয়া হয়েছিল ব্যয়-সংক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপরে।

ভূমি-ব্যবস্থা, সরকারি আয়ব্যয়, অযৌক্তিক বিদেশী খরচ— এই-সব আলোচনার পরে রামমোহন প্রস্তাব করলেন যে, ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে এসে বসবাস করবার সুবিধা করে দেওয়া হোক। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ আরো অনেকে তখন এই মতই প্রকাশ করেছিলেন। রামমোহনের যুক্তি ছিল যে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইংরেজ কৃষি-শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নত আধুনিক পন্থা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে; আনবে তাদের মূলধন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করবে; দরকার হলে সরকারকে সামরিক সাহায্য দেবে। এর অসুবিধার দিকটাও তাঁর নজর এড়ায় নি। ইয়োরোপীয় বাসিন্দারা একটা উচুস্তরের অধিকার দাবি করে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে, দরিদ্র জনসাধারণকে নানাভাবে শোষণ করতে পারে এবং এ-সবের ফলে অনেক রকম আর্থিক ও সামাজিক সংঘর্ষের উৎপত্তি হতে পারে। তিনি এও বলেছিলেন যে, হয়তো পরবর্তী কালে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী ভারতীয়েরা এই-সব ইয়োরোপীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা দাবি করতে পারে। অন্য অসুবিধাগুলিকে রামমোহন খুব বেশি গুরুত্ব দেন নি। স্বাধীনতার সম্ভাব্য দাবি সম্বন্ধে কানাডার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, ভারতে এরকম দাবি সম্ভবত উঠবে না; আর যদি ওঠে, তা হলেও এদেশে অনেক 'ইংরাজী ভাষা ভাষী খৃষ্টান ইউরোপীয়' থেকে যাবে। রামমোহনের এ সম্বন্ধে লেখা খুঁটিয়ে পড়লে সন্দেহ হয় যে, তাঁর মনের অন্তস্তলে শিক্ষিত ভারতীয় ও স্থায়ী ইয়োরোপীয় বাসিন্দাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা অবাঞ্ছিত ছিল না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই।

পরবর্তী যুগে ভারতীয় অর্থনীতিবিদেরা রামমোহনের অনেক প্রস্তাবই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভারতে ইংরেজ বসবাস-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব কখনো উচ্চারণও করেন নি। তার প্রধান কারণ, উনিশ শতকের শেষে ইয়োরোপীয় 'কলোনাইজেশন'-এর ফলাফলের দৃষ্টান্ত ছিল উত্তর-আমেরিকা নয়, দক্ষিণ ও পূর্ব-আফ্রিকা। বস্তুত, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকখানিই আফ্রিকার উপনিবেশ-সমস্যার প্রতিধ্বনি। রামমোহন ভেবেছিলেন, উত্তর-আমেরিকাতে ইংলণ্ডের মূলধন ও শ্রমশিল্প গিয়ে যেভাবে আর্থিক উন্নতি সম্ভব করেছিল এবং যেভাবে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভব হয়েছিল সেভাবে ভারতেও দ্রুত উন্নতি আনা সম্ভব হবে। তাঁর আশা ছিল যে স্থায়ী ইযোরোপীয় বাসিন্দা আর শিক্ষিত ভারতবাসী একজাতি হয়ে যাবে। এটা হয়তো তখনকার দিনের সমাজের উপর-তলার শ্রেণীর মনোভাব। আফ্রিকাতে পরে কী হবে সেটা রামমোহন অবশ্য অনুমান করতে পারেন নি, কিন্তু আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের স্থান তখন কোথায় ছিল সেটাও তাঁর নজরে পড়ে নি। সম্ভবত, তাঁর মনে হয়েছিল যে আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের চেয়ে শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংরেজের সহযোগী হিসাবে সহজে গৃহীত হবে। এটাও আশ্চর্য যে, স্থায়ী বসবাসকারী ইংরেজ ব্যবসায়ীর দ্বারা ভারতীয়দের শোষণের সম্ভাবনাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন নি, যদিও নীলকরদের অনাচারের কাহিনী তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়।

রাজা রামমোহনের সমস্ত মতবাদ ও প্রস্তাব কালের বিচারে গ্রহণীয় হয় নি, কিন্তু এটা খুব বড়ো কথা নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁর হাতে ভারতের অর্থনীতি-আলোচনা একটা বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করল। এও উল্লেখযোগ্য যে তাঁর সমস্ত প্রস্তাবের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ যোগসূত্র ছিল— প্রত্যেকটি প্রস্তাব একসঙ্গে এক চিন্তাধারায় গ্রথিত ছিল। যদি জমিদারের রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তা হলে চাষীর খাজনারও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক। যদি চাষীর খাজনা আর না বাড়ানো হয়, তা হলে জমিদারের দেয় রাজস্ব কিছু কমানো হোক। যদি এর ফলে সরকারি আয়-ব্যয়ে ঘাটতি পড়ে, তা হলে নতুন শুল্ক বসানো হোক এবং ভারতীয় কর্মচারী অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করে ব্যয় কমানো হোক। ব্যয় কমানো হোক দেশের প্রশাসনে, ব্যয় কমানো হোক বিদেশে পেনসন সুদ ইত্যাদির অপচয় হ্রাসে। দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি করা হোক দ্রুত হারে এবং এর জন্যে ইংরেজদের এখানে আমন্ত্রণ করা হোক প্রশাসক রূপে নয়, আর্থিক

উন্নতির পথপ্রদর্শক স্থায়ী বাসিন্দা রূপে। যুক্তিধারা চলে এসেছে অবারিত ভাবে, এক ধাপ থেকে আর-এক ধাপে। এখানেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী মনের পরিচয়।

উপসংহারে একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই আলোচনায় রামমোহনের যে লেখাগুলির উপরে নির্ভর করা হয়েছে সেগুলি একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু এগুলি আরো সহজপ্রাপ্য হওয়া উচিত। অধ্যাপক সুশোভন সরকার -সম্পাদিত রামমোহনের অর্থনীতি-সংক্রান্ত রচনা-সংগ্রহের সুলভ সংস্করণ আমাদের ছাত্র ও গবেষকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। তা ছাড়া, হয়তো অনুসন্ধান করলে এই রচনাগুলি ছাড়াও অন্য রচনা পাওয়া যেতে পারে। ১৮৩১ সালে সহসা প্রায় ষাট বৎসর বয়সে রামমোহন যে সুচিন্তিত ও সুসম্বদ্ধ রচনাগুলি লেখেন, তার আগে কোনো প্রস্তুতি ছিল না এটা বিশ্বাস করা কঠিন। এবং লেখাতে যাঁর কার্পণ্য ছিল না, তিনি অর্থনীতি সম্বন্ধে আগেই লিখেছেন এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। দেশের এবং ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকায়, নানা পণ্ডিত-জনের সঙ্গে চিঠিপত্রে, সরকারের কাছে আবেদন ও প্রতিবেদনে রামমোহনের অর্থনৈতিক মতবাদের প্রাক্-১৮৩১ সাক্ষ্য খুঁজলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। এদিকে অনুসন্ধিৎসু গবেষক যাতে অগ্রসর হতে পারেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলি সে সম্বন্ধে অবহিত হবেন এটা আশা করা বোধ হয় অন্যায় হবে না। রামমোহনের জন্মের দ্বিশতবার্ষিকীতে তাঁর স্মরণে সবচেয়ে বড়ো কাজ হবে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সব দিক নিয়ে গবেষণার পথ পূর্ণতর ও প্রশস্ততর করে তোলা; এর মধ্যে বিশেষ করে প্রয়োজন অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে রামমোহনের দান সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও আলোচনা।

রামমোহনের দৃষ্টিতে খৃস্ট ও খৃস্টধর্ম

পি. ফার্লো

"প্রকৃত ধার্মিকজন তারা-ই, যারা সত্যনিষ্ঠা ও
আধ্যাত্মিকতা নিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করে।"

[খৃস্ট যীশুর উক্তি]

সর্বপ্রথমে আমি আন্তরিকভাবে সেই সত্যনিষ্ঠ ও অধ্যাত্মসন্ধানী মহাপুরুষ রামমোহনকে শ্রদ্ধা জানাই, যাঁর প্রেরণাদান ও সাধনা ভারতের সনাতন ধর্মের ইতিহাসে এক নবযুগ আনয়ন করেছিল। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা ধর্মপ্রাণ চিন্তানায়ক এবং উদারমনা অক্লান্ত কর্মযোগী। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি দ্বিধাহীন আস্থা রেখে বিভিন্ন দেশ ও জাতির শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি পাঠ করতেন; নিত্য-জিজ্ঞাসু মন নিয়ে মুসলমান সুফী, বৌদ্ধ মহাযানী দার্শনিক ও পাশ্চাত্ত্য জগতের অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী মনীষীদের বই আর তাত্ত্বিক নিবন্ধ পড়তে পড়তে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার সম্ভার সমৃদ্ধতর ক'রে চলতেন। সেই উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণের যেমন কোনো প্রকার জাত্যভিমান ছিল না, তেমনি ছিল না কোনো সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের উগ্রতা। রামমোহন মানবতাবাদী ছিলেন ব'লে তাঁর মনোভাবে নিহিত ছিল এক আশ্চর্য বিশ্বজনীন অনুপ্রেরণা। পরব্রহ্মের উপাসক হয়ে তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষকে একই বৃহৎ "আত্মীয় সভা"র সদস্য, একই পরম পিতার সন্তানরূপে দেখতেন।

রামমোহন যীশু খৃস্টকে অসাধারণ ধর্মপ্রবক্তা ব'লে মেনে থাকতেন। খৃস্ট যে ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন সকল মানুষের সামনে এক উৎকৃষ্ট নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শ উপস্থিত করবার জন্য, এই কথা রামমোহন সর্বান্তঃকরণে মানতেন। *The Precepts of Jesus* নামে ১৮২০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে রামমোহন সুস্পষ্ট ভাষায় খৃস্টের উপদেশ-সমূহ ও খৃস্টের ব্যক্তিগত জীবন সাধনার অনন্ত মূল্য ও শ্রেষ্ঠতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। তাঁর দৃঢ় ধারণাও ব্যক্ত করেন যে, তৎকালীন ভারতীয় সমাজজীবনের শোচনীয় নৈতিক অবনতি এবং হিন্দু ধর্মসাধনার সাময়িক গ্লানির প্রতিকার করতে হলে খৃস্টের *Precepts* খুবই উপকারী হবে। তাতে সর্বজনগ্রাহ্য একেশ্বরবাদ (*monotheism*) বিদূরিত করবে প্রচলিত পৌত্তলিকতা-জনিত অনেক কুসংস্কার;

খৃস্ট-প্রচারিত মানবসেবার আদর্শ ও জাতি-শ্রেণী-নির্বিশেষে ঈশ্বর-সন্তান ব'লে সকল মানুষের সমান মৌলিক যোগ্যতার স্বীকৃতি দূর করবে জাতিভেদ-জনিত হিন্দু সমাজের অনৈক্য ও দুর্বলতা। খৃস্টধর্ম না হোক, স্বয়ং খৃস্টেরই বাণী রামমোহনের মতে এক দেশ-কালাতীত সর্বজনীনতার দাবি রাখে। যুক্তি-সংগত, সুষ্ঠু ও উন্নত নীতিবোধ-সহায়ক, বাহ্য আনুষ্ঠানিকতা-প্রতিকূল ও আন্তরিক সত্যনির্ভর আত্মনিবেদন-পরিপোষক, *The Precepts of Jesus* রামমোহনের গভীর শ্রদ্ধার বস্তু ছিল।

রামমোহন খৃস্টের শিক্ষায় শ্রদ্ধান্বিত হয়েও প্রচলিত খৃস্টধর্মেরই সমালোচনা করতেন, যেহেতু তাঁর মতে খৃস্টের প্রকৃত বাণীর অর্থ বিকৃত ক'রে খৃস্টধর্মাবলম্বীরা একেশ্বরবাদ পরিত্যাগ করেছে। তাঁর মতে খৃস্টবিশ্বাসীরা পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মা নামে ভিন্ন ভিন্ন তিনজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরত্বের সমান অধিকারী ব'লে প্রচার ক'রে পরব্রহ্মের অখণ্ড ও অপার ঐক্যের মধ্যে বহুদেববাদ প্রক্ষিপ্ত করেছে; তারা অযৌক্তিকভাবে ত্রিত্ববাদ প্রবর্তন ক'রে আর যীশুর উপর দেবত্ব আরোপ ক'রে পৌত্তলিকতার মারাত্মক দোষে কতকটা দোষী হয়েছে। তা ছাড়া যীশুর চরিতকার খৃস্টধর্মী লেখকরা নানান অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনা ও কাজের বিবরণে যীশুর বাস্তব ও ঐতিহাসিক জীবনবৃত্তান্ত বহুলাংশে পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত করেছে। রামমোহনের মতে, যীশুখৃস্ট সকল মানুষের পক্ষে একটি মহৎ মানবীয় জীবনের আদর্শ-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন কিন্তু তিনি ঈশ্বর ও পাপকলঙ্কিত মানুষের মধ্যে পুনর্মিলনকারী 'মধ্যস্থ' ছিলেন, তা নয়। বিধাতা পরমেশ্বরের অনুগত সন্তান আর নির্ভীক সেবক ও সাক্ষীরূপে যীশু তাঁর সর্বজনীন বাণী প্রচার করেছিলেন নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে, তাতেই তাঁর অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা ও চারিত্রিক মাহাত্ম্যের প্রমাণ প্রদর্শিত হয়েছে কিন্তু খৃস্টধর্মীদের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবাদী রামমোহন একমত হতে পারেন নি এই ঐতিহাসিক তথ্যের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে। তিনি মনে করতেন যে, এই ব্যাখ্যা যুক্তিসংগত নয় এবং এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ন্যায্য বিচার, সীমাহীন দয়া ও কারুণ্যের সত্যকার উপলব্ধির বিরোধী। একটি নির্দোষ মানুষের দুঃখসহনে অপর একজন বা বহুজন পাপী মানুষের পাপ থেকে ক্ষমা লাভ হবে, তা কি যুক্তিসংগত ও সুবিচার-সাপেক্ষ? ধার্মিকের রক্তপাত ছাড়া ঈশ্বর কি পাপীকে নিজ করুণাগুণে উদ্ধার করতে পারেন না? যীশুর পুনরুত্থান ও তাঁর স্বর্গারোহণ ঘটনা দুটির কি অকাট্য প্রমাণ আছে?

প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের মতে এই-সমস্ত প্রশ্ন সন্দেহ ও তর্কবিতর্কের কথা একরকম অবান্তর ছিল। তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মুখ্য কথা ছিল খৃস্টের স্বরূপ নির্ণয় কিংবা খৃস্টধর্মীদের বিশ্বাসের বস্তুতন্ত্রী সত্যাসত্যের বিচার নয় কিন্তু খৃস্টের বাণী ও উপদেশের বিশ্বজনীন নৈতিক উপযুক্ততা ও উপকারিতার ঘোষণা। তাঁরই মতে ধর্মবিশ্বাস বড়ো কথা নয়, ধার্মিকতাই বড়ো কথা। বিশ্বাস, অবিশ্বাস নিয়ে ঐ সমস্ত চিন্তাতীত ও রহস্যময় তত্ত্বের আলোচনা বাদ দিয়ে মানুষ খৃস্টের আদর্শের অনুসারে আচরণ করলেই তবে সকলের মধ্যে শান্তি ও প্রীতিপূর্ণ আত্মীয়তা এবং মানবোচিত যুক্তিসম্মত ঐক্য বিরাজ করবে। যীশুখৃস্ট যে "কে" বা 'কী" ছিলেন, তা সর্বাগ্রে অবধানযোগ্য নয়। তিনি যে তাঁর বাণীপ্রচারে ও ব্যক্তিগত আচারব্যবহারে কোন্ শিক্ষা মানুষকে দান ক'রে গিয়েছিলেন, সেটাই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন।

রামমোহনের এই ভাবধারা যথোচিত উদারতা ও পরমত-সহিষ্ণুতার সঙ্গে আলোচনা না ক'রে শ্রীরামপুরের খৃস্টান মিশনারিরা তার প্রতিবাদ ও আক্রমণাত্মক প্রত্যাখ্যান করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্যই খৃস্ট ও খৃস্টধর্মের সম্বন্ধে রামমোহনের সকল মতামত মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ভগবানের কল্পনাতীত ও বোধাতীত ভালোবাসার রহস্যময় সত্য কোনো যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না ব'লে তা অযৌক্তিক বা যুক্তি-বিরোধী নয় বরং যুক্তির অতীত। "বিশ্বাসে পাইবে, তর্কে বহু দূর।" খৃস্টের নাম ও বাণীর বিশ্বাসী প্রচারকেরা যুক্তিবাদী দার্শনিকের সঙ্গে একমত হবেন কেমন ক'রে? রামমোহনের প্রশংসিত বিশুদ্ধ নীতির উপদেষ্টা খৃস্ট এবং ঐকান্তিক ভক্তি ও বিশ্বাসে সমর্পিতপ্রাণ পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী মানুষের খৃস্ট একই অর্থে খৃস্ট নন। বাইবেলের ভাষায় খৃস্ট শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ছিল "অভিষিক্ত", পরমেশ্বরের দ্বারা প্রেরিত ও ঐশ প্রসাদে অভিষেকপ্রাপ্ত প্রভু আর মুক্তিদাতা। রামমোহনের ব্যাখ্যা অনুসারে খৃস্ট এই অর্থে মুক্তিদাতা যে, তিনি তাঁর উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রচারের দ্বারাই মানুষের মনকে উদ্‌বুদ্ধ ও কুসংস্কার-মুক্ত করার প্রয়াসী ছিলেন। বিশ্বাসী অনুগামী শিষ্যের পক্ষে খৃস্টের দ্বারা প্রদত্ত ও খৃস্টভক্তের বিশ্বাসলভ্য মুক্তির অর্থ-ই নবজীবনদান, নবজীবনলাভ— কেবলমাত্র শিক্ষাদান, শিক্ষালাভ নয়।

কিন্তু রামমোহনের *The Precepts of Jesus* বইটার তীব্র সমালোচক হয়ে মার্শম্যান সাহেব প্রভু যীশুর একটি মূল্যবান কথা ভুলে গিয়েছিলেন:

একদিন যীশুর প্রিয়তম শিষ্য যোহন তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন, "গুরুদেব, আমরা একজন মানুষকে দেখলাম যে আমাদের দলের কেউ নয় অথচ আপনার নামেই নানা রোগে ক্লিষ্ট লোকদের সুস্থ ক'রে তোলেন। আমরা তাকে ঐ সমস্ত করতে বারণ ক'রে দিয়েছি।" যীশু তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন: "আমার নাম নিয়ে যে ঐশ শক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শন কাজ করে, সে তো আমার শিষ্য না হয়েও আমার শত্রু নয়। যে মানুষ তোমাদের বিপক্ষে নয়, জেনে রেখো সে তোমাদের স্বপক্ষেই আছে।" রামমোহন কোনো ভাবে খৃস্টের বিপক্ষে ছিলেন না। খৃস্টবিশ্বাসীর কাছে মুক্তিদাতা ও নবজীবনদাতা যীশুর যে পরিচয়, খৃস্টের সেই পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রামমোহন জানতেন না বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি খৃস্টের সশ্রদ্ধ অনুগামী ছিলেন। যীশু নিজের বাণী প্রচারের সময়ে কোনো নূতন ধর্মমত কিংবা নূতন ধর্মবিশ্বাসের কথা প্রচার করেন নি, ইহুদী জাতির সমাজ ও ধর্মবিধাতা মহর্ষি মোশী (Moses)-এর বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রভু যীশু মুক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন : "এ কথা মনে কোরো না যে, আমি শাস্ত্রের বিধান এবং মহর্ষিদের কথা বাতিল করতে এসেছি। আমি তাদের সরিয়ে ফেলে দিতে আসি নি, তাদেরই আমি পূর্ণ করতে এসেছি।" খৃস্টের প্রতি রামমোহনের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি খৃস্টধর্মীর মতো বিশ্বাসী ছিলেন না। মিশনরির কথাটি অসত্য ছিল না কিন্তু রামমোহনের বক্তব্য সরিয়ে ফেলে না দিয়ে তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা স্বীকার ক'রে তা পূর্ণতর ক'রে বিশ্বাসের উচ্চতর ও গভীরতর স্তরে আনবার চেষ্টা ছিল খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকের কর্তব্য।

ব্রাহ্ম আন্দোলন ও ভারতের শ্রমজীবী সমাজ

চিন্মোহন সেহানবীশ

কোনো সামাজিক আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র যাচাই করার একটি সহজ ও সুস্থ মাপকাঠি হল সমাজের 'নিচু তলার বাসিন্দা', দুর্গত ও শ্রমজীবী জন-সাধারণের প্রতি তার মনোভাব। আর ব্যাপক ও গভীর অন্তর্বিরোধ-দীর্ণ বর্তমান পৃথিবীতে যে সে মাপকাঠি প্রয়োগের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

ব্রাহ্মসমাজকে দেশের অসংখ্য ধর্মসম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর আরো একটি হিসেবে না দেখে যদি আমরা তাকে ভারত ইতিহাসের আধুনিক পর্বের এক জীবন্ত সামাজিক আন্দোলন গণ্য করি, তা হলে সে আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ঐ মাপকাঠিটি প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনে তার সার্থকতা বা প্রকৃত ভূমিকা কী।

স্বভাবতই সে-কাজ শুরু হবে রামমোহনকে দিয়েই। 'Every man is entitled by law and reason to enjoy the fruits of his honest labour and good management'— শুধু এ-ধরনের একটা আপ্তবাক্য বলেই কিন্তু তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, এ-ব্যাপারে সে-নীতি প্রয়োগেব কিছুটা চিন্তা করেছিলেন দেশবাসীর বৃহত্তম অংশ, কৃষক-সমাজের ক্ষেত্রে। যেমন, বিলেতে 'হাউস অফ কমনস'-এর 'সিলেক্ট কমিটি'র কাছে ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কিত ৩০ নং প্রশ্নের ('বাংলায় হালের জমিদারি বন্দোবস্ত এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রায়তোয়াড়ি ব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থা কি রকম?') জবাবে রামমোহন লিখেছিলেন:

'দুই ব্যবস্থাতেই কৃষকের অবস্থা খুবই দুর্দশাপন্ন, একটিতে তাঁরা জমিদারের লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিকার, অন্যটিতে তাঁদের বহন করতে হয় জরীপকারী ও রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের শোষণ ও চক্রান্তের বোঝা। দুক্ষেত্রেই আমার গভীর সহানুভূতি তাঁদের প্রতি— পার্থক্য শুধু এই যে বাংলার কৃষকদের ক্ষেত্রে জমিদারেরা তাঁদের রাজস্ব সাব্যস্তের সময়ে সরকারের তরফ থেকে দাক্ষিণ্য ভোগ করে থাকেন কিন্তু সে দাক্ষিণ্যের এক অংশও প্রসারিত হয় না গরীব কৃষকদের বেলায়। ভালো ফসলের দিনে যখন ফসলের দাম পড়ে

যায় তখন তাঁদের পুরো ফসলটাই বেচতে হয় জমিদারের খাঁই মেটাতে—বীজ-ধান বা মেহনতী মানুষ বা তাদের পরিবার পোষণের জন্ত কিছুই থাকে না, অথবা যৎসামান্যই থাকে' (তর্জমা লেখকের)।— *Rammohun Roy on Indian Economy* অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার, সম্পাদিত রেয়াব বুক পাবলিশিং সিণ্ডিকেট, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ ৯।

১৮৩১ সালের ১৯শে আগস্ট লণ্ডনে লেখা তাঁর ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা বিষয়ক নিবন্ধর ১৪ নং প্রসঙ্গেও আছে :

'রাজস্ব আদায়ের সুবিধার এবং জমি-মালিকদের ভূসম্পত্তি উন্নয়নে উৎসাহিত করার জন্য সরকার খাজনা ধার্য করার অনিশ্চয়তা-জাত দুর্গতি ও ঝামেলা থেকে তাঁদের উদারভাবে মুক্তি দিয়েছিলেন. ১৭৯৩ সালে তাঁদের সঙ্গে এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রে। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না কেন ঐ দাক্ষিণ্য তাঁদের প্রজাদেব ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা হল না জমি-মালিকদেরও সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণে বাধ্য ক'রে যার ফলে নির্দিষ্ট কয়েক বছর কৃষকদের কাছ থেকে বাস্তবিক যে আদায় হযেছে, গড়পডতা সেই নির্দিষ্ট হারেই প্রত্যেক কৃষকদের দেয় বেঁধে দিয়ে। এ'ও বুঝি না কৃষকদের দুরবস্থায় যে অনুকম্পার উদ্রেক হয়েছে তার দরুন সরকার বছর বছর প্রত্যেক কৃষক যা দিযে থাকেন সেই অনুসারে আদায়ের একটা সর্বোচ্চ মান নির্দিষ্ট করার এবং তার বেশি আদায় সরাসরি নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা এখনো কেন করেন না' (তর্জমা লেখকের)।— পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ২৪।

এরও আগে ১৮২৯ সালের শেষ দিকে রামমোহন বাংলার ভূমি ব্যবস্থা বিষয় লর্ড বেণ্টিংকের কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করেন, অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস কিছু দিন হল বেণ্টিংকের কাগজপত্রের মধ্যে সেটি আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁর 'রামমোহন-সমীক্ষা' গ্রন্থে প্রকাশও করেছেন (পৃ. ৫৬১-৬৬)। অধ্যাপক বিশ্বাস ঐ স্মারকলিপিতে লিপিবদ্ধ রামমোহনের বক্তব্য সম্পর্কে লিখেছেন :

'...চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে জমিদার ও রায়ৎ দু'পক্ষের অবস্থা নিপুণ-ভাবে বিশ্লেষণ করে লেখক (অর্থাৎ রামমোহন) দেখিয়েছেন গত ছত্রিশ বছরের মধ্যে (১৭৯৩ থেকে ১৮২৯) জমিদারেরা একটি নির্দিষ্ট হারে সরকারকে খাজনা দিয়েছে এবং তৎসহ পতিত জমিকে চাষের আওতায় এনে ও অনবরত নানা ছুতোয় রায়তের উপর করবৃদ্ধি করে নিজেরা সমৃদ্ধিশালী হয়েছে; অপরপক্ষে

নিয়মিত করবৃদ্ধি ও শোষণের ফলে এই সময়ের মধ্যে রায়তের অবস্থা হয়ে উঠেছে শোচনীয়। জমিদারগণ জমির খাজনাবৃদ্ধি ব্যতীত আবওয়াব, চাঁদা, ধর্মীয় ও বিবাহানুষ্ঠানে অনুমতিদানের মূল্যস্বরূপ পাওনা প্রভৃতি নানা অবৈধ আদায়ের দ্বারা প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গে, তমলুক, হিজলী প্রভৃতি অঞ্চলে ও রংপুর প্রভৃতি জেলায় এ-জাতীয় প্রজাশোষণ খুবই সাধারণ ঘটনা। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন কতগুলি প্রতিকার নির্দেশ করেছেন: সরকারী নির্দেশে প্রত্যেক জমিদারের ভূসম্পত্তির নিখুঁত সমীক্ষা জেলার কালেক্টারদের কাছে দাখিল করতে হবে; এবং সরকারীভাবে সেই হিসাব পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হবার পর প্রত্যেক চাষীর সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে সম্পাদিত স্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে চাসের জমি একটি নির্দিষ্ট করহারে বিলি করতে হবে। এই নির্দিষ্ট করহার ভবিষ্যতে কিছুতেই বৃদ্ধি করা চলবে না। জমিদারবর্গ এই নির্দিষ্ট করের অতিরিক্ত কোনও কিছু রায়তের কাছে দাবি করলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হবে এবং এর জন্য তাদের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড ভোগ করতে হবে ··' (দিলীপকুমার বিশ্বাস, 'রামমোহন সমীক্ষা', সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৮৩ পৃ ৫৫৯-৬০)।

রামমোহন জমিদার ছিলেন। ১৭৯৩ সালের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'ও তিনি অবশ্যই সমর্থন করতেন। কিন্তু এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে জমিদার ও রায়তের মধ্যেও আরো একটি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র জন্য বারবার, জোরালো সুপারিশ করেছিলেন, এ-কথা না বললে শুধু যে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়, তাই নয়, কালের বিচারে তাঁর কাছে, তখন এর চাইতে বেশি প্রত্যাশা নিশ্চয়ই অনৈতিহাসিক।

এও লক্ষণীয় যে বিলেতে থাকার সময়ে রামমোহনের সঙ্গে কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদের (Utopian Socialism) অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, রবার্ট ওয়েনের কিছুটা যোগাযোগ হয়। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস তাঁর গ্রন্থে ওয়েনকে লেখা রামমোহনের পাঁচটি চিঠি প্রকাশ ক'রে আমাদের সকলেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। ওয়েনের পুত্র, রবার্ট ডেল ওয়েনকে লেখা চিঠিও তিনি ঐ বইতে এবং এর আগেও অন্যত্র প্রকাশ করেছেন। সেই চিঠিতে আছে এ-ধরনের কথা:

'····লক বা নিউটনের মতো মানব-হিতৈষী কি ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন? না। বরং তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন ধর্মের ভিতরে কালক্রমে যে-সব বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তার অপসারণের। মুহূর্তের জন্য যদি আমরা মেনে

নিই যে, ধর্মের ঈশ্বরতত্ত্ব কোনো যুক্তিবাদীকে তুষ্ট করার মতো করে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়, তা হলেও আমার মনে হয় নিরপেক্ষ বিচারে আমরা এ-ধারণায় পৌঁছতে রাজী হব যে প্রেম ও দাক্ষিণ্য যার মধ্যে নিহিত আছে, সেই ধর্মব্যবস্থা (খৃস্টধর্ম) আমাদের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনের সুযোগ ঘটিয়ে এবং আমাদের অনিষ্টকর সংশয় ও দুষ্প্রবৃত্তি দমন করে আমাদের সুখ ও আনন্দ বর্ধন করতে পারে। এ-ঘটনাটি লক্ষ করে আমি দুঃখিত যে আপনার অতি মহদাশয় পিতৃদেব ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে এতাবৎ বিড়ম্বিত করে এসেছেন তাঁর সাফল্যকেই। আমার গভীর বিশ্বাস, উপরে উল্লিখিত অর্থে তিনি খৃস্ট ধর্মেরই অনুগামী যদিও সে বিষয়ে তিনি নিজে অবহিত ন'ন।···· আপনাকে ও আপনার পিতৃদেবকে আপনাদের মহৎ কর্মপ্রয়াসে সাফল্যমণ্ডিত দেখার কামনাই আমাকে এ-সব কথা বলার সাহস জুগিয়েছে— আমার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে, আশা করি, আপনি সে-বেয়াদবি মার্জনা করবেন' (তর্জমা লেখকের)।

ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে রামমোহন ও ওয়েনের অবনিবনা একেবারে মৌলিক চরিত্রের। তা সত্ত্বেও রামমোহন যে ওয়েনের সামাজিক তৎপরতাকে 'মহৎ কর্মপ্রয়াস' মনে করতেন এবং তার সাফল্য কামনা করতেন, এ ব্যাপারটিও লক্ষণীয়।

রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় এক দশক পরে রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু ও অনুরাগী দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেত যান। তিনি যখন সেখানে পৌঁছন তখন বিলাতে চার্টিস্ট আন্দোলনের দাপটে দেশ তোলপাড়। ব্রিটেনের ঐ শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি দ্বারকানাথের মনোভাব পরিস্ফুট ডিরোজিও-পন্থীদের দ্বারা পরিচালিত *Bengal Spectator* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এই চিঠিতে: ····'আমরা ভেবেছিলাম বার্মিংহ্যাম যাব কিন্তু চার্টিস্ট দাঙ্গার জন্য আমরা তার বদলে রেলপথে ডার্বি গেলাম।··· এডিনবরা দেখে আমি গ্লাসগো ও ম্যাঞ্চেস্টার যাব— আশা করি ততদিনে দেশে শান্তি আসবে। এখানে বেকারের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ— সে হতভাগ্যদের প্রতি খুবই দুর্ব্যবহার করছে সৈন্যেরা। ভারতবর্ষের পাহাড়ী কুলিদের খেতে না পাওয়ার কথা বলা হয় কিন্তু এখানে আমার চার দিকেই দুঃখ-দুর্দশা' (*Bengal Spectator*, ১ নভেম্বর, ১৮৪২)।

দ্বারকানাথ লিখেছেন 'চার্টিস্ট দাঙ্গা'র কথা, তবু সেই 'দাঙ্গাবাজদের' প্রতি তাঁর কিছুটা সহানুভূতিও লক্ষণীয়।

'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট রক্ষণশীল আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও নিশ্চয়ই চরমপন্থী ছিলেন না। তবু 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র প্রথম বাৎসরিক রিপোর্টে সম্পাদক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিন নম্বর অনুচ্ছেদে লিখেছেন : 'যে গ্রামের মানুষ তাদের মেহনতে রাজকোষে সব থেকে বেশি যোগান দেয়, তাদের রক্ষাব্যবস্থা যে শুধু যথেষ্ট নয়, তাই নয়, অন্যান্য শ্রেণী যে-সব সুযোগসুবিধা ভোগ করে তার অনেকগুলিই তাদের জোটে না। তাদের রক্ষা করাব জন্য আইনের মুসাবিদায় তাদের নিজেদের খরচেই নিযুক্ত চৌকিদারদের উপর খবরদারীর কথা বলা হয়েছে কিন্তু সরকারী তহবিল থেকে সে-ব্যাপারে কোন খরচের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু যেহেতু রাজস্বের বেশ মোটা একটা অংশ তোলা হয়েছে দেশের সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক পুলিসবাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশে, তাই এই কমিটি বাধ্য হয়ে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছে যে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কার্যকর হলে অন্যায় হবে আর জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের যে দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে অথচ পালিত হয় নি—তার দিকে।'

আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত কৃষকদের দুর্গতির কথা। অক্ষয়কুমার দত্ত তো সেখানে স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন বাংলার কৃষকদের দুই শত্রু— জমিদার ও নীলকর। যেমন, ১৭৭২ শকাব্দের (১৮৫০ খৃ.) বৈশাখ, সংখ্যা ৮১ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় লেখা হয়েছিল : '...মনুষ্য যখন লোভ রিপুর বশীভূত হয়েন, তখন পরপীড়াপ্রদান বিষয়ে অরণ্যবাসী হিংস্র জন্তুও তাহাব নিকট পরাভব মানে। 'যে রক্ষক সে ভক্ষক' এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূস্বামীদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি কখন কি উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহারদিগের যথাসর্বস্ব হরণে একাগ্রচিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন।... তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ি-রাজস্বের নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনি, পার্বণি, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিপীড়ন করিতে থাকেন।...ভূস্বামির ভবনে বিবাহ, আদ্যকৃত্য, দেবোৎসব বা প্রকারান্তর পুণ্যক্রিয়া ও উৎসব ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত, তাহারদিগকেই ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়...।'

আর নীলকর সাহেবদের বিষয়ে ১৭৭২ শকাব্দের (১৮৫০ খৃ.) অগ্রহায়ণ (৮৮) সংখ্যায় ঐ পত্রিকায় লেখা হল :

'.... ভূস্বামিদিগের বিষম অত্যাচারের বিবরণ পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন ও ব্যাকুলিতচিত্ত হইতে হয়, কিন্তু এক্ষণে চতুর্দিক হইতে এই কথাই শ্রুত হওয়া যাইতেছে, যে নীলকরদিগের অত্যাচার তদপেক্ষাও ভয়ানক, তাহারদিগের দৌরাত্ম্যে প্রজাকুল নির্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাস্তবিক, যেমন কোন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দুই ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্র দৃষ্টি করিলে তাহাদের পরিমাণ নিরূপণ ও পরস্পর তারতম্য নিশ্চয় করা যায় না, কারণ তাহারদের উভয়কেই অসীমপ্রায় বোধ হয়, সেইরূপ ভূস্বামী ও নীলকরদিগের অশেষ প্রকার উপদ্রবের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া পরস্পর তারতম্য করা দুষ্কর, কারণ উভয়েরই অত্যাচার-জনিত দুঃসহ দুঃখরাশির সীমা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত ও বাক্যপথের অতীত।'

১৮৭৩ খৃস্টাব্দের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (সংখ্যা অজ্ঞাত) হরচন্দ্র চৌধুরীর 'সেরপুর বিবরণ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচকের মতে ঐ গ্রন্থটিতে জনৈক 'টিপু পাগলা' প্রবর্তিত 'পাগলপন্থী' নামে এক ধর্মগোষ্ঠীর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। টিপুর মতে সব মানুষই আল্লার সন্তান আর তাই সকলেই সমান। আমীর, ফকির, প্রভু বা দাস, জমিদার প্রজা বলে কিছু নেই— কাজেই জমিদারকে খাজনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ঐ বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয় এবং টিপুকে মোট ৪৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৮৫২ সালে যখন কারাগারে টিপুর মৃত্যু হয়, তখন তাঁর পুত্র ও পৌত্রও কারারুদ্ধ।

১৮৭০ সালের ১২ এপ্রিল কেশবচন্দ্র সেনকে লণ্ডনে যে সভায় সংবর্ধনা জানানো হয় সেখানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা, লুই ব্লাঙ্ক।

ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার পর কেশবচন্দ্র সম্ভবত সেখানে খৃস্টান চার্চের পরিচালনায় যে-ধরনের সমাজসেবামূলক কাজকর্ম হয় তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে কলিকাতায় একটি 'Workingmen's Institute' স্থাপন করেন। বিপিনচন্দ্র এ-প্রসঙ্গে তাঁর *The Brahmo Samaj and the Battle for Swaraj* গ্রন্থে লিখেছেন :

'ভারত সংস্কারক সভা নামে একটি নূতন সমাজসংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান

কলকাতা ও শহরতলির শ্রমিক ও কারিগরদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে' (পৃ. ৫০)।

'Workingmen's Institute' স্থাপনা ছাড়াও কেশবচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত এক পয়সার সাপ্তাহিক কাগজ 'সুলভ-সমাচার'ও প্রকাশ করেন মেহনতী মানুষদের জন্য সহজ ভাষায়। (১৮৭১ সালে) ১২৭৮ শকাব্দের ৩১ শ্রাবণ (৪০ সংখ্যায়) 'সুলভ সমাচারে' লেখা হল :

'বাস্তবিক বড় মানুষ কাহারা ? আমাদেব দেশে এ-দেশের ছোটলোকেরা। তাহারা না থাকিলে কার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ী চড়িয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিত। দেখ, সামান্য লোকেরা আমাদের সর্বস্ব দিতেছে। তাহাদের ধনে আমরা বড়মানুষী করিতেছি। কিন্তু কয়জন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব মনে করে। তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিনরাত কষ্ট করিয়া আমাদিগকে অন্ন দিতেছে, কিন্তু কয়জন তাহাদিগের অবস্থা একবারও মনে করে।

'বিলাতের যে এত টাকা, এত বলবিক্রম, তাহা কোথা হইতে আসিল ? সেই ছোটলোকদের হইতে। পৃথিবীতে এমন এক সময় আসিবে যখন ছোটলোকেরা আর চুপ করিয়া থাকিবে না, আর দুঃখে মাটির শয্যায় পড়িয়া থাকিবে না। এখনি বিলাতে তাহারা এমনি বলবান হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারা আব রাজাকে মানে না। আপনাদের অধিকার, আপনাদের বিক্রম আপনারাই প্রকাশ কবিতে যায়। বিলাতের ভিতর আয়াবল্যাণ্ড বলিয়া যে দেশ আছে, সেখানকার রায়তরা ঠিক বঙ্গদেশের রায়তদের মতো দুর্দশাপন্ন। জমিদাররা তাহাদের কিছুই করিতে দেয় না। কিন্তু এই রকম দৌরাত্ম্য সহ্য কবিয়া তাহাবা এমন দুরাচারী হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহাদের মধ্যে অনেকের এই এক গৌরবের বিষয় হইয়াছে যে, কে কত জমিদারকে মাঠের বেড়া হইতে একেবারে দূর করিতে পারে। তাহাদের দুরাচারের ফল ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রাজপুরুষেরা ভয় পাইয়াছেন এবং ভয় পাইয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই রকম সকল বড় বড় দেশে বড়মানুষ ছোটলোকে লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা নহে যে এখানেও রায়তরা সেই রকম অত্যাচার করে। কিন্তু অন্যায় না করিয়া তাহারা তাহাদের পীড়নকারী জমিদারদের জব্দ করে— ইহা আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা।'

১৮৮০ সালের ১৩ মার্চ 'সুলভ সমাচারে' লেখা হয় :

'আজকাল রুশিয়াতে কি ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। দেশের শিক্ষিত দলের মধ্যে সাধারণ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে বর্তমান রাজাকে ও রাজকর্মচারীদের নিপাত করিতে ও শাসনপ্রণালীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে হইবে।··· এই দল দিন দিন প্রবল হইতেছে। ফরাসী দেশের কমিউনিষ্ট ও জার্মানীর সোশিয়ালিষ্ট দল যে রূপ রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ। ইহারা রাশিয়ার বর্তমান সামাজিক, পারিবারিক ও রাজকীয় প্রথা চূর্ণবিচূর্ণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে।...'

'সুলভ সমাচারের' এ-সব লেখায় পরিচয় মেলে য়ুরোপে শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে চেতনার।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতেও শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব কিছুটা চোখে পড়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৮৬৪ সালে লণ্ডনে 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র জন্ম হয়। ১৮৭১ সালের ১৫ আগস্টে অনুষ্ঠিত তার সাধারণ সংসদের এক সভায় (তাতে মার্কস, এঙ্গেলস প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারা উপস্থিত ছিলেন) বিবরণীতে এক জায়গায় লেখা হয়েছে :

'আগের সভায় কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হওয়াব পব সম্পাদক জানান যে লিভারপুল ও লিস্টারশায়ারের লাফবরোতে শাখা গঠিত হয়েছে। তিনি কলকাতা থেকে একটি প্রেরিত চিঠিও পাঠ করেন যাতে ভারতবর্ষে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার অধিকার চাওয়া হয়েছে। সম্পাদককে নির্দেশ দেওয়া হল ঐ শাখা প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখতে, তবে পত্রলেখককে জানাতে হবে যে ঐ শাখাকে স্বনির্ভর হতে হবে। তাঁকে ঐ সমিতিতে দেশের মানুষকে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে বলা হল'— 'The General Council of the First International, 1870-71 : Minutes', পৃ. ২৫৮।

বিবরণী খণ্ডের শেষে কলকাতার ঐ চিঠির যে অংশটি ছাপা হয়েছে তা এই : 'জনসাধারণের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ বর্তমান এবং বৃটিশ সরকারকে সকলেই পুরোপুরি অপছন্দ করেন। করভার অতিরিক্ত আর রাজস্বের সবটাই খেয়ে যায় ব্যয়বহুল এক আমলাবাহিনী পুষতে। অন্যান্য জায়গার মতো শাসকশ্রেণীর বিলাসব্যসনের সঙ্গে এখানেও শ্রমিকদের দীন হীন অবস্থার বৈপরীত্য মর্মান্তিক, সেই শ্রমিক যাঁদের মেহনত থেকেই সৃষ্টি হয় ঐ অপব্যয়িত সম্পদের। শাখা

প্রতিষ্ঠা হলে 'আন্তর্জাতিকে'র নীতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবে তার সংগঠনের মধ্যে।'— ঐ, পৃ. ৫৯০

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক কলকাতার ঐ পত্রলেখক কে? এর সঠিক উত্তর এখনো অবধি মেলে নি, তবে এই নিয়ে নানা আলোচনা— অবশ্য প্রধানত অনুমানমূলক— কিছুদিন আগে চলেছিল পত্রপত্রিকায়। প্রসঙ্গত যাঁদের নাম উঠেছে তাঁরা হলেন :

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – যিনি ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধে, উল্লেখ করেছিলেন শুধু ইউরোপের কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদী নেতৃবর্গের বা তাঁদের মতামতের নয়— 'কমিউনিজম' এবং প্রথম 'ইণ্টারন্যাশানালের'ও।

২। রেভারেণ্ড জেমস লঙ— 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের অপরাধে যাঁর ১০০০ টাকা জরিমানা ও ১ মাসের কারাদণ্ড হয়েছিল এবং

৩। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ লব সাহেব ১৮৭১ সালে যিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বিপ্লবী প্যারিস কমিউনকে।

আর নাম উঠেছে কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রীর। এ প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে এইখানে।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' গোড়ায় প্রকাশিত হত বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক দৈনিক পত্রিকা হিসাবে। ১৮৭১ সালের ২০ জুলাই সংখ্যায় (বাংলা সংস্করণ) প্রকাশিত হয় এই খবর :

'ইউরোপীয় শ্রমোপজীবিদিগের একটি সভা আছে। আজ কয়েক বৎসর হইল এই সভার সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু ইহার শাখা উপশাখা পৃথিবীর, বিশেষত আমেরিকা ও ইউরোপের সমুদয় প্রধান প্রধান নগরে সংস্থাপিত হইয়াছে। সভার মূল লণ্ডনে।... তাহাদের মতে প্রতিবাসী অপেক্ষা কাহারও অধিক সুখভোগ করিবার দাবী নাই। যদি কাহারও সুখসম্পত্তি থাকে তবে উহা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র প্রতিবেশীকে বণ্টন করিয়া দেওয়া কর্তব্য।'

পত্রিকার ৩১ আগস্ট (১৮৭১) সংখ্যায় বেরোল এই খবর : 'পিপলস এসোসিয়েশন ইহার বিষয় অনেক শুনিয়াছেন, ইহা সংস্থাপনের জন্য অনেকে মনোযোগী হইয়াছেন, কিছুদিন হইল এই সম্বন্ধে কতকগুলি প্রধান লোক জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটিতে একটি সভা করেন।'

১৮৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের সংখ্যায় (বাংলা সংস্করণ) বেরোল : 'বাংলার তাবৎ লোক রাজনৈতিক সভার নিমিত্ত চীৎকার করিতেছেন। এ

পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এরূপ একটি সভা সংস্থাপনের নিমিত্ত কেহ কেহ বিস্তর যত্ন করিতেছেন। তবু উহা অদ্যাপি কার্যে পরিণত হয় নাই, বোধ হয় প্রকৃতই তখন সময় হয় নাই।... সম্ভবত সত্বরই ঢাকায় এরূপ একটি সভা সংস্থাপিত হইবে। এ সমুদয় সভা কি পদ্ধতি অনুসারে গঠিত হইবে ইহা অনেকে আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা উত্তর হঠাৎ দিতে পারি না। বাঙ্গলার প্রধান প্রধান বিচক্ষণ ব্যক্তি একত্র হইয়া এই বিষয় সাব্যস্ত করিবেন।... বাবু কেবশচন্দ্র সেন যখন বিলাতে যান তখন এখানকার অনেক প্রধান লোক তাঁহাকে এইরূপ স্থানে স্থানে করিতে অনুবোধ কবেন'।

এই সব খবরেব ভিত্তিতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা র প্রাক্তন প্রধান রিপোর্টার' প্রয়াত কালীপদ বিশ্বাস অনুমান কবেন যে কেশবচন্দ্র সেনই সম্ভবত এ-দেশে 'International Workingmen's Association'-এর শাখা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন আর তাই 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র কাছে ঐ চিঠি পাঠিয়েছিলেন হয়তো তিনিই অথবা তাঁরই কোনো ঘনিষ্ঠ সহযোগী ('সপ্তাহ', বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩৬, ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৩)।

১৮৭০ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীব সহযোগী, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগবে একটি 'শ্রমজীবী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে ১৮৭৪ সালে এ-দেশেব প্রথম শ্রমজীবী মাসিকপত্র 'ভাবত-শ্রমজীবী'র প্রকাশনা শুরু করেন। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা — 'শ্রমজীবী'। তাব কয়েক ছত্র এই বকম :

'সমাজেব মূল তোরা ভাই।
কে দেখেছে ধরাতলে
মূল বিনা তরু চলে।
মাথা চলে তাতে লাভ নাই,
যথা ছিল রহিবে তথাই।

'ওই দেখ সাগরের পারে,
শ্রমজীবী শতশত
কেমন সংগ্রামে রত
এই ব্রত— রবে না আঁধারে
আয় তোরা দেখি যে সবারে।'

· সাগরপারের কোন্ সংগ্রামের কথা বলছেন এখানে শিবনাথ? 'প্যারিস কমিউন' না দুর্ধর্ষ বিসমার্কের সমাজবাদবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে জার্মান সমাজতন্ত্রীদের সংগ্রাম?

'ইংলণ্ডের ডায়ারী'তে শিবনাথ লিখেছেন:

'যুবকযুবতীদিগের মধ্যে কার্য করিবার সময় ভাঙ্গা ও গড়া উভয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একদিকে কুসংস্কার-ভঞ্জন, জাতিভেদ-দমন, শাস্ত্রনিগড়ভেদ— অপরদিকে সাধুতাতে নিষ্ঠা, সাধুজনে ভক্তি, ধর্মে প্রবল বিশ্বাস, ঈশ্বরে প্রগাঢ় নির্ভর সমভাবে রক্ষা করিতে হইবে। একদিকে সোশ্যালিষ্ট, সেকুলারিষ্ট প্রভৃতির গ্রন্থাবলী পড়িতে ও ভাবগ্রহণ করিতে হইবে; অপরদিকে সাধুদিগের জীবনালোক ও ভজন সাধনাদির দ্বারা ভক্তি ও বিশ্বাসকে জাগ্রত করিতে হইবে। আমি উভয় ভাবকে যে পরিমাণে নিজ জীবনে ধারণ করিতে পারিব, সেই পরিমাণে অপরের মনে দিতে পারিব। ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া দেশে ফিরিতে হইতেছে।'—পৃ. ১৭২-৭৩

আর-এক জায়গায় শিবনাথ 'ডায়ারি'তে লিখেছেন:

'বৈকালে আহারের পর হ্যামারগ্রেন, মিঃ অষ্ট্রোগোরস্কি এবং আমি— এই কয়জনে মিসেস বেসাণ্টের বাড়িতে *সোশ্যালিষ্টদিগের এক সভাতে গেলাম।* সেখানে একজন কোঁৎ-এর মতাবলম্বন করিয়া সোশ্যালিষ্টদিগের মতের প্রতিবাদ করিলেন। মিসেস বেসাণ্ট ও আরো কয়েকজন সোশ্যালিষ্ট উঠিয়া প্রতিবাদ করিলেন।'—পৃ. ৬৮

শিবনাথ শাস্ত্রীর "ইংলণ্ডের অপ্রকাশিত দিনলিপি থেকে" প্রবন্ধে শিবনাথ ১৮৮৮ সালের ৫ অক্টোবর লিখেছেন:

'আর একটা কাজ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কাজের জন্য এবং আমার পারিবারিক ধর্মসাধনের সহায়তার জন্য Church History; Lecky's 'History of European Morals'; 'Great Sayings of Great Men' কিনিয়া লইতে হইবে। এতদ্ভিন্ন Socialist-দিগের Literature কতকগুলি কিনিয়া লইতে হইবে। আমরা যে নূতন সমাজ গঠন করিতে যাইতেছি তাহার সম্মুখ পথে কি কি আছে তাহার জ্ঞান আবশ্যক, এই জন্য এই জাতীয় গ্রন্থ পড়া আবশ্যক।'— 'আলেখ্য', ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮০

বিলাত থেকে ফেরার পথে জাহাজে বসে শিবনাথ ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর লেখেন: 'ব্রাহ্মসমাজের একদল সেবক প্রস্তুত করা যায় কি না, যাহারা

Communism অনুসারে থাকিবেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি যাহা দিবেন ও শ্রমের দ্বারা অর্জিত হইবে, তদ্দ্বারা তাহাদের ভরণপোষণ হইবে।'—হেমলতা দেবী, 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত', পৃ ২৪২

বিলেত থেকে ফেরার পর শিবনাথ শাস্ত্রী 'সমদর্শী সমিতি' নামে যে ছোটো দলটি গঠন করেন তাতে যোগ দেবার সময়ে সদস্যদের কয়েকটি শপথ গ্রহণের পর 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা' নিতে হত। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'সত্তর বছর। আত্মজীবনী'তে লিখেছেন যে 'আমাদের প্রতিজ্ঞার বিষয় ছিল আমরা প্রতিমা-পূজা করিব না— ; আমরা বাক্যে ও কার্যে জাতিভেদ মানিব না··· ; আমরা সমাজে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিব···' ; 'আমরা··· একুশ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না, কোন বালিকাকে তাহার ষোড়শ বৎসর পূর্বে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না' ; 'আমরা যথাসাধ্য স্ত্রীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টা করিব' ; 'আমরা··· অশ্বারোহণ ও বন্দুক চালনা শিক্ষা করিব···' ; 'আমরা একমাত্র স্বায়ত্তশাসনকেই বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করি ; তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের মুখ চাহিয়া এখন যে বিদেশীর রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার আইন কানুন মানিয়া চলিব, কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য. দুর্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকাব করিব না'। ··

'···আমরা এই প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলাম যে, আমাদের কাহারও কোন স্বতন্ত্র তহবিল থাকিবে না। যে যাহা উপার্জন করিবে, তাহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইবে এবং এই সাধারণ তহবিল হইতে আমাদের এবং আমাদের পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় খরচপত্রের ব্যাবস্থা হইবে।'— পৃ ২২২-২৪

বিপিনচন্দ্র তাঁব 'নবযুগের বাংলা'য় আক্ষেপ করেছেন :

'যে কমিউনিজমের আদর্শে আমরা এই দলটা বাঁধিতে গিয়াছিলাম, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, সাধাবণ অর্থভাণ্ডারে নিজ নিজ উপার্জিত অর্থদান করিব এবং সেই ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনোপযোগী বৃত্তি লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিব— এই আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলি সকলেই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।'—পৃ. ১২৭-২৮

শ্রদ্ধেয় প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া'য় লিখেছেন :

'১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উক্ত সমাজের উৎসাহী

প্রচারক দল ভারতের সর্বত্র প্রচারকার্যে যাতায়াত করিতে থাকেন। এইরূপ প্রচার-ব্রত পালনে সুদূর আসাম অঞ্চলে বারবার গমন করেন রামকুমার বিদ্যারত্ন। এই প্রচার ব্যপদেশেই তিনি কুলিদের দুঃসহ জীবনযাত্রাব কাহিনী অবগত হন এবং তাহাব প্রতিকারে আত্মনিয়োগ করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন।··· রামকুমার যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া কুলিদের অসহায় দাস জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী বলিলেন তখন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর শুকুল ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রভৃতি গণতন্ত্রের পূজারিগণ জ্বলিয়া উঠিলেন। রামকুমার যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহাদের চেষ্টায় সেগুলি মুদ্রিত হইল।··· 'ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের' পক্ষ হইতে কুলিদেব অবস্থা সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি রচনা করিয়া তাঁহারা তাহার সহিত রামকুমার প্রণীত পুস্তকখানিও ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপনের নিকট প্রেরণ করেন।'—পৃ. ৬৮

লর্ড রিপনও লিখেছেন :

'···They [Indian Association] press upon us in their memorial this point of the ignorance of the cooly and give a curious extract from a book published by a Missionary of the Brahmo Samaj [that is, Ramkumar Vidyaratna] to show how very ignorant a great number of the coolies who engage to go to Assam, are. I have, no doubt, that is a perfectly fair statement of the knowledge of many of the coolies.'— যোগেশচন্দ্র বাগল, *History of the Indian Association 1876-1951*, পৃ. ৫৩।

কী অবস্থায় সেদিন রামকুমারকে কাজ করতে হয়েছিল তা বোঝা যায় ১৮৮৫ সালের ৬ জুন তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার এই রিপোর্টে ('সঞ্জীবনী'র সংবাদদাতা ছিলেন রামকুমার —লেখক) :

'সংবাদদাতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাদজালে জড়িত। চতুর্দিকে শত্রু বেষ্টিত। কেবল যে সাহেবরাই শত্রু তাহা নহে ; কোম্পানীর হাকিম, উকিল, মোক্তার, সরকার, কেরাণী, গোমস্তা সকলেই উচ্ছেদ সাধনে তৎপর।'

আসামে তখন ব্রিটিশরাজের অর্থ ইংরেজ চা-করদের রাজত্ব আর ক্ষিপ্ত চা-করেরা তখন প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন :

'The contributor to *Sanjibani* will be the first victim to the planters' gun'.—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৯

১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয় রামকুমার বিদ্যারত্নের উপন্যাস 'কুলিকাহিনী'।

ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলিও আসামে যান ঐ 'কুলি' সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। রামকুমারের মতো তাঁকেও অনেক সময়েই আত্মগোপন করে কাজ করতে হয় এবং রামকুমারের মতোই তাঁরও এ প্রচেষ্টায় জীবনসংশয় হয় একাধিকবার। আসাম থেকে তাঁর পাঠানো বহু রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 'সঞ্জীবনী'র পৃষ্ঠায়।

কলকাতায় ফিরে এসে দ্বারকানাথ শুধু ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নয়, জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও আসাম কুলীদের প্রশ্নটি সম্পর্কে প্রচার চালান। কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ এ-প্রশ্ন আলোচনা করতে গোড়ায় রাজী হন নি এই যুক্তিতে যে প্রশ্নটি নাকি নিছক প্রাদেশিক, তার সর্বভারতীয় গুরুত্ব নেই। দ্বারকানাথ এ যুক্তি খণ্ডন করে দেখান আসামের এই কুলীরা এসেছেন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। শেষ পর্যন্ত দ্বারকনাথের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৯৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে প্রশ্নটি আলোচ্য তালিকাভুক্ত হয়।

প্রায় ঐ সময় নাগাদ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল প্রভৃতিরা আর এক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। কৃষ্ণকুমার লিখেছেন: 'লর্ড রিপনের শাসনকালে প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্তন করার সূচনা হয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমিদারের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সংঘবদ্ধ হন। ভারত সভা (Indian Association) প্রজার উন্নতির জন্য মহা আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, ভারতসভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি অতুল উদ্যমের প্রতিমূর্তি ছিলেন। তিনি কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কালীশঙ্কর সুকুল, দেবীপ্রসন্ন রায় ও আমাকে সঙ্গে লইয়া নদীয়া, হুগলী ও হাওড়া জেলার নানাস্থানে গমন করিয়া প্রজাসভার আয়োজন করিতেন। আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন কোন সভায় গমন করিয়া জমিদার ভয়ে ভীত প্রজাগণের মনে সাহসের সঞ্চার করিয়া দিতেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের সভায় প্রায় বিশ হাজার প্রজা সমবেত হইয়াছিল। কোন কোন প্রজা জমিদারের ভীষণ অত্যাচার কাহিনী সভাস্থলে বর্ণনা করিয়া সমাগত লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। পোড়াদহের সভায় প্রায় দশ হাজার লোক, কুষ্টিয়ার

সভায় প্রায় পনেরো হাজার লোক যোগদান করিয়াছিল। তারকেশ্বরে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভাবাজারের রাজকুমার নীলকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি কলকাতার প্রসিদ্ধ লোক তারকেশ্বরে গমন করিয়া জমিদারের অত্যাচার-কাহিনী প্রজার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সকল আন্দোলনের ফলে, গভর্ণমেণ্ট প্রজাস্বত্ব আইনের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।'—'আত্মচরিত', দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯৪

Brahmo Public Opinion পত্রিকা এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য লেখেন :

'We are glad to hear that the Indian Association has been able to form some Rent Unions in the mofussil. The importance of having such Unions all over the country is very great. These Unions, if properly formed and organised will be a power in the land. The field for work is very extensive'.— Volume, V, No. 2, January 12, 1882.

রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক আলোচনা— ১৮৯২ সালের 'সোশ্যালিজম' প্রবন্ধ ('সাধনা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) থেকে 'রাশিয়ার চিঠি' বা আরো পরের অসংখ্য রচনায় ও চিঠিপত্রে তাঁর মনের প্রবণতা ও গতির পরিচয় মেলে। তবে সে-কথা স্বতন্ত্রভাবেই বিচার্য।

অস্পৃশ্যতা-নিবারণ এবং তথাকথিত 'depressed class'দের প্রতি সামাজিক অবিচার নিরাকরণের প্রচেষ্টায়ও ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও কর্মীবৃন্দ অনেক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের ভি. আর. সিন্ধেই ১৯১৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণের কাজে অগ্রণী হন এবং গান্ধীজীকে রাজী করান অস্পৃশ্যতা নিবারণের কাজটিকে কংগ্রেসের কর্মসূচীর আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে। তিনি ছাড়াও ঢাকায় নমঃশূদ্রদের মধ্যে 'সাধনাশ্রমে'র কাজ, আসামে বিশেষ করে চেরাপুঞ্জি এলাকায় নীলমণি চক্রবর্তী এবং বাভা, গারো ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী ও বিনোদ রায়, হাজারীবাগে মেথরদের মধ্যে মন্মথনাথ দাশগুপ্ত, ওড়িয়াভাষী হাদি ও কৈবর্তদের মধ্যে জয়মঙ্গল রথ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং কেরালায় মালায়ালম-ভাষী এজভা সম্প্রদায়ের মধ্যে বীরেশলিঙ্গম প্রভৃতির কাজকে নিছক সংস্কারমূলক কাজ বলে তুচ্ছ করা

চলে না। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মুখে সমাজসংস্কারের সেই জরুরী কাজে ঐ-সব অগ্রণীদের উদ্যম ও নিষ্ঠা নতুন দিনের বিপ্লবীদের কাছেও প্রেরণার উৎস।

'ব্রাহ্মেরা আসলে তাঁদের অজান্তে প্রচ্ছন্ন কমিউনিষ্ট'— এমন কথা প্রবন্ধকারের অবশ্যই পতিপাদ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধান একেবারে মৌলিক। বক্তব্য শুধু এই যে সমাজ ইতিহাসকে খণ্ডে খণ্ডে বিচার করা চলে না। অনেক মিল-গরমিল, অনেক আঁকা-বাঁকা সত্ত্বেও ক্রমশ বিকাশমান সমাজ-চেতনায়, সমগ্র অগ্রগতির ধারণায় একটা ধারাবাহিকতার সূত্র পাওয়া যায়। এর আভাস পাওয়া যায় মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিক ও স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এই লেখায় :

"লেখক নিজে উদার মত-বিশিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার বংশের পরিচয় অতি পূর্ব সময় থেকে। লেখক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম প্রচারকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়া পড়াশুনা করিতেছিলেন। লোকমুখে শুনিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয়ও বলিয়াছিলেন 'আমি তাহাকে [অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথকে—প্রবন্ধকার] ভিত্তি করিয়া নূতনভাবে একটি প্রচারকমণ্ডলী সৃষ্টি করিব'। কিন্তু লেখক, পরে ম্যাট্‌সিনির প্রবন্ধাবলী ও স্বামী বিবেকানন্দের 'From Colombo to Almora' নামক পুস্তক পাঠে এই উপলব্ধি করিলেন যে রাজনীতিক সংস্কার না হইলে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার হয় না। এই ধারণা লইয়া তিনি ১৯ ২-০৩ খৃঃ বৈপ্লবিক আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। লেখকের জীবনে ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শ থেকে মস্কোতে লেনিনের সহিত পরোক্ষভাবে সংস্পর্শের মধ্যে ভাবধারার একটা ক্রমবিকাশ আছে।" 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', (প্রথম খণ্ড) বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ৩য় সংস্করণ, ১৯৪৯, পৃ. ৯১।

রামমোহন রায় ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

রামমোহনের আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করার আগে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মনে পড়ছে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাদেমিক কাউন্সিল হলে রামমোহনের তৈলচিত্র উন্মোচন অনুষ্ঠানটির কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সি. ডি. দেশমুখ উন্মোচনকালে বলেছিলেন আকাদেমিক হলে প্রথম তৈলচিত্র যে রামমোহনের এটা খুবই সংগত কারণ। বাস্তবিকই তিনি হলেন আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম সত্যকার শিক্ষাবিদ। তবে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জয়রামদাস দৌলতরামের একটি মন্তব্য আমার মনে মানুষ রামমোহন এবং তাঁর কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে একটি নতুন ধারণার উদ্রেক করে। তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করেন এই কথা বলে যে রামমোহনকে শুধু সমাজ সংস্কারক হিসেবে চিহ্নিত করে আমরা তাঁকে খর্ব করেছি— আসলে তিনি ছিলেন সারা বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদী।

রামমোহনকে প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদী বা আন্তর্জাতিকতাবাদের পথিকৃৎদের অন্যতম প্রতিপন্ন করা সহজ নয় শুধু এই কারণেই আন্তর্জাতিকতাবাদ বা internationalism শব্দটির ব্যঞ্জনা বিষয়ে অনিশ্চয়তা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে অধুনা ঐ শব্দ বিষয়ে বেশ-কিছুটা ধারণাগত স্বচ্ছতা দেখা যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে একাধিক জাতি বিষয়ক যে-কোনো ব্যাপারই আন্তর্জাতিক বলে গণ্য। এথেন্সের নেতৃত্বে ৪৭৮ খৃস্টপূর্বাব্দে গঠিত ডেলিয়ান কনফিডারেসি নামক সমুদ্র-সম্পর্কিত মৈত্রীসংঘ ছিল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ঐ চিন্তার প্রবক্তা এথেন্সের রাষ্ট্রনীতিবিদ থেমিস্টোক্লিস ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। কিন্তু ঐ মিত্রসংঘ গঠিত হয়েছিল পারসিকদের বিরুদ্ধে একটি জোট হিসাবে এবং অচিরেই সেটি পর্যবসিত হয় এথেনীয় সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ারে এবং শেষ পর্যন্ত পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধে। এম. এন. টড ১৯১৩ সালে প্রকাশিত তাঁর *International Arbitration Amongst the Greeks* গ্রন্থে স্পার্টা ও আর্গসের

মৈত্রীচুক্তিকে দুটি জাতির পারস্পরিক মতভেদ আন্তর্জাতিক সালিস মারফত মীমাংসা করার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে কিছুটা ব্যাপকতাবোধ সৃষ্টি করে রোমক সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র মানবজাতির সমার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু রোমান সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় এবং উদার মানুষটিকেও কি আমরা সত্যই আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি? দান্তে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে লেখা তাঁর ল্যাটিন রচনা *De Monarchica*-তে মানবজাতিকে এক মানবিক ব্যবস্থার অংশ হিসাবে দেখেছেন এবং স্থির করেছেন যে সারা পৃথিবী জুড়ে একটি মাত্র সাম্রাজ্য হওয়া উচিত এক রাজার অধীনে। স্বভাবতই এ কথা আজকের যুগে আমাদের কাছে অর্থহীন। দান্তের বিশ্বমানবভাবনায় তিনি আন্তর্জাতিকতবাদী নন, কারণ তাঁর পরিকল্পনায় সমস্ত জাতি তাদের জাতীয়তা হারায় এক সম্রাটের অধীনস্থ হয়ে। দান্তের সমসাময়িক দুবয় (Dubois) সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সমন্বয় হিসাবে এক ইউরোপীয় খৃস্টান কমনওয়েলথের প্রস্তাব করেন কিন্তু S. J. Hemblemen ১৯৩৩ সালে তাঁর *Plans for World Peace through Six Centuries* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে খৃস্টান জাতিগুলির ঐ সমন্বয় আসলে পরিকল্পিত হয়েছিল পুণ্যভূমিকে পুনরুদ্ধারের এক সার্থক ধর্মযুদ্ধের (crusade) প্রস্তুতি হিসাবে।

Hugo Grotius ১৬২৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *The Law of War and Peace* গ্রন্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণের কিছু নীতি সূত্রবদ্ধ করেছেন শুধু এই অর্থেই তাঁকে আন্তর্জাতিকতাবাদী বলা যায়। যদিও বা তাঁকে আমরা আন্তর্জাতিক আইনের জনক বলতে পারি তবু তাঁকে আন্তর্জাতিকতাবাদী বা বিশ্বমানবিকতার আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত এক বিশ্বসমাজের দার্শনিক বলতে পারি না।

ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী তালের্াঁকে লেখা রামমোহনের ঐতিহাসিক পত্র—আন্তর্জাতিকতাবাদের এক দলিল হিসাবে যেটি বিবেচিত হতে পারে, তার দুই দশকের আগের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের দিকে আমরা চোখ ফেরাতে পারি। ঐ চিঠি লেখা হয় ১৮৩২ সালে অর্থাৎ ভিয়েনা কংগ্রেস-এর ১৮১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮১৫ সালের জুন অবধি যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তার ১৭ বছর পরে। এর কিছুদিন আগে ইউরোপে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল প্যারিসের চুক্তি। ১৮১৫ সালের চতুঃশক্তি মৈত্রী এবং ১৮১৮ সালের পঞ্চশক্তি

মৈত্রী বিশ্বশান্তির হাতিয়ার হওয়ার বদলে হয়েছিল আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী। ঐগুলি যুযুৎসু মেজাজকে ঢাকা দেবার কিভাবে চেষ্টা করেছিল তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন ১৮২০ সালের ট্রপো কংগ্রেসে ঘোষিত হয় সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মাবাত্মক নীতি।

১৮২৩ সালের ২ ডিসেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রপতি মনরোর ঘোষণাও এক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নতুন এক আন্তর্জাতিক শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি নয়, মার্কিন স্বার্থের উপর সম্ভাব্য আঘাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার হুঁশিয়ারি। ডেলিয়ান কনফিডারেসি থেকে শুরু করে মনরো নীতি পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শান্তির সব প্রচেষ্টাই আসলে ছিল সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক জোট বাঁধার চেষ্টা। সে সবই ছিল এক ধরনেব যুদ্ধবাজ শান্তি প্রচেষ্টা, ধারালো তলোয়ারের দাপট প্রদর্শনের পর তাকে কোষবদ্ধ করার কায়দা। এর মধ্যে সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম ১৭৯৫ সালে প্রকাশিত ইম্যানুয়েল কান্টের *Perpetual Peaec* তত্ত্ব যেখানে জার্মান দার্শনিক চিন্তা করেছিলেন যুদ্ধবন্ধ চুক্তিতে আবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রদেব এক যুক্তরাষ্ট্র এবং যা নাকি টেনিসনের *Parliament of Man and Federation of the World* ধারণার প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগেব পূর্বাভাস। বামমোহনেব পক্ষে কাণ্ট-এর ঐ রচনার কথা জানার সম্ভাবনা খুবই কম।

তাই রামমোহন যখন ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখলেন সমস্ত মানবজাতি 'এক বিশাল পরিবারভুক্ত' তখন তিনি এমন কথা বললেন যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্ব। তিনি যে মধ্যস্থতার নীতি উল্লেখ করেছিলেন তা নতুন নয় কিন্তু যা উল্লেখযোগ্য তা হল তিনি এই মধ্যস্থতার জন্য কোনো বিশ্বসংঘের প্রস্তাব দেন নি। তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন প্রতিপক্ষ দু'দলের প্রতিনিধির মাধ্যমে মধ্যস্থতার। তিনি স্বভাবতই আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্যে আন্তর্জাতিক বিবাদ মেটানোর প্রশ্ন অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠাব ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামান নি। তিনি মূলত মানবিক সৌভ্রাত্র-বোধেব উপর জোর দিয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে ঐ বোধ বিজ্ঞান ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি চিঠিতে লিখলেন, 'এটা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে শুধু ধর্ম নয়, সাধারণ জ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে সমস্ত মানবজাতিই এক বিশাল পবিবার যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা হল বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী।' আন্তর্জাতিকতাবাদের ইতিহাসে মানব ঐক্যের ভাবনা

প্রসঙ্গে এক মানবিক দৃষ্টি হিসাবে এক গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত ঘোষণা। কিন্তু তাঁর এই ধারণাকে দীর্ঘ প্রবন্ধ অথবা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করার অবকাশ পান নি রামমোহন। এটা সত্যই খুব দুর্ভাগ্যজনক যে এই রকম একটি ঐতিহাসিক বিবৃতি রয়ে গেল শুধুমাত্র ফরাসী সরকারের কাছে লিখিত এক চিঠিতে, যেখানে প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে মানুষমাত্রই একদেশ থেকে অন্যদেশে অবাধে যাতায়াত করতে পারেন।

অবশ্য এই চিঠিই রামমোহনের আন্তর্জাতিকতাবাদের একমাত্র দলিল নয়। ভারতের জাতীয় নবজাগরণের প্রসঙ্গেও রামমোহন আন্তর্জাতিকতাবাদী। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ক্রমশ পরিস্ফুট হচ্ছিল, তাঁর দেশে ঔপনিবেশিক শাসন প্রসঙ্গে রামমোহনের দৃষ্টি তার থেকে স্বভাবতই স্বতন্ত্র। জাতীয়তাবাদীরা ঔপনিবেশিক শাসনকে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর ভাবতেন এবং তার উচ্ছেদই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক শাসনকে উচ্ছেদ করার কোনো পরিকল্পনা রামমোহনের ছিল না। তিনি তাকেই দেশের নবজাগরণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এই দিক থেকেই তাঁর সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড ছিল আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দৃষ্টান্ত। তাঁর দেশের পুনর্জাগরণের জন্য ভারত-ব্রিটিশ যৌথ প্রচেষ্টায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বৈদেশিক ব্যাপারটি ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও নবজাগরণের এক জীবন্ত উপাদান হিসেবে তাকে ব্যবহার করতে তিনি নিরুৎসাহ হন নি। ইতিহাসের পরিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর দেশাত্মবোধও অবস্থাগতিকে ঔপনিবেশিক শাসনকে স্বীকার করেছিল। এমন-কি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'ও শেষ হয়েছে ব্রিটিশ আনুগত্যের সুরেই— 'ইংরাজ মিত্র রাজা'। আজকের বাতাবরণে পুষ্ট আমাদের পক্ষে তৎকালীন মনোভাবকে বোঝা কঠিন।

কিন্তু ব্রিটিশ প্রজা হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন পৃথিবীর স্বাধীন নাগরিক হিসাবেই কাজ ও চিন্তা করে গেছেন। তাঁর সমসাময়িক দেশ-বিদেশের কোনো রাষ্ট্রনেতাই তৎকালীন পৃথিবীর বড়ো বড়ো ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর মতো ভাবিত হন নি। তিনি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন স্পেনে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের সংগ্রাম, অস্ট্রিয়ার দাসত্ব থেকে ইটালীর মুক্তিসংগ্রাম, আয়ারল্যাণ্ডের আন্দোলন এবং আমেরিকায় দাসত্বপ্রথা বিলোপের জন্য বিক্ষোভ। নেপল্‌সে অস্ট্রিয়ার আক্রমণের প্রসঙ্গে তিনি বাকিংহামকে জানান:

'নেপল্‌সবাসীদের দুর্দশা আমারও দুর্দশা, তাদের শত্রু আমার শত্রু।' যখন ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে প্যারিসের তিন দিনের বিপ্লবের খবর কলকাতায় এসে পৌঁছায় তখন তিনি এক ভোজসভার আয়োজন করেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতে খুব কম লোকই মানুষের স্বাধীনতা ও প্রগতি প্রসঙ্গে রামমোহনের বিশ্বজনীনতার ভাবধারার তাৎপর্য বুঝতেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে গেলে সেখানে অনেকেই তাঁর বিশ্বজনীন সমবেদনার গভীরতায় আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাঁর জীবনীকারদের একজন ব্রিটিশ মহিলার এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: I take a personal concern in a third quarter of the globe since I have seen the excellent Rammohan Roy. জেরেমি বেন্থামই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি রামমোহনের আন্তর্জাতিকতাবাদী চরিত্র লক্ষ্য করেছিলেন যখন এক চিঠিতে তিনি রামমোহনকে অভিহিত করেছিলেন 'গভীর প্রশংসভাজন ও মানবসেবায় প্রিয় সহকর্মী' বলে। কিন্তু উপযোগিতাবাদী দার্শনিক বেন্থাম যিনি ১৭৮০ সালে সর্বপ্রথম 'international' বা 'আন্তর্জাতিক' শব্দটি ব্যবহার করেন তিনি জানতেন না যে রামমোহন internationalist বা আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন কারণ তিনি ধর্মচেতনায় ছিলেন একেশ্বরবাদী।

রামমোহনের মৃত্যুর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মৃতিরক্ষা কমিটি-আয়োজিত একটি সভায় পঠিত ইংরাজি বক্তৃতার তর্জমা করেছেন শ্রীঅমরজিৎ দত্ত।

রামমোহনের শিক্ষাচিন্তা

নলিনী দাশ

রাজা রামমোহন রায়কে বলা হয় আধুনিক ভারতের নবজাগরণের উদ্‌বোধক।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকেই ধীরে ধীরে দেশের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছিল, কিন্তু তখনো সেটা একটা স্পষ্ট রূপ ধরে নি। ১৮১৫ খৃস্টাব্দে রামমোহন স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস করতে আসেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বিশিষ্ট প্রগতিবাদী ভাবতীয়রা সমবেত হলেন, ভারত-দরদী কিছু ইংরেজ বন্ধুও এগিয়ে এলেন। সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে আত্মীয়-সভা নামে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে রামমোহন দেশের ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা -সংস্কারের কাজে হাত দিলেন। ভারতে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রামমোহন যে একজন বিশিষ্ট পথিকৃৎ এ কথা আজ সর্বজনবিদিত। আশ্চর্য দূরদৃষ্টিবলে তিনি বুঝেছিলেন যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে সর্বাঙ্গীণ নবজাগরণ আনতে হলে সর্বাগ্রে চাই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা। তখন জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া ও শুভংকরী শেখানো হত। সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী শিক্ষার জন্য যে-সব টোল-চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসা ছিল, তাদের পাঠ্যক্রম ছিল নিতান্ত সীমিত ও সংকীর্ণ। আর ছিল নিম্নমানের ইংরেজি পাঠশালা, যেখানে ইংরেজি শব্দ ও তার বাংলা প্রতিশব্দ সুর করে কণ্ঠস্থ করানো হত, যেমন 'পাম্পকিন = কুমড়া, কিউকাম্বার = শসা, ব্রিঞ্জেল = বার্তাকু, প্লাউম্যান = চাষা'। আধুনিক বিজ্ঞান বা ইংরেজি ভাষা শেখাবার কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না। খৃস্টান মিশনারিরা কয়েকটি স্কুল খুলে-ছিলেন কলকাতার বাইরে, কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সেখানে ছেলেদের পাঠাতেন না। দেশবাসীদের রুষ্ট করবার আশঙ্কায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মিশনারিদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন না সে যুগে।

অষ্টাদশ শতকের শেষে তাই আমরা দেখতে পাই যে উইলবারফোর্স, চার্লস গ্রাণ্ট প্রমুখ খৃস্টান মিশনারিরা ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন চাইলেও, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৮১ খৃস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ খৃস্টাব্দে কাশী সংস্কৃত কলেজ খুললেন।

১৮১৩ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নূতন সনদ দেবার সময়ে শর্ত দেওয়া হয়েছিল যে 'বার্ষিক একলক্ষ টাকা ব্যয়ে ভারতীয় সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতি করতে হবে, শিক্ষিত নরনারীদের উৎসাহদান এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে'। কিন্তু প্রাচ্য-শিক্ষা বনাম পাশ্চাত্য শিক্ষা নিয়ে বিতণ্ডার ফলে এই সামান্য অর্থও বহু বৎসর পুরোপুরি ব্যয়িত হয় নি। জেনারেল কমিটি ফর পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের (G. C. P. I.) উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে প্রাচ্যবাদীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন তাই ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কোনো সুব্যবস্থা হল না।

রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়-সভা প্রথম থেকেই আধুনিক ও উচ্চমানের ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা ও পরিকল্পনা করেছিলেন। রামমোহন ও ডেভিড হেয়ার ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, গোপীমোহন ঠাকুর, কালীশংকর ঘোষাল প্রমুখ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সম্ভবত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ই সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টের কাছে গিয়ে বলেন যে 'সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইউরোপীয়রা নিজেদের ছেলের জন্য যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন' তেমনি উচ্চমানের ইংরেজি স্কুল খুলতে তাঁরা আগ্রহী।

স্যার হাইড ইস্ট শুধু মৌখিক সহানুভূতিই জানান নি, সভা করে এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু কিছু-সংখ্যক বিদ্যোৎসাহী সংরক্ষণশীল হিন্দুদের রামমোহন-বিরোধিতা এতই তীব্র ছিল যে রামমোহন এর মধ্যে থাকলে তাঁরা থাকবেনই না। ফলে, রামমোহন নিজে এর মধ্যে থাকলেন না কিন্তু আত্মীয়-সভার অন্যান্য অনেক সভ্যই যে শুধু থাকলেন তাই নয়, তাঁরাই অর্থদান করলেন সবচেয়ে বেশি। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় হলেন প্রথম সম্পাদক। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে এই ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হল, পরে যার নাম হয়েছিল হিন্দু কলেজ: পরবর্তীকালে সেটি রূপান্তরিত হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে এই পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেই রামমোহন সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। ১৮১৬ খৃস্টাব্দেই সুরিপাড়ায় তিনি একটি স্কুল খোলেন এবং নিজগৃহে মিঃ মোরক্রফ্‌ট্ নামে এক ইংরেজ শিক্ষক নিযুক্ত করে উচ্চমানের ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই দুটিকে কলকাতার সর্বপ্রথম আধুনিক ইংরেজি বিদ্যালয় বলা চলে। কিন্তু স্কুল দুটি বেশিদিন চলে নি।

১৮২২ খৃস্টাব্দে রামমোহন সিমলা স্ট্রীটে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে আর

একটি বিদ্যালয় খোলেন। সেই প্রচেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী ও সার্থক হয়েছিল, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইংরেজি-শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে রামমোহন ডেভিড হেয়ার ও উইলিয়াম এডামের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন। রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ যখন প্রথম কলকাতায় আসেন তখন কলকাতায় স্কুল খোলার কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন রামমোহনের কাছে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সাক্ষ্য দেবার সময়ে রেভারেণ্ড ডাফ বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রধান কৃতিত্ব দুই ব্যক্তির— ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায়— যিনি ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে রামমোহন সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁরা যেন দরিদ্র ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন।

১৮২৩ খৃস্টাব্দে রামমোহন তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র লেখেন। সেই বৎসর জি. সি. পি. আই.-তে প্রাচ্যবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা আরো কয়েকটি সংস্কৃত কলেজ এবং আরবী-ফারসী মাদ্রাসা খুলতে চাইছিলেন। রামমোহন তাঁর পত্রে অনুরোধ জানালেন যেন তার পরিবর্তে সরকারি ব্যয়ে উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ শিক্ষক নিয়োগ করে উচ্চমানের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। কঠিন সংস্কৃত ভাষায় বেদান্ত দর্শনের জটিল বিতণ্ডা মোটেই জন-শিক্ষার উপযোগী নয়। যে আধুনিক বিজ্ঞানের বলে য়ুরোপীয় দেশগুলি পৃথিবীতে এত শক্তিশালী হয়েছে, সেই গণিত. রসায়ন ও অন্যান্য বিজ্ঞান ভারতবাসীকে শেখানো হোক।

এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রের কোনো উত্তর রামমোহন পান নি ; প্রধানত প্রাচ্যবাদী জি. সি. পি. আই.-এর সম্পাদক মিঃ স্টার্লিং মন্তব্য করেন যে দেশবাসী রামমোহনকে সমর্থন করেন না, পণ্ডিত এবং মৌলবীরা ইংরেজি শিক্ষা চান না। তা ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান শেখাবার উপযুক্ত শিক্ষক নেই। পাঠ্যপুস্তক ও সরঞ্জামের অভাব।

বলা বাহুল্য ওঁদেরই ভুল হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ও মৌলবীদের স্বার্থবিরোধী, তাঁরা তা চাইবেন না এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু প্রগতিকামী আধুনিক ভারতীয়েরা তখন ইংরেজি শিক্ষাই চাইছিলেন। তার প্রমাণ হিন্দুস্কুল এবং রামমোহন ও ডেভিড হেয়ার-স্থাপিত ইংরেজি

স্কুলগুলির জনপ্রিয়তা। শিক্ষক, পুস্তক আর সরঞ্জামের অভাব কিভাবে পূর্ণ করা যাবে সে কথা তো রামমোহন তাঁর ঐ পত্রেই বলেছিলেন, যে একলক্ষ টাকা প্রতিবৎসর শিক্ষাখাতে ব্যয় করার কথা, তার অনেকটাই বাস্থিত হয় না, সেই অর্থে ইংলণ্ড থেকে উপযুক্ত শিক্ষক এবং উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক আনা হোক। ক্রমে ভারতেই সে-সব পাওয়া যাবে।

পরবর্তীকালে যখন জি সি. পি আই-তে পাশ্চাত্যবাদীরা দলে ভারী হলেন, লর্ড বেন্টিঙ্ক সরকারিভাবে ইংরেজিশিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করলেন, তখন তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে রামমোহনের পত্রটিকে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ইংরেজিশিক্ষার মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে ভারতের নবজাগরণ দ্রুততর হয়েছিল।

কিন্তু রামমোহন যা চেয়েছিলেন তার সবটা গ্রহণ করা হয় নি, ফলে এই শিক্ষার কিছু কুফলও দেখা গিয়েছিল। চাহিদার অনুপাতে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয় নি ; শিক্ষক, পুস্তক ও সরঞ্জামের অভাব ছিল। মুখস্থ বিদ্যাই তাই প্রাধান্য পেয়েছিল। পরে যখন ভারতীয় ভাষাগুলি সুপরিণত হল, তখনো বহুবৎসর শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজিই রাখা হল। ইংরেজি-জানা পণ্ডিত-ব্যক্তি ও ইংরেজি-না-জানা জনসাধারণের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল, যার প্রভাব থেকে আমরা এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারি নি।

রামমোহন কিন্তু স্বাদেশিকতা-বিমুখ ইংরেজি শিক্ষা চান নি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্য সুশিক্ষক ও উচ্চমানের পুস্তকের মাধ্যমে ইংরেজি শেখাতে চেয়েছিলেন। সে সময়ে য়ুরোপেও প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান শিক্ষার মর্ম বোঝেন নি, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রীক-ল্যাটিনকেই প্রাধান্য দিতেন। এখানেই রামমোহনের আশ্চর্য দূরদৃষ্টি ও আধুনিকতা প্রকাশ পাচ্ছে। মাতৃভাষাকে অবহেলা করে কেবলমাত্র ইংরেজি শেখারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম যুগে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম থেকে মাতৃভাষাকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছিল, যার ফল মোটেই শুভ হয় নি। এই প্রবণতা লক্ষ্য করে ১৮২২ খৃস্টাব্দে রামমোহন তাঁর নিজস্ব সংবাদপত্র 'সংবাদ-কৌমুদী'-তে কঠে'র সমালোচনা করেন। মাতৃভাষা না শিখে ইংরেজি শিখতে গেলে যে কোনো ভাষাই ভালোভাবে আয়ত্ত করা যায় না, এটা রামমোহন তখনই বুঝেছিলেন। দুঃখের বিষয়, আজও অনেকে এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পথিকৃৎ রামমোহন বাংলা গদ্যভাষার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম করেছিলেন। তিনি স্কুলবুক সোসাইটির হয়ে 'ভূগোল' ও 'খগোল' পাঠ্যপুস্তকও লেখেন। তাঁর রচিত বাংলা ব্যাকরণও বিশিষ্ট স্থান নিয়েছিল। রামমোহনের স্কুলের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল, সেখানে ইংরেজি এবং বাংলা দুটি ভাষাই ভালোভাবে শেখানো হত। তখনকার পত্রপত্রিকা পড়লে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা যায়। ১৮২৮ খৃস্টাব্দে 'বেঙ্গল ক্রনিক্ল্' ১০ জানুয়ারি লিখছেন যে রামমোহনেব স্কুলের ৫০টি ছাত্র পঠন, বানান, ব্যাকরণ ও অনুবাদ পরীক্ষায় সফল হয়েছে। উচ্চশ্রেণীর ছেলেরা জয়েসেব বলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ইউক্লিডের জ্যামিতি ও ভলতেয়ার-রচিত য়ুরোপের ইতিহাসের পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। সম্পাদক আবো মন্তব্য করেছেন যে বিশ্ববিদিত এক বদান্য ব্যক্তি এই স্কুলের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করছেন। দেশের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপাত করছেন। নাম না থাকলেও ইনি যে রামমোহনই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বছরখানেক পরেকার আর-একটি বিবরণে দেখা যায় যে এই ছাত্ররা পোপের অনূদিত হোমারের ওডিসি, গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাস, জ্যামিতি, ভূগোল. গ্লোব, পাটীগণিত এবং উচ্চ মানের ইংরেজি ও বাংলা পরীক্ষায় প্রশংসনীয় জ্ঞান ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই রামমোহনের স্কুলের ছাত্রদের গভীর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও জ্ঞানস্পৃহা দেখা গিয়েছিল। কখনো হিন্দু কলেজের ছেলেদের সঙ্গে যুগ্মভাবে, কখনো বা নিজেরাই নানা সভা-সমিতি-পত্রিকা তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে যার গুরুত্ব অপরিসীম। তখনকার 'বেঙ্গল ক্রনিক্ল্', 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'জনবুল' প্রভৃতি পত্রিকায় এই-সব প্রতিষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সবই এই ছেলেদের আলোচ্য ছিল।

১৯।১।১৮৩৩-এর 'সমাচার দর্পণে' রামমোহনের স্কুলের ছেলেদের এক সভার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়, 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' নামে এই সভার বৈশিষ্ট্য ছিল, এখানে বাংলাভাষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা হত। সভার প্রথম সভাপতি হন রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ এবং প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকাতেও এই সভার পরবর্তী কাজের বিশেষ প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল।

এইভাবে রামমোহন ইংরেজি ও বাংলা, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় ইংরেজ সরকার প্রথমে উগ্রপ্রাচ্য ও পরে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য দৃষ্টি ও নীতি গ্রহণ করেন। রামমোহনের সমন্বয়ের আদর্শ গ্রহণ করলে ভারতের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাস নিঃসন্দেহে আরো অনেক সাফল্য ও সার্থকতার সাক্ষ্য দিতে পারত।

উল্লেখপঞ্জী

১. Sophia Dobson Collet : *Life and Letters of Raja Rammohun Roy.*

২. English Works of Raja Rammohun Roy.

৩. Ramprasad Chanda & Jatindra Kumar Majumdar : *Selecions from official letters and Documents Relating to thc Lıfe of Raja Rammohun Roy*, Vol 1.

৪. Jatindra Kumar Majumdar : *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements ın Indıa* (A Selection from records)

৫. সুকুমার সেন : 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য'

৬. কাজী আবদুল ওদুদ : 'বাংলার জাগরণ'

৭. পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।'

রামমোহন : রাজনীতি ও দেশাত্মবোধ

নির্মাল্য বাগচী

হেগেল বড়োলোক (greatman) সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছিলেন, রামমোহন সম্পর্কে আলোচনায় তা ভাববার মতো :

> "the one who can put into words the will of his age, tell his age what its will is, and accomplish it. What he does is the heart and essence of his age ; he actualizes his age."[১]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রামমোহন প্রসঙ্গে অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন যে,

> "যেদিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতে আসিলেন, সেই দিন হইতে পরিবর্তন আরম্ভ হইল, সেইদিন হইতে নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হইল, এই পরিবর্তন এখনও চলিতেছে।··· ইনি সমাজ যে ভাঙ্গিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছিলেন, সমাজ যে পথে যাইবে তাহাও বুঝিয়াছিলেন এবং প্রাণপণে সর্বপ্রযত্নে সমাজকে এই পথে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।"[২]

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কলিকাতাবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে বলেন,

> "আপনারা সকলেই জানেন, যেদিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিলেন, সেইদিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেইদিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যপথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এখন ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে।"[৩]

ইউরোপে প্রথম যাঁরা ধনতন্ত্রের সমালোচনা করেছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন সিসমণ্ডি (১৭৭৩-১৮৪২)। সিসমণ্ডির ঐতিহাসিক ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অবদান আমরা কোন্ মাপকাঠিতে বিচার করব, সে সম্পর্কে লেনিন বলেন,

"Historical services are not judged by the contributions historical personalities *did not make* in respect of modern requirements, but by *the new contributions they did make* as compared with their predecessors."[8]

রামমোহন একাধারে মধ্যযুগের কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে নূতন পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে, তাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রামমোহনের মধ্যে এই নূতন যুগ সম্পর্কে যে চৈতন্য আমরা দেখতে পাই, সেখানেই রামমোহনের বৈশিষ্ট্য, তাঁর নূতনত্ব। মধ্যযুগকে ভেঙে ফেলে কিভাবে ভারতবর্ষ নূতন আধুনিক যুগে উপনীত হবে, এটাই ছিল রামমোহনের একমাত্র চিন্তা ও তার জন্য বিভিন্ন কর্ম।

রংপুর ছিল (১৮০৯-১৪) রামমোহনের নূতন চিন্তা ও ধ্যান ধারণার প্রস্তুতি পর্ব। সেখানে ডিগবির সান্নিধ্যে তিনি পশ্চিমের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন ; তিনি তাঁর গ্রন্থাগারে ছিলেন নিরলস পাঠক এবং বিলাত থেকে যে-সব পত্রপত্রিকা আসত, তিনি ছিলেন তার নিয়মিত পাঠক, এইভাবে বিশ্বের জানালা তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে, ডিগবির সংস্পর্শে আসার আগে রামমোহনের পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো সুযোগ হয়েছিল কি না? ঐতিহাসিক কে. এম পানিক্কর একাধিকবার এমন কথাও বলেছেন, ফরাসী প্রগতিবাদী চিন্তানায়ক কণ্ডরসেটের (Antoine Condorcet : 1743-1799) সঙ্গে রামমোহন রায়ের পত্রালাপ ঘটেছিল, "was even said to have been in correspondence with Condorcet."[৫] যদি এই সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তবে রামমোহনের চিন্তাধারার বিকাশ সম্পর্কে নূতন আলোকপাত ঘটবে। এর ফলে আরো জানা যাবে, রংপুর পর্বের অনেক আগেই রামমোহনের সঙ্গে পশ্চিমের যোগাযোগ ঘটেছিল।

২

রামমোহন গভীর ইতিহাসবোধ থেকে অনুভব করেছিলেন এক বিশ্ববোধ। এর আগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ছিল ; তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে এই বিশ্ব-ইতিহাস গড়ে উঠতে থাকে ; একই চিন্তার স্রোত দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়তে

থাকে ; বিভিন্ন দেশগুলি "পারস্পরিক নির্ভরতা'র"[৬] ভিত্তিতে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। "World History was not always in existence; history as a World History is a result."[৭]

এইভাবে বুর্জোয়া যুগের সৃষ্টি হয় ; ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক বাজারের অর্থনীতি সমগ্র বিশ্বকে নিকটে টেনে এনেছে, যা প্রাচীন বা মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের এই নূতন পরিবর্তন রামমোহন তাঁর চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ধনতন্ত্র এই নির্দিষ্ট যুগে ইতিহাসগতভাবে এক প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ইতিহাসের একটি বড়ো পদক্ষেপ। বুর্জোয়াশ্রেণী সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সমগ্রজাতির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। রামমোহন সেই আধুনিকযুগের প্রবক্তা।

লেনিনের একটি বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

"The word bourgeois is often understood very incorrectly, narrowly and unhistorically... when our enlighteners of the forties and sixties wrote, all social problems amounted to the struggle against serfdom and its survivals.... No selfishness was therefore displayed at that time by the ideologists of the bourgeoisie; on the contrary.... they quite sincerely believed in universal well-being and sincerely disired it."[৮]

এ কথা উঠিতে পারে, ভারতবর্ষে রামমোহনের কালে কতটুকু ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল বা মোটেই ঘটেছিল কিনা ; সুতরাং রামমোহনের পক্ষে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবার কি বাস্তব অবস্থা ছিল ? এর উত্তরে এই কথা বলা চলে, রামমোহনের পক্ষে এটাই কৃতিত্ব যে এই ঐতিহাসিক সম্ভাবনাকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

৮ এমন প্রশ্নও উঠতে পারে, রামমোহনের যুগে তাঁর প্রচার ও আন্দোলন সমাজের এক মুষ্টিমেয় সামান্য অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় নগণ্য সংখ্যাই সমাজকে নূতন চৈতন্যের সন্ধান দেয়। তারাই সমাজে অগ্রগামী পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

কার্ল মার্কস তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছেন, "The intellectual movement now taking place in Russia testifies to the fact that deep below the surface fermentation is going on. Minds are always connected by invisible threads with the body of the people."[১] সমাজের গভীরে অদৃশ্য যোগসূত্রে নূতন ধ্যানধারণা ছড়িয়ে পড়ে। না হলে রামমোহন রায়কে নিয়ে সুদূর পল্লীতে নানারকম ছড়া লেখা হত না।

কলকাতার এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভ্যুত্থান মার্কসের নজরে পড়েছিল : ১৮৫৩ সালে 'নিউইয়র্ক ট্রিবিউন'-এ প্রকাশিত 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' প্রবন্ধে মার্কস লিখেছেন "কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নূতন এক শ্রেণী গড়ে উঠছে, যারা সরকার পরিচালনায় যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত "

এই নূতন পরিবর্তন সম্পর্কে রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরা যে সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ 'বঙ্গদূত'-এর ১৮২৯ সালের ১৩ই জুন (১ আষাঢ়, ১২৩৬) -এর 'গৌড় দেশের শ্রীবৃদ্ধি' নামক প্রবন্ধে :

> "গত ক-এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড় রাজ্যের সর্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোনো সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্যক, অতএব লিখিতেছি এই দেশের পূর্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পূর্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে. দ্বিতীয়তঃ এদেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক য়ুরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে, অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে দূরীভূত করণার্থে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু যেহেতুক ঐ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং।
>
> পূর্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিনশত টাকা পর্যন্ত তাহার মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে এবং এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট ; এমতে ভূম্যাদির মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে। যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য

ছিল না, এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।

এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল। তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত— অতএব দেশব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং ঐ অসংখ্যোপকার কেবল গৌর দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্তু ইংলণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্থৈর্য্য প্রতিও বটে।

অতএব যে হেতুক লোকেরদিগের যখন এপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে এই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক, ইহার অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংলণ্ডের পূর্ববৃত্তান্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবেক···।"

রামমোহন নিজে এই যুগান্তরকে সচেতনভাবে ইউরোপীয় রেনাসাঁস-এর সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করেছিলেন : "I began to think that something similar to the European Renaissance might have taken place here in India."[১০]

৩

জিজ্ঞাস্য থেকে যায়, ইংরেজের অধীনে পরাধীনতার প্রশ্নটি তিনি কিভাবে বিচার করেছিলেন?

তার আগে ইতিহাসের একটা মৌলিক প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে, পশ্চিমের এই প্রচণ্ড আঘাত ছাড়া ভারতবর্ষের পক্ষে আধুনিক যুগে পৌঁছানো সম্ভবপর ছিল কি না? মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতি ভারতবর্ষের উন্নতির পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাণিজ্যের বিকাশ ঘটলেও, শহর সৃষ্টি হলেও, উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production)-এর ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো আবিষ্কার এখানে ঘটে নি, কোনো নূতন technology এখানে গড়ে উঠিতে পারে নি।

নিজস্ব অভ্যন্তরীণ শক্তিতে কোনো শিল্প-বিপ্লব দেখা দেবার সম্ভাবনা ছিল না ; স্বাধীন ধনতান্ত্রিক বিকাশ সম্ভবপর ছিল না। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় অর্থ-নীতিতে এর কোনো প্রস্তুতি ছিল না : সোভিয়েত লেখকেরা এই সমাজ ও অর্থনীতিকে "উন্নত সামন্ততন্ত্র" (advanced feudalism) বলে বর্ণনা করেছেন। বণিক মূলধন (Merchant Capital) এর উৎপত্তি ঘটলেও, এই সামন্ততন্ত্রকে ভাঙবার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। মার্কস লিখেছেন : "It can not by itself contribute to the overthrow of the old mode of production, but tends rather to preserve and retain it..."[১১] ঐতিহাসিক ভাবে, বস্তুগতভাবে ইংরেজকে এই কাজটি করতে হয়েছিল, যেজন্য মার্কস বলেছেন 'ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার' 'এশিয়া মহাদেশের একমাত্র সামাজিক বিপ্লবে' 'নতুন জগতের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি'।[১২]

রামমোহনের সঙ্গে ফরাসী পর্যটক ভিক্তর জাকমোঁর যে আলোচনা হয়, এ ছাড়া অন্যত্র ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, সে সম্পর্কে কোনো কোনো ঐতিহাসিক এ প্রশ্ন তুলেছেন, রামমোহন কি কোনে কোনো ক্ষেত্রে পরাধীনতাকে বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে করতেন। রামমোহনের বক্তব্যকে সরলীকৃত এক রেখাশ্রয়ী করে দেখলে রামমোহনের বক্তব্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য বোঝা যাবে না। বিদেশী শাসন বা পরাধীনতা সম্পর্কে রামমোহন একটি দ্বান্দ্বিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন যেখানে Providence কথাটি ব্যবহার করেছেন, সেখানে History বা ইতিহাস কথাটি ব্যবহার করলে রামমোহনের প্রতি সুবিচার করা হবে।[১৩]

ফ্রান্স যখন আলজেরিয়া জয় করে (১৮৪৭) তখন এঙ্গেলস্ একটি সাময়িক পত্রিকায় বিজয়ের তাৎপর্য সম্পর্ক লেখেন, "After all, the modern bourgeoisie, with civilisation, industry, order and atleast relative enlightenment is preferable to the feudal lord or to the maurading robbers, with the barbarian state of society to which they belong."[১৪]

জারের আমলের রাশিয়া-কর্তৃক মধ্যএশিয়া অধিকার সম্পর্কে এঙ্গেলস্ মার্কসকে লিখেছেন : "Russia, on the other hand, is truly progressive by comparison with the East. Russian Rule, with all its infamy, all its slavic dirtiness, is civilising for the

Black and Caspian Seas and Central Asia, for the Bashkirs and Tartars; and Russia has absorbed for more cultural elements and especially industrial elements...[১৫] বিশ্বইতিহাসের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস্ এই-সব বক্তব্য রেখেছিলেন; কিন্তু এখানেই মার্কস ও এঙ্গেলসের বক্তব্য শেষ হয়ে যায় নি। পরবর্তীকালে বিদেশী শাসক সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য আরো কঠোর ও তীক্ষ্ণ হয়েছে; ১৮৬৭ সালে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে মার্কস লিখেছেন: "Rendering the expansion of production more or less impossible and reducing the direct producers to the physical minimum of means of subsistence. This is particularly the case, when this form is met with and exploited by a conquering commercial nation, e. g., the English in India...."[১৬]

রামমোহন ভিক্তর জাকমোঁকে (২১ জুন, ১৮২৯) যে কথাগুলি বলেছিলেন, তার প্রথম অংশ হল, "Conquest is very rarely an evil when the conquering people are more civilised than the conquered, because the former bring to the latter the benefits of civilisation." এ হল বিশ্বইতিহাসের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে একটি সাধারণ বক্তব্য। পরের মুহূর্তেই তিনি বলেছেন, এই পরদেশ অধীনতা ও শাসন একটি স্থায়ী ব্যাপার হবে না; ইতিহাসের গতি সেখানেই থেমে যাবে না। ইতিহাসের অন্তর্নিহিত যে দ্বন্দ্বময় গতি (dialectics), তার ফলে বিজিত ও বিজেতার মধ্যে যে মূল বিরোধ (main contradiction) তার অস্তিত্ব সম্পর্কে রামমোহন পুরোপুরি সচেতন ছিলেন, এবং সংঘাত যে ঘটবে, সে সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। সেজন্য তিনি বলেন, "India requires many more years of English domination, so that she might not have many things to lose." এই পরাধীনতার মেয়াদ কত বছর চলবে, সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর, এই তথ্য আমরা পাই রামমোহনের সচিব স্ট্যান ফোর্ডের বিবরণ থেকে।[১৭] এই অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করে, সামন্ততন্ত্র ও পশ্চাদপদতাকে অতিক্রম করে এক নূতন সামাজিক ভিত্তি গড়ে তুলবে এবং ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-

বিতা আয়ত্ত করে ইংরেজের সমকক্ষ হয়ে উঠবে ও চ্যালেঞ্জ করবার মতো সাহস ও শক্তি অর্জন করবে। জাকমোঁকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন, এরই পাশাপাশি "she is reclaiming her political independence" ভারতবর্ষ তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে যাবে।

ঘটনার মধ্য দিয়ে রামমোহনের ইংরেজ সম্পর্কে বিরোধিতা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার বিরুদ্ধে রামমোহন সোচ্চার হয়ে ওঠেন; প্রতিবাদস্বরূপ নিজের কাগজ 'মিরাৎ-উল আখবর' প্রকাশনা তিনি বন্ধ করে দেন। ইংলণ্ডের রাজার নিকট প্রতিবাদে তিনি যে ঐতিহাসিক পত্র লেখেন (১৮২৩) তাতে তিনি অভিযোগ করেন যে ইংরেজ রাজত্বে তুলনামূলকভাবে অনেক সুযোগ সুবিধা থাকলেও, ভারতবাসীরা এই সময়ে তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছিল— "the natives of India have entirely lost this political consequence." [১৮]

রামমোহন ১৮২৩ সালে 'Final Appeal to the Christian Public' বইয়ের ভূমিকায় 'বিদ্রোহের অধিকার' ঘোষণা করেন— "They may be justified in opposing any system, religious, domestic or political, which is immical to the happiness of society or calculated to debase the human intellect." ধর্মীয়, পারিবারিক বা রাজনৈতিক যে-কোনো ব্যবস্থা— যা সমাজের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর বা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে হেয় করে— তার বিরোধিতা করা যুক্তিসংগত।

প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে রামমোহন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপক্ষে বলতে কোনো দ্বিধা করতেন না। এঁবি ডুবোয় এইরকম একটি সভায় (১৮২৩) প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন; তিনি তাঁর বিবরণীতে লিখছেন: "I observed him, at an entertainment he recently gave to the Spaniards living in Calcutta, presuming to give a decided opinion on the late revolution in Spain and emphatically boasting in an elaborate speech, published with an equal emphasis in most of the public papers at that presidency, the advantages of religious and political freedom."[১৯]

জুরী বিলের (১৮২৮) প্রতিবাদে রামমোহন রায় এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত সরকারকে এই বিল প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য

করেন। সাম্রাজ্যবাদের চিরাচরিত ভেদনীতির তিনি মুখোশ খুলে দেন। ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন, আজ যদি সম্ভবপর নাও হয়, একশো বছর পরে ভারতবর্ষ সেই শক্তির অধিকারী হবে যার ফলে "resist effectually any injust and oppressive measures" এবং পরিণত হবে "trouble-some and annoying as a determined enemy."[২০]

৪

প্রশ্ন উঠতে পারে ইংরেজ-বিরোধিতার যে পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা মোটেই বিপ্লবী ছিল না, নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারবাদী পথই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা মনে রাখা দরকার কোনো আন্দোলন যুগের চৈতন্য ও অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গে হেগেলের একটি বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: "It is just as foolish to think that any philosophy can go beyond the bounds of its contemporary world as to believe that a certain individual can jump his epoch."

সংগ্রামের ধরন (forms of struggle) নির্ভর করে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর, এর থেকে বিচ্যুতি ঘটলে আন্দোলনের মারাত্মক ক্ষতি হয়। লেনিন লিখেছেন: "Marxism demands an absolutely *historical* examination of the question of the forms of struggle. To treat this question apart from the concrete historical situation betrays a failure to understand the rudiments of dialectical materialism."[২১]

প্রশ্ন উঠেছে, কোথায় সেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, ইংরেজের বিরুদ্ধে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করার ঘোষণা, রামমোহন তো ব্রিটিশ শাসনকে চরমপত্র দেন নি, কোনো confrontation, মুখোমুখি সংঘর্ষে যান নি। সেই সময়কার অবস্থা বিবেচনায়, এ-সব হত সম্পূর্ণ বাস্তব-বিরোধী।

ভিয়েৎনামের বরেণ্য নেতা হো. চি. মিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ নেই। ১৯১৯ সনের জানুয়ারি ভার্সাই শান্তি সম্মেলনে হো. চি. মিন যে আটদফা দাবি পেশ করেন, তাতে ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার দাবি তোলেন নি। তিনি দাবি করেন সেই-সব নাগরিক স্বাধীনতা, যেমন

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতির অধিকার, চলাফেলার অধিকার, যা ফ্রান্সের মানুষ ভোগ করে, এ-সব ভিয়েৎনামকে দেওয়া হোক। তিনি শিক্ষার, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় স্থাপনের দাবি করেন।[২২]

রামমোহন মুদ্রাযন্ত্রের সুযোগ পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করেন ; প্রচারের উদ্দেশ্যে একাধিক ভারতীয় ভাষায় বই ও সংবাদপত্র প্রকাশ করেন এবং নিজ ব্যয়ে বিনামূল্যে বহুক্ষেত্রে বিতরণ করেন। গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও গণদরখাস্ত পেশ, সভাসমিতি আহ্বান, বিতর্কে যোগদান, শিক্ষার প্রসার, সমাজ সংস্কার, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল চিন্তা ও আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ, এই ভাবে রামমোহন দেশের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন, "বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস"।[২৩]

রামমোহন দেশের মানুষের উপর নির্ভর করেছিলেন, নূতন চেতনাকে তারা যদি গ্রহণ করতে পারে, তবে সেই শক্তির সৃষ্টি হবে, যা আধুনিক ভারতবর্ষকে জন্ম দেবে ; ভবিষ্যতের চিত্রটি তিনি দেশের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। আমাদের দেশে রামমোহনই প্রথম যিনি দেশকে একটি মূল ideology দিয়েছিলেন ; ideology যদি মানুষের মনকে আকর্ষণ করতে পারে, তবেই এক বিপ্লবীশক্তির জন্ম হয়। মার্কসের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে : "When an idea grips the masses, it turns into a material force."

৫

ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সঠিকভাবেই বলেছেন, "রামমোহন ভগ্নপ্রায় সামন্ত-তান্ত্রিক রাজ্যসমূহকে চাঙ্গা করে তুলতে চান নি, চেয়েছিলেন যুক্তিবাদী নবভারত গঠন।"[২৪] সেই সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কাঠামোয় দুইটি দেশীয় রাজন্যশক্তি ছিল— মারাঠা ও শিখ ; তাদের সম্পর্কে রামমোহনের কোনো আস্থা বা মোহ ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন, এরা সেই পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ; আধুনিক যুগ সম্পর্কে, নূতন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে এদের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই। রামমোহনের দৃষ্টি পিছনের দিকে ঘোরানো ছিল না ; রামমোহন তাকিয়েছিলেন সম্মুখের পানে, দূরাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধানে।

ঠিক একই কারণে, তিতুমীরের পথ রামমোহনের পথ ছিল না। তা ছাড়া,

রামমোহন সে সময় এদেশে ছিলেন না। ইসলামধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করে আদিম পবিত্রতা উদ্ধার করাব যে লক্ষ্য এই ওয়াহবি আন্দোলনের ছিল, তার প্রতি রামমোহনের কোনো আগ্রহ থাকতে পারে না। এই আন্দোলন মুসলমানদের এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, মুসলমান সমাজের বৃহৎ অংশটি বাহিরে থেকে গিয়েছিল; হিন্দুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থাকাব ফলে, হিন্দুরাও এই আন্দোলনে যোগ দেয় নি। যোগ দিলেও নামমাত্র। এই আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে এখনো ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। বাংলার কৃষিব্যবস্থার সংকট ও শোষণের একটি চিত্র এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে, এবং ইংরেজসৈন্যের গুলিতে এদের প্রাণদান, সমস্ত আন্দোলনকে এক বিষাদ, কারুণ্য দান করেছে। এইসব স্বতঃস্ফূর্ত, বিচ্ছিন্ন, আঞ্চলিক কৃষক অভ্যুত্থানগুলির জয়লাভের সম্ভাবনা কি ছিল? লেনিনের ভাষায় "এদের মধ্যে সংগ্রামের চেয়ে বেশি ছিল হতাশার ফলে বেপরোয়া মনোভাব এবং প্রতিহিংসার বিস্ফোরণ": "More in the nature of outbursts of desperation and vengeance than of Struggle."[১৪] লেনিন অন্যত্র বলেছেন: "....do not and can not see what kind of a new order is taking shape, what social forces are shaping it and how, what social forces are capable of bringing release..." একটি পরিচ্ছন্ন ideologyর অভাব এই-সব অভ্যুত্থানগুলির ব্যর্থতার জন্য প্রধানত দায়ী।

ঐতিহাসিক নেমিয়ার (Namier) তৃতীয় জর্জেব রাজত্বকালে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ভূমিকা আলোচনায় একটি পদ্ধতি (methodology) গ্রহণ করেন, যা 'নেমিয়ানবাদ' নামে পরিচিত। ব্যক্তিবিশেষের অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্পর্কের উপর তার রাজনৈতিক অবস্থান, ধ্যানধারণা নির্ভরশীল; এই দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় জর্জের রাজসভায় যে অভিজাতরা উপস্থিত থাকতেন, তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা নেমিয়ার বিচার করেন। ব্যক্তি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধনে বাঁধা; তার চিন্তা, ভাবনা, কাজ সব-কিছু সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়; তার মানসলোকে অন্য কোনো আলোড়ন ঘটে না, এই ধরনের পূর্বনির্দিষ্ট যান্ত্রিক সরলীকৃত ইতিহাসে বিচারের পদ্ধতি বহুদিন পরিত্যক্ত হয়েছে। আমাদের দেশের কিছু গবেষক ইতিহাস বিচারে এই বাঁধাধরা ছক এখনো ব্যবহার করে থাকেন। তাই তাঁদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী রামমোহন

ভূম্যাধীকারী ও বিত্তবান ; যে ভূমিব্যবস্থার ফলে তিনি লাভবান ও নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন, তা ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার দান। অতএব তাদের সহজ সিদ্ধান্ত, রামমোহন কখনো কোম্পানির শাসনের বা চিরস্থায়ী ব্যবস্থার অবসান চাইতে পারেন না।

ইতিহাস উদাহরণ দেয়, বহু বুদ্ধিজীবী তাদের জন্মনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানকে অস্বীকার করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হন এবং শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে থাকেন।

লেনিন লিখেছেন : "existence of exploitation, will always engender ideals opposite to this system both among the exploited themselves and among certain members of the intelligentsia."[২৬] লেনিন আরো লিখেছেন : "The intelligentsia most consciously, most resolutely and most accurately reflect and express the development of class interests and political groupings of society as a whole."[২৭]

রামমোহনের ক্ষেত্রে দেখা যাক ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষকদের সম্পর্কে তিনি কী ভেবেছিলেন। দেখা যাবে, চিরস্থায়ী বা রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর কোনো উচ্ছ্বাস বা মোহ ছিল না। ১৮৩১ সনে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট তিনি তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন ; তা ছাড়া ১৮২৯ সনে তিনি বেন্টিঙ্ক-এর নিকট যে স্মারক লিপি পেশ করেন,[১৮] তাতে তিনি কয়েকটি দাবি তোলেন : জমিদারদের মতো কৃষকদের খাজনা চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে ; জমিদারদের প্রত্যেক কৃষককে একটি পাট্টা দিতে হবে ; প্রত্যেক জমিদারির অধীন সমস্ত কৃষকের নামের তালিকা তৈরি করতে হবে : কৃষক তার অধিকার বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করবে এবং কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না ; জমিদারেরা প্রজার নিকট থেকে কোনো চাঁদা বা আবওয়াব আদায় করতে পারবে না ; অন্যথা তাদের জরিমানা ও জেল হবে। রামমোহনের এই অগ্রসর চিন্তা তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যেও দেখা যায় নি। রামমোহন পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রশ্নোত্তরে লিখেছিলেন : "In short, such is the melancholy conditions of the agricultural laborers that it always gives me the greatest pain to allude to it." আর রবীন্দ্রনাথ একশো বছর পরে সোভিয়েত রাশিয়ায়

উপস্থিত হয়ে (১৯৩০) লিখেছিলেন, "কেবল ভাবছি, আমার দেশ জোড়া চাষীদের দুঃখের কথা।"

৬

গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "Gurudev himself is international because he is truly national." প্রকৃত জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর নেই। রামমোহনও সেই অর্থে আন্তর্জাতিকাবাদী। রামমোহন তাঁর বিশাল দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, শুধু ভারতবর্ষ নয়, এশিয়া মহাদেশের একাধিক দেশ ও জাতি ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলির পদানত হয়েছে এবং Colony বা উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। এমন-কি ইউরোপ মহাদেশেও বহুজাতি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে রামমোহন ভারতবর্ষের মুক্তির প্রশ্নটিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। "যত্র বিশ্বভবেৎ একনীড়ম্।"

স্থূল অর্থে স্বাধীন দেশকেও তিনি 'স্বাধীন' বলে গণ্য করতেন না। স্বাধীনতার অর্থ রামমোহনের কাছে ছিল বহু ব্যাপক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। বিদেশী কর্তৃত্বমুক্ত হলেই রামমোহন তাকে স্বাধীন বলে স্বীকার করেন নি। যেখানে মুষ্টিমেয়ের হাতে ক্ষমতা এবং দেশের বৃহৎ অংশ অত্যাচারিত ও শোষিত সে দেশ রামমোহনের বিচারে স্বাধীন নয়। এই আদর্শ তিনি লাভ করেছিলেন ফরাসী বিপ্লব থেকে। সেজন্য পৃথিবীর দূরবর্তী কোণেও যদি বিপ্লবে ঘটে, রামমোহনের কানে সেই খবর এসে পৌঁচেছে এবং রামমোহন তার সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, অভিবাদন জানিয়েছেন, চাঁদা তুলে আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন, যা সে যুগের পক্ষে ছিল বিরল দৃষ্টান্ত। যেখানে বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, পাশব শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে, সেখানে রামমোহন বেদনার আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন।

ইংলণ্ডের প্রথম রিফর্ম বিলের ভাগ্য তিনি বিশেষ আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করেন। প্রকাশ্যে রামমোহন ঘোষণা করেন, রিফর্ম বিল পাস না হলে রামমোহন সে দেশ পরিত্যাগ করে চলে যাবেন। রামমোহন অনুভব করেছিলেন রিফর্ম বিল পাস হওয়া শুধু ইংলণ্ডের মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বিশ্বইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত।

প্রথম রিফর্ম বিল পাস হলেও (১৮৩২), রামমোহনের চোখে এর অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছিল, ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। রামমোহন লিখছেন : "The nation can no longer be a prey of the few who used to fill their purses at the expense, nay, to the ruin of the people..." কিন্তু অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তিনি নির্ভর করেছিলেন তাদের উপর, "the people, the mighty people of England" যারা রাজনৈতিক জীবন থেকে "bribery, corruption and selfish interests" তাদের 'banish' নির্বাসিত করতে পারবে। রামমোহনের কাছে কোনো দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এক জায়গায় এসে আবদ্ধ হয়ে যায় না; এই আন্দোলন হল নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন। পরশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য লাভই শেষ ও চরম নয়; গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার দায়িত্ব ও প্রয়োজন সেইসঙ্গে আসে।

রামমোহন ভারতবর্ষের মুক্তির প্রশ্নটিকে 'world revolutionary process' বা 'বিশ্ববিপ্লব প্রক্রিয়া'র অংশ হিসাবে দেখেছিলেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নটি গভীরভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের মুক্তি নির্ভর করে অন্য সব উপনিবেশগুলির মুক্তি সংগ্রামের উপর। সেজন্য রামমোহনের আহ্বান ছিল সমস্ত নিপীড়িত পরাধীন জাতিগুলির নিকট, "নির্যাতিত জাতিগুলি, এক হও।" এই-সব দেশগুলির ভাগ্য এক সূত্রে গাঁথা।

রামমোহন জানতেন, তাঁর জীবিতকালে উপনিবেশগুলির মুক্তি দেখে যেতে পারবেন না। কিন্তু রামমোহন আশাবাদী ছিলেন যে একদিন আসবেই, যখন পরাধীন জাতিগুলি শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা ও মর্যাদা লাভ করবে।

"I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European colonies...

...I consider the cause of Nepolitans as my own, and their enemies as our. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful." —Letter to James Silk Buckingham, August 11th, 1821.

এই আশাবাদ নিছক রোম্যান্টিক আশাবাদ নয়, এ হল ঐতিহাসিক আশাবাদ (historical optimism) এবং মানব-ইতিহাসের প্রগতিশীলতার (progress) আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

টীকা :

১. Hegel : 'Philosophy of Right', quoted in E. H. Carr, *What is History*.

২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : "বর্তমান শতাব্দীর বাংলার সাহিত্য সমালোচনা", 'বঙ্গদর্শন', ১২৮৭।

৩. বিশ্ববিবেক, পৃ. ১৭০।

৪. V. I. Lenin : *Collected Works*. Vol. 2, p. 185-86.

৫. K. M Panikkar : *In Defence of Liberation* ; *Asia and Western Dominance*.

৬. Karl Marx : *The Future Results of British rule in India* : "the universal intercourse founded upon the mutual dependency of mankind."

৭. Karl Marx and F. Engels : *Works*, Vol 46, p. 47 (in Russian).

৮. Lenin : *Collected Works*, Vol 2, pp. 505-05.

৯. Marx and Engels.

১০. G. Smith : *Life of Alexander Duff*, Vol I, p. 118.

১১. Karl Marx : *Capital*, Vol 3, p. 334.

১২. Karl Marx : *New York Tribute*, 1853 ; *The Future Results of British Rule in India* ; *The British Rule in India*.

১৩. "রামমোহন যে ইংরেজদের আগমনকে বলেছেন Divine providence, তাকেই আমরা ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল বলব শুধু এই কারণে যে গ্রাম্য স্বৈরাচারে আবদ্ধ গ্রাম সমাজ বিশিষ্ট ভারতের বিচ্ছিন্নতাকে দূর করে বৃহত্তর মানব-সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করে তার ভবিষ্যৎ মুক্তির পথ উন্মোচন করেছিল।"—রবীন্দ্র গুপ্ত : 'সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতি', পৃ. ৬৬।

১৪. *Northern Star*. June 22, 1948. *Collected Works*, p. 472.

১৫. Eastern Question ; *Collected Works*, 38, p. 545.

১৬. *Capital*, III, p. 796.

১৭. *Asiatic Journal*, 1833 : "He always contended for the necessity of continuing British rule for at least forty or fifty years for the good of the people themselves."

১৮. Appeal to the King in Council, para 43, March, 1823.

১৯. Abbe J. A Dubois : *Letters on the State of Christianity in India*, 1823, p 165-66.

২০. Letter to J Crawford, Aug 18, 1828.

২১. Lenin : *Collected Works*, Vol II, p. 214.

২২. *Our President : Ho Chi Minh* Hanoi, 1961.

২৩. রবীন্দ্রনাথ : ২৭ জানুয়ারি, ১৮৮৫, সিটি কলেজে রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণ ; 'ভারতপথিক রামমোহন রায়', পৃ ১১২।

২৪. ড ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্বামী বিবেকানন্দ', পৃ. ৪৪-৪৫।

২৫. Lenin : What is to be done : *Collected Works* Vol 5, p. 375.

২৬. Lenin : *Collected Works*, Vol I, p. 416.

২৭ Lenin : *Collected Works*, Vol 7, p. 45.

২৮. দিলীপকুমার বিশ্বাস : 'রামমোহন সমীক্ষা', পৃ. ৫৬১-৬৬।

রামমোহনের গান

রাজ্যেশ্বর মিত্র

রামমোহন রায় "ব্রহ্মসঙ্গীত"-এর সূত্রপাত করেছিলেন। এই পর্যায়ের গানগুলি প্রথম অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ করেছিল উপাসনা সভায়। অ্যাডাম সাহেব যে ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন, সেখানে ইউনিটেরিয়ান খৃস্টধর্মাবলম্বীদের মতানুসারে ঈশ্বরোপাসনা হত। রামমোহন রায় তাঁর অনুবর্তীদের নিয়ে এই সোসাইটিতে যাতায়াত করতেন। একদিন সভার পর যখন তাঁরা ফিরে আসছেন, তখন তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব প্রস্তাব করলেন, বিদেশীদের উপাসনা গৃহে যাবার চেয়ে নিজেদের একটি গৃহ প্রতিষ্ঠা করাটা অনেক সুবিধাজনক এবং উচিত কর্তব্য। রামমোহন এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। তিনি এ-বিষয়ে পরামর্শ করলেন তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং টাকি-র রায় কালীনাথ মুন্সীর সঙ্গে। এ সম্পর্কে কর্তব্য স্থির করার জন্য একটি সভা ডাকা হল। সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং মথুরানাথ মল্লিক বললেন যে তাঁরা এই উদ্দেশ্যে বিশেষ সাহায্য করবেন। চন্দ্রশেখর দেবের ওপর ভার দেওয়া হল যে, তিনি সিমলায় শিবনারায়ণ সরকারের বাড়ির দক্ষিণে একটুকরো জমির মূল্য স্থির করবেন। কিন্তু সেই স্থানটি উপাসনার পক্ষে তেমন অনুকূল বলে বোধ হল না। অতএব, আবার আলোচনার পর জোড়াসাঁকো, চিৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর (ফিরিঙ্গি কমল বসু) একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে ১৮২৮ খৃস্টাব্দে, ৬ ভাদ্র উপাসনা সভা সংস্থাপিত হল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত সভার কাজ চলত। দুজন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক বিষয়ের ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। সবশেষে সংগীত অনুষ্ঠিত হয়ে সভা ভঙ্গ হত। কলকাতার অনেক হিন্দুসমাজের ভদ্রজন, যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, তাঁরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সভায় উপস্থিত হতেন। এই সভা সংস্থাপনের অল্পকাল পরেই উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হল। তখন চিৎপুর রোডের উপরেই চার কাঠার সামান্য অধিক জমি কিনে সমাজগৃহ নির্মাণ করা হল; দাম পড়েছিল চার হাজার দুশো টাকা। ১৮২৯ সালের ৬ জুন এই জমি ক্রয়ের

দলিল প্রস্তুত হয়েছিল। যিনি বিক্রয় করেছিলেন তাঁর নাম কালীপ্রসাদ কর। চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে এই যে, তখনো সরকারী ব্যাপারে চিৎপুর-সন্নিহিত এই জোড়াসাঁকো "সুতানুটি" নামেই পরিচিত ছিল। রামমোহন রায় সেই সময় দেওয়ান রামমোহন রায় নামে পরিচিত ছিলেন এবং তৎপ্রবর্তিত সমাজ "ব্রহ্মসমাজ" নামে পরিচিত হত। অনেকে একে ব্রহ্মসভা আখ্যাতেও জানতেন। এই বৎসর ১১ই মাঘ নতুন গৃহে সমাজের কাজ আরম্ভ হল। প্রথমে কিছুদিন সাম্বৎসরিক উৎসব হত ভাদ্রমাসে; পরে মাঘোৎসবরূপে এই প্রতিষ্ঠার দিনটি পালিত হয়ে আসছে।

এই সংস্থায় বালক দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন। তিনি তাঁর জীবনীতে লিখেছেন— প্রথম দিকটা সংগীতানুষ্ঠান আশানুরূপ ছিল না; রামমোহন রায ভালো ভালো গুণী গায়কদের আমন্ত্রণ করে আনতে চেষ্টা করেছিলেন (এঁদের নাম বোধ করি রক্ষিত হয় নি)। তাঁদের অনেকে এলেন বটে, কিন্তু সেটা একটা ওস্তাদি গানের আসরে পরিণত হল। রামমোহন কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন সেখানে ব্রহ্মবিষয়ক সংগীত গাইতে হবে এবং উদাহরণসহযোগে গানেব নমুনা কিরকম হবে সেটা দেখিয়ে দিলেন। এই সমাজের প্রধান গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী আজীবন প্রার্থনাসভায় গান গেয়ে এই প্রথাকে উজ্জীবিত রেখেছিলেন।

ব্রহ্মসংগীতেব পরিকল্পনায় রামমোহনেব কী আদর্শ ছিল সেটা উপলব্ধি করা দরকার। তাঁর সমসাময়িক গীতকারদেব মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন রাধামোহন সেন, কালী মীর্জা এবং রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) প্রমুখ ব্যক্তিগণ। শেষোক্ত দুজন, গায়ক হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন এবং নিধুবাবু রামমোহনের সময়ে বাংলাদেশ জুড়ে ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। শোনা যায়, রামমোহন নিজে কালী মীর্জার সঙ্গে সংগীতচর্চা করতেন। এমন-কি তাঁদেব মধ্যে ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনাও হত, কারণ কালী মীর্জা সংস্কৃততে পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু, তাঁর বচনা অধিকাংশই হয় প্রেমসংগীত নতুবা শ্যামাসংগীত। রামমোহন অবশ্য সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে তৎকালীন বাংলাগানের আসরে সবরকম গানই উপভোগ করতেন। সেখানে তিনি রাগসংগীতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকেই উপভোগ করতেন এবং ব্রহ্মসংগীতও রাগসংগীতের বা কাব্যসংগীতের বৈশিষ্ট্যে সার্থক হয়ে উঠুক এটাই তাঁর কাছে একান্ত কাম্য ছিল। রামমোহন নিধুবাবুর গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং ব্রহ্মসংগীতের ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতাও কামনা

করেছিলেন। এটা নিশ্চয়ই তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত করবার উদ্দেশ্য নয়; নিপুণ গীতিকারের হস্তক্ষেপে ব্রহ্মসংগীতকে প্রকৃত লিরিকের পর্যায়ে উন্নীত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। নিধুবাবু রামমোহনের মনোভাবের এই আনুকূল্যে নিঃসন্দেহে অভিভূত হয়েছিলেন; কিন্তু তখন তাঁর বয়স অষ্ট-অশীতি বৎসর এবং তাঁর ক্ষমতা স্তিমিত বললে ভুল হয় না। এ সম্বন্ধে তাঁর পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত লিখেছেন— "ব্রহ্মসমাজের পূর্ব উপাচার্য ৺উচ্ছবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহোদয় একদিবস রামনিধিবাবুকে আদেশ করিলেন,— মহাশয়, একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া শ্রবণ করাইতে হইবে, সেই অনুরোধে বাবু তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া এই গীত রচনা করিয়া শুনাইলেন, যথা—

রাগ বেহাগ — তাল আড়া

পরমব্রহ্ম তৎপরাৎপর পরমেশ্বর।
নিরঞ্জন নিরাময় নির্বিশেষ সদাশ্রয়
আপনা আপনি হেতু বিভু বিশ্বধর।
সমুদয় পঞ্চকোষ জ্ঞানাজ্ঞান যথা বসে
প্রপঞ্চ ভূতাধিকার।
অন্নময় প্রাণময় মানস বিজ্ঞানময়—
শেষেতে আনন্দময় প্রাপ্ত সিদ্ধ নর।

বিদ্যাবাগীশ মহোদয় এই গীত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন —"বাবু তুমি সাধু, তোমার অসাধারণ ক্ষমতাদৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি, কারণ এপ্রকার গীত পূর্বে কেহ কখনও রচনা করেন নাই, তাহাতে হঠাৎ এমন রচনা শুনা যায় নাই; যাহা হউক, এই গীত দেওয়ানজীকে অর্থাৎ রামমোহন রায় মহাশয়কে দেখাইয়া ব্রহ্মসমাজে গান করাইব। এই কথাবার্তার পর কোন বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়া এতন্মায়াময় সংসার পরিহার করত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। এ কারণ অনুমান হইতেছে এ গীত সমাজের গীতে ভুক্ত হয় নাই, অপ্রকাশ রহিয়াছে।" ('গীতরত্ন', ২য় সংস্করণ)। এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে রামমোহন তখনো দেওয়ানজী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি "রাজা" উপাধি পেয়েছিলেন ১৮২৯ সালের আগস্ট মাসে। এই সালেই জুন মাসে জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং ১১ই মাঘ নতুন গৃহে সমাজের কাজ আরম্ভ হয়। এর পূর্বে ১৮২৮ সালের ৬ ভাদ্র থেকে যে উপাসনা কমললোচন

বসুর ভাড়া করা বাড়িতে অনুষ্ঠিত হত, সেখানে উপনিষদ পাঠ করতেন উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ। এই-সব তারিখ থেকে অনুমান হয় ১৮১৮ সালের ৬ ভাদ্রের পর থেকে ১৮২৯ সালের আগস্ট মাসের পূর্বেই কোনো সময় বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নিধুবাবুকে গানের জন্য অনুরোধ করেন এবং সম্ভবত উপাসনা-সভা চলাকালীন পূর্বেই এই গানটি রচিত হয়, কারণ সেই সময় ভালো ব্রহ্মসংগীতের অভাব একটু বেশি অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু, এই প্রসঙ্গ তোলার উদ্দেশ্য হল এই যে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রামমোহনের অনুমতিক্রমেই নিধুবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কেননা তাঁর সম্মতি ব্যতীত কোনো গানই নীতিগতভাবে সমাজে গাওয়া হত না। এই ধরনের ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে রামমোহন উৎকৃষ্ট কাব্যসংগীত আহরণ করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন এবং কেবলমাত্র উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের কাছেই তাঁর আস্থাভজন ব্যক্তিরা সংগীত সংগ্রহে অগ্রবর্তী হতেন।

রামমোহন রায় গান রচনার জন্য কোনো নতুন পন্থার উদ্ভাবন করেন নি। তিনি এবং সমসাময়িক অপরাপর ব্রহ্মসংগীত রচয়িতাগণ সে যুগের পয়ার ও চতুষ্পদী রীতিকেই প্রধানত অবলম্বন করেছিলেন এবং গায়নভঙ্গিও তৎকালোপযোগী পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত করছি :

গৌড়মল্লার আড়াঠেকা

সঙ্গের সঙ্গীরে মন কোথা কর অন্বেষণ
অন্তর না দেখে তাঁরে কেন অন্তর ভ্রমণ,
যে বিভু করে যোজন কর্মেতে ইন্দ্রিয়গণ,
মাজিয়া মনদর্পণ তারে কর দরশন॥

চতুষ্পদীর এই রীতি এবং প্রকাশের ঈদৃশভঙ্গি ছিল রাধামোহন সেন, নিধুবাবু এবং কালী মীর্জা প্রভৃতি তৎকালীন গীতরচয়িতাদের নিজস্ব— তফাত এই যে রামমোহন এই রীতিকে প্রয়োগ করেছেন আত্মজ্ঞান ও উপাসনাসূচক রচনায়। এটা কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে রামমোহন বিদেশী Hymn ধরনের রচনায় উদ্বুদ্ধ হন নি, যে সংগীত আমাদের চিরাচরিত, যা সহজেই আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে তিনি সেই সংগীতকেই অবলম্বন করেছিলেন; কারণ ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই সামাজিক সংগীতেরই অনুরাগী ছিলেন।

রামমোহন সংগীতে কতখানি ব্যুৎপন্ন ছিলেন বা গায়ক হিসাবে তাঁর পারদর্শিতা কতখানি ছিল তা আমরা জানি না। তিনি প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে গান করতেন এমন কোনো উল্লেখ বোধ করি পাওয়া যায় না, তবে অনুমান হয় সংগীত সম্বন্ধে তাঁর মোটামুটি ধারণার অভাব ছিল না এবং তিনি সাধারণভাবে গান গাইতেও পারতেন— যদিচ সেদিক থেকে তাঁর প্রকাশের বাহুল্য ছিল না। তাঁর গানে সুরসংযোগ সম্ভবত সে যুগের বিশিষ্ট গায়কগণই করে গেছেন, তথাপি রামমোহনের অনুমোদিত রীতিতেই এগুলি গাইতে হত, কেননা নিছক ওস্তাদী করে গাইবার জন্যই তিনি এ-সব গান রচনা করেন নি। কিন্তু, পরবর্তীকালে যখন ব্রহ্মসংগীত জনপ্রিয়তা অর্জন করল এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে এই সংগীত গায়ক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হল, তখন এমন একজনও ওস্তাদ গায়ক ছিলেন না যিনি ব্রহ্মসংগীত গান করতেন না এবং যে-সব গান রীতিমত বৈঠকী রীতি অনুসারেই গাওয়া হত। এটা অবশ্য সংগীতের অপর একটি দিক যেখানে ব্রহ্মসংগীতকে রাগসংগীত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে: তথাপি সমাজের উপাসনাতেও যাঁরা গান করতেন তাঁরা কেবলমাত্র একটি অনাড়ম্বর সরল কাব্যগীতি গাইতেন না, বেশ-কিছু তানবিস্তারের আশ্রয় নিতেন। এর প্রধান কারণ এই যে আমাদের গান কিছুটা তানবিস্তারে সংগীতকে এমন একটি ভাবপ্রবণ অবস্থায় পৌঁছে দেয়, যা সাধারণ আবৃত্তি ধরনের গানে সম্ভব হয় না। রামমোহন নিশ্চয়ই এই পরিমাণ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিলেন না।

রামমোহন ও তদীয় সহযোগীদের রচিত গানে প্রধানত যে-সব সুর ও তাল প্রযুক্ত হয়েছে সেগুলির একটি তালিকা এই প্রবন্ধের শেষে যোজিত হল। সেগুলি অনুধাবন করলে দেখা যাবে তাঁরা প্রধান প্রধান সব রাগই তাঁদের গানে প্রয়োগ করেছিলেন। তালগুলি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় ধ্রুপদ ধামার জাতীয় কিছু গান তাঁদের রচনায় ছিল; কিন্তু প্রধানত সেকালের টপ্পা ধরনের গানে যে-সব তাল ব্যবহৃত হত, সেইগুলিই তাঁরা বিশেষভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। আড়াঠেকা তালটি তৎকালীন গানে প্রায়ই প্রযুক্ত হত এবং ব্রহ্মসংগীতেও তার অভাব দেখা যায় না। এমন-কি "ছেপকা"-র মতো লঘুতালও কোনো কোনো গানে প্রযুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া প্রধানত ত্রিতাল, ঢিমা-ত্রিতাল, যৎ, কাওয়ালী, একতাল, ঠুংরী— এইগুলি অবলম্বন করা হত। তালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল এই কারণে যে তালের উল্লেখ থেকে

সহজেই গানের প্রকৃতি কিরকম ছিল সেটি উপলব্ধি করা যায়। রামমোহন সংস্কৃত স্তোত্রের অনুরাগী ছিলেন। ব্রহ্মসংগীতে সংকলিত এই ধরনের কয়েকটি গান সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রকৃতির গানে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি নিজে স্তোত্রগান গাইতে খুবই উৎসাহ বোধ করতেন। রামমোহন বা তাঁর সমসাময়িক অপরাপর রচয়িতাদের সব গানই যে ব্রহ্মবিষয়ক এমন নয়, বরঞ্চ দেহতত্ত্বের গানই তুলনায় অধিকতর। এই-সব গানের মাধ্যমে তিনি সত্যের শরণ নেবার জন্য সকলকে উপদেশ দিয়েছেন। অতএব, তাঁদের গান যে সম্প্রদায় বিশেষের গান এমন নয়, সুফী বা বাউলদের গান যেমন সবাইকার উদ্দেশ্যে রচিত হয়ে এসেছে, তাঁদের গানও তেমনি সকলের গাইবার জন্য রচিত হয়েছিল। রামমোহন কিন্তু কীর্তনাঙ্গ বা লোকসংগীতের রূপকে তাঁদের রচনায় আরোপ করবার জন্য উৎসাহিত হন নি। যদিও তিনি বাউলদের ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন তথাপি ব্রহ্মসংগীতকে তিনি একটি আর্টসংগীতের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। চোখের উপরেই তিনি তৎকালীন কবিগান বা খেউড় গানের আতিশয্যে সমাজে যে রুচির বিকার ঘটেছিল তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অতএব ব্রহ্মসংগীতের ভাবমূর্তি বা গাম্ভীর্য রক্ষা করার জন্য তিনি প্রবহমান ধারাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর ধারাগুলিকেই অবলম্বন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সেই সময় লঘু প্রেমসংগীত ও আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়াগুলি ভদ্রসমাজে একটি আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে বহু পরিবার তাঁদের ছেলেমেয়েদের গান-বাজনায় উৎসাহ দিতে বিরত হয়েছিলেন; এমন-কি সংগীত অনেকের কাছে দোষজনক বলেও বিবেচিত হত। একদিকে যেমন শিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণ খৃস্টধর্মের প্রতি প্রভূত আসক্তি বোধ করছিলেন, অপর দিকে তেমনি স্বল্পশিক্ষিত তরুণদল কবিগান, খেউড়, প্রণয়-সংগীতের অশ্লীলতাকে অবলম্বন করে অতিমাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছিলেন। এই পরিস্থিতিতে রামমোহনের অভ্যুদয় না ঘটলে সমাজ এবং ধর্মকে শাসনে রাখাই কঠিন হয়ে উঠত। অব্যবহিত পরের যুগে এই রকম করে একজন দূরদর্শী মহাপুরুষের অভ্যুদয় ঘটেছিল— তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন যদি আগে থেকে সমাজকে বেশ খানিকটা শৃঙ্খলার দিকে ফিরিয়ে না আনতেন তা হলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষেও ততখানি সাফল্য লাভ করা বোধ করি সম্ভব হত না।

রামমোহন গীতকার হিসাবে প্রতিষ্ঠার দাবি করেন নি, তথাপি তাঁর গানের

সাহিত্যিক ও সাংগীতিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বাদ দিলেও সাংগীতিক দিক থেকেও তাঁর রচনা একটা নতুন যুগের সূত্রপাত করেছিল। পরবর্তীকালে যাঁরা সংগীতশিক্ষা করতেন তাঁরা ব্রহ্মসংগীত থেকেই শিক্ষায় পরিণতি লাভ করতেন। এমন-কি, এই লেখকও তাঁদের বাল্যকালে দেখেছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও প্রচুর শিক্ষার্থী তাঁদের তরুণ বয়সে ব্রহ্মসংগীত থেকে শিক্ষা আরম্ভ করে রাগসংগীত ও তাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ হতেন। দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগে ছেলেমেয়েরা প্রথম থেকে হিন্দুস্থানি গান আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে, যার ফলে বাংলাগানের রাগবৈশিষ্ট্য ও গঠনপারিপাট্য সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এইভাবে বাংলা গানের আদিযুগ ক্রমেই বিস্মৃতির মধ্যে বিলীন হতে চলেছে।

প্রসঙ্গক্রমে রামমোহন রায়ের একজন আদি জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে তথ্য প্রদান করেছেন সেটি উদ্‌ধৃত করা প্রয়োজনীয় মনে করি।

"ব্রহ্মসঙ্গীত রাজা রামমোহন রায়ের এক অতুল কীর্তি। অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীতের তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার নিজের ও বন্ধুগণের বিরচিত সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই উক্ত পুস্তকের দুই তিন সংস্করণ হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনের পরেও অন্যান্য লোকের দ্বারা ইহা অনেকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল সঙ্গীত এক্ষণে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হইয়াছে। কি ব্রহ্মোপাসক, কি পৌত্তলিক— রামমোহন রায়ের সঙ্গীত সকলেরই নিকট সমাদৃত। এইরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মৃত্যু ও অনিত্যতা বিষয়ে রামমোহন রায়ের সঙ্গীতের তুলনা নাই। "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর"—প্রভৃতি গীতগুলি ঘোর বিষয়ীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়েও বিদ্যুতের ন্যায় বৈরাগ্য প্রতিভাত করিয়া দেয়। অসামান্য তর্কশক্তিসম্পন্ন হইয়াও তিনি যে কবিত্বশক্তিবিহীন ছিলেন না, গীতগুলি ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। যে সঙ্গীতটির উল্লেখ করা হইল, তাহাতে মৃত্যুর ছবি কেমন নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত করা হইয়াছে। বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত, অথচ কেমন ভয়ঙ্কর!

"রাজার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বিশেষরূপে আত্মজ্ঞান-সাধনের সহায়। বেদান্তের জ্ঞানমার্গ ও উপাসনানুযায়ী রচিত। ব্রহ্মের নিরাকারত্ব, নামরূপাতীত ও ত্রৈগুণাতীত ভাব, সর্বব্যাপীত্ব, দ্বৈতভাববর্জন ও অদ্বৈতভাব দৃঢ়াকরণ, সংসারের

অনিত্যতা, শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যসাধন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অভিমান এবং আমি আমার ভাবত্যাগ, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীতে এই সকল বিষয়ের উপদেশ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপ যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতসকল সেই ভাবে রচিত। এতদ্ভিন্ন, উহা বেদান্তানুযায়ী সাধনের একান্ত উপযোগী। আত্মানাত্মবিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি বেদান্তানুযায়ী সাধনের পক্ষে তাঁহার সঙ্গীত বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। উহাতে পরমেশ্বরের দয়া প্রভৃতিরও বর্ণনা রহিয়াছে।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে রামমোহন রায়ের গীতের বিষয়ে বলিয়াছেন,—তিনি (রামমোহন রায়) অত্যুৎকৃষ্ট গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহাব ব্রহ্মসঙ্গীত বোধ হয় পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয়-নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। ঐ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সমন্বিত। অনেক কলাবন্তেরা সমাদর-পূর্বক উহা গাইয়া থাকেন।"

এর পরে উক্ত জীবনীকার রামমোহনের সমকালীন সংগীত রচয়িতাদেব সম্পর্কে বলছেন :

"সঙ্গীত পুস্তকের যে সঙ্গীতগুলি রামমোহন বায়েব বন্ধুগণেব বিরচিত, তাহার নিম্নে রচয়িতাগণের নামের সঙ্কেত আছে। অনেকেই গীতরচয়িতাদিগের প্রকৃত নাম জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। সেইজন্য আমরা নিম্নে তাঁহাদের সাঙ্কেতিক ও স্পষ্ট নাম লিখিয়া দিলাম।

কৃ, ম— কৃষ্ণমোহন মজুমদার
নী, ঘো— নীলমণি ঘোষ
নী, হা— নীলরতন হালদার
গৌ, স — গৌবমোহন সরকাব
কা, রা— কালীনাথ রায়
নি, মি — নিমাইচরণ মিত্র
ভৈ, দ — ভৈরবচন্দ্র দত্ত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বেথুন স্কুলের সম্পাদক তখন এই ভৈরবচন্দ্র দত্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেদিন শুনিলেন যে

'অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা'— এই সঙ্গীতটি ভৈরববাবুর রচিত, সেইদিন হইতে তাঁহাকে 'আপনি' বলিয়া সম্মানের সহিত সম্বোধন করিতে লাগিলেন।"

বাংলার সংগীতে ব্রহ্মসংগীত এসেছে আশীর্বাদের মতো। কি টেকনিক, কি সংগঠন— সব দিক থেকেই বাংলাগানকে ব্রহ্মসংগীত এমন একটা উন্নতমানে পৌঁছে দিয়েছে, যা কল্পনাতীত। আমাদের দেশের এবং জাতির সৌভাগ্য যে রামমোহন আমাদের সংগীতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করে তার উন্নতির একটি মহান আদর্শ নির্দেশ করে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে রচয়িতাগণ এই সংগীতকে সর্বতোভাবে পরিপুষ্ট করেছেন। অতএব, সংগীতের দিক থেকে রামমোহনের এই অভিযান যে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

রামমোহন রায়ের কতিপয় প্রসিদ্ধ রচনা

	কথা	সুর তাল ও সুরান্তর
১।	শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং	আলাইয়া ধামার,— ইমনকল্যাণ
২।	বিগতবিশেষং, জনিতাশেষং	কেদারা—আড়াঠেকা
৩।	নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ	বেহাগ—ত্রিতাল
৪।	ভাব সেই একে	ভূপালী—তেওট—ইমনকল্যাণ
৫।	জানত বিষয় মন	ককুভ— ঝাঁপতাল
৬।	আমি হই, আমি করি	সাহানা- যৎ
৭।	সত্যসূচনা বিনা	ভৈরব— ঢিমেতেতালা
৮।	কেন সৃজনলয়কারণে ভজনা	ককুভ
৯।	মন যাঁরে নাহি পায়	দেশাখ— ঝাঁপতাল, কালাংড়া-আড়া
১০।	এই হল এই হবে এই বাসনায়	ভৈরব— আড়াঠেকা
১১।	স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে	গান্ধার— ত্রিতাল, গৌড়মল্লার, ধামার,
১২।	সঙ্গের সঙ্গীরে মন	মল্লার— আড়াঠেকা
১৩।	দেখ মন এ কেমন	বেহাগ— একতাল
১৪।	দ্বৈতভাব ভাব কি মন জেনে কারণ	সিন্ধুড়া—মধ্যমান
১৫।	ভয় করিলে যাঁরে	সাহানা— ধামার

	কথা	সুর	তাল ও সুরান্তর
১৬।	মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর	সুরট—	ত্রিতাল,রামকেলি-আড়াঠেকা
১৭।	একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ	সুরট—	ত্রিতাল,রামকেলি আড়াঠেকা
১৮।	মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর	মিয়াকি সারঙ্গ—	ত্রিতাল,ইমনকল্যাণ-আড়াঠেকা
১৯।	দম্ভভাবে কত রবে হও সাবধান	মেঘ সারঙ্গ—	রামকেলি-আড়াঠেকা
২০।	একবার ভ্রমেতেও	ছায়ানট—	ত্রিতাল
২১।	গ্রাস করে কাল পরমায়ু	ঝিঁঝিট মূলতানী—	ত্রিতাল (রামকেলি— আড়াঠেকা)
২২।	কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে	ঝিঁঝিট—	ত্রিতাল (রামকেলি— আড়াঠেকা)
২৩।	অনিত্য বিষয় কর সর্বদা চিন্তন	ঝিঁঝিট—	ত্রিতাল, রামকেলি, আড়াঠেকা
২৪।	ভজ অকালনির্ভয়ে	ধানীবারোয়া—	ত্রিতাল
২৫।	কেন ভোল মনে কর	খাম্বাজকাফি—	ত্রিতাল
২৬।	জন্মের সাফল্য কর	ধনাশ্রী—	ত্রিতাল
২৭।	দৃশ্যমান যে পদার্থ	ললিত—	ঢিমা ত্রিতাল
২৮।	ভুল না নিষাদকাল পাতিয়াছে কর্মজাল	ইমনকল্যাণ—	আড়াঠেকা
২৯।	কোথায় গমন, কর সর্বক্ষণ	আলাইয়া—	আড়াঠেকা
৩০।	এত ভ্রান্তি কেন মন	টোড়ী—	আড়াঠেকা
৩১।	মন একি ভ্রান্তি তোমার	সিন্ধু ভৈরবী—	আড়াঠেকা
৩২।	দ্বিভাব ভাব কি মন	আলাইয়া—	ঝাঁপতাল
৩৩।	অজ্ঞানে জ্ঞান হারাইয়ে	বেহাগ—	আড়াঠেকা

সুরান্তরগুলি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় -রচিত রামমোহনের জীবনচরিতে উদ্ধৃত গানগুলি থেকে প্রাপ্ত।

এই তালিকায় ২৮ সংখ্যক পর্যন্ত গান কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব -সংকলিত 'সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম' তৃতীয় খণ্ড (১৮৪৬) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ সাক্ষাৎ রামমোহনের কাছ থেকে তাঁর গানগুলি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি; সম্ভবত দ্বারকানাথ ঠাকুর অথবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে সংগ্রহ

করেছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত ব্রহ্মসংগীত-রচয়িতা রামমোহনের সহযোগী নীলরতন হালদারের নিকট থেকেও তিনি সংগীত সংগ্রহ করেছিলেন। কালীনাথ মুন্সীর কাছ থেকেও তিনি কিছু গান পেয়েছিলেন। রামমোহনের জীবিতকালেই এগুলি সংগৃহীত হয়, যদিচ সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর তেরো বৎসর পরে। রামমোহনের মৃত্যুকালে কৃষ্ণানন্দের বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ বৎসর। ২৯-৩৩ সংখ্যক গানগুলি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' থেকে উদ্ধৃত। তিনি সম্ভবত "ক্ষুদ্রপত্রী" নামক রামমোহনের ব্রহ্মবিষয়ক সংগীতপুস্তিকা সংগ্রহ করেছিলেন।

কৃষ্ণানন্দের সংগ্রহে যে সুরগুলি আছে সেগুলি অন্যত্র অন্যসুরেও দেখা যায়। তবে, কৃষ্ণানন্দ-প্রদত্ত সুরগুলি যে ভ্রমাত্মক এমন অভিযোগ বোধ করি করা যায় না। এর সমর্থনে বলতে পারা যায় যে, এই লেখক তাঁর বাল্যকালে – "ভাব সেই একে" গানটি ভূপালীতেই গাইতে শুনেছেন এবং "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্করে" বা "একদিন হবে অবশ্য মরণ"— গান দুটিও সুরটেই প্রচলিত ছিল। ১৯২৩/২৪ সালেও বিভিন্ন স্থানে একাধিক ব্যক্তির কাছে এই সুরেই গান দুটি শোনা গেছে। কোনো স্থানেই "রামকেলি" রাগে এই গানটি শোনা যায় নি; তবে তাল যেটি ছিল, সেটা বলতে গেলে আড়া-ত্রিতাল। এই-সব সুর এখনো এই লেখকের বেশ ভালোরকম মনে আছে। তৎকালে সুরকারগণ তাঁদের রচনায় তাঁদের প্রদত্ত সুরসমূহের উল্লেখ করলেও গায়কগণ অনেক সময় সেগুলির পরিবর্তন সাধন করে অন্য সুরে গাইতেন। এটা রচয়িতাদের অনুমোদিত না হলেও এ নিয়ে তেমন মতান্তর ঘটত না, কারণ তখন গায়কদের বহুল পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া হত। তথাপি এইরকম সুরান্তর নিয়ে নিধুবাবু তাঁর 'গীতরত্ন' গ্রন্থের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। পরে গানগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হলে তাতে প্রচলিত জনপ্রিয় সুরগুলিই সংযোজিত হত। তখনকার দিনে (বিশেষ করে সংগীতগ্রন্থের) সম্পাদনার কোনো বিধিবদ্ধ প্রণালী ছিল না।

রামমোহন ও নারী-মুক্তি

রেণু চক্রবর্তী

আজ থেকে দুইশত বছরেরও আগে ১৭৭২ সালের ২২ মে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালে— দেড়শো বছর আগে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁর জন্মগ্রহণ, তাঁকে আধুনিক ভারতের পথপ্রদর্শক কেন বলা হয়, এই প্রশ্ন আজকের যুগেব মানুষের জিজ্ঞাসা করা খুবই ন্যায়সংগত। সেই সময়কার সমাজের অবস্থা— তার কুসংস্কার ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড আধিপত্য ও গোঁড়ামির কথা মনে রেখেই রামমোহনের বহুবিধ অবদানকে যাচাই করতে হবে। নারী সমাজের মুক্তি ও উন্নতির জন্য রামমোহনের অপরিসীম প্রচেষ্টা তর্কের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সেই অবদানকে আজকের প্রতিটি মেয়ের কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা উচিত।

সেদিনগুলি ছিল সামন্ততান্ত্রিক অন্ধকারে নিমজ্জিত। ধর্মের নামে মেয়েদের উপর যে সীমাহীন নির্যাতন চলত তা যে শাস্ত্রসম্মত নয়— এই লড়াই লড়ার জন্য রামমোহন তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য ও মানবতাবোধকে ব্যবহার করে দ্বিধাহীন চিত্তে এগিয়ে গেলেন। সেই যুগের ঘোরতর সনাতনপন্থীদের সব রকমের কুৎসা, আক্রমণ, এমন-কি জীবন সংশয়ের হুমকিতে ভ্রূক্ষেপ না করে দৃঢ় চিত্তে সংগ্রাম করতে লাগলেন রামমোহন মেয়েদের জীবনের দুঃখ মোচন করবার জন্য। সে কালে শিশু বিবাহ বা গৌরী দান করা পবিত্র কাজ হিসাবে গণ্য হত। বহুবিবাহের প্রচলন ছিল ব্যাপক। যার যত টাকার মর্যাদা সে স্ত্রী-সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে তা জাহির করত। শুধু ধনী নয়। নির্ধনদের মধ্যেও একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল যথেষ্ট। সেই সতীনদের কী দুঃখময় জীবন কাটাতে হত তা কল্পনা করা কঠিন নয়। পর্দার অন্তরালে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি অথবা অলস জীবন যাপনের কষ্ট ও গ্লানি ছাড়া তাদের কপালে কিছুই জুটত না। পুরুষের কামনা পূর্ণ করা ছাড়া তাদের নিজস্ব সত্তা প্রায় ছিল না বললেই চলে। অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনকে ঘিরে তাদের দিন কেটে যেত। যে দেশে ব্যাপক শিশুবিবাহের প্রচলন, সেখানে বিধবার সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়াও আশ্চর্যের নয়। সেই-সব বিধবাকে ধর্মের নামে নানান কঠোর নিয়ম পালনে আষ্টে পিষ্ঠে বেঁধে দেওয়া হত। সে যত অল্প বয়সের বিধবাই হোক,

তাকে চুল কাটানো, নিরামিষ খাওয়ানো, থান বস্ত্র পরানো, উপোষ পালনের কৃচ্ছ সাধন করতে বাধ্য করানো হত। রামমোহনের যুগে সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও নিষ্ঠুর নিয়ম ছিল বিধবাকে স্বামীর চিতায় বসিয়ে দগ্ধ করে সহমরণে যেতে বাধ্য করা। এই সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহনের অটল সংগ্রাম নারী-মুক্তির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

বড়ো দুঃখের কথা যে রামমোহন যে কঠিন সংগ্রাম করে সতীদাহকে বেআইনী ঘোষণা করলেন— আজ আবার সেই কুপ্রথা নূতন রূপে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। পণলোভী পাত্রপক্ষ আজ বধূ হত্যা করে চলেছে সারা ভারতবর্ষে। অগ্নি দগ্ধ হচ্ছে কত যুবতী বধূ। রামমোহন সতীদাহের নৃশংস রীতি বন্ধ করতে গিয়ে সনাতনপন্থীদের হাতে দারুণ নিগৃহীত হয়েছিলেন। যখন এই লড়াই ব্রিটিশ প্রিভি কাউন্সিলের সামনে এলো রামমোহন সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বিরোধী পক্ষের ঋগ্বেদ, ব্যাস, হরিতা, অঙ্গিরার ভুল তর্জমা ধরিয়ে দেন। তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য দিয়ে মনু ও বৃহস্পতির উদ্ধৃতি উপস্থিত করে বিরোধীদের যুক্তিতর্ক সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দেন। রামমোহন দেখালেন যে বিধবাদের তাঁরা পবিত্র জীবন যাপনের নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছিলেন যে বিধবাদের পরিপূর্ণ জীবন যাপন করবার সম্পূর্ণ অধিকারও আছে। ১৮৩২ সালে ব্রিটেনের হাউস্ অফ্ লর্ডসে সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করার পক্ষে রায় দেন। সতীপ্রথা ভারতবর্ষে বেআইনী ঘোষিত হল। মেয়েদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে রামমোহনের নিরলস সংগ্রাম জয়ী হল। আজকের যুগে স্বাধীন ভারতবর্ষে বধূদের অগ্নিদগ্ধ করে মেরে ফেলার যে নিদর্শন দেখা যায় এই নৃশংস অভিযান রোধ করতে কি রামমোহনের উত্তরসূরীরা এগিয়ে আসবে না? ১৫০ বছর আগে রামমোহন যে কাজ শুরু করেছিলেন সেই নৃশংসতাকে নির্মূল করার ভিতর দিয়ে হবে আমাদের রামমোহনের স্মৃতির প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা জানাবার পথ।

রামমোহন পণ প্রথা সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি বলেছিলেন "যদিও বেদে ও মনু সংহিতাতে বিবাহে টাকা বা উপঢৌকন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও তাঁদের অনুগামীদের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বালিকা বিক্রয়ের প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত করেছেন।" অর্থাৎ রামমোহন সুস্পষ্ট করে দিলেন যে পণ শাস্ত্রসম্মত নয়। ব্রাহ্মণদের দ্বারা এটি একটি কুপ্রথা প্রচলিত হয়েছে।

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে কুলীন ব্রাহ্মণ যেভাবে যত্রতত্র বিবাহ করে স্ত্রীদের ত্যাগ করে ফেলে রেখে চ'লে যেত, তার বিরুদ্ধে রামমোহন তীব্র ধিক্কার দিয়ে গিয়েছিলেন।

বিধবা বিবাহের পক্ষে রামমোহন তাঁর মত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন। বিধবাদের দুঃখময় পরাধীন জীবনের উন্নতিকল্পে রামমোহন মনে করতেন তাদের পুনর্বিবাহের অধিকার দেওয়া উচিত। এই আন্দোলন তাঁর জীবনের অল্প পরিসরের মধ্যে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। উন্নতচেতা উত্তরসূরীরা বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই আন্দোলনের হাল ধরে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের পুরোধা হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে ওঠে তত্ত্ববোধিনী সভা। রামমোহন অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক ছিলেন তা ছাড়া বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তত্ত্ববোধিনী সভা জনমত গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নিল। স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় "তত্ত্ববোধিনী সভা"র প্রতি আকর্ষিত হলেন এবং তাঁর বিদ্যা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের দরুন এই আন্দোলনকে অজেয় করে তুললেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রমুখ রামমোহনের আরব্ধ কাজ এগিয়ে নিয়ে চললেন। রামমোহনের মৃত্যুর পরেও তাঁর আদর্শ ও প্রভাব নারী-মুক্তির পথে যে বাধা ছিল তা দূর করার চেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। তাঁর ঐ অনুগামীরা নিজেদের পরিবারেই তাঁরা সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন তাই শুধু নয়, তাঁদের পরিপূর্ণ জয় হল যখন ১৯ জুলাই ১৮৫৬ সালে গবর্নর জেনারেল বিধবা বিবাহ আইন পাসের সম্মতি দিলেন।

সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর কোনো অধিকার ছিল না। রামমোহন এই বঞ্চনা খুব অন্যায় মনে করতেন। তিনি এই বঞ্চনা যে শাস্ত্রসম্মত নয় সেটা প্রমাণ করতে উদ্যত হলেন। ১৮২৩ সালে রামমোহন "হিন্দু নারীর অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ" নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি দেখান যে এই অন্যায়ের কোনো শাস্ত্রীয় সম্মতি নেই। হিন্দু সমাজপতিরা ও গোঁড়া সনাতনপন্থীরা এর তীব্র বিরোধিতা করলেন। আওয়াজ উঠল "হিন্দু ধর্ম গেল গেল"। হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি ও অন্ধ সংস্কারের ভিত কত গভীর তা বোঝা যায় যখন দেখি এক-বিবাহ ও সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে লেগে গেল রামমোহনের পর ১৩৩ বছর। ১৯৫৬ সালে যখন আমরা স্বাধীন ভারতের

প্রথম লোকসভায় নির্বাচিত হই, তখনই মাত্র আমরা বিরাট বিরোধিতা সত্ত্বেও এই আইন গৃহীত করতে সমর্থ হই। ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে রামমোহনের কী দূরদর্শিতা, কী আধুনিক চিন্তাধারা ছিল সেই ১৫০ বছর আগে। কত গভীর ছিল তাঁর নারী জাতির প্রতি সম্মানবোধ এবং তাকে সমানাধিকার প্রদান করার অদম্য ইচ্ছা।

আরো আশ্চর্য লাগে যখন আমরা দেখি অত বছর আগে রামমোহন চেয়েছিলেন সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একটিমাত্র সামাজিক আইন প্রবর্তন হোক। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের ভিত্তিতে সামাজিক রীতি-নীতির কানুনের বদলে তিনি চেয়েছিলেন একটিমাত্র আইন চালু হোক সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকের জন্য। ইংরাজিতে একে বলা হয় One Common Civil Code। এটা যে কত প্রগতিশীল চিন্তা তা বুঝি যখন আজকের ভারতের সামনে জাতীয় অখণ্ডতা, সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্ন এত গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ ধর্মের ভিত্তিতে যে সামাজিক আইন প্রচলিত আছে তার মোড় ঘুরিয়ে একটি সুসংহত নাগরিক ও সামাজিক বিষয়ক আইনের পরিবর্তে আজ দাবি উঠছে শুধু হিন্দু আইন মুসলমান বা খৃস্টান আইন না, শিখ সম্প্রদায়েরও পৃথক সামাজিক আইন প্রয়োজন। এইভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষ ছড়িয়ে পড়ছে। রামমোহনের জাতীয় ঐক্যের প্রগতি-শীল ও আধুনিক চিন্তাধারা আমাদের অভিভূত না করে পারে না।

রামমোহনের শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারাও ছিল আধুনিক। সামাজিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের স্বনির্ভরতার প্রয়োজন বেড়ে যায় এ কথা রামমোহনের কাছে ছিল সুস্পষ্ট। তাই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক। মেকলে সাহেবের শিক্ষা-সংক্রান্ত নোটের আগেই ১৮২৩ সালে রামমোহন গবর্নর জেনারেল লর্ড অ্যামহার্স্ট'কে লিখেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার শুধু সংস্কৃত শিক্ষাকে সাহায্য দেবে বলে যে চিন্তা করছে তা ভুল। রামমোহন নিজে বেদান্তে শুধু বিশ্বাসীই ছিলেন না তিনি একটি বেদান্ত কলেজ পরিচালনা করা সত্ত্বেও সেই চিঠিতে লিখেছিলেন "শুধু সংস্কৃতের ব্যাকরণের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি দিয়ে ছাত্রদের মন ভারাক্রান্ত করলে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে তার কিছুই করতে পারবে না।" তাই তিনি লিখেছিলেন বৈজ্ঞানিক বিষয় যথা রসায়নবিদ্যা, শারীর বিজ্ঞান ও আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হোক। তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকদের পরিচালনায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোক

যেখানে উপযুক্ত বইপত্র, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, আধুনিক ভারতবর্ষে যে সব চেয়ে প্রয়োজন— সেই দূরদর্শিতা রামমোহনের ছিল বলেই তিনি এই কথা বলতে পেরেছিলেন।

শিক্ষাকে প্রসারিত করা, উন্নত করার কাজে ডেভিড হেয়ার সাহেব, ডাফ সাহেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, স্বামী হরিহরানন্দ তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও রামমোহনকে পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভা ও সনাতন পন্থীরা তাঁর ঘোরতর বিরোধিতা করেন। তাঁরা ভুলতে পারেন নি যে রামমোহন সতীদাহ ও একেশ্বরবাদ প্রচারে তাঁদের বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৮১৭ সালে যখন হিন্দুস্কুলের পত্তন হয় রামমোহন ও তাঁর বন্ধু ডেভিড হেয়ার সাহেবের অবদান ছিল অপরিমেয়। কিন্তু সনাতনপন্থীদের তীব্র বিরোধিতার জন্য রামমোহনকে ডিরেকটর বোর্ডের সদস্য করা যায় নি। নানান ধরনের কুৎসা, টিটকারি পূর্ণ ছড়া কাটা হয়েছিল রামমোহনের নামে, যথা—

"খানাকুলের বামুন একটা করেছে ইস্কুল
জাতির দফা রফা হল, থাকবে না তো কুল।"

এ-সব ভ্রূক্ষেপ না করে রামমোহন তাঁর আদর্শে রইলেন অটল। স্ত্রীশিক্ষার যে বীজ বপন করেছিলেন রামমোহন তাঁর অকাল মৃত্যুর পর তা রূপ নিল স্কুল সোসাইটির ভিতর দিয়ে। যে রাধাকান্ত দেব আজন্ম রামমোহনের বিরোধিতা করে এসেছিলেন তিনি হলেন এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। ১৮৩৪ সালে, রামমোহনের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে, ১৯টি মেয়েদের স্কুল জেলায় জেলায় স্থাপিত হল। ১৮৪৯ সালে জন্ ড্রিংকওয়াটার বেথুনের নেতৃত্বে মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলের স্থাপনা হয়। এই স্কুল সুপ্রসিদ্ধ বেথুন স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ, যাঁরা রামমোহনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা বেথুন সাহেবকে সর্বতোভাবে স্কুলটিকে দাঁড় করাতে সাহায্য করেন। ১৮৫০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের সম্পাদক হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-সমাজের গোঁড়ামি উপেক্ষা করে কন্যা সৌদামিনীকে ঐ স্কুলে পাঠান এবং স্কুলে মেয়েদের পাঠালে সমাজে একঘরে করে রাখার ভয়কে তোয়াক্কা না করে মহর্ষি, রামমোহনের আদর্শকেই পূর্ণ সমর্থন করলেন। স্ত্রীশিক্ষার গতিরোধ কোনো ভাবেই করা গেল না। রামমোহন স্ত্রী জাতিকে শিক্ষায় ও আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন— সেই নারী-প্রগতির পথ উন্মুক্ত করতে তিনি সফল হলেন।

তাঁর উদার চিন্তাধারা, সর্বধর্মকে সমান সম্মান দেওয়া, হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করা, শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ও আধুনিকীকরণ করা, নারীর সম্মান ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তাদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা – এ সবই রামমোহনের বৈপ্লবিক অবদান।

তাই আজ রামমোহনের দেড় শত বছরের মৃত্যুবার্ষিকীতে ভারতের নারী জাতি জানায় তাঁকে তাদের অন্তরের প্রণাম।

রামমোহনের মৃত্যুর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মৃতিরক্ষা কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগনা শাখার হরিনাভিতে আয়োজিত একটি সভায় ভাষণ।

বেদান্তের রামমোহন-ভাষ্য

অমিয়কুমার মজুমদার

সর্বপ্রকার স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সেবক, সত্যসন্ধ, যুক্তিবাদী, মানবমিত্র রামমোহন যখন 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫) প্রকাশ করেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য শুধু ভাষ্য রচনায় নিবদ্ধ ছিল না ; তাঁর লক্ষ্য ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি এমনভাবে ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান করেছিলেন যাতে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে একটা সংহতি প্রতিষ্ঠা করা যায়। স্বার্থান্বেষী পুরোহিতকুলের প্রভাবে এবং নিরর্থক আচারসর্বস্ব যাগযজ্ঞ ও প্রক্রিয়ার ফলে হিন্দু সমাজে যে ভাঙন এসেছিল তাকে রোধ করবার জন্য রামমোহন আজীবন একাকী সংগ্রাম করে গেছেন। কাজেই তাঁর বেদান্তভাষ্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক ও সামাজিক এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে বন্ধুবর জেম্স্ সিলক্-বাকিংহামকে লেখা রামমোহনের চিঠির (১৮ জানুয়ারি, ১৮১৮) অংশবিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে : "I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interests. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and subdivisions among them, has entirely deprived them of patriotic feeling and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprises.... It is necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort."

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিতর্কেরও মীমাংসা করা প্রয়োজন। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের চিঠিতে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে। এবং বেদান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়েছে। ঐ চিঠিতে রামমোহন বলেছেন : "Neither can such improvement arise from such

speculations as the following, which are the themes suggested by the Vedanta: In what manner is the soul absorbed into the deity? What relation does it bear to the divine essence! Nor will youths fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection and therfore the sooner we escape from them and leave the world the better."

এই বিখ্যাত চিঠির তিন বছর পরে ১৮২৬ সালে নিজের মানিকতলার বাড়িতেই রামমোহন বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। অনেক সমালোচক এই দুটি ঘটনার মধ্যে স্ববিরোধ লক্ষ্য করে থাকেন। একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে আসলে রামমোহনের এই দুই প্রচেষ্টার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। রামমোহনের যুগে টোলগুলিতে যে পদ্ধতিতে হিন্দুধর্মের বই পড়ানো হত তা ছিল অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল। ছাত্ররা পুঁথির পঙ্‌ক্তি ও শব্দ ধরে ব্যাখ্যা করতেন, ব্যাকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন কিন্তু সমস্ত পঠন-পাঠনই ছিল কেতাবী; বহির্বিশ্বের, মানুষ ও সমাজের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এক কথায়, ধর্মের সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে অধ্যাপক বা ছাত্র কেউই সচেতন ছিলেন না। বেদান্তের মায়াবাদকে এমন ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করা হত যার ফলে তরুণ ছাত্রের মনে পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হত না। এই জাতীয় পঠন পাঠনের ফলে যুবসম্প্রদায় সামাজিক সংহতির প্রতি সহায়ক না হয়ে বরং বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ালেন। এইজন্যই টোল-অনুসৃত বেদান্ত পঠন-পাঠনের বিরুদ্ধে রামমোহনের আপত্তি। তাঁর নিজের বেদান্ত কলেজে পঠন-পাঠন এইজাতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিল। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বেদান্তভাষ্য যেন একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। আর প্রগতিশীল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাও বেদান্ত কলেজে ছিল। রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল; তাঁর জীবনের ব্রত ছিল সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে এক অখণ্ড সংহতি আনা। কাজেই তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যা, বেদান্ত পঠন-

পাঠন ঐ এক উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর প্রতিবাদ বেদান্তের বিরুদ্ধে নয়, বেদান্তের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা এবং বেদান্তের প্রচলিত পঠন পাঠনের বিরুদ্ধে।

ষোল বছর বয়স থেকেই রামমোহন হিন্দুধর্মের অন্যতম অভিশাপ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভিযান চালান। ফলে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের বিরাগভাজন হন এবং রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় নানাভাবে তাঁকে নির্যাতন করতে শুরু করে। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ রামমোহনকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং তাঁর মূর্তিপূজার প্রতি বিরাগ ইসলামপ্রীতির থেকে উদ্ভূত এ কথা বললে অন্যায় হবে না। ইংরেজ শাসকদল হিন্দুর মূর্তিপূজায় হস্তক্ষেপ করেন নি। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দুর মূর্তিপূজা আসলে প্রতীকোপাসনা। রামমোহন সেই সময়কার হিন্দুর পূজাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, যদিও প্রতীকোপাসনা একটি উচ্চ আদর্শ তবু হিন্দুর আচার-আচরণে দেখা গেল যে তাঁরা মূর্তিকেই আসল দেবতা বলে গণ্য করতেন। রামমোহন বলতেন, শাস্ত্রে প্রতিমাপূজার বিধি আছে সত্য, কিন্তু শাস্ত্রই আবার বলেছেন যে, যে-সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নন তাঁরা প্রতিমাপূজার অধিকারী। অর্থাৎ দুর্বলাধিকারীর জন্যই প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই কুলার্ণবতন্ত্রে দেখি :

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতি স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা॥

আত্মার স্বরূপে উপস্থিতি উত্তম অবস্থা, ধ্যানধারণা মধ্যম, জপ ও স্তুতি অধম আর হোম ও প্রতিমাপূজা অধমেরও অধম। যাঁরা মূর্তিপূজা সমর্থন করেন তাঁদের যুক্তি হল যে মূর্তিমাত্রেই উপাস্য নয়। মন্ত্রের সাহায্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার পরেই তা পূজার যোগ্য হয় এবং পূজার শেষে মন্ত্রের দ্বারাই মূর্তির প্রাণ বিসর্জন করা হয়। প্রাণ বিসর্জনের পরে মূর্তি আর উপাস্য থাকে না। রামমোহনের যুক্তিবাদী মন মন্ত্রের সাহায্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা বা প্রাণবিসর্জন প্রভৃতি ব্যাপার সমর্থন করতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে ব্যাসদেবের নামে প্রচলিত একটি প্রার্থনা উল্লেখ করা যেতে পারে :

রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্
স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

হে অখিলগুরু! তুমি রূপবিবর্জিত, তুমি অনির্বচনীয় এবং স্তুতিদ্বারা বর্ণনার অতীত। তুমি সর্বব্যাপী। তবু তোমার নানা গুণ কল্পনা করে এবং তোমার সর্বব্যাপীত্ব ভুলে গিয়ে বিশেষ কোনো তীর্থে গমন করে, আমার বিকলতা বা অসামর্থ্যের জন্যে যে অপরাধ করেছি, তা তুমি ক্ষমা করো।

রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন যে যাঁরা বহু দেবদেবীকে ঈশ্বর জ্ঞানে পুজা করেন তাঁরা একদিকে যেমন পরম সত্য থেকে দূরে চলে যান অপর দিকে তাঁরাই বহু সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, ফলে জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত হয়। রামমোহন হিন্দুর সকল শাস্ত্র বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে হিন্দুশাস্ত্রে পরমাত্মার কোনোরূপ মূর্তি বা বিগ্রহ স্বীকার করা হয় নি; আবার পরমাত্মার অবতারের কথাও শাস্ত্রে কোথাও নেই। তবুও দুর্বলাধিকারী প্রতিমাপুজা ততদিন পর্যন্তই করে থাকে যতদিন না তার উপলব্ধি হয় যে ঈশ্বর সর্বভূতে আত্মাস্বরূপে অবস্থিত আছেন।

বেদান্ত ব্যাখ্যায় রামমোহন শংকরাচার্যকে অনুসরণ করলেও অন্ধভাবে তিনি শংকরকে মেনে নেন নি। এ বিষয়ে রামমোহনেব ওপর হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর প্রভাব খুব গভীর। কুলার্ণবতন্ত্র ও মহানির্বাণ তন্ত্রে রামমোহনের অসামান্য অধিকার ছিল। আগমশাস্ত্র আলোচনার সময়ে রামমোহন ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ এই তত্ত্বে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। কাজেই তাঁর মতে মায়া হচ্ছে ব্রহ্মশক্তি। এই শক্তি থেকেই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। ব্রহ্মের যা শক্তি, জীবের কাছে তাই অবিদ্যা। শক্তির প্রকাশ জগৎকে মানুষ ব্রহ্মসত্তা থেকে পৃথক্ জ্ঞান করে বলেই সে মোহান্ধ হয়। শংকরপন্থীরা মায়াকে "সদসত্ত্যামনির্বচনীয়া" বলে ব্যাখ্যা করে সর্বশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন যে মায়া তুচ্ছা। জগৎকে মায়া বলার অর্থ এই যে, জগৎ ব্রহ্মের মতো সৎ বস্তু নয়, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ নামে পৃথক বস্তুর জ্ঞান অবলুপ্ত হয়। আবার জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে কারণ জগৎ বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুসুমের মতো অসৎ নয়। কাজেই জগৎ সৎও নয়, আবার অসৎও নয়, তাই জগৎকে বলা হয় মায়া। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে; ব্রহ্ম ছাড়া যখন মায়া নামে আর-একটি পদার্থ স্বীকার করা হল তখন অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় কেমন করে? এ প্রশ্নের জবাবে শংকরপন্থীরা বলেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে কেবল ব্রহ্মই আছেন, মায়া তুচ্ছ। অন্যভাবে বলা যায়, নির্গুণ ব্রহ্ম মানলেই জগতের ত্রৈকালিক নিষেধ মানতে হবে, অর্থাৎ জগৎ কোনো কালে ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও

থাকবে না। রামমোহন এই অর্থে 'মায়া' মানতে রাজী নন, কারণ ত্রৈকালিক নিষেধ মানলে মানুষের সেবা, লোকশ্রেয়স প্রভৃতি অসিদ্ধ হয়ে পড়ে ; আবার নীতিবোধের প্রয়োগেরও অবকাশ থাকে না।

রামমোহন বেদান্ত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মননশীলতা ও বুদ্ধিবিচারের ওপর সব চেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, যদিও বেদবিরুদ্ধ তর্ক নিষিদ্ধ, তবুও বেদসম্মত তর্কের দ্বারা অবশ্যই শাস্ত্রবাক্যের অর্থ নিরূপণ করতে হবে। শ্রুতি পরমেশ্বরকে অরূপ, অদ্বিতীয়, অচিন্ত্য, অগ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়, সর্বব্যাপী বলে বর্ণনা করেছেন। আবার ব্রহ্মকে নির্বিশেষ ও চৈতন্যমাত্র বলেও বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ। ঘট দেখলে যেমন তার নিমিত্তকারণ কুম্ভকারের কথা মনে হয়, তেমনি সৃষ্ট জগৎ দেখলে তার সৃষ্টিকর্তার কথা মনে হবে, সেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম। আবার ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণও হন। শংকরাচার্য উপাদান কারণের উদাহরণ দিতে গিয়ে পরিণাম ও বিবর্তের পার্থক্য দেখিয়ে বিবর্তকেই গ্রহণ করেছেন। মাটি রূপান্তরিত হয়ে ঘটে পরিণত হয় এটা পরিণামের উদাহরণ ; ভুল করে দড়িকে যখন সাপ রূপে দেখি তখন বিবর্ত। অর্থাৎ দড়ি যদিও সাপে রূপান্তরিত হয় নি, তবুও দড়ি আদৌ না থাকলে সাপ দেখতেই পেতাম না। কাজেই মিথ্যা সাপের উপাদান কারণ দড়ি। বিবর্তকে অবলম্বন করে শংকরাচার্য মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু রামমোহন ব্রহ্মকে যুগপৎ নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ রূপে গ্রহণ করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে জগতের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। রামমোহনের কাছে জগতের আশ্রয় ব্রহ্ম ; শংকরাচার্যের কাছে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। রামমোহনের সিদ্ধান্ত এই যে মিথ্যা নামরূপময় জগৎ ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশিত হয়।

বেদান্তমতে ব্রহ্ম আর পরমাত্মা সমার্থক শব্দ। কাজেই বৃহদারণ্যক যখন বলেন, আত্মেবোপাসীত অর্থাৎ, কেবল আত্মার উপাসনা করবে, তখন বুঝতে হবে যে এ কথার তাৎপর্য এই যে ব্রহ্মের উপাসনা করবে।

ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুতি চাই। এই প্রস্তুতি হল শমদমাদির অনুষ্ঠান, এর ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়। মন ও ইন্দ্রিয়কে আপন বশে রাখতে হবে ; ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক্ জগৎ মিথ্যা এই বিচার করতে হবে এবং নশ্বর বিষয়ে প্রীতি ও আকর্ষণ ত্যাগ করতে হবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত কর্মের প্রয়োজন। রামমোহনের মতে সন্ন্যাসীর যেমন ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার, সেইরকম উত্তম

গৃহস্থেরও অধিকার আছে। ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানের জন্য কোনো তীর্থের কিংবা কোনো দেশের প্রয়োজন নেই। যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেখানেই উপাসনা করা চলে। গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মোপাসনায় সুপারিশ করে রামমোহন এক নবযুগের প্রবর্তন করেছেন। শংকরাচার্য সন্ন্যাসের পক্ষে, রামমোহন গৃহস্থের পক্ষে। শংকরাচার্য নির্গুণ ব্রহ্মকেই সারসত্য বলে স্বীকার করেছেন। রামমোহন সগুণ ও নির্গুণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। যদিও ব্রহ্ম নির্গুণ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না, তবুও তাঁকে জগতের কর্তা ও বিধাতারূপে জানা যায়। জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ম দেখে ব্রহ্মকে স্রষ্টা, পাতা, সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"…ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য রামমোহন এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করে নিজ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। নির্বিশেষ ব্রহ্মকে এই তিন বিশেষণে ভূষিত করা কি ভ্রমাত্মক নয়? এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বলেন, এই গুণগুলি যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা কেবল প্রথমাধিকারীর বোধের জন্য। ব্রহ্মকে স্রষ্টা, পাতা, সংহর্তা এই তিনগুণে ভূষিত করলে তাঁকে সগুণ বলা হয়। কিন্তু সগুণ মানলে সঙ্গে সঙ্গে সাকার বলে মানতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। ব্রহ্ম সগুণ হয়েও নিরাকার। জীবাত্মাতে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ মানা হয় কিন্তু ইচ্ছা নামক গুণের আকার মানা হয় না। সকল মনুষ্যজাতির মানসিক উন্নতি বিধানের জন্যই শাস্ত্রে সাকারোপাসনার বিধি আছে এই মন্তব্যের জবাবে রামমোহন বলেন, যে-সকল মানুষ নিরাকার পরমেশ্বরকে চিন্তা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম শুধু তাঁদের জন্যই শাস্ত্রে মূর্তিপূজার ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্র বলেছেন যে, যার বিশেষ বোধাধিকার ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নেই, সেই লোকই কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপে উপাসনা করবেন, আর যিনি বুদ্ধিমান, যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন তিনি পরমাত্মার উপাসনা করবেন। অর্থাৎ, পরমেশ্বরের উপাসনায় যার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তার প্রয়োজন নেই।

ব্রহ্মের উপাসনার জন্য কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে? শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথমে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রবচন মনোযোগের সঙ্গে শুনতে হবে; দ্বিতীয়ত, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে, শেষে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের প্রতি ঐকান্তিক ইচ্ছা বা আগ্রহ আনতে হবে। ঘট পটাদি জাগতিক বস্তু, যা-কিছু প্রত্যক্ষ করছি তা সকলই ব্রহ্মের সত্তায় সত্তাবান্ এই বোধে ব্রহ্মসত্তাতে অনুরাগ আসলেই নিদিধ্যাসনের পথ প্রশস্ত হয়।

সাকারবাদীদের আপত্তি এই যে, যিনি জগৎকর্তা ব্রহ্ম তিনি তো বাক্য ও মনের অগোচর। সুতরাং তাঁর উপাসনা কেমন করে সম্ভব? কেবল সাকার পদার্থই জগতের কর্তারূপে উপাসনার যোগ্য। রামমোহন এই আপত্তির উত্তরে একটি উদাহরণের সাহায্যে নিজের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেছেন। যদি কোনো লোক শৈশবে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দেশান্তরে চলে যায় তা হলে সে নিজের পিতার সংবাদ কিছুই জানতে পারে না; অথচ সে যখন বড়ো হয় তখন যে-কোনো পদার্থ সামনে দেখলেই তাকে নিজের পিতা বলে গ্রহণ করে না। সে যদি পিতার উদ্দেশ্যে কোনো ক্রিয়া করে; বা প্রার্থনা করে তবে সে বলে: আমার জন্মদাতার শ্রেয়ঃ হোক্। সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় না হলেও জগতের স্রষ্টা, পাতা সংহর্তা রূপে তাঁর উপাসনা হতে পারে।

স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্তা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে রামমোহন পাশ্চাত্য দর্শনের Cosmological argument এবং ন্যায়দর্শনের কার্যকারণ যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ন্যায়মতে পৃথিবীর সকল সৃষ্ট বস্তুরই বুদ্ধিমান কর্তা থাকবে কারণ যেখানে অবয়বত্ব এবং অবান্তরমহত্ব থাকে সেখানেই স্রষ্টা থাকবে। শংকরাচার্য যেহেতু নির্গুণ ব্রহ্মকেই চরম সত্য বলে স্বীকার করেছেন সেই হেতু তাঁর মতে জগতের স্রষ্টা সগুণ ব্রহ্ম আসলে ব্যবহারিক দিক থেকে সত্য, কিন্তু পারমার্থিক দিক থেকে সত্য নয়। মায়া-প্রসূত জগৎ মিথ্যা কাজেই তার সত্যিকারের স্রষ্টা থাকা সম্ভব নয়। জগৎ ব্রহ্মেতে আরোপ করা হয়েছে, যেহেতু জগতের বিকল্প কারণগুলি যেমন, প্রকৃতি, শূন্য, পরমাণু, বিজ্ঞান প্রভৃতি কোনোটাই জগতের কারণ বলে গ্রহণীয় নয়। তর্কপাদ অংশে রামমোহনের সিদ্ধান্ত শংকরানুযায়ী। রামমোহনও বলেছেন, জগতের অধিষ্ঠান সত্তা ব্রহ্ম; সাংখ্যের প্রকৃতি নয়। বৌদ্ধের শূন্য নয়, বিজ্ঞান নয়, বৈশেষিকের পরমাণু নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে শংকর স্বীকার করেছেন যে একমাত্র বেদরূপ প্রমাণের দ্বারাই জগতের কারণাদিরূপে ব্রহ্মকে জানা যায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম বেদৈকবেদ্য। এই অংশে শংকরাচার্য ও রামমোহন একমত। কিন্তু শংকরাচার্য শেষ সিদ্ধান্ত করলেন ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জগতের পৃথক্ জ্ঞানের নিষেধ হয়, যেমন দড়ি-সাপের ভ্রমের ক্ষেত্রে দড়ির প্রত্যক্ষ প্রতীতি হলেই ঐ সাপ যে ভ্রান্ত, তার কোনো সত্তা নেই, ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না— এইরকম নিশ্চয়াত্মক বোধ হয়। অজ্ঞান দড়িকে আবৃত করে আর সেখানে সাপকে বিক্ষেপ করে। এর জন্যই ভ্রম হয়।

উপাসনার ব্যাপারে শংকরাচার্য সূক্ষ্ম বিচার প্রয়োগ করেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্য "ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" বিশ্লেষণ করে শংকরাচার্য দেখিয়েছেন যে 'ইতি' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যেমন "শুক্তিকাম্ রজতম্ ইতি প্রত্যেতি"। অর্থাৎ শুক্তিকে রজত বলে ভ্রম হয়। সেইরকম "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ"। এ কথার তাৎপর্য আদিত্য প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হবে। ব্রহ্মকে উপাসনা না করলে ফলপ্রাপ্তি কেমন করে হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে শংকর বলেন, আদিত্যাদির উপাসনাতেও ব্রহ্মই ফল প্রদান করেন। শংকরাচার্য বলেন, ব্রহ্মোপাসনা কথার তাৎপর্য এই যে প্রতীকসকলে ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যারোপ করতে হবে। অতএব, অপ্রধানরূপে হলেও ব্রহ্মেরই উপাস্যতা সিদ্ধ হওয়ায় এই উপাসনাসকল ব্রহ্মোপাসনা রূপেই গ্রাহ্য।

অধ্যায় মানার ফলে অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সংগতি রেখে শংকরাচার্যকে উপাসনার এইরকম ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। কিন্তু রামমোহন উপাসনার সহজ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে সগুণ অথচ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা শুধু যে সম্ভব তাই নয়, অবশ্যকর্তব্য। শংকর উপাসনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'উপাসনং নাম সমানপ্রত্যয় প্রবাহকরণম্'। এইজন্যই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভব নয়। রামমোহন উপাসনাকে কতখানি গভীর ভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ তিনি বলেছেন— জীবন্মুক্ত হবার পরেও সাধকের যেন উপাসনা অব্যাহত থাকে।

সর্বশক্তিমান্, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য যে ব্রহ্মসভা রামমোহন স্থাপন করেছিলেন তার সনদে (trust deed) অন্যান্য নির্দেশের মধ্যে এ-কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ : বক্তৃতায় বা সংগীতে কোনো প্রাণী বা পদার্থ কোনো মানুষ বা সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিদ্রূপ, অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা চলবে না। অর্থাৎ যদিও রামমোহন সাকারবাদী নন তবুও তাঁর ধর্মসভায় সাকারবাদীদের অবজ্ঞা বা নিন্দা করা চলবে না। রামমোহনের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি সে যুগে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

যুক্তিবাদী রামমোহন বেদকে অপৌরুষেয় বলে স্বীকার করেন নি। যুগ যুগ ধরে মানুষের অনুভূতিসঞ্জাত চিন্তারাশির সমষ্টি বেদে প্রকট হয়েছে। যুক্তির এইজাতীয় নিরঙ্কুশ প্রকাশ এবং মানুষের এইজাতীয় অকুণ্ঠ জয়গান রামমোহনকে নবযুগের অগ্রদূত হিসাবে জগতের সামনে তুলে ধরেছে।

বেদান্ত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রামমোহন যে কয়টি মৌল প্রত্যয়ের ওপর তাঁর

ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে : ১. অনুশাসন (authority)-এর পরিবর্তে মানুষকে তার নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হবে ; ২. গৃহস্থের ব্রহ্মবিদ্যায় পূর্ণ অধিকার আছে ; ৩. বেদ অপৌরুষেয় নয় ; বেদ হচ্ছে যুগ যুগ সঞ্চিত মানুষের অনুভূতি-সঞ্জাত সত্যের প্রকাশ ; ৪. যে বেদান্ত মাতা, পিতা ও জগৎকে মিথ্যা জেনে সংসার ত্যাগ করবার নির্দেশ দেয় সে বেদান্ত ভ্রান্ত ; ৫. মুক্তির উপায় জ্ঞান ও শমদমাদি সাধন এবং জনকল্যাণকর কর্মানুষ্ঠান ; ৬. সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়েই সমান সত্য ; জাতীয় সংহতি সাধনের জন্য সগুণ অথচ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা কর্তব্য ; ৭. জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই ; ৮. মায়া মুখ্যরূপে ঈশ্বরের জগৎকারণ শক্তি ; মায়া গৌণরূপে ঐ শক্তির কার্য অর্থাৎ জগৎ।

শংকরাচার্য ব্রহ্ম সম্পর্কে সৃষ্টিবোধক বাক্যগুলিকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন কারণ "যতঃ বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে··" প্রভৃতি বাক্য আত্মার একত্ব জ্ঞানই সূচিত করে, ব্রহ্মের স্রষ্টা রূপ সূচিত করে না। "নেতি নেতি" আবার "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বাক্যের সঙ্গে সৃষ্টিবোধক বাক্যগুলির বিরোধ থাকায় শংকর সৃষ্টিবোধক বাক্যকে পারমার্থিক তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। রামমোহনের এদিক থেকে কোনো বাধা নেই। তিনি সৃষ্টিবোধক বাক্যগুলিকে চরম সত্য বলেই গ্রহণ করেছেন। আর ব্রহ্মোপাসনার দুটি সাধনের কথা বলেছেন : প্রথম, ইন্দ্রিয়দমনে প্রযত্নের প্রয়োজন। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে নিজের এবং অপরের কল্যাণ সাধিত হয়। এইটাই সনাতনধর্মের অন্যতম লক্ষণ। দ্বিতীয় কথা, প্রণব ও উপনিষদ প্রভৃতি বেদাভ্যাসে যত্ন করতে হবে। বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করতে হবে। শংকরাচার্য যেখানে উপাসনাকে মানসপূজা বলে গ্রহণ করেছেন, রামমোহন সেখানে ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনাকে জ্ঞানের আবৃত্তি অর্থে গ্রহণ করেছেন। উপাসনা বাহ্যসেবাও নয় আবার প্রেমভক্তির সাহায্যে অন্তরপূজাও নয়। রামমোহন উপাসনার প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটন করেছেন এবং বেদান্তের জনকল্যাণমুখী ভাষ্য রচনা করে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন।

রামমোহন রায় ও হিন্দুনারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন

শংকরপ্রসাদ মিত্র

সারা দেশে রাজা রামমোহন রায়ের সার্ধশত মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন— সাধারণ মানুষের কর্মক্ষেত্রে ও জীবনযাত্রার এমন কোনো দিক নেই যা এই অতুলনীয় মনীষীর সঞ্জীবনী স্পর্শে সমৃদ্ধ হয় নি। এই নিবন্ধে আমরা শুধু একটি দিকে তাঁর প্রতিভার কথা উল্লেখ করব। হিন্দু নারীর অধিকার রক্ষায় প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধানের যুগোপযোগী আধুনিক ব্যাখ্যাতা রূপে তাঁর ভূমিকা আমাদের আলোচ্য।

যে যুগে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই যুগের অচলায়তন সামাজিক সংস্কারের কথা স্মরণে রাখলে জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে রামমোহনের সংস্কারমুক্ত উদার মতবাদের কথা ভাবলে অবাক লাগে। বিবাহ ব্যাপারে জাতি ও বর্ণগত ভেদাভেদ তিনি মানতেন না। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে বিবাহে কোনো বাধা স্বীকার্য নয় এবং তাঁর এই মতবাদের সমর্থনে মহানির্বাণতন্ত্রের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন তাতে বলা হয়েছে, "শৈব বিবাহে বয়স, জাতি ও বর্ণের কোনো বাচবিচার নাই। শিব নির্দেশে যে নারী পতিহীনা, 'সপিণ্ড'ভুক্ত নয় অর্থাৎ বিবাহ নিষিদ্ধ সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত নয় সেই নারীকে যে-কেহ বিবাহ করিতে পারে।" শৈব বিবাহ বৈদিক বিবাহেরই নামান্তর— তাঁর এই প্রস্তাবের বৈধতা যাতে স্বীকৃত হয় তার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। তাঁর মতবাদ যদি গ্রাহ্য হত তা হলে বিধবা বিবাহ, বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে বিবাহ হিন্দু লোকাচারে বৈধ বিবাহ বলে প্রচলিত হতে পারত।

নারীর প্রাচীন শাস্ত্রীয় অধিকার সম্পর্কে একটি নিবন্ধ তিনি ১৮২২ খৃস্টাব্দে প্রকাশ করেন। নিবন্ধটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই নিবন্ধে তিনি যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, নারদ, স্মার্ত বিষ্ণু, বৃহস্পতি ও ব্যাসের মতো সুপ্রাচীন স্মৃতিকারদের রচনা থেকে উদ্ধৃত করে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত করেন যে তাঁরা মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে পুত্রের সঙ্গে বিধবা পত্নীর সমান অংশের অধিকারিণী সাব্যস্ত করে গেছেন। রামমোহন বলেন যে পরবর্তী যুগের বঙ্গীয় টীকাকার ও ব্যাখ্যাতাগণ এই সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করেন এবং বিধান দেন যে একমাত্র পুত্রের জননীও মৃত স্বামীর সম্পত্তির কোনো অংশে অধিকার পাবে না। তাঁদের মতে সমগ্র

সম্পত্তি পুত্রে অর্সাবে। এবং সম্পত্তিতে অধিকারলাভের পর পুত্রের মৃত্যু হলে তার পুত্র অথবা স্ত্রী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এই অন্যায় ব্যাখ্যার ফলে বিধবা জননীকে সম্পূর্ণভাবে নিজের পুত্রের উপর বা পুত্রবধূর উপর নির্ভর করতে হত। এই টীকাকারদের মতে একাধিক পুত্র জীবিত থাকলে তারা একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থেকে তাদের জননীকে সম্পত্তিতে তার স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করতে পারত যেহেতু, তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী, একান্নবর্তী পরিবারের অস্তিত্বের উপরে মৃত পিতার সম্পত্তিতে জননীর স্বত্বাধিকার নির্ভর করে।

দায়ভাগ-প্রণেতা ও দায়তত্ত্বের লেখক বাঙালি নারীকুলের যে অপরিসীম ক্ষতিসাধন করেছেন রামমোহন তাঁর অনবদ্য ভাষায় তার বর্ণনা করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন, প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধানের অপব্যাখ্যার ফলে যে-নারী পরিবারের সর্বময় কর্ত্রী ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রসন্তানদের উপর নির্ভর করা ছাড়া তার উপায় ছিল না, এবং পুত্রবধূদের হাতে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়ে তাকে জীবন ধারণ করতে হত। রামমোহনের সময়কার হিন্দুসমাজে জননীদের যে অসহায় অবস্থা আইনসংগত বলে স্বীকৃত ছিল তার সুযোগ নিয়ে কুলাঙ্গার পুত্রেরা জননী ও তাদের স্ত্রীদের মধ্যে পারিবারিক বিরোধ দেখা দিলে প্রায়শই তাদের স্ত্রীদের পক্ষাবলম্বন ক'রে অসহায় জননীর মর্মান্তিক মনঃক্ষোভের কারণ হত। এ ছাড়া যে সমাজে বহুপত্নীগ্রহণ প্রচলিত সেখানে সৎমাতাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়— একদিকে সপত্নীদের নির্লজ্জ অবহেলা, অন্য দিকে পুত্রভাগ্যে ভাগ্যবতী সপত্নীদের সদর্প অবজ্ঞা।

পরবর্তী টীকাকারদের হাতে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিকৃত ভাষ্য জননীকে যে নীচ ও হেয় অবস্থায় নামিয়ে এনেছিল, রামমোহনের দৃঢ় অভিমত, অসংখ্য বিধবাদের সতীদাহে মৃত্যুর তাই ছিল অন্যতম কারণ। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ধর্মীয় সংস্কার বা পাতিব্রত্য বশে হিন্দু বিধবারা মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করত না। মরিয়া হয়ে এইভাবে আত্মবিসর্জন দেবার পিছনে তাঁর মতে, আরো একটা কারণ ছিল। তারা নিজ চোখে দেখেছে তাদের অবস্থায় পড়ে বিধবাদের কী দুঃখে দিন কাটে, কী অপরিসীম নির্যাতন ও লাঞ্ছনা তাদের নিত্য সহ্য করতে হয়। নারীর উত্তরাধিকারে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল বলেই, রামমোহনের মতে, বহুবিবাহ অবাধে হতে পারত। যেহেতু পুত্রসন্তানরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে গণ্য, অসহায় কন্যাদের কুলধর্ম রক্ষার জন্য তাদের পাণিগ্রহণ করে কুলীন ব্রাহ্মণদের বদান্যতার শেষ ছিল না।

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার এই প্রথাকে রামমোহন কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, মৃতস্বামীর সম্পত্তিতে ন্যায়সংগত অধিকার থেকে বিধবা পত্নীকে বঞ্চিত করার ফলে দুরপনেয় সামাজিক অন্যায় প্রশ্রয় পেয়েছে। প্রথমত, অপর স্বামীর আশ্রয়লাভের আশা যার নেই, সেই চির বিধবাকে আর-সবার সেবাদাসী হয়ে অপরের দয়াভিক্ষায় সারাজীবন কাটানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। দ্বিতীয়ত:, উদরান্নের দৈহিক তাগিদে নিরুপায় হয়ে বিধবাকে অসামাজিক গর্হিত পথ অবলম্বনে হয়তো বাধ্য হতে হত। এই দুই উপায়ের কোনোটাই গ্রহণ করা যার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তার একমাত্র উপায় ছিল মৃত স্বামীর চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা। বঙ্গীয় উত্তরাধিকার-আইন কী পরিমাণ সাম্যবোধবিবর্জিত তার প্রমাণ রামমোহন দেখিয়ে দিয়েছেন। বঙ্গদেশে নারী-আত্মহত্যার সংখ্যা যেখানে দশ, অন্যান্য প্রদেশে সেখানে এক। এর আর-একটি প্রমাণ, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশে বহুপত্নীগ্রহণ অনেক বেশি প্রচলিত ছিল।

এই নিবন্ধে রামমোহন যুক্তি প্রমাণ সহ দেখাতে চেষ্টা করেন যে নির্দিষ্ট কয়েকটি অবস্থা ব্যতিরেকে আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকর্তারা কখনোই বহুবিবাহ অনুমোদন করেন নি। তিনি যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু উদ্‌ধৃত করে দেখিয়েছেন যে প্রথম স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ তখনই অনুমোদনযোগ্য যদি ১. স্ত্রী মদ্যপান দোষে দুষ্টা হয় ২. যদি তার দুরারোগ্য ব্যাধি হয়, ৩. যদি সে ব্যাভিচারিণী হয় ৪. যদি বন্ধ্যা হয়, ৫. যদি উচ্ছৃঙ্খল ও অপব্যায়ী হয়, ৬. যদি কুট-ভাষিণী হয়, ৭. যদি কন্যা প্রসবিনী হয় এবং ৮. স্বামীব প্রতি ঘৃণা ও বিরাগ পোষণ করে।

মনুর উদ্‌ধৃতি দিয়ে রামমোহন বলেন, অষ্টম বর্ষ অতিক্রান্ত হলে বন্ধ্যা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বিবাহ অনুমোদনযোগ্য। মৃতবৎসা স্ত্রী বা যে স্ত্রীর সব সন্তান মৃত তার ক্ষেত্রে দশম বর্ষ এবং যে স্ত্রী কেবলমাত্র কন্যাসন্তান প্রসবিনী তার ক্ষেত্রে একাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে স্বামী পুনর্বিবাহ করতে পারবে। এ ছাড়াও, মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৮২তম শ্লোকে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে: "পত্নী, ব্যাধি-গ্রস্ত হলেও, প্রেয়সী ও সাধ্বী ; এবং যদিও তার অনুমতি নিয়ে অপর পত্নী গ্রহণ করা হয়েছে, তার প্রতি কখনো কোনো অপমান ও অনাচার যেন না করা হয়।"

সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে রামমোহন প্রস্তাব করেন যে, প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা কালে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতির জন্য আবেদন গ্রহণ করতে ম্যাজিস্ট্রেট

বা অনুরূপ কর্মচারী নিযুক্ত করা হোক। এই-সব ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীরা উল্লিখিত কোনো শর্ত সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত করা হলে পুনর্বিবাহের প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। বহুবিবাহ নিরস্ত করার আইন বলবৎ না করার জন্য তিনি শাসনকর্তৃপক্ষকে দায়ী করেন এবং এই আইন প্রচলন করে বঙ্গদেশের নারীকুলের দুঃখমোচন করে তাদের আত্মহত্যা হ্রাস করার জন্য তিনি তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন।

অতঃপর, তিনি প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধানে কন্যার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বৃহস্পতি, বিষ্ণু, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ন উদ্ধৃত করে প্রমাণিত করেন যে প্রাচীন বিধায়কবা পুত্রের উত্তবাধিকারের এক-চতুর্থাংশ কন্যার অধিকার স্বীকার করেছেন। রামমোহন বলেন, দায়ভাগের ভাষ্যকারেরা কিন্তু কন্যাদের এই অধিকার অস্বীকার করেন, তবে তাদের বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যয়ভার তাদের ভ্রাতারা বহন করবে বলে নির্দেশ দেন।

রামমোহনের মতে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যর একটি অনুশাসনের ভুল ভাষ্যের উপর নির্ভব করে ভাষ্যকারেরা তাদেব মতবাদ প্রচার করেছিলেন। মূল অনুশাসনটি নিম্নরূপ :

"অবিবাহিত কন্যাদের এক-চতুর্থাংশ এবং পুত্রদের তিন-চতুর্থাংশ প্রাপ্য— ইহা সুবিদিত; যদি সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ এত স্বল্পপরিমিত হয় যে তদ্দ্বারা তাদের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যয়ভার সঙ্কুলান সম্ভব নয়, সেই ক্ষেত্রে পুত্রদের উপর সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার বর্তাবে কিন্তু তারা ভগ্নীদের বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য থাকবে।"

রামমোহন ভুল ভাষ্যটির কঠোর সমালোচনা কবেন। "নারীকুল এবং তাদের যাবা হিতাকাঙ্ক্ষী তারা যখন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করে ধনিক সম্পন্ন পরিবারের একাধিক কন্যা তাঁদের স্বর্গত পিতার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সামান্য কোনো অংশে নিজস্ব স্বত্ব দাবি করতে অপারগ যদি তাদের একটি ভ্রাতাও জীবিত থাকে; এবং এই অবস্থায় (যদি তারা উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ হয় অথবা কুলীন পরিবারভুক্ত হয়) তাদের এমন ব্যক্তিদের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় যাদের একাধিক পত্নী জীবিত এবং এই পত্নীদের ভরণপোষণের কোনো সামর্থ্য যাদের নাই, তখন তাদের কী অবর্ণনীয় মর্মপীড়া সহ্য করতে হয়।"

হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আর-একটি প্রথাকে রামমোহন নির্মমভাবে আক্রমণ করেন। বঙ্গদেশে নিম্নকোটিক ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল অত্যধিক। এই

শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের এবং উচ্চবর্গীয় কায়স্থদের কন্যা বা ভগ্নী ছিল অর্থলাভের অন্যতম উপায়। কন্যা বা ভগ্নীর বিবাহে তাদের অর্থব্যয় করতে হত না; অপরপক্ষে পাত্রপক্ষ বা পাত্রের পরিবারের কাছ থেকে পাত্রীর মূল্য বাবত যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্তি ঘটত। কেবলমাত্র অর্থের লোভে প্রায়শই তারা তাদের আত্মীয়াদের বিকলাঙ্গ, বার্ধক্যে জীর্ণ বা ব্যাধিগ্রস্ত পাত্রদের সঙ্গে বিবাহ দিত। এর ফলে এই-সব নারী বিবাহের পরে পরেই বিধবা হত এবং বাকি জীবন তাদের চরম দুঃখে কষ্টে কাটাতে হত।

রামমোহনের দৃঢ় অভিমত ছিল, আত্মীয়দের বিক্রয় করার এই প্রথা প্রাচীন শাস্ত্রকারদের বিধানের বিরোধী। তিনি মনু ও কাশ্যপকে উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেন: "সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনায় এবং দেশের প্রচলিত আইনে এই প্রথাকে প্রকৃতপক্ষে নারীবিক্রয় বলা যেতে পারে। এই প্রথার অস্তিত্ব, সেইসঙ্গে আধুনিক ভাষ্যকার-প্রবর্তিত উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার বিলোপ— হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা হৃদয়বান ও উদার মনোভাবাপন্ন তাঁদের ক্ষোভের কারণ হয়ে রয়েছে। তাঁদের অবশ্য ভরসা এই যে সরকারের সহৃদয় দৃষ্টি সেই-সব অন্যায় দূরীকরণে আকৃষ্ট হবে যা নারীকুলের দুঃখকষ্ট, পদস্খলন, এমন-কি আত্মহননের জন্য মুখ্যত দায়ী।..."

ব্যবহারশাস্ত্রবিদ হিসেবে রামমোহনের উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা পাই নারী-সম্পর্কিত বিধিবিধান এবং তা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত নিবন্ধগুলি থেকে। পরবর্তীকালে সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের প্রশ্নে হিন্দু আইনে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা সুবিদিত। আইনের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করবেন তাঁদের বিচার্য বিষয়— আইনের পরবর্তী বিকাশের মূলে নারীর পক্ষে রামমোহনের শাণিত যুক্তি কতখানি সহায়ক ছিল।

মূল ইংরেজি রচনার অনুবাদ: শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়

ই. ভি. পায়েভ্স্কায়া

বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে। রামমোহন রায় ছিলেন বাংলার বুর্জোয়া মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে অগ্রদূত।

রামমোহনের জন্ম ১৭৭২ খৃস্টাব্দে। তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশ (গ্রাম—রাধানগর; জিলা হুগলি) ঐ সময়েই ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের একটি শক্ত ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে—ব্রিটিশ শাসন এদেশে টিকে থাকার পক্ষে অবশ্য-অপরিহার্য সৈন্যরা এবং কেরানীরাই শুধু নয়—বাংলাদেশে পাদ্রী ও বৈজ্ঞানিকদেরও পাঠানো হতে থাকে। এমনিতে দেখলে পাদ্রীদের লক্ষ্য খৃস্টধর্ম প্রচার মনে হলেও, আসলে তাঁদের প্রাথমিক কাজ ছিল নেহাতই ইহলৌকিক স্বার্থের পরিপোষক। প্রায়ই তাঁরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী অথবা প্রতিনিধি অথবা গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে নিতেন তাঁদের পারত্রিক কর্তব্য। ইংরেজরা খুব ভালো করেই বুঝত যে বিজিত দেশকে পদানত রাখতে হলে, শুধু দৈহিক বলই যথেষ্ট হবে না। জনসাধারণের উপর আদর্শগত আধিপত্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা তারা বুঝেছিল। ভারতের ধর্ম, ইতিহাস এবং সাহিত্য সম্পর্কে ইংরেজ কর্মচারীদের ঔৎসুক্য আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন ভারতীয়দের উপর সব থেকে কড়া, বর্বর অত্যাচারী ও ভারতবিদ্বেষীদের মধ্যে অন্যতম, যদিও নিঃসন্দেহেই তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ ও শাসক। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, কয়েকটি ভারতীয় ভাষার উপর তাঁর দখল ছিল অসামান্য এবং সংস্কৃতের উপর তিনি অত্যন্ত বেশি রকম গুরুত্ব আরোপ করতেন। ভারতকে আরো পুরোপুরি অধীন করার লক্ষ্য নিয়েই ইংরেজরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়াশুনো করত; এদেশের রীতি এবং আইন নিয়ে চর্চা করত যাতে স্থানীয় জনসাধারণকে (যাদের তারা ঘৃণাভরে 'আমাদের নেটিভ' বলে সম্ভাষণ করত) অধীনে রাখার জন্য তাদের তূণে বেশি বেশি অস্ত্রশস্ত্রর ব্যবস্থা থাকে।

ভারতবর্ষ জয় করার জন্য ইংরেজরা যত রকমের অস্ত্র ব্যবহার করেছিল, পাদ্রীরা ছিল তারই একটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, হয়তো বা এইজন্যই, বাংলা-দেশের শিক্ষিত মহলে খৃস্টান পাদ্রীরা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন একটা মস্ত প্রভাব। তাঁরা সঙ্গে করে এনেছিলেন ইওরোপীয় বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ এবং সংস্কৃতির জ্ঞান। এ ছাড়া অন্যরকম হওয়া সম্ভবও ছিল না, কারণ "ব্রিটিশরা ছিলেন ভারতবর্ষে প্রথম এমন ধরনের বিজেতা যাঁদের সংস্কৃতি ছিল তুলনায় উন্নততর" (মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৩, রুশ সংস্করণ)।

শ্রীরামপুর এবং কলিকাতার মিশনারিরা রামমোহনের বিশ্বদৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ভাষাতত্ত্ববিদ এবং বাংলা-সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের সংকলয়িতা উইলিয়ম কেরী, ভি. ওয়ার্ড, মার্শম্যান, জোট্স ও উইলিয়াম অ্যাডাম। শেষোক্তজন রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি স্মারক গ্রন্থ লিখেছেন ('রামমোহন রায়ের জীবন ও কাজ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা', কলিকাতা, ১৮৭৯)। পাশ্চাত্য জীবনধারা সম্পর্কে ঔৎসুক্য রামমোহনকে টেনে নিয়ে যায় ইংলণ্ডে এবং যাবার আগেই এই অভিজাত, ধনী এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকারী বাঙালিটিকে নিয়ে সেখানে যথেষ্ট কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদের মেয়াদ-বৃদ্ধির প্রশ্নে হাউস অব কমন্সের আলোচনায় মোগল-সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করতে ইংলণ্ডে গিয়ে রামমোহন অনেক বন্ধু পেয়ে গেলেন যাঁরা সাগ্রহে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাজদরবার তাঁর কাছে সহজেই অধিগম্য হল এবং পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি পেলেন লর্ড বেণ্টামকে। গ্লাসেনাপ-এর ভাষায় বলতে গেলে তিনিই সর্বপ্রথম সাহস করেছিলেন "সমুদ্র পেরোতে এবং বিশ্বের মানচিত্রে তাঁর জাতির স্থান করে নিতে" (এইচ. গ্লাসেনাপ—*Religiose Reformbewegung in heutigen Indien*, লাইপজিগ, ১৯২৮, ১ম পরিচ্ছেদ। রামমোহনেরও আগে ভারতীয় মুসলমানেরা ইওরোপে গিয়েছিলেন ; দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে— চতুর্দশ লুইয়ের দরবারে টিপু সুলতানের দূত প্রেরণ)।

ফরাসী 'বিশ্বকোষ রচয়িতা'দের (যাঁদের বলা হয়ে থাকে 'এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট') মতামতের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় ছিল। তিনি বেকনের লেখা পড়েছিলেন। "চীনের সমস্যা, গ্রীসের সংগ্রাম এবং জমিদারদের অধীনে আয়ার্লণ্ডের দুরবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল। ১৮২১ খৃস্টাব্দে নেপল্‌সে

বিপ্লবের ব্যর্থতায় তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন" (অমিত সেন [সুশোভন সরকার]— 'নোটস অন্ বেঙ্গল রেনেসাঁস্', বোম্বাই, ১৯৪৬, পৃ. ১১)। বর্মাঁ রলাঁ হয়তো একটু বাড়িয়েই বলেছিলেন যে রামমোহনের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে "ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থাবলী থেকে আরম্ভ করে তৎকালীন ইওরোপের বৈজ্ঞানিক চিন্তাভ্যাস পর্যন্ত সব কিছুই পড়ত" (আর. রলাঁ — 'সংগৃহীত রচনাবলী,' খণ্ড ১৯, পৃ ৬১)। কিন্তু জগতের ইতিহাসে তাঁর গভীর ঔৎসুক্য, নানা বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর বিস্তৃত পরিচিতি এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং বোধ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

উপরি-লিখিত দৃষ্টান্তগুলি থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা কিভাবে রামমোহনকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তাই বলে, অধিকাংশ ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের মতো, রামমোহনের স্ব-বিরোধী এবং জটিল চিন্তাধারার কারণ হিসাবে একমাত্র ইওরোপীয় প্রভাবকে দেখানো কেবল যে সেকেলে ব্যাখ্যা তাই নয়, একান্ত অসম্ভবও বটে। রামমোহনের চিন্তার সারবস্তু, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি শেষ পর্যন্ত শুধু ভারতীয় নয়, হিন্দুই থেকে গিয়েছিল— যদিও এটা অস্বীকার করা যায় না যে ইসলাম এবং মুসলিম সংস্কৃতি মোটের উপর তাঁর চিন্তাধারা গঠনে এক বড়ো অংশ গ্রহণ করেছিল। তাঁর সামাজিক মর্যাদা এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে মোগল দরবারের ঘনিষ্ঠতা, তাঁর পক্ষে ইসলামের চিন্তাধারা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছিল। পাটনার একটি উচ্চ মুসলিম শিক্ষালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং সংস্কৃত শিখবার আগেই শিখেছিলেন ফারসী ও আরবী। বাঙালিদের শিক্ষা-পদ্ধতির এই ছিল তৎকালীন বৈশিষ্ট্য। মুসলমানদের প্রতি তাঁদের কোনো ঘৃণা ছিল না। স্পষ্টতই মোগল-আমলে বাংলাদেশে সাধারণত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো বৈরীভাব ছিল না। অনেক পরে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের পর, ইংরেজদের রাজনীতির ফল হিসাবে এর উদ্ভব হয়েছিল। যেমন, মৌলবী সৈয়দ আমীর হোসেনের কাছ থেকে ব্লান্ট্ জেনেছিলেন (নবম দশকে) যে, "বাংলার মুসলমানেরা নিপীড়িত সম্প্রদায়: যদিও আগেকার কালে হিন্দু ও মুসলমানেরা খুব বন্ধুভাবেই থাকত" (ডব্লিউ. এস. ব্লান্ট — 'রিপনের আমলে ভারত', ১৯০৯, পৃ. ৯৪)।

১৮৩৫ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশে শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে গিয়ে

অ্যাডাম লিখেছেন : "হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে এই দেশে (অর্থাৎ বাংলায়— লেখিকা) একটা গুরুতর প্রশ্ন ছিল না। স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুধাবন করলেই সেটা বোঝা যায়। বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় বাংলা (অর্থাৎ হিন্দু— লেখিকা) স্কুলে ১৩ জন মুসলমান শিক্ষক ছিলেন··· মুসলমান শিক্ষকদের যেমন মুসলমান তেমনি হিন্দু ছাত্রও ছিল। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা একই স্কুলে একই শিক্ষকের কাছে একই শিক্ষা লাভ করত, একত্র খেলা করত এবং সময় কাটাত" ('বাংলা ও বিহারে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে অ্যাডামের রিপোর্ট', কলিকাতা, ১৮৬৮, পৃ. ১৭৮)।

কিন্তু জীবন থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন অথচ রূপের দিক থেকে জটিল দর্শন-শাস্ত্রের উপর রামমোহনের পুরোদস্তুর দখল ছিল।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের এক সুবৃহৎ অংশের কাছেই হিন্দুধর্ম ছিল শ্রেণীগত আর জাতিগত বাধানিষেধের, বর্বর, অন্ধ বিশ্বাস ও রীতির, ক্রূরতা ও অত্যাচারের একটি শৃঙ্খলবিশেষ। বিশ্বাস ও দেশাচারের এই গোটা ব্যবস্থাটাই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-অচলায়তন থেকেই উদ্ভূত। তার ভিত্তি ছিল বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠী আর ভিতরের দিক থেকে বিভেদ, বৈষম্য ও বাধানিষেধের ধাঁধা ছিল এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই আবার অন্য দিক থেকে জিইয়ে রেখেছিল এই অচল, অনড় অবস্থা। মোট হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ একটা ভালো ধারণা মার্কস-এর এই কথায় পাওয়া যায় : "আমাদের ভুললে চলবে না যে এই গৌরবহীন, রুদ্ধগতি ও স্থাণু জীবন (তিনি গ্রামীণ গোষ্ঠীদের সম্পর্কেই এ কথা তুলেছেন), এই নিষ্ক্রিয় টিঁকে থাকার প্রতিঘাত হিসাবেই উদ্ভূত হয়েছিল বন্য, লক্ষ্যহীন ও অবাধ ধ্বংসশক্তি এবং নরহত্যা পর্যন্ত হিন্দুস্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের ভুললে চলবে না এই ছোটো ছোটো গোষ্ঠীগুলি ছিল দাসত্ব ও জাতিভেদ প্রথার বিষে জর্জরিত, মানুষকে ভাগ্যের দাস করে রেখেছিল··এরা স্বভাবত গতিশীল সমাজব্যবস্থাকে অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়তিতে পর্যবসিত করেছিল এবং এইভাবে প্রবর্তন করেছিল বর্বর প্রকৃতিপূজার যার অবনত চরিত্রের প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে প্রকৃতির প্রভু মানুষ হনুমান নামক বানর এবং সবালা নামের গোরুর নিকট ভক্তিভরে নতজানু হত" (মার্কস ও এঙ্গেলস্— 'সংগৃহীত রচনাবলী', খণ্ড ৯, পৃ. ৩৫১)।

কিন্তু এই হিন্দুধর্মই আবার জাতিপ্রথার প্রধান স্তম্ভ ব্রাহ্মণদের কাছে দার্শনিক ধর্মতাত্ত্বিক "জ্ঞান" দাবি করত। এই ধর্ম ইন্দ্রিয়জ উচ্ছ্বাসের, আত্ম-

নিগ্রহী সন্ন্যাসীর, লিঙ্গ ও জগন্নাথেরও ঋষির ধর্ম" (ঐ, পৃ. ৩৪৬)। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জীবন উৎসর্গ করতে হত জ্ঞানান্বেষণে। ফলে, শিক্ষিত শ্রেণীর ভিতর সীমাবদ্ধ এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশের ধর্মতাত্ত্বিক প্রবৃত্তি সম্ভব হত।

বস্তুবিচ্ছিন্ন চিন্তাভ্যাস পুরুষানুক্রমে চলে এসে এই স্বল্পপরিসর গোষ্ঠীর একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই গোষ্ঠীর একজন হিসাবে রামমোহনের সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা ছিল এবং (তাঁর সময়ের অনুপাতে) তাঁর উপলব্ধিও নগণ্য ছিল না। হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থগুলি তিনি পড়েছিলেন এবং সারা জীবনই তিনি বেদকে জ্ঞান ও ধর্মের অভ্রান্ত উৎস বলে মনে করতেন।

জাতিভেদ-প্রশ্নকে রামমোহন দেখতেন সুবিধা-অসুবিধার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। জাতি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত তাঁর রচনায় তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান, মানুষে মানুষে কোনো প্রভেদ নেই। জাতি-প্রথা এবং হিন্দুধর্মের অন্যান্য রীতির বিপক্ষতা করে রামমোহন যে শুধু হিন্দুদের ধর্মের ভিত্তি নষ্ট করলেন (ঐ ধর্মের গোঁড়া ভক্তরা এই নিয়ে রামমোহনকে ঠিকই দোষ দিত) তাই নয়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিও দিলেন টলিয়ে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। কিন্তু জাতি-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রেও নিজে ব্রাহ্মণ ও জমিদার হিসাবে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও ব্রাহ্মণের উপবীত ফেলতে পারেন নি এবং তাঁর জন্য অস্পৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করতে সঙ্গে করে ইওরোপে ব্রাহ্মণ-ভৃত্য নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮২৮ সালে তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নিয়ম অনুসারেও ধর্ম-উপাসনা পরিচালনার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদেরই।

হিন্দুয়ানীর প্রধান ব্যবস্থাগুলিকেই রামমোহন সমালোচনা করেছিলেন প্রথমত জাতি-প্রথা (উপরে যার উল্লেখ করা হয়েছে), দ্বিতীয়ত পৌত্তলিকতা। নতুন একটি ধর্ম-আন্দোলনের স্থাপনার সঙ্গে রামমোহনের নাম জড়িত, যে আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ব্রাহ্মসমাজ। ইংরেজ পণ্ডিতেরা রামমোহনের ধর্ম এবং সংস্কার সম্বন্ধীয় কাজের উপরই বিশেষ জোর দেন। রামমোহনকে দৃষ্টান্ত করে তাঁরা খৃস্টান চার্চ ও প্রোটেস্টান্ট পাদ্রীদের "কল্যাণকর চরিত্র" দেখাতে চান। কিন্তু এই-সব "আলোকদাতা ও সভ্যতার বাহক", ইংরেজরাই তাদের সময়ে হিন্দুয়ানীর সমস্ত বর্বর প্রতিষ্ঠানগুলিকেই সুদৃঢ় করেছিল।

কপটভাবে তারা ঘোষণা করল যে হিন্দুদের মামলার হিন্দু-আইন অনুযায়ীই বিচার হওয়া দরকার ; এবং এই ঘোষণা মারফতই জাতিপ্রথা হিন্দু-আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং অপরিবর্তনীয় হিসাবে স্বীকৃত হয়ে গেল (জে, মেইন—'হিন্দু-আইন ও প্রথা সম্পর্কে একটি রচনা', ১৮৮৩, পৃ. ৩৩)। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকেরা হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের পুরোহিত-মোল্লাদেরই যথেষ্ট সুবিধা দিত এবং ১৮৫৭-১৮৫৯ সালের বিদ্রোহের ফলে স্বল্পস্থায়ী বিরতির পর, গোঁড়া ইসলাম এবং গোঁড়া হিন্দুয়ানীর পুরোহিতদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করত। অর্থাৎ আইন-প্রণয়নের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ইংরেজরা পরিষ্কার ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল, যার ফলে মধ্যযুগীয় হিন্দু আইনের মর্যাদা কেবল টিঁকেই ছিল না, দৃঢ়তরও হয়েছিল। এর পরিচয় তারা এ ছাড়াও দিয়েছিল, উচ্চশ্রেণীর যাজকদের উপর আস্থা স্থাপন করে এবং জাতিপ্রথা ও একটির পর একটি সামন্ততান্ত্রিক জের-এর প্রতি কার্যত সমর্থন দেখিয়ে।

জাতিভেদ-প্রথার মতবাদগত ভিত্তি— আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তিতত্ত্বের ব্যাপারে খৃস্টান ধর্মের বিরুদ্ধতা রামমোহনকে যতটা প্রভাবিত করেছিল, ততটাই করেছিল ঐ ধর্মের একেশ্বরবাদ। কিন্তু তাঁর ধর্মাদর্শের মূল কথা শেষ পর্যন্ত ছিল গভীরভাবেই হিন্দু। এরও আগে, মুসলিম স্কুলে শিক্ষার ফলে, তিনি ইসলামের ধর্মের সঙ্গে বাল্যকাল থেকে পূর্বপুরুষদের যে ধর্মশিক্ষা করেছিলেন তার তুলনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তাতে হিন্দুয়ানীর মতবাদে তাঁর অন্ধ বিশ্বাস গিয়েছিল টলে।

১৭৯০ সালে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম লেখা বাংলায় প্রকাশিত হল। রামমোহন্ লিখেছেন, "আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি পৌত্তলিকতার সমর্থকদের বিরুদ্ধে খুব জোরের সঙ্গে দাঁড়ালাম। মুদ্রণ-ব্যবস্থার সাহায্যে পৌত্তলিকতার সমর্থক ও তাঁদের ভ্রান্তির বিরুদ্ধে আমি দেশী ও বিদেশী ভাষায় বিভিন্ন রচনা ও পুস্তিকা প্রকাশ করলাম। আমি দেখাতে চেষ্টা করলাম যে ব্রাহ্মণদের পৌত্তলিকতা তাঁদের পূর্বপুরুষদের আচারের বিরোধী এবং তাঁদের প্রাচীন গ্রন্থমালার নীতি-বিরুদ্ধ।"

কর্মজগতে রামমোহনের প্রবেশ ১৮১৪ সালে, তাঁর অবসর গ্রহণের সময়ে (১৮১০ সালে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মৃত্যুর পর রামমোহন একজন ধনী ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন)। ১৮০৩ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত রামমোহন ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী। স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর

ইংরেজ প্রভুদের মতো তিনিও 'অর্থাগমের নিষ্পাপ উপায়গুলি' পরিহার করেন নি এবং ওয়াকেফহাল ওয়্যানের ভাষায় তিনি সেরেস্তাদারের (নিম্নতম রাজস্ব কর্মচারী— ১৮২৮ সালে সারা ভারতবর্ষে এই পদে মাত্র ৩৬৭ জন ভারতীয় নিযুক্ত ছিলেন) পদে অধিষ্ঠিত থেকে 'দশ বছর সময়ের মধ্যে এতটাকা জমিয়েছিলেন যাতে তিনি বাৎসরিক দশ হাজার টাকা আয়ের এক জমিদারির মালিক হতে পেরেছিলেন।' ওয়্যান আরো লিখেছেন, 'কিন্তু কী উপায়ে এই টাকা সংগৃহীত হয়েছিল তা জানা নেই। এইটুকু জানা আছে যে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করা এবং কলকাতায় একটি বাড়ি কেনা' (সি. জে. ওয়্যান— 'ভারতের ব্রাহ্মণ, ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং মুসলিমরা', লণ্ডন, ১৯০৭, পৃ. ১০২)। ধনী, 'উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ' (এ কথা তাঁর নিজেরই) রামমোহন মোগলদের দরবার এবং বাংলার শাসক ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে এক অতি উচ্চস্থানে ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং তিনি প্রাচীন হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব সংগ্রাহকের কর্তব্যের সঙ্গে কোনো রকমে মিলমিশ করেও রেখেছিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে, কৃষক-প্রজাদের রক্ত নিঙড়ে যে টাকা সঞ্চয় হয়েছিল তারই ফলে, তিনি তাঁর পরবর্তী জীবন মাঝারি গোছের জমিদারের অনগ্রসর চিন্তার নাগাল থেকে বহু দূরে সামাজিক কাজকর্ম এবং গবেষণায় উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন।

রামমোহন চেষ্টা করেছিলেন হিন্দু ধর্মকে পরবর্তীকালে পরগাছা থেকে মুক্ত করতে এবং তাকে ভারতের জাতীয় ধর্মে রূপান্তরিত করতে। নিজেকে কখনোই তিনি নতুন কোনো ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে করতেন না ; কিন্তু এই কাঠামোর মধ্যেই নতুনের বীজ নিহিত ছিল, যেটাকে রামমোহন নিজে পুরাতনেরই পুনরুজ্জীবন মনে করতেন। এক অদ্বৈত ঈশ্বরের কল্পনা ভারতবর্ষে মোটেই অভিনব নয়। কিন্তু রামমোহনের একেশ্বরবাদ বেদ বা ভক্তির একেশ্বরবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর একেশ্বরবাদ ব্রহ্মজ্ঞানীর ঈশ্বর-কল্পনা মাত্র। রামমোহনের কাছে এক ঈশ্বর ভারতের ঐক্যেরই প্রতীক। তিনি লিখেছেন, 'আমি পৌত্তলিকতার বিরোধী, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী নই' (আর্নটকে লেখা চিঠি— মূলার— 'জীবনীমূলক রচনা', লণ্ডন, ১৮৮৪, পৃ. ৪৮, পরিশিষ্ট)। অন্যান্য ধর্মেও তিনি তাঁর ধারণার সমর্থনের সন্ধান করতেন। ১৮২০ সাল থেকে তিনি মনোযোগের সঙ্গে খৃস্টধর্ম পড়াশুনা করেন। কিন্তু নিজে

তিনি খৃস্টান হন নি। হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হত তাঁর মতে ভারত-বর্ষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

কর্মফলতত্ত্বের বিরোধিতা করে রামমোহন মানুষের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করেছিলেন এবং মানুষকে মুক্ত করেছিলেন ভাগ্য ও নিয়তির কবল থেকে; নিজ উদ্যম প্রকাশের সম্ভাবনার পথও কিছুটা তাঁর সামনে উন্মুক্ত করেছিলেন।

সবশেষে রামমোহন আত্মার দেহান্তর-ধারণ-তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না।

রামমোহনের উদ্যোগে গঠিত ব্রাহ্মসমাজ, তাঁরই ধর্মীয় ধারণার বাস্তব ফল; এই সমাজের প্রথম সভা হয় ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট। সমাজের সভ্যেরা ছিলেন রামমোহনের কাছাকাছি মানুষ কিংবা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন একজন শিক্ষিত আইনজ্ঞ এবং লবণের ঠিকাদারীতে বড়োলোক হয়ে তিনি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন (যেমন, হাণ্টার বলেছেন, তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে একটি সিল্কের কারখানা কিনে অনতিবিলম্বেই অ্যাবটকে বিক্রি করেছিলেন,— ডব্লিউ ডব্লিউ. হাণ্টার, 'বাংলার তথ্যমূলক বর্ণনা', খণ্ড ৮, পৃ. ২৭০) — রামমোহন স্বয়ং ও দ্বারকানাথ ছাড়া ব্রাহ্মসমাজ তালিকায় নিম্নোক্ত সভ্যদের নাম পাওয়া যায়: ঢাকার কালীনাথ রায়, হাওড়ার মথুরানাথ মল্লিক, অভিজাত বংশীয় ব্যবহারজীবী প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী— এঁরা সকলেই হচ্ছেন বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি। শেষোক্তজন ছিলেন সমাজের প্রথম সম্পাদক। এ ছাড়াও ছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, যিনি রামমোহনের ইংলণ্ড-যাত্রার পর সমাজের প্রধান হয়ে দাঁড়ান।

কলকাতায় (চিৎপুর রোড) নতুন উপাসনা-গৃহের উদ্‌বোধনের সময়, ১৮৩০ সালে "প্রামাণিক সনদ" প্রকাশিত হয়, তাতে সমাজের নীতিগুলি বেশ পরিষ্কারভাবেই আছে। এতে লেখা আছে, 'যাঁকে কোনো নাম অথবা বিশেষণ দেওয়া অসম্ভব, সেই এক, অনন্ত, অজ্ঞেয় ও অপরিবর্তনীয়, বিশ্বের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর উপাসনার উদ্দেশ্যে মিলনের স্থান হিসাবে এই গৃহ নির্বিশেষে সর্বসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে। কোনো প্রতিকৃতি অথবা ঈশ্বরের কোনো প্রকার প্রতিমূর্তি এস্থানে নিষিদ্ধ; এবং সর্বপ্রকার বলিদান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব এস্থানে নিষিদ্ধ' (জে. এন. আরকুহার্ট— 'ভারতে আধুনিক কালের ধর্ম-আন্দোলন', লণ্ডন, ১৯২৪, পৃ. ৩৫)।

১৮৩০ সালে রামমোহনের ইংলণ্ড-যাত্রার পর, সমাজের গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমে যায়। প্রথম যুগের ব্রাহ্মসমাজ তৎকালীন ধর্মীয় অথবা সামাজিক জীবনের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে রামমোহনের ধারণা ও কাজকর্মের প্রতিফলনই ছিল। রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ তাঁর শক্তিতেই সক্রিয়, তাঁর ধারণা অনুযায়ী সংগঠিত এবং সর্বপ্রকারেই তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। সমাজের সভায় ৬০।৭০ জনের অধিক লোকের সমাগম হত না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে সেই সময়কার প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে সমাজ ঐক্যবদ্ধ করেছিল। ঠিক এই কারণেই ব্রাহ্মসমাজকে আমরা বাংলার জীবনে নিশ্চিতরূপে উন্নতিমূলক ঘটনা মনে করতে পারি। ব্রাহ্মসমাজের পত্তনে গোঁড়া হিন্দুদের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। এই নতুন সমাজের বিরোধিতার জন্য ধর্মসভা নামে একটি নতুন সংঘ গঠিত হল। এই শেষোক্ত সংগঠনের কাজের পরিচয় পাওয়া যায় এই ঘটনা থেকে যে, সতীদাহ-প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাব করে এরা সরকারের নিকট আবেদন জানায়।

রামমোহনের ধর্ম-জিজ্ঞাসা থেকে দেখা যায় যে সম্যকরূপে উপলব্ধি না করলেও তিনি অনুভব করেছিলেন যে ধারণা, রীতি ও বিশ্বাসের এক সংগঠন হিসাবে হিন্দুধর্ম ধ্বংসোন্মুখ! হিন্দুধর্মের এই ধ্বংস সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তার যোগাযোগেরই ফল, যে সামন্ততন্ত্র নতুন বুর্জোয়াতন্ত্রকে অনিবার্যভাবেই স্থান ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম করছিল। বুর্জোয়াদের দরকার ছিল অন্য এক ধর্মের; জাতিভেদ-প্রথার কুসংস্কার মেনে চলা ধনতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না। ধর্ম সংস্কারের সংগ্রামের মধ্যে ভবিষ্যৎ-বুর্জোয়াদের দাবি লক্ষ্য করা যায়—যেমন, বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, কর্মপ্রচেষ্টার স্বাধীনতা, ...ইত্যাদি অর্থাৎ বুর্জোয়া স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় সব-কিছুই। ধর্মই ছিল তখন পুরোপুরি অনুন্নত প্রাচ্য-সমাজের একমাত্র বোধগম্য মতবাদ।

এইজন্যই সামাজিক অগ্রগতির সব প্রশ্নই এখানে ধর্মের আবরণে দেখা দিত। সেই প্রশ্নসমূহের গঠনমূলক সমাধান খুব বড়ো একটা প্রগতিশীল ধাপ; মধ্যযুগীয়তা এবং তার অন্ধকার ও জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামী রামমোহনের বিরাট দান এইখানেই।

সতীপ্রথা এবং সদ্যোজাতা শিশুকন্যা হত্যার বিরুদ্ধে রামমোহনের যে সংগ্রাম তার তাৎপর্য শুধু বর্বরতা-বিরোধিতার দিক থেকেই নয়, তা ছিল সঙ্গে সঙ্গে

নারীর পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার অধিকার এবং মানুষ হিসাবে তার স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারের এক ধরনের স্বীকৃতি।

১৮১১ সালে রামমোহনের নিজের ভ্রাতৃবধূ শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান। রামমোহনের দিক থেকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার এটা একটা পরোক্ষ কারণ ছিল।

"নারীর প্রাচীন অধিকার" প্রবন্ধে রামমোহন দেখিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিক দিক থেকে নারী পুরুষের সমান তো বটেই, আইনের চোখেও তাকে সমান অধিকার দিতে হবে। উত্তরাধিকারসূত্রে তার সম্পত্তি পাবার অধিকার থাকবে।

রামমোহনের রচনাবলীর দিকে তাকালেই বোঝা যায় তিনি সাহিত্যে কত বড়ো ঐতিহ্যের স্রষ্টা। প্রচারমূলক লেখা, ধর্মানুসন্ধান, ব্রহ্মোপাসনা, সংস্কৃত থেকে অনুবাদ, এমন-কি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নিয়েও তিনি লিখে গেছেন।

বাংলায় গদ্য-রীতির তিনিই প্রথম প্রবর্তক। সংগত কারণেই তাঁকে বলা হয় 'বাংলা গদ্যের জনক'। 'আধুনিক সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট্-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।' রামমোহনের সৃষ্ট সাহিত্য বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। সংস্কৃত ছিল অভিজাত শ্রেণীর ভাষা। সে জায়গায় বাংলা ভাষার প্রচলন করে গদ্য-সাহিত্যকে তিনি ব্যাপকতর অংশের কাছে সহজ-গ্রাহ্য করে তুললেন। এ থেকে দেখা যায়, দেশের বলতে যা-কিছু তার ওপরই তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল। রামমোহনের পরে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে এই লক্ষণটিই জাতীয়তাবোধ হয়ে ফুটে উঠেছে। বাঙালিমাত্রেরই যে জনবোধ্য মাতৃভাষার প্রয়োজন তা সমাজ-বিবর্তনের তাগিদেই অনুভূত হয়েছিল। সমাজ এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁচেছিল, যখন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যে সবাইকে মেলাতে পারে এমন একটি সার্বজনীন ভাষার দরকার হয়। লেনিন বলেছেন, 'দেশের ভেতরকার বাজারের ওপর পুরোপুরি দখল ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের অবাধ স্বাধীনতার জন্যে জাতীয়তা ও ভাষাগত ঐক্য খুব জরুরী হয়ে দাঁড়াল' (ভি. আই. লেনিন, 'রচনা সংগ্রহ', খণ্ড ১৭, পৃ. ১৫৭)। অর্থাৎ ঐতিহাসিক দিক থেকে একটি দেশের ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে

একটি সার্বজনীন জাতীয় ভাষা না হলে চলে না। এর সঙ্গে জাতিগঠন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

বাঙালির জাতি-গঠনের ইতিহাসে রামমোহনের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রামমোহনের প্রকাশনাকার্য তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ থেকে বাংলা সংবাদপত্রই শুধু নয়, সর্বভারতীয় জাতীয় সংবাদপত্রেরও গোড়াপত্তন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতবর্ষে ইংরেজি সংবাদপত্র ছাপা হতে থাকে। প্রথম যে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'হিকিজ গেজেট' (প্রথম সংখ্যা বার হয় ১৭৮০-র ২৯ জানুয়ারি)। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পন' (প্রথম সংখ্যা ১৮১৮ সালের ২৯ মে) বার করেন। এই কাগজে হিন্দুধর্মের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ হতে থাকায় রামমোহনকে নিজের আলাদা কাগজ বার করতে হয়। ১৮২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বি. জি. বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় রামমোহনের এই সাপ্তাহিক মুখপত্রটি প্রকাশিত হয়। অবশ্য পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি নেওয়া হয় গোবিন্দচন্দ্র কাউর ও আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নামে। পত্রিকাটির নাম ছিল 'সংবাদ-কৌমুদী'। বাংলা ভাষায় তৃতীয় সংবাদপত্র 'চন্দ্রিকা'র (এপ্রিল, ১৮২৩) সঙ্গেও রামমোহনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। হিন্দুধর্মের বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে লেখা তাঁর রচনাগুলি এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও রামমোহন ফার্সী ভাষায় আরো দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

রামমোহন চার চারটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন— এটা কম কথা নয়। তাঁকে নিঃসন্দেহে বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। কিন্তু শুধু সংবাদপত্র প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, তাকে পূর্ণ অধিকারে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে এবং তার স্বাধীনতার জন্যে তিনি লড়েছেন। ১৮২৩ সালে সংবাদপত্রের ওপর দ্বিতীয় বিধিনিষেধের (প্রথম বিধিনিষেধ আসে ১৮১৮ সালে। সে সময়কার সেন্সরকর্তা জন অ্যাডাম প্রকাশকদের কাছে এক চিঠি দেন। তাতে বলেন, সরকারকে লোকচক্ষে হেয় করা বেআইনী বলে গণ্য হবে এবং যদি কোনো আলোচনার ফলে স্থানীয় লোকের মনে ত্রাস, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব ও সন্দেহের উদ্রেক হয়, তা হলে তা ছাপানো চলবে না।) বিরুদ্ধে "ভারতীয় সংবাদপত্রের" নাম দিয়ে রামমোহন হাইকোর্টে এক দরখাস্ত

পাঠান। এই দরখাস্তে তিনি সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের বিরুদ্ধে সমগ্র কলকাতাবাসীর প্রতিবাদের কথা জানান। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, তাঁর প্রতিবাদ জানানোর ভাষা বড়ো বেশি মোলায়েম ছিল। তিনি লিখে-ছিলেন, "এর ফলে [সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ায়— অনু.] ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রসারের পথ রুদ্ধ হবে, স্থানীয় শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজদের প্রতি বিমুখ হবে এবং ইংরেজদের আর সহায়তা করবে না" (এন. বার্নস্-লিখিত 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' গ্রন্থে ১২৩-২৪ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত)। চিঠির মধ্যে আনুগত্যের সুর থাকলেও হাইকোর্ট তা প্রত্যাখ্যান করেন। রামমোহন তখন সম্রাটের কাছে দরবার করলেন যাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-হরণকারী বিধিনিষেধের আইন প্রত্যাহার করা হয়। প্রিভি কাউন্সিল তাঁর এই দ্বিতীয় আবেদনটিও নাকচ করে। সংবাদপত্রের আরো বেশি স্বাধীনতার জন্যে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সংবাদপত্রকে তিনি সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিস্তারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় বলে দেখতে পেয়েছিলেন।

শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রেও রামমোহনের বিরাট ভূমিকা ছিল। ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার তিনি বরাবর চাইতেন। তিনি মনে করতেন এ দেশের শিক্ষার স্তর ইওরোপের সমান হয়ে ওঠা খুবই দরকার এবং ভারতীয়দের পক্ষে বিজ্ঞান আয়ত্ত করা অত্যন্ত জরুরি কাজ।

রামমোহন দেখলেন সংস্কৃত শিক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। লর্ড আমহার্স্টকে তিনি লিখলেন, "সংস্কৃত শিক্ষা দেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখবার শ্রেষ্ঠ উপায়।" ভারতীয় পণ্ডিতেরা শুধুমাত্র ভগবৎতত্ত্ব বিষয়ক "শিক্ষা" দিতেন ; অর্থাৎ, শিক্ষা ছিল শুধুই ধর্মপ্রচার। পার্থিব জিনিসের মধ্যে কেবল ভাষা শেখানো হত, যাতে ছাত্ররা মূল ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করতে পারে। হাতে-কলমে পরীক্ষা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রমাণসহ বিজ্ঞানশিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রামমোহনই প্রথম দেখান। তিনি দাবি করেন শিক্ষাকে ধর্ম-নিরপেক্ষ করতে হবে এবং তিনি বলেন যে ভারতীয় বিজ্ঞানের দশা হল ইংলণ্ডের প্রাক্-বেকনীয় বিজ্ঞানের মতো। উপরোক্ত চিঠিতে তিনি সরকারকে ভারতবর্ষে এমন এক নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করবার জন্যে অনুরোধ করেন যার মধ্যে থাকবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (গণিত, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৃতি-দর্শন, ইত্যাদি)। কিন্তু ইংরেজের নীতি তখন এর সম্পূর্ণ উলটো ; ইংরেজ রাজনীতিকেরা ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তুলতে ভয় পেতেন। তার বাস্তব

কারণও ছিল। ব্যবহারিক শিক্ষাপদ্ধতির বদলে এক সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করবার প্রস্তাব এল। ভারতবর্ষে রামমোহনই বাস্তবিক প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৬-তে ডেভিড হেয়ার-এর সহযোগিতায় তিনি কলকাতায় "বিদ্যালয়" নামে প্রথম ইওরোপীয় কলেজ শুরু করেন। এই শিক্ষালয়ে ইওরোপীয় এবং ভারতীয় দু-রকম ভাষাই শেখানো হত। ১৮১৮-তে এই বিদ্যালয়ে মাত্র ২০ জন ছাত্র ছিল; এবং ১৮২০-তে ছাত্রসংখ্যা ৪৩৬ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতবাসীর পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পক্ষে এই দাবিকে শুধুই ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ মনে করলে ভুল করা হবে। রামমোহনের দাবি দেশের পশ্চাৎপদ্ অবস্থার বিরুদ্ধে মস্ত আঘাত। রামমোহন তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করবার উপায় হিসেবে সম্রাট বা গভর্নরের কাছে যে একান্ত বিনীত অনুরোধের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন—সে কথা আলাদা। কিন্তু তখনকার বাংলাদেশের অবস্থায় এ-সব পরিকল্পনার কথা ভাবতে পারাটাই ছিল প্রগতিমূলক।

নিজের দেশের জমির উপর দাঁড়িয়ে এবং নিজের চাহিদা অনুসারে অজ্ঞানের অন্ধকারের বিরুদ্ধে, টুলো শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে, ধর্মমূলক সংরক্ষণশীলতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে, মধ্যযুগীয় অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামী হিসেবেই রামমোহনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ভারতবর্ষের পেছিয়ে-পড়া দশাকে তিনি যে-ভাবে বুঝেছিলেন তার দরুনই তিনি ইংলণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলেন; তাঁর ধারণায় ইংলণ্ডের পক্ষে এই পেছিয়ে-পড়া অবস্থা দূর করা সম্ভব ছিল।

রামমোহনের নিজের ভাষাতেই, ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর চরম ঘৃণা ছিল; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ইওরোপীয়দের সম্বন্ধে তিনি সহনশীল হয়ে উঠলেন এবং ক্রমশ তাদের পক্ষপাতী হতে শুরু করলেন, বুঝতে শুরু করলেন যে যদিও তাদের সরকার বিদেশী শাসনব্যবস্থাই তবুও তার দরুন স্থানীয় জনগণের অবস্থার উন্নতি খুব তাড়াতাড়িই হবে (আর্নট-কে লেখা চিঠি—'বায়োগ্রাফিকাল এসেজ', ১৮৮৪, পৃ. ৪৬-৪৮, মূলার-কর্তৃক উদ্ধৃত)। এই কথাগুলি থেকেই তাঁর রাজনৈতিক রূপটা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। রামমোহনের সংগ্রামের মূল বিষয় ছিল সংস্কৃতি এবং শিক্ষা। হয়তো কালেক্টারি দপ্তরের সেরেস্তাদার হিসেবে তাঁর চোখে পড়েছিল কী ভাবে শিক্ষিতরা কৃষকসাধারণের সর্বাঙ্গীণ সর্বনাশের জন্যে দায়ী। এদিকে "উন্নততর

সংস্কৃতিসম্পন্ন বিজেতা" বলতে ইংরেজই প্রথম, আর তাই ভারতীয় সভ্যতার কাছে তাদের নাগাল পাওয়া অসম্ভব মনে হয়েছিল। পল্লী-সমাজকে উৎখাত করে ইংরেজরা ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংস করল। উৎসন্নে দিল ভারতীয় শিল্প এবং ভারতীয় সমাজে যা-কিছু অসামান্য তাকেই ধূলিসাৎ করল। মার্কস বলেছেন. "ভারতে ইংরেজ-শাসনের ইতিহাসের পাতায় ধ্বংস ছাড়া অন্য কথা খুবই সামান্য ; এই ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে তাদের গঠনমূলক কাজ চোখে পড়তে চায় না। তবুও এই গঠনমূলক কাজের সূত্রপাত হয়েছে" (মার্কস-এঙ্গেলস্, 'গ্রন্থাবলী'— খণ্ড ৯, পৃ. ৬৬৩)।

রামমোহন শুধুই যে কৃষকদের সর্বনাশ হতে দেখেছিলেন তাই নয়, জনসাধারণের দুর্দশায় নিজে ধনবান হয়েছিলেন। ইংরেজ-শাসনের দরুন কৃষকদের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরদেরও দৈন্য দেখা দিল। রামমোহনের নিজের শ্রেণীর অন্তর্গত অনেক জমিদারও সর্বস্বান্ত হল। রমেশ দত্ত লিখেছেন, সাধারণত ঐতিহাসিকরা যে মনে করেন অমানুষ সিরাজদ্দৌল্লার শাসনেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে জনসাধারণের অমন দুর্গতি দেখা দিল— যে দুর্গতির কথা মেকলে অমন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন,— তা ঠিক নয় ; আসলে এই দুর্গতি শুরু হল ইংরেজের কবলে এই প্রদেশ (বাংলা) এসে পড়বার পরই (রমেশচন্দ্র দত্ত— 'পেজান্ট্রি অব বেঙ্গল', কলকাতা, ১৮৭৪, পৃ. ৪২)। কিন্তু ইংরেজদের এদেশ জয়ের দরুন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবানের বরাত খুলে গেল, রামমোহন তাঁদেরই একজন। ইজারার টাকায় তিনি খুব বড়োলোক হলেন। কর্নওয়ালিসের সংস্কার মারফত যে জমিদাররা ইংরেজদের প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল, তাঁদেরই কোঠায় পড়েন রামমোহন নিজে কিংবা দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি তাঁর জমিদার-বন্ধুরা। ইংরেজদের মধ্যেই তিনি ভারতের প্রকৃত শাসকশ্রেণীকে দেখতে পেলেন ; তাই ইংরেজদের কাছেই তিনি আবেদন জানালেন এবং তাদের ওপর ভরসা করলেন।

মোটামুটি কী দাঁড়াল দেখা যাক। সাধারণ সিদ্ধান্ত হিসেবে রামমোহনের কয়েকটি দিক যে প্রগতিশীল তা বলা দরকার। স্পষ্ট কথায়, সেগুলি হল : হিন্দুদের মধ্যযুগীয় এবং বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা-পদ্ধতির পক্ষে প্রচার। ভারতবর্ষ যাতে বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে বাকি পৃথিবীর সংস্পর্শে আসতে পারে, রামমোহন তার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষে ধনতন্ত্রের পথে বিকাশ লাভ করার যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল তার

দরুনই রামমোহন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি, সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্য জীবনধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ছিলেন, এবং তখনকার বাংলাদেশের সমাজের তুলনায় উন্নত স্তরের যে সমাজ তার প্রতি আকৃষ্ট হন। বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও বাংলা সংবাদপত্র গড়ে তোলার জন্যেও রামমোহনকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

রামমোহন সাংস্কৃতিক বিকাশের যে পথ দেখিয়েছেন তা আসলে ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক বিকাশেরই এক অপরিহার্য অঙ্গ। এই পথে তিনি জাতীয় সংস্কৃতির পূর্বগৌরব ফিরে পাবার সংকল্প করেছিলেন; কিন্তু তা শুধুমাত্র জাতীয় মুক্তির অবস্থাতেই সফল হতে পারে। তবুও রামমোহনের মতে জাতীয় সংস্কৃতির এই আদর্শ সফল করবার সঙ্গে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের কোনো যোগ ছিল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রামমোহন যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সফল করবার বাস্তব চেষ্টা ইংরেজ-শাসনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। সে-বাধা শুধুমাত্র সংগ্রামের সাহায্যেই দূর করা সম্ভব— ১৮৫৩-তে মার্কস্ যেমন বলেছিলেন, "ইংরেজের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে" তবেই সে-বাধা দূর করা সম্ভব। (মার্কস্-এঙ্গেল্স্, 'রচনাবলী', খণ্ড ৯, পৃ. ৩৬৬)।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে রামমোহনের ধারণা আর পরবর্তীকালের উদারপন্থীদের ধারণা মূলত একই।

পরবর্তীকালের সামাজিক আন্দোলনের দুটি ধারা— উদারপন্থী নীতি আর জাতীয়তাবাদ— রামমোহনের দার্শনিক ধারণার কাছ থেকেই প্রেরণা পেয়েছে। ভারতের শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা করবার দরুন, ইংরেজ এবং ইংরেজের সমর্থকরা রামমোহনকে এই বলে প্রশংসা করেন যে, তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা, সংস্কৃতি ও নীতিজ্ঞানকে সার্থকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয়তা-বাদী বাঙালিরা রামমোহনের আদর্শ এবং কর্মজীবনের অন্য দিকটা দেখেন। রামমোহনের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পান সেই মানুষকে. যিনি বাঙালিকে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় বিকাশের নতুন পথ দেখিয়েছিলেন।

এঁরা কেউই ভ্রান্ত নন। কেননা, তখনকার দিনে রামমোহনের পক্ষে বিকাশের এই দুই গোড়াকার ধারাকে মেলানো সত্যিই সম্ভব ছিল। ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে এর মিল রয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে রামমোহনের কোনো অর্থনৈতিক সংঘর্ষ বাধবার কথা নয়; কেননা তিনি নিজে যে শ্রেণীর লোক ছিলেন, সেই জমিদার শ্রেণীকে ইংরেজরা জমির ওপর ব্যক্তিগত

মালিকানা দিয়েছিল। তবু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ইংরেজ-শাসনের মধ্যে রামমোহন নির্জলা ভালো দেখেন নি। ইংরেজ শাসনকে অপরিহার্য অমঙ্গল বলেই তাঁর মনে হয়েছে— যেমনটা তাঁর সমসাময়িক অনেক বাঙালি এবং পরবর্তী অনেক বুর্জোয়া রাজনীতিকেরই মনে হয়েছিল।

'পরিচয়', আশ্বিন ১৩৫৮ সংখ্যা থেকে সংকলিত।

হিন্দী ভাষায় রামমোহন

হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী

হিন্দী গদ্যের খুব বিস্তৃত পুরাতন ইতিহাস নাই। পুরাতন হিন্দী সাহিত্যে দেখিতে গেলে দেখা যায় 'দেব' প্রভৃতি কয়েকজন কবি কিছু গদ্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অতি সামান্য। কয়েকটি খুব প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকা ব্রজভাষা গদ্যে লেখা হইয়াছে; তাহা ছাড়া অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় দাদূপন্থী সাধকদের কয়েকটি গদ্য পুস্তকেব সন্ধান পাইয়াছেন। 'জটমল' নামক একজন গদ্য লেখকের পুস্তকের আলোচনা মিশ্র বন্ধুরা করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত লেখকের বংশধর শ্রীপূরণচন্দ্র নাহর মহাশয় বলিয়াছেন যে জটমলের মূল বইখানি গদ্যে নয়, পদ্যে। "কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার" রিপোর্টের মধ্যে আবো কয়েকটি গদ্য পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু যে ভাষা নিজের প্রাচীন সাহিত্যের বিপুলতায় উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া গণ্য হয়, তাহার সাহিত্যের ৮০০ বৎসর ব্যাপী বিরাট ইতিহাসে এইটুকু গদ্য যে নিতান্ত অল্প, তাহা না বলিলেও চলে।

উপরে যে গদ্যের কথা বলা গেল, সে গদ্য আজকালকার হিন্দী গদ্য নয়। লল্লূজী লালকেই বর্তমান যুগের হিন্দী গদ্যের প্রথম লেখক বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, এবং সেই সূত্রে 'প্রেমসাগর' নামে একটি গদ্য গ্রন্থ লেখেন। সদল মিশ্র নামে আর-একজন অধ্যাপকও সেই কলেজে অধ্যাপনা কবিতেন। তিনি 'নাচিকেতোপাখ্যান' নামে আর-একটি গদ্য গ্রন্থ লেখেন। এই দুইখানি বই ইং ১৮০১ খৃস্টাব্দে লেখা হয়। তাহার মধ্যেও শুধু— 'প্রেমসাগর' ইং ১৮০৭ সালে ছাপা হয়। কিন্তু ইহাদের পূর্বে মুন্শী সদাসুখ লাল বলিয়া আর একজন লেখক সমগ্র ভাগবতের হিন্দী গদ্য অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের নাম 'সুখসাগর'। সুখসাগর যদিও হিন্দী ভাষাতে লেখা হইয়াছিল তবুও উহার লিপি ছিল পারসী। ফোর্ট উইলিয়ামের অধ্যাপকদের পরে মুন্শী 'ইন্শা অল্লা খাঁ নামক জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের হিন্দী গদ্য পাওয়া যায়। ইনি 'রাণী কেতকী কী কহানী' নামে একটি কথা পুস্তক লেখেন। তার ভাষার সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে তাহাতে একটিও আরবী কিংবা পারসী শব্দ লেখা হইবে না। কিন্তু সেই পুস্তকও

উর্দু অক্ষরেই লেখা হইয়াছিল। ১৮১০-১১ সালের কাছাকাছি ইন্‌শা অল্লা খাঁ তাহার পুস্তকটি প্রণয়ন করেন। আমরা তাহার সঠিক সময়ের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তবে, ১৮৫২ খৃষ্টীয় সালে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে ধারাবাহিকরূপে 'রাণী কেতকী কী কহানী' ছাপানো আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এই বই ১৮৫৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জার্নেলেও এই পুস্তকের লিপি পারসীই ছিল।

সকলেই মনে করেন যে তাহার পর ৬০ বৎসর পর্যন্ত হিন্দী গদ্যের আর-কোনো পুঁথিপাতি পাওয়া যায় নাই। এই পর্যন্ত হিন্দীর গদ্যের ঐতিহাসিকেরা একস্বরে এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন হইল রাজা রামমোহনের জীবনচরিত এবং গ্রন্থাদি আলোচনা করিতে গিয়া দেখি, আমাদের এই বিশ্বাস ভুল। কারণ, রাজা রামমোহন ১৮১৫ খৃস্টাব্দে বেদান্তসূত্রের হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃস্টাব্দে তাহার আর-একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হিন্দীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তিকার বিষয় ছিল কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত শাস্ত্রার্থ'।* এই শাস্ত্রার্থটি হইয়াছিল বিহারী-লাল চৌবের কলিকাতার বাড়িতে। পরবর্তী সাহিত্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, এই বিহারীলাল চৌবে সুপ্রসিদ্ধ ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের কবিমণ্ডলের একজন প্রবীণ কবি ছিলেন।

এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে রাজা রামমোহন রায়ের হিন্দী বেদান্তসূত্র যে বৎসরে প্রকাশিত হয়, তাহার ঠিক আট বৎসর পূর্বে লল্লুজীর 'প্রেমসাগর' প্রকাশিত হইয়াছিল। অর্থাৎ রাজা রামমোহনের হিন্দী পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্বে হিন্দী ভাষায় এই যুগের গদ্যে একটি মাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখন-ক্রমানুসারে যদি দেখা যায়, তাহা হইলেও হিন্দী গদ্যে রাজা রামমোহন অতি উচ্চ ও বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কারণ, এই পর্যন্ত তাঁহার পূর্ববর্তী চারিজন হিন্দী গদ্য লেখকের নাম পাওয়া যায়; এই চারি জনের মধ্যেও দুই জনের ভাষা যদিও হিন্দী, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থ পারসী অক্ষরে লিখিয়াছিলেন। কালক্রমানুসারে রাজা পর্যন্ত গদ্য লেখকের ক্রম এই :—

১	সদাসুখ লাল	(১৭৮৩ খৃ)	পারসী লিপি
	লল্লুজী	(১৮০১ খৃ.)	দেবনাগরী লিপি
	সদল মিশ্র	(১৮০১ খৃ.)	,,

* হিন্দী ভাষায় শাস্ত্রার্থ শব্দের অর্থ, বিচার।

ইন্‌শা অল্লা খাঁ	(১৮১০ ?)	পারসী লিপি
রাজা রামমোহন	(১৮১৫ „)	দেবনাগরী লিপি

এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে ভাষার সঙ্গে লিপির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বস্তুত যাঁহারা দেবনাগরী আশ্রয় করিয়া হিন্দী লিখিয়াছিলেন, তাঁহারাই বর্তমান হিন্দী গদ্যের যথার্থ পথপ্রদর্শক। এই কালক্রমানুসারে রামমোহন হইলেন এই যুগে তৃতীয় হিন্দী গদ্য লেখক। কিন্তু তাঁহার লিখিত হিন্দী ভাষার মহত্ত্ব আরো বাড়িয়া যায়, যখন উপলব্ধি করি যে ফোর্ট উইলিয়ামের অধ্যাপকেরা কেবল চাকরির দায়ে পড়িয়া গদ্য লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজাই ছিলেন বর্তমান হিন্দী ভাষায় দেবনাগরী লিপির প্রথম স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত লেখক।

রাজা রামমোহন রায় জীবনের প্রারম্ভ কাল হিন্দী-ভাষী নগরেই কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-কালের বেশির ভাগ সময় পাটনা এবং কাশীতেই যাপিত হইয়াছিল। ইহার পরেও তিনি মুর্শিদাবাদে থাকিতেন। শ্রীযুত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, সে যুগে মুর্শিদাবাদ এবং ঢাকাতে হিন্দুস্থানী ভাষা 'ফ্যাশনেব্‌ল্' ভাষা বলিয়া গণ্য হইত। যাহাই হউক, রামমোহনের বাল্যজীবন হিন্দী-ভাষী নগরেই ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার ভাষাতে এই দুই নগরের ভাষার প্রভাব রহিয়া গিয়াছে। রাজার প্রকাশিত বেদান্তসূত্রের হিন্দী অনুবাদ আমি দেখি নাই। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিবাবুর মুখে শুনিয়াছি যে তিনি এই অনুবাদখানি মির্জাপুরের জনৈক ভদ্রলোকের কাছে দেখিয়াছিলেন। রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে এই পুস্তকের সংগ্রহ নাই। সংগ্রহ কর্তারা এই গ্রন্থখানির মহত্ত্ব একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই। গ্রন্থাবলীতে হিন্দীতে লেখা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র দেখা যায়, যাহা আশ্রয় করিয়া এই আলোচনা করা গেল। শুনিয়াছি, তিনি আরো কয়েকখানি হিন্দী পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থাবলীতে যে পুস্তিকা সংগৃহীত আছে, তাহার ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত ভাবে অন্য স্থানে বিচার করিয়াছি ('বিশাল ভারত' ডিসেম্বর ১৯৩৩, কলিকাতা)। এইখানে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে রাজা রামমোহনের হিন্দী "বাঙ্গালী হিন্দী" নয়। তাহা ব্যাকরণ হিসাবে খুব বিশুদ্ধ। যেটুকু ত্রুটি আছে তাহাও তাঁহার নিজের দোষে নয়। তিনি কাশীতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। সেখানকার পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে যেরূপ ভাষা প্রচলিত ছিল, রাজা অবিকল সেইরূপ ভাষাই লিখিয়াছেন। অধুনাতম

হিন্দী গদ্যে যে রকম বানান ব্যবহার করা হয়, রামমোহনের বানানে তাহা হইতে একটু প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তাহা কতকটা পরিমাণে বাংলা বানানের মতো দেখায়। তিনি 'কর্নে'র স্থানে 'কর্ণে' লিখিয়াছেন। এই রীতি আজকাল বাংলা বানানে দেখা যায়। বর্তমান বাংলাতে 'রানী' না লিখিয়া লেখা হয় 'রাণী,' অর্থাৎ উচ্চারণে না থাকিলেও লেখাতে সংস্কৃতের ণত্ব-বিধানের নিয়ম পালন করা হয়। রাজা রামমোহন এই নিয়মেই লিখিয়াছেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তাঁহার হিন্দী পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্বে একখানি মাত্র হিন্দী গদ্য পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। সে বিষয়েও একটু ভাবিবার আছে। কে জানে তিনি মুদ্রিত 'প্রেমসাগর' বইখানি আদৌ দেখিতে পাইয়াছিলেন কিনা।

বেদান্তসূত্রের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে "একদিন আসিবে. যখন আমার এই বিনম্র প্রযত্ন সকল ন্যায় দৃষ্টিতে বিচারিত হইবে, এবং সম্ভবতঃ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে।" এখন আর এই কথা বলিবার প্রয়োজন নাই যে সেইদিন ইতিপূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী হইতে 'সম্ভবতঃ' শব্দ এখন আপনিই মুছিয়া গিয়াছে। সমাজ ও ধর্ম প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে রামমোহনের সাধনা আজ সকলেই কৃতজ্ঞভাবে স্বীকার করিয়াছেন। আজ ভক্তিভরে আমরা তাঁহার হিন্দী ভাষা সম্বন্ধীয় সাধনাও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি।

'বিশাল ভারতে'র উক্ত প্রবন্ধে আমি সে যুগের ইউরোপীয় বৈয়াকরণদের লিখিত ভাষা উদ্‌ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে সে ভাষা কি রকম অশুদ্ধ এবং বিশ্রী ছিল। রাজা রামমোহনের হিন্দীর কাছে এই বৈয়াকরণদের হিন্দী নিতান্ত হাস্যকর। রাজার অর্ধশতাব্দী পরে বাঙালি সংবাদপত্রকাররা যেরূপ হিন্দী লিখিয়াছিলেন, তাহা আরো অদ্ভুত। তাহাতে না আছে কোনো শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার, না আছে ভাষার সৌন্দর্যের দিকে কোনো দৃষ্টি। রাজার হিন্দী অতি ললিত এবং প্রাঞ্জল। তাঁহার ৬৬ বৎসর পরে স্বামী দয়ানন্দের সেই বিষয় প্রতিপাদক গদ্যের সহিত নিঃসংকোচে তাঁহার ভাষার তুলনা করিতে পারা যায়। যে-সব ত্রুটি সেই যুগে রাজার হিন্দীতে অগত্যা রহিয়া গিয়াছিল, প্রায় সেই সব ত্রুটি তাঁহার ৭০ বৎসর পরে লিখিত জৈন সাধু আত্মানন্দের গদ্যের মধ্যেও দেখিতে পাই। এই-সব কথা ভাবিয়া দেখিলে রামমোহনের যুগে তাঁহার হিন্দীর বিশিষ্টতা ও উৎকর্ষ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

যে পবিত্র মনীষা ভারতের রাজনীতিগত সমাজগত এবং ধর্মগত প্রভৃতি বিবিধ সংস্কারের মহত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ পন্থা চিন্তা করিতে পারিয়াছিল, সেই ভবিষ্যদ্দর্শী মনীষা ভারতের কেন্দ্রীয় ভাষা হিন্দীর মহিমাও বুঝিতে পারিয়াছিল। তখন 'রাষ্ট্র ভাষা' বলিয়া কোনো শব্দ কেহ শোনে নাই; শুনিয়াছিল শুধু সেই মহাপুরুষের মহিমাশালী শ্রবণ। দুঃখের বিষয়, এতদিন তাঁহার এই মহান্ উদ্যোগ কেহই লক্ষ্য করেন নাই। তাহার ফলে বেদান্তসূত্রের প্রথম হিন্দী ভাষান্তর প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। সে পুস্তকখানি খুঁজিয়া এখন প্রকাশিত করা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিরক্ষার মধ্যে অন্যতম হইবে।

প্রবন্ধটি *The Father of Modern India*, **Part II, Compiled and Edited by Satis Chandra Chakravorti, 1933,** গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

মহাজাতীয়তার দিশারী

নির্মল সেনগুপ্ত

যিনি কখনো পুরানো হন না, যিনি কখনো পুরাতত্ত্বে পর্যবসিত হন না, সকল যুগেই যিনি আধুনিক এমনি মানুষের সংখ্যা সারা পৃথিবীতে খুব বেশি নয়। সেই অঙ্গুলিমেয় মানুষের মধ্যে একজন হলেন ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়। তাঁকে আমরা বলতে পারি আধুনিকদের মধ্যে আধুনিকতম।

আধুনিকতা বলতে কী বোঝায়? আধুনিকতার অর্থ এই নয়, যা-কিছু প্রাচীন তাকে বর্জন করতে হবে। যাঁরা অতীতকে শ্রদ্ধা করেও অতীতের অন্ধ পূজারী নন, যাঁরা অতীতকে শ্রদ্ধা করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের প্রতি এবং ভবিষ্যতের পানে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন, প্রকৃত আধুনিক তাঁরাই। আধুনিক মন কখনোই দেশকাল এবং সীমিত ধর্ম ও সংকীর্ণ বিশ্বাসের নিগড়ে আবদ্ধ থাকে না। সব ঠাঁই তাঁর ঘর আছে, দেশে দেশে তাঁর দেশ আছে।

যুগ সৃষ্টি করে তার স্রষ্টাকে। স্রষ্টা সৃষ্টি করেন তাঁর যুগকে। ভারতবর্ষের এক অন্ধকারময় যুগ যেন নিজের তাগিদেই সৃষ্টি করেছিল রামমোহনের মতো একজন প্রবুদ্ধ মানবকে। সেই যুগটা রামমোহনের মতো মানুষের কর্মধারার উপযোগী ছিল না। তাই তাঁকে তাঁর নিজের প্রয়োজনেই যুগসৃষ্টি করতে হয়েছিল। হয়তো আরো শতবর্ষ পরে জন্মগ্রহণ করলেই রামমোহন যুগের সঙ্গে আরো বেশি মানাতেন।

রামমোহন ঋষির দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, হাজার বছর ধরে মুসলিম শাসন চললেও সর্বংসহা জননীর মতো ভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভারতীয় জীবনকে ধারণ করে রয়েছে। তিনি দেখেছিলেন, মুসলিম শাসকরা শ্বেতাঙ্গদের কাছে পরাজিত হলেও ঐসলামিক সংস্কৃতির পরাজয় ঘটে নি। তিনি দেখেছিলেন, বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হলেও তার মাধ্যমে এসেছে আধুনিক ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতীয়দের কাছে আশীর্বাদের মতো। তিনি দেখেছিলেন, তাঁর স্বপ্নের ভারত সংস্কৃতির এক ত্রিবেণী সঙ্গমের সামনে উপস্থিত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতভূমিতে সংস্কৃতির মহামিলন ঘটবে বিবিধের মধ্যে। তারই মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে ভারতের মিশ্র সংস্কৃতি,

জাতীয় সংহতি, ধর্মীয় সংহতি এবং ভাবগত সংহতি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ভারতের জন্য চাই Vedantic brain এবং Islamic body. বস্তুত স্বামীজী যে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করেছিলেন, সেই পটভূমি সৃষ্টি করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

চিন্তার গভীরে

এবার রামমোহনের চিন্তাধারার গভীরে প্রবেশ করা যাক। তিনি যে-সব পুস্তক রচনা করেছিলেন তার মধ্যে অনেকগুলি উপনিষদ ও বেদ-ভিত্তিক। তিনি বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় যে-সব উপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন, তার মধ্যে আছে 'কেনোপনিষৎ', 'ঈশোপনিষৎ', 'কঠোপনিষৎ', 'মুণ্ডকোপনিষৎ' প্রভৃতি। এই সব রচনা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের চিন্তাধারাকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'— অর্থাৎ জগতের স্রষ্টা পরমেশ্বর জীবরূপে সর্বদেহে বিরাজমান। ঈশ্বর যদি সর্বদেহে বিরাজিত হন, সকল মানুষের মধ্যেই যদি তিনি থাকেন, তবে একজন মানুষ আর-একজন মানুষের চেয়ে ছোটো বা বড়ো হতে পারে না।

…'যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥'

যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে এবং আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না অর্থাৎ একজন যদি আর-একজনকে নিজের ক'রে নিতে পারে এবং কেউ যদি কারোকে পর না ভাবে, তবে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকে না।

যুগ যুগ ধরে বহু সংস্কারে ও কুসংস্কারে মানুষের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তার ওপর চেপে বসে আচার-বিচারের মরুবালুরাশি। তার ফলে কতটুকু গ্রাহ্য এবং কতটুকু পরিত্যাজ্য সেই বোধশক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। যিনি বিজ্ঞানবান' চিন্তায় ও কর্মে যিনি সংযমী, তাঁর পক্ষেই গ্রাহ্য ও ত্যাজ্যের মধ্যে প্রভেদ বোঝা সম্ভব। মনরূপ সারথি যদি দক্ষ হয়, তবেই সে অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রাখতে পারে—কঠোপনিষদে বলা হয়েছে সেই বিজ্ঞানবানের কথা:

'যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥'

রামমোহন ছিলেন তেমনি এক বিজ্ঞানবান পুরুষ। কিন্তু বিজ্ঞানবান পুরুষের

পক্ষেও কাজটা যে সহজ নয়, কঠোপনিষদেই তা বলা হয়েছে— 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।' ক্ষুরের ধার যেমন তীক্ষ্ণ, এ পথও তেমনি। তাকে অতিক্রম করতে হবে অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে, কেননা সে পথ দুর্গম। কবিরা সে কথাই বলে গেছেন। বিজ্ঞানবান মানুষকে বিবেচনা করতে হবে আগে কী ঘটেছে এবং পরে কী ঘটতে পারে— 'অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য যথা পরে।'

রামমোহন জানতেন শাস্ত্রের নির্দেশ হল, 'ন লিঙ্গং ধর্মকারণং'— বাহ্য চিহ্ন ধর্মের কারণ হতে পারে না। সর্বভূতে সমভাব, এই হল মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। বলদৃপ্ত সিংহ যেমন আপন শক্তিতে পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে আসে, তেমনি, মোহ-জাল থেকে বেরিয়ে আসেন মুক্ত পুরুষ। এই আত্মিক শক্তিকে অর্জন করা বলহীনের পক্ষে সম্ভব নয়— 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।'

'কিমাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ…'। হে সখা, তুমি কাঁদছ কেন? তোমাতেই তো সর্ব শক্তি রয়েছে। তোমার ঐশ্বর্যশালী স্বরূপ প্রকাশ করো। এই অখিল জগৎ এই ত্রৈলোক্য সবই তোমার পাদমূলে। জড়ের কোনো ক্ষমতা নেই; আত্মাই আসল শক্তি।

কর্মলোকে

এরপর চিন্তার জগৎ থেকে কর্মের জগতে। ১৮২৮ খৃস্টাব্দের ২০ আগস্ট আধুনিক ভারতের জীবনে, এক পরম শুভ দিন। রামমোহনের উদ্যোগে সেইদিন ব্রাহ্মসমাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল। তাতে ভাষান্তরে বলা হয়েছিল উপনিষদের বাণী— ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর মধ্যেই বিরাজ করে সব-কিছু।

'ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমানভাবে থাকে।'

এই এক ও অদ্বিতীয় সত্তার উপলব্ধি রামমোহনের মধ্য দিয়ে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ঈশ্বর যদি এক ও অদ্বিতীয় হন, তবে সমগ্র মানবসমাজও এক-অদ্বিতীয়।

রামমোহন কোন্ ধর্মের মানুষ ছিলেন? তা নিয়ে সে সময় সমাজে বিতর্কের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ কেউ বলতেন, তিনি না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃস্টান। যদিও তিনি ব্রাহ্মণ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবু তিনি কোনো ধর্মের আওতার মধ্যেই পড়েন না। সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তিনি

হয়েছিলেন অবাধ মুক্ত পুরুষ। তিনি শুধু সেই অদ্বিতীয় একেশ্বরের শরণাপন্ন ছিলেন। এই ভাবটির সঙ্গে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ভাবটির সুস্পষ্ট মিল আছে— 'সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ…'।

তিনি যদি না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃস্টান, তবে তিনি কী ছিলেন? এই প্রশ্নের একজন উত্তর দিয়েছেন অনবদ্য ভাষায়— তিনি ছিলেন বিশ্ব-ধর্মের প্রচারক, ভারতীয় নবজাগরণের আধ্যাত্মিক পথনির্দেশক, নতুন ভারতের গঠয়িতা, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক,— তিনি ছিলেন হিন্দুর পণ্ডিত, মুসলমানের জবরদস্ত মৌলবী, খৃস্টানের পাদ্রী, বিংশ শতকের ঋষি শান্তি ও সম্প্রীতির মেসায়া এবং মানবজাতির মুক্তি-সাধক।

সারা পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষ যখন ছিল শুধু একটি দুজ্ঞের্য় নাম, তখন রামমোহন বিশ্বের আকাশে উদিত হয়েছিলেন। রকেট বা তুবরির মতো। তাতে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, সবাই বুঝতে পেরেছিল ভারত নামক দেশটা মৃত নয়, অত্যন্ত জীবন্ত। কিন্তু ভারতের মাটিতে তিনি আকস্মিক ভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এ কথা ভাবলে ভুল করা হবে। যুগে যুগে এই ভারতের মাটিতে প্রকাশিত হয়েছিলেন অনেক ধর্মগুরু— কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য থেকে রামমোহন পর্যন্ত অবিরাম ধারা চলে এসেছিল। আধুনিক কালে ভারতের যে-কোনো সংস্কার আন্দোলনের পেছনে আছে রামমোহনের অনুপ্রেরণা। তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল ধর্মীয় সংস্কারের সাথে সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করা। তিনি ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের উদ্‌গাতা ছিলেন।

জাতপাত

সতীদাহ নিবারণ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কৌলীন্যের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং নারীর শিক্ষা ও মুক্তির প্রয়াস রামমোহনকে নবযুগের যাবতীয় সংস্কার চিন্তার পুরোভাগে রেখেছিল। তাই বলে হিন্দুদের জাতিভেদ ও জাতপাঁতের দ্বন্দ্ব তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এই সংকীর্ণ জাতিবাদ হিন্দু সমাজের যে কী নিদারুণ ক্ষতিসাধন করেছে, একখানি পত্রে তা তিনি বর্ণনা করেছেন এক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষণীতে। সেই পত্রের কিয়দংশ ছিল এ রকম: 'আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, হিন্দুদের বর্তমান ধর্মাচরণ পদ্ধতি মোটেই তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপোষক নয়। জাতিভেদ, অসংখ্য খণ্ড খণ্ড জাতি উপজাতি বিভাগ তাদের দেশাত্মবোধকে বিনষ্ট করেছে

সম্পূর্ণরূপে। তার ওপর আছে বহুবিধ ধর্মাচার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং প্রায়শ্চিত্তের কঠোর নিয়মকানুন। এই-সব কারণে তারা সব রকম কঠিন কাজের দায়িত্ব নেবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।····এমতাবস্থায় আমার মনে হয়, তাদের ধর্মবিধির কিছু পরিবর্তন হওয়া দরকার। অন্তত রাজনৈতিক সুবিধা এবং সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তো বটেই।'

রামমোহনের 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক মানবহিতৈষীর (হয়তো তিনি নিজেই) পত্রে হিন্দুদের নানারকম কুসংস্কার-সঞ্জাত দুঃখ-দৈন্যের কথা উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল যে, তাঁরা যেন এই পন্থা পরিহার করেন এবং তার বদলে তাঁরা যেন এমন পন্থা অনুসরণ করেন, যাতে তাঁদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার পথ সুগম হয়।

রাজা নিজেও হিন্দু ছিলেন। তবু তিনি হিন্দুদের বহু অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর কুসংস্কারকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন— যেমন তিনি কালাপানি পার হয়েছিলেন, ইওরোপীয়ান ও তথাকথিত ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আহারবিহার করেছিলেন, তাঁর জীবনে কোনো রকম ছুঁৎমার্গের স্থান ছিল না। তিনি মৃত্যুঞ্জয়াচার্য রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'বজ্রসূচী'-র প্রথম অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, সেটি ছিল জাতিভেদের বিরুদ্ধে। 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ ভারতের পরাধীনতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে রামমোহন লিখেছিলেন, প্রায় নয় শতাব্দীকাল ধরে আমাদের যে পরাধীনতার অপমান সহ্য করতে হয়েছে, তার অন্যতম কারণ হল আমাদের জাতিবিভাগ যা কখনো আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেয় নি।

সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও বর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় এর একটি উপায় হিসাবে শৈব বিবাহ প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন এবং তার সমর্থনে 'মহানির্বাণ তন্ত্রের' এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন— 'শৈব বিবাহে কোনো বয়স, বর্ণ বা জাতিভেদ নেই। শৈব মতে একজন পুরুষ বিবাহ করতে পারে সেই নারীকে যার স্বামী নেই এবং যে সপিণ্ড নয়, অর্থাৎ কিনা যে নিষিদ্ধ বিবাহের সীমার মধ্যে পড়ে না।' রামমোহন চেয়েছিলেন হিন্দুরা শৈব বিবাহকে হিন্দু বিবাহের সমান মর্যাদা দিক। তাঁর মতবাদ যদি গৃহীত হত, তবে বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ এবং মেয়েদের বয়ঃসন্ধির পর বিবাহবিধি প্রভৃতি সব-কিছুই হিন্দুরীতি বলে মর্যাদা পেতে পারত।

রবীন্দ্রনাথের চোখে

১৯৩৩ সালে রাজা রামমোহন রায়ের মহাপ্রয়াণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালেই এসেছেন রামমোহন। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারেন নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কারো স্থান সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়; তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে, যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।"

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছিলেন: "ভারতবর্ষে তার সমস্যা সুস্পষ্ট। এখানে নানান জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটে নি। যারা একত্র হয়েছে, তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে, সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম — এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ, এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক; এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার কোনো পথ নেই।... মানুষের পরম ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল। তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে খৃস্টানকে ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর এক পঙ্‌ক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়।"

শুরুতে যে কথা বলেছিলাম, তা আরো সুন্দরভাবে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণে: "রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন, তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীত কালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই। তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে

পেরেছেন, যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামীকালে, যে কালে ভারতের মহাইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।"

রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব ভাষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি পূর্বতন ধর্মগুরুগণ সত্য ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁদের মধ্য দিয়ে নিদ্রিত ভারত সাময়িক জাগরুকতা লাভ করে তার প্রাচীন আদর্শগুলিকে স্মরণ করেছে। কিন্তু গতিবান রামমোহন কোনো আবেদনের আকৃতি নিয়ে আসেন নি। তিনি এসেছিলেন তরবারি হাতে নিদ্রিত ভারত-চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য। তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন, ভারত কি শুধু হিন্দুর? ভারত যাদের আশ্রয় দিয়েছে তারা সকলেই কি আমাদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে নি? যে মুসলমানেরা বণিক হিসাবে বা সশস্ত্র সেনাবাহিনী নিয়ে এই ভারতে এসেছিল অথবা সুদূর পারস্য দেশ থেকে যে জরথুস্ত্ররা এসেছিল, তারা এখন সকলেই কি ভারতমাতার সন্তান নয়? খৃস্টানরা ভারতের সন্তানরূপ গঙ্গার পূত সলিলে অবগাহন করে, নতুন করে পবিত্র হয় নি কি?

জাতীয় সংহতি ও হিন্দু সংহতি

জাতীয় সংহতির প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান জৈন পারসিক প্রভৃতি সকল জাতির সংহতি। এই সংহতি যতখানি প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি বৈ কম প্রয়োজন নয় হিন্দু সমাজের সংহতি। সবাই জানেন, হিন্দু-সমাজের বিভেদের অন্যতম কারণ হল তার স্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যতা। অস্পৃশ্যতার দ্বারা এক শ্রেণীর হিন্দু অপর এক শ্রেণীর হিন্দুর যে অপমান করেছে, তার কথাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন অনবদ্য ছন্দে—'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।' বস্তুত হিন্দু তার স্বদেশ-বাসীকে অপমান ক'রে বিদেশীর কাছে অপমানিত হয়েছে পরাধীনতার দ্বারা।

হিন্দুদের সামাজিক বিভেদের কতশত কারণ যে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এক শ্রেণীর হিন্দু যে দেবদেবীকে পূজা করে, অন্য শ্রেণীর হিন্দুরা সেই দেবদেবীকে পূজা করে না। সেই সূত্রে এই দুই শ্রেণীর হিন্দু পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত নয়। বৈষ্ণব ও শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব, শিবের পূজারী ও মনসার পূজারীদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ অনতিদূর অতীতে কখনো কখনো

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হত। আজকাল এই ধরনের ঘটনা বড়ো একটা ঘটে না। তাই বলে হিন্দুসমাজের বিভেদ প্রবণতা যে নির্মূল হয়ে গেছে এই কথা বলা যাবে না। এখনো হরিজন নিধনের ঘটনা ঘটে, এখনো হরিজন বালিকা বর্ণ হিন্দুদের নিপীড়নের ভয়ে সাধারণ জলাধার থেকে শূন্য কলসী নিয়ে ফিরে যায়। এখনো তপশিলী হিন্দু এবং আদিবাসী বা তপশিলী উপজাতীয় ও খণ্ডজাতীয় লোকদের বিশেষ অধিকার সংরক্ষণের দরকার হয়। রামমোহনের আমলে এই-সব কথা ওঠে নি। কিন্তু এক ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে এক জাতীয়তারও স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। সেই এক জাতীয়তার কাঠামোর মধ্যে এত খণ্ড ক্ষুদ্র জাতীয়তার কোনো স্থান থাকতে পারে না।

প্রগতিশীল মুসলিম নারী বেগম সামসুন্নাহার মাহমুদ রামমোহনকে বর্ণনা করেছেন আধুনিক মুসলমানের একজন অগ্রবর্তী নেতারূপে। কেননা তিনি ইসলামের সারটুকু গ্রহণ করেছিলেন। মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম ও সভ্যতার দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে উদ্‌ভূত হয়েছিলেন নানক, কবীর, দাদূ, আকবর, আবুল ফজল এবং দারা শিকোহ। তাঁরা চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের দ্বারা এক অভিনব জগৎ সৃষ্টি করতে। বেগম সামসুন্নাহার বলেছেন, 'অনেক পরবর্তী হলেও রামমোহন ছিলেন এঁদেরই বংশধর।'

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর ভাষায়: "তার পর ঘটিল হিন্দু-মুসলমানের সাক্ষাৎ। বিরুদ্ধতায় বিরুদ্ধতায় সংঘর্ষে সংঘর্ষে কি প্রচণ্ড সেই মিলনভূমি। তখনই বিধাতা পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন ঐক্যের ও যোগের সব মহাগুরু! কবীর, নানক, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি দলে দলে আসিলেন; শাহইনায়ৎ, শাহলতীফ প্রভৃতি আসিতে লাগিলেন ক্রমে শিবনারায়ণ, বুল্লে শাহ, প্রাণনাথ, পল্টুশাহ প্রভৃতি প্রায় দুইশত সাধক আসিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক-একজন মহাপুরুষ। যে ঐক্য বিধাতা চাহেন, তাহা পূর্ণ হয় না, —আর দলে দলে তিনি পাঠাইয়া দেন তাঁহার সব আপন ভক্ত বীরকে। এমন করিয়া গেল রামমোহনের পূর্ব ভারতের অবস্থা। তারপর আসিলেন রামমোহন .... তাই দেখিতেছি, রামমোহন ভারতে আকস্মিক নহেন, তিনি ভারতে সনাতন চিন্তাধারারই যুগ-গত পরিপূর্ণতা। রামমোহনকে দিয়া বিধাতা সেই ধারাকেই মুক্ত, সার্থক ও পরিপূর্ণ করিয়াছেন।"

সাধক রজ্জব বলেছেন, 'প্রাণ পুস্তক দেখহ হিন্দু মুসলমান ...। হে হিন্দু মুসলমান, প্রাণ পুস্তক পড়িয়া দেখ। সকলের মধ্যে দেখিবে একই বিদ্যা।'

রাধাকৃষ্ণানের দৃষ্টিতে

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বলেছেন, রামমোহন ছিলেন একনিষ্ঠ দেশ-প্রেমিক। সুতরাং একজন সমাজ-সংস্কারকও বটেন। আরো ন্যায়ভিত্তিক এবং স্থায়ী সমাজব্যবস্থা যদি গড়ে তোলা না যায়, তবে রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয়। তাঁর যুগে এবং একালেও ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে ন্যায়-বিচারকে অস্বীকার করার এবং সংস্কারকে বিলম্বিত করার কাজে। মানুষ নিপীড়িত হয়েছে মূল্যহীন মূল্যবোধ এবং বিচারের সংশয়াচ্ছন্ন মানদণ্ডের দ্বারা। ধর্মের মূলাদর্শগুলি পর্যালোচনা করে রামমোহন দেখেছিলেন ধর্মের নামে মানুষকে যে গঞ্জনা দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মের সাহায্যে সমাজে যে তিক্ততা সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। তথাকথিত ধর্ম অন্যায় অবিচারের পরিপোষণ করেছে। মহাভারতকার বলেছেন:

'একবর্ণম ইদম পুরাণম্ বিশ্বম্ আসীদ যুধিষ্ঠির।
কর্মক্রিয়া বিশেষেন চাতুর্বর্ণ্যম্ প্রতিষ্ঠিতম্॥

হে যুধিষ্ঠির, আদিতে সমগ্র বসুন্ধরায় জাতি ছিল একটাই। তারপর বিভিন্ন প্রকার কর্মের ভিত্তিতে চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করা হয়েছিল। 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ।'— গীতা ৪।১৩

গভীর পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে এখনো অস্পৃশ্যতার সমস্যা আছে। এ সম্পর্কে এখনো যে দ্বিমত প্রকাশ করা হয়, তাতেই বোঝা যায় আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি কত ঠুনকো। একদিকে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী পুরুষানুক্রমিক অবমাননায় পতিত, অন্য দিকে আমরা বলি গণতান্ত্রিক সংবিধানের কথা, এতেই বোঝা যায় আমাদের মন স্ববিরোধিতায় কতখানি আচ্ছন্ন। আমরা যখন স্বেচ্ছাচারে মত্ত, তখন শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া অর্থহীন। রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন, বিপুল সংখ্যক মানুষকে তাদের জন্মের সুবাদে পতিত, চণ্ডাল ও অচ্ছুৎ করে রাখা মূঢ় মানসিকতার ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে নিরিখে তাদের অচ্ছুৎ ও পতিত বলে বর্ণনা করা হয়, তাতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের অনেকেই চণ্ডাল ও পতিত বলে পরিগণিত হবে।

রামমোহনের যাবতীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কৃতির পেছনে ছিল তাঁর হৃদয়াসীন দেবতার প্রতি গভীর বিশ্বাস। বহিরাচার পৃথক হতে পারে, কিন্তু সব ধর্মের মূল সূত্রগুলি একই রকম। সকল ধর্মই একসূত্রে গাঁথা— 'সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।'— গীতা ৭.৭

শেষ নাহি যে

সমাপ্তি টানবার আগে এই কথাটা বলে নিতে হবে যে, রামমোহনের কালের কথ্য এবং লেখ্য ভাষা একালের মতো ছিল না। সে কালে রীতিমত একটা ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়েছিল। হিন্দু ধর্মের ওপর ক্রমাগত আঘাত আসছিল বাইরে থেকে। একদিকে ভারতের মিশ্র সমাজে তখনো ছিল মৌলবী মোল্লাদের প্রভাব, তখনো প্রাধান্য ছিল আরবী ফার্সী ভাষার। অন্য দিকে ইওরোপীয় বণিক ও শাসকদের সাথে সাথে এসেছিলেন খৃস্টান ধর্মযাজকেরা। তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন খৃস্টধর্মের বিস্তারের জন্য। হিন্দু ধর্মের ওপর আঘাত ভিতর থেকেও বড়ো কম ছিল না। জাতিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ, উঁচু জাতি, নীচু জাতি, উপজাতি, খণ্ডজাতি, অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ ও পতিত ইত্যাদি মিলে হিন্দুরা পদে পদে অভ্যন্তরীণ আঘাতে জর্জরিত ছিল দীর্ঘকাল ধরে। তখনকার দিনের ধর্মীয় তর্কবিতর্ক হত শাস্ত্রীয় ভাষাতে। সর্বশাস্ত্রবিশারদ রামমোহনকে একই সঙ্গে লড়তে হয়েছিল ভিতরের এবং বাইরের আঘাতের বিরুদ্ধে। তাঁর কাছে শাস্ত্রই ছিল শস্ত্র। একদিকে তিনি যেমন বেদ উপনিষদের সাহায্যে অন্য ধর্মের মোকাবিলা করেছেন, তেমনি আপন শাস্ত্রের সুযুক্তি দিয়ে কুযুক্তিকে খণ্ডন করেছেন। তাঁর আরাধ্য দেবতার কাছে সবাই ছিল সমান, নীচ অন্ত্যজ বলে কেউ ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন, ভাবীকালের ভারতকে সমস্ত ভেদাভেদ নীচতা দীনতা ভুলতে হবে, ভাবীকালের ভারতীয় সংস্কৃতি হবে মিশ্র সংস্কৃতি।

রামমোহনের সেই প্রবুদ্ধ চেতনা নদীর অবিরাম স্রোতধারার মতো আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছে। রামমোহনের মশাল তুলে নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তুলে নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রমুখ। হিন্দুসমাজকে পরিচ্ছন্ন ও পরিমার্জিত করার জন্য তাঁরা আপন আপন ভূমিকা পালন করে গেছেন। কিন্তু রামমোহন ও তাঁর উত্তর-সূরীদের নির্দেশিত পথে চললেও এখনো আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি নি। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন উপলক্ষে উল্লেখ করেছেন ভারতের পুনরুজ্জীবনে রাজা রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ ও অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা, যেমন বলতেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

কিছুদিন আগে নতুন দিল্লীতে জাতীয় সংহতি সম্মেলনে শ্রীমতী গান্ধী আধুনিক প্রেক্ষিতে আধুনিক ভাষায় তুলে ধরেছেন ভারতের জাতীয় সংহতির

সমস্যার কথা। তিনি বলেছেন, আমরা স্বাধীন এবং আমাদের একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান আছে বলে আমাদের সামাজিক সংহতি আপনা থেকেই অক্ষত থাকবে, এ কথা যেন মনে না করি। আমরা যেমন সীমান্ত রক্ষা করব বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে, তেমনি আমাদের সামাজিক সংহতিকে রক্ষা করতে হবে অভ্যন্তরীণ শত্রুদের আঘাত থেকে। বাইরের এবং ভিতরের শত্রুরা আমাদের দেশকে দুর্বল করার জন্য আমাদের ধর্মে ধর্মে, ভাষায় ভাষায়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, অঞ্চলে অঞ্চলে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস অবিরাম চালাচ্ছে। আমাদের প্রাচীন সাধক ও শাসকরা ভারতবর্ষকে এক ও অখণ্ড বলে গণ্য করেছেন। এই সংহতির আলোকবর্তিকা বহন করেছেন শংকরাচার্য, গুরু নানক প্রভৃতি সন্ত সাধকগণ, করেছেন অশোক, সমুদ্রগুপ্ত ও আকবরের মতো শাসকগণ। তাঁরা সবাই বলে গেছেন সহিষ্ণুতার কথা, সহযোগিতার কথা।

রাজা রামমোহন রায় তাঁদেরই উত্তরসাধক।

বিশ্বমানব রামমোহন

শিবদাস ভট্টাচার্য্য

পলাশীর যুদ্ধের ১৫ বছর পরে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। তখন দিল্লীতে মোঘলের ক্ষমতা স্তিমিত হলেও শেষ হয় নি। বাংলাদেশে তখন মীরজাফরের বংশধর নবাব। এই নবাবকে সামনে রেখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজ্য চালাচ্ছে এবং বাণিজ্য করে চলেছে।

ইউরোপে শিল্পের বিকাশ শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে ধনতন্ত্রের বিকাশ। কিন্তু রামমোহনের জন্মলগ্ন থেকে তাঁর জীবদ্দশার সময়েও ভারতবর্ষে পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই বিদ্যমান ছিল।

রামমোহনের পিতামহ ও পিতার দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। দিল্লীর সম্রাট তাঁর প্রপিতামহকে রায়রায়ান উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মেছিলেন এবং নিজেও জমিদার ছিলেন। এই সামাজিক অবস্থা এবং পরিবেশে মানুষ হয়েও রামমোহন কিভাবে ভারতবর্ষে নবচেতনার অগ্রদূত হিসাবে এগিয়ে এলেন এটাই আশ্চর্য।

উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে। ইউরোপে উৎপাদন যন্ত্রের বিকাশের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে, নতুন যুগে নতুন চিন্তা ও মনীষার জন্ম দিয়েছে। নতুন চিন্তা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী বহন করে এনেছে, জন্ম দিয়েছে ফরাসী-বিপ্লবের এবং পরবর্তী কালে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার। ইতিহাসের নিরিখে রামমোহন একজন অসামান্য এবং বহুবৈচিত্র্যের সমাবেশে গঠিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। রামমোহন শুধু বহু ভাষাবিদ ছিলেন না, তিনি বহু ভাষায় লিখেছেন। শুধু পুস্তক প্রকাশনা, আবেদন, পত্রিকা, সংগঠন ও প্রচারে অক্লান্ত যোদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথাগত ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আধুনিকতার আসরে রামমোহনের প্রথম পদক্ষেপ ঘটলেও সেখানেই তিনি থেমে থাকেন নি, সমাজসংস্কার থেকে মানবাধিকারের দাবিতে তিনি এগিয়ে গেছেন। উদার মানবিকতাবোধই তাকে ধর্ম-সংস্কারে, সমাজসংস্কারে এবং নিপীড়িত মানুষের মুক্তিতে অনুপ্রাণিত করে। পরাধীন পশ্চাৎপদ দেশে জন্মেও ইউরোপের বুকে সমাজপরিবর্তন দেখে তিনি জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছেন। তাঁর জাতীয় চেতনার উপলব্ধি লক্ষ্য করি যখন দেখি রামমোহন ফরাসী-বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার

পতাকাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন।

সমাজে যারা বঞ্চিত, অবজ্ঞাত ও নিপীড়িত তাদের প্রতি একজনার আচরণ তার প্রগতিশীলতার নিরিখ, সেই নিরিখে রামমোহনকে দেখি সমগ্র সমাজের অর্ধেক নারীসমাজের জন্য সতীদাহ নিবারণ ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য কী অক্লান্ত প্রচেষ্টায় রত। আমেরিকা ইউরোপ তখন দাসব্যবসায়ে লিপ্ত। এই দাসব্যাবসার বিরুদ্ধে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ এবং ইউরোপে আন্দোলন শুরু হয়।

আমেরিকায় যে মুক্তিসংগ্রামিগণ ঘৃণ্য দাসপ্রথা উচ্ছেদের জন্য সংগ্রামে নেমেছিলেন, তাদের সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোনো প্রমাণ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু সমসাময়িক বিশ্বে মানবমুক্তিসংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে রামমোহনের ভূমিকা ও খ্যাতির বার্তা তাঁদের কাছে পৌঁছেছিল। ১৮০০ থেকে ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে দাসপ্রথাবিরোধীদের একটি সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে উপস্থিত কোনো সভ্য Address to the Members of the Congress on the Abolition of Slavery শীর্ষক এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এতে তিনি ছদ্মনামে স্বাক্ষর করেন 'রামমোহন রায়' এবং কৈফিয়ৎস্বরূপ মন্তব্য করেন: "In closing this address allow me to assume the name of one of the most enlightened and benevolent of the human race now living, though not a white man,—Rammohun Roy."

সমসাময়িক দুনিয়ায় রামমোহনের মতো স্বাধীনতাবোধ ও বিশ্ববোধ খুব কম মানুষের মধ্যেই ছিল। তাই ভারতবর্ষে পরাধীনতার গ্লানিসম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন— এর বহিঃপ্রকাশ তাঁর বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা চিঠি থেকে বোঝা যায়

রামমোহনের সময়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তা আসে নি। তখন ভাববাদী সমাজতন্ত্রীদের একজন নেতা ছিলেন রবার্ট ওয়েন। ওয়েন-পরিবারের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। রবার্ট ওয়েন ও তাঁর পুত্রকে লিখিত রামমোহনের পত্রাবলী থেকে বোঝা যায় ওয়েনের সমাজতন্ত্রী কর্মসূচীর রামমোহন একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, যদিও ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার উপর ওয়েনের আক্রমণকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি।

এই মহামানব রামমোহনকে কেউ কেউ ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, তিনি ব্রাহ্মদের বলে দাবি করেন। কিন্তু রামমোহন শুধু ব্রাহ্মদের বা হিন্দুদের নন। রামমোহন বাঙালির, রামমোহন ভারতবাসীর, রামমোহন বিশ্বমানবের।

রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ : একজন অব্রাহ্মের চোখে

সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ

একজন অব্রাহ্মের দৃষ্টিতে রামমোহনের জীবনী ও কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন কিভাবে হতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের উপর রামমোহনের চিন্তাধারা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। শৈশবেই আমি ঐ মনীষীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম কোনো এক পত্রিকায় তাঁর জীবনচরিত পাঠ করে। আমার বয়স যখন নয় কিংবা দশ, তখনই আমার মায়ের কাছে পবিত্র কুরান পাঠ শুরু করি এবং তিনি আমাকে নমাজ পড়াও শেখান। মা ছিলেন আমার প্রথম শিক্ষাগুরু। তাঁর কাছেই আমার লেখাপড়ার প্রথম হাতে-খড়ি হয়। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা না করেও তিনি বাংলা, উর্দু ও আরবি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। সামান্য ইংরেজিও জানতেন। বাবা ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ, সংসারের ব্যাপারে একেবারে নির্লিপ্ত; বিষয়বুদ্ধি একেবারে ছিল না বলা যায়। কোনোমতে সাব-ডেপুটির চাকুরি জুটেছিল; ঐ চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। বাবা ও মা উভয়ই ছিলেন অত্যন্ত উদার মনের অধিকারী। তাঁরা খুব ধার্মিক ছিলেন কিন্তু ধর্মান্ধতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতা তাঁদের মধ্যে এতটুকু ছিল না। বাবার অনেক হিন্দু বন্ধুবান্ধব ছিল। বাবার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতি কিছুটা ঝোঁক ছিল। সাধু-সন্ন্যাসী বা ফকির-দরবেশদের বাবা বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। আমাদের বিষ্ণুপুরে থাকাকালীন একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। একদিন সকালে দেখা গেল আমাদের বাড়ির সামনে বটগাছের নীচে এক জটাধারী সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন। বাবা তাঁর কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙার পর বাবা তাঁকে সবিনয়ে অনুরোধ করলেন যে সন্ন্যাসী যতদিন বিষ্ণুপুরে থাকবেন আমাদের আতিথ্য যেন গ্রহণ করেন। জানা গেল সন্ন্যাসী নাকি কাশী থেকে পদব্রজে বিষ্ণুপুরে এসেছেন। প্রায় দিন-সাতেক তিনি এখানে ছিলেন এবং প্রতিদিন আমাদের বাসা থেকে চাল, ডাল, ঘি ইত্যাদি তাঁর কাছে পাঠানো হত; তিনি নিজে রান্না করে খেতেন। এ নিয়ে

বাড়িতে বেশ ঠাট্টা-তামাশা হত। আমার কিন্তু বাবার এই আচরণ ভালোই লেগেছিল।

আগেই উল্লেখ করেছি মার কাছে নমাজপড়া শিখেছিলাম। আরবি ভাষায় নমাজের অনেক 'সুরা' বা সূত্র মুখস্থ করতে হত। তোতা পাখির মতো না বুঝে আউড়ে যেতাম। মা অবশ্য কিছু কিছু অংশের অর্থ বলে দিতেন। আমি তখন বাঁকুড়া জিলা স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। একদিন বাংলা পাঠ্য পুস্তক 'সাহিত্য চয়ন'-এর পদ্যাংশের প্রথম কবিতাটি পড়ে খুব ভালো লেগে গেল। এটি ছিল (পরে জেনেছি) একটি ব্রাহ্ম উপাসনা-সংগীত; রবীন্দ্রনাথের রচনা। বেশ মনে আছে কবিতাটি যে পৃষ্ঠায় ছাপা, তার বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় রাজা রামমোহন রায়ের একটা সুন্দর ছবি ছিল। আমার এখনো কবিতার প্রথম লাইনগুলি মনে পড়ে :

'বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি ॥
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব দমিতে, খর্ব করিতে কুমতি ॥'

আমি ঠিক সেই সময় নমাজের শেষ 'মুনাজাত' অর্থাৎ প্রার্থনাটি মুখস্থ করছি। কিন্তু এই ব্রাহ্ম প্রার্থনা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং তখনই এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমি ঠিক করলাম যে প্রচলিত আরবি 'মুনাজাতের' বা প্রার্থনার বদলে আমি এই বাংলা প্রার্থনাটি দিয়ে আমি আমার নমাজ পড়া শেষ করব, এবং তাই করতে লাগলাম। একটা সুবিধা ছিল যে নমাজের সূত্রগুলি মনে মনে পড়তে হয়; সুতরাং কারুর জানার উপায় নেই যে কী পড়া হচ্ছে। কিছুদিন পর মনে হল আমার এই সিদ্ধান্তটি মাকে জানানো দরকার। মার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক ছিল। কতদিন মার কোলে মাথা রেখে মার মুখে ইসলামের পৌরাণিক কাহিনী শুনেছি। তাই মাকে একদিন বলে ফেললাম নমাজ পড়া সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্তটি। মা তো শুনে হতবাক। আমি মাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম এই বাংলা প্রার্থনাটির ভাষা ও ভাব কত সুন্দর। এটিতেও নিরাকার আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে এবং আরবি 'মুনাজাতের' সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই; সুতরাং আমার এই প্রার্থনাটি আল্লাহ্‌র কাছে কেন গ্রহণযোগ্য হবে না? আমার বলার মধ্যে বোধ হয় এমন একটা যুক্তি ও আন্তরিকতা ছিল যেটা লক্ষ্য করে

মা জবাব দিলেন, "কী জানি বাপু, আমি অতশত বুঝি না। আমার যা জানা ছিল আমি তোমাকে শিখিয়ে দিয়ে আমার দায়িত্ব পালন করেছি।" মার সঙ্গে কথা বলার পর আমি নিশ্চিত হলাম যে আমি কোনো অন্যায় করছি না। তারপর বহুকাল আমি ঐ ব্রাহ্ম প্রার্থনাটি দিয়ে আমার নমাজ বা ইসলামী প্রার্থনা শেষ করেছি।[১] পরে অবশ্য প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমার ধ্যান ধারণা বদলে যায়। কিন্তু সেটা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

* * *

বস্তুত রামমোহনের ধর্মচিন্তার বৈশিষ্ট্য হল যে কেবলমাত্র হিন্দুদের নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের হৃদয়কেও গভীরভাবে নাড়া দিতে সক্ষম। তাই এর মধ্যে একটা সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন আবেদন রয়েছে যেটা আধুনিক যুগেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তাঁর মহান প্রচেষ্টা ছিল বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের মূলনীতি প্রণালী সমূহকে অতি প্রাকৃত ও শাস্ত্রীয় আচার-বিচারের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে সেগুলি যুগের প্রয়োজনের তাগিদে এবং যুক্তির আলোকে মূল্যায়ন করে সমন্বয় সাধন করা। এই দুরূহ কাজটি করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন কি না কিংবা কতখানি সক্ষম হয়েছিলেন, সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হল, রামমোহন একটি মহান আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে তুলনাহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সেটাই তাঁকে মহত্ত্বের উচ্চতম শিখরে তুলে দিয়েছিল।

আমি অনেক সময় ভেবেছি হিন্দুসমাজে রামমোহনের মতো একজন অসাধারণ মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু মুসলমান সমাজে এ ধরনের মানুষের

১। অনেক পরে আমার শৈশবকালের অর্বাচীন সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কিছুটা সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলাম প্রখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক, আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ সৈয়দ আমীর আলি (১৮৪৯-১৯২৮)-র এই উক্তিতে: "The reformation in Islam will begin when once it is recognised that divine words rendered into any language retain their divine character and that devotions offered in any tongue are acceptabl› to God. The Prophet himself had allowed his foreign disciples to say their prayers in their own tongue, He had expressly permitted others to recite the Koran in their respective dialects ; and had declared that it was revealed in seven languages".— Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (First Pakistan edition 1969, Karachi, Pak Publishers Limited), p 186

আবির্ভাব হয় নি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে হিন্দুধর্ম যেমন পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মসমূহের অন্তর্গত, সে তুলনায় ইসলামের ইতিহাস অতটা প্রাচীন নয়। বস্তুত ধর্ম হিসেবে ইসলামের ইতিহাস এতখানি তথ্যসমৃদ্ধ এবং মানুষের সার্বিক জীবন সম্বন্ধে ইসলামের বিধান ও সূত্রগুলি এত পরিষ্কার ভাবে সংশ্লেষিত, যে এর মধ্যে কোনো আমূল বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা প্রায় অসম্ভব। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে চালিত ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসলামের সর্বব্যাপক বিধানসমূহ যেমন অলঙ্ঘনীয় তেমনি ইসলামী ধর্মবিশ্বাসমতে ঐ বিধানসমূহ সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। বোধ হয় এইখানেই ইসলামের শক্তি ও দুর্বলতা নিহিত।

অন্য দিকে হিন্দুধর্মকে ইসলামের মতো সংগঠিত ধর্ম বলা যায় না। সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত ভাবনা-চিন্তা, রীতি নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের বিচিত্র সমাবেশ ও সহ-অবস্থান হিন্দুধর্মে দেখা যায়। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ও নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কার ও নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম-চিন্তায় কিছুটা উন্মুক্ততা ও নমনীয়তা বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলে যুগে যুগে হিন্দু সমাজে বেশ কিছু-সংখ্যক প্রচলিত-মতবিরোধী ও অনন্য-সাধারণ মতবাদ ও রীতির বিকাশ ঘটেছে। এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বিশেষ করে বঙ্গদেশে যেখানে আর্য সভ্যতা গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারে নি।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে হিন্দুধর্ম যে চ্যালেঞ্জ বা হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল তাকে মোকাবেলা করতে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে প্রধানত দুই ধরনের প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। এক ধরনের প্রতিক্রিয়া ছিল রক্ষণশীল ও নেতিবাচক, বহিরাগত কোনো ধারাকে গ্রহণ না করে সনাতন হিন্দুধর্মের সব-কিছুকে কঠোর ও অনমনীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করে সংরক্ষণ করাই ছিল এই প্রতিক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এটি ছিল বলিষ্ঠভাবে বহিরাগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে পুনর্গঠন করা। এই প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মচিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার উন্মেষ ঘটেছিল যেটাকে আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ বা মানবতাবাদী অতীন্দ্রিয়বাদ বলে অভিহিত করা যায়। খৃষ্টীয় চৌদ্দ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে কতিপয় ধর্মসংস্কারক ইসলামের বহিরাগত

চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মকে পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়াস করেছিলেন। এঁদের মধ্যে পাঞ্জাবে নানক, উত্তর প্রদেশে রামানন্দ ও কবীর, বাংলায় চৈতন্য এবং মহারাষ্ট্রে দাদূ ও রামদাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগতভাবে কবীর আমাকে আকৃষ্ট করেন সবচেয়ে বেশি। ভারতের ইতিহাসে তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মুসলমান ঘরে জন্ম ও লালিত এবং মুসলমান নামধারী (পুরো নাম শেখ কবীরউদ্দীন আনসারী) এই মহাপুরুষ রামকে রহিমের সঙ্গে সমীকরণ করে হিন্দু ভক্তিবাদের সঙ্গে ইসলামী সুফিবাদের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। কবীর সমকালীন মুসলমান সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দু সমাজে পেয়েছিলেন ঋষির সম্মান। হিন্দি ভাষায় রচিত কবীরের দোঁহা বা ভজন আজও হিন্দু সমাজে সমাদৃত। এই-সব মরমী সাধকদের বাণীর মূল প্রতিপাদ্য ছিল : (ক) সৃষ্টিকর্তার একত্ব; (খ) উপাসনার বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের নিরর্থকতা; (গ) বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথার অসত্যতা; (ঘ) আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও পরমেশ্বরের প্রতি অবিমিশ্র নিষ্ঠা। এই-সব মহাপুরুষরা হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মর্মবাণীকে সমন্বিত করে এক নতুন মানবতাবাদী ধর্মের উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন। এই উদার চিন্তাধারা হিন্দু সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল সত্য, কিন্তু সমগ্র হিন্দু সমাজের উপর বড়োরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। জাতিভেদ প্রথার মতো সামাজিক কুপ্রথা যেগুলি হিন্দু সমাজে যুগযুগান্তকাল ধরে রয়ে গেছে, সেগুলি এই নয়া ধর্মপ্রচারকদের শিক্ষার ফলে বিশেষ পরিবর্তিত হয় নি।[২] প্রচলিত ধর্মমত ও সামাজিক আচরের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এই সব মরমী সাধকদের প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলির জন্য হিন্দু সমাজ শ্রদ্ধা জানিয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের মতাদর্শ গ্রহণ বা পালন করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখায় নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর মতো মহাপুরুষদের প্রতিও হিন্দু সমাজ গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছে কিন্তু মনে হয় খুব কম সংখ্যক হিন্দু তাঁদের শিক্ষাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলতার প্রাধান্য কখনো ক্ষুন্ন হয় নি।

রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ চিন্তাকে এই ঐতিহাসিক পটভূমির পরি-

২। U. N. Ghosal, *Studies in Indian History and Culture*, (Calcutta, 1957), p. 265.

প্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন। তাঁর চিন্তাধারা ভারতের সুমহান মনো-জাগতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। এই ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য হল পরমতসহিষ্ণুতা এবং ধর্ম ও সমাজচিন্তা ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য। এই ঐতিহ্যিক পরিবেশে রামমোহন লালিত হয়েছিলেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৮০৪-০৫ সালে যখন 'তুহ্‌ফাতুল্‌ মুওয়াহ্‌হিদীন' অর্থাৎ একেশ্বরবাদীদের জন্য উপহার নামক তাঁর প্রথম রচনাটি মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স প্রায় ত্রিরিশের কোঠায়। সুতরাং এই পুস্তিকাটিকে রামমোহনের পূর্ণ যৌবন এবং পরিপক্ক চিন্তার ফসল বলে চিহ্নিত করা যায়। আরবি শিরোনাম ও ভূমিকাসহ এবং পারসিক ভাষায় রচিত এই পুস্তিকাটি সমকালীন ভারতীয় ঐতিহ্যিক মনীষার একটি আশ্চর্য নিদর্শন। আশ্চর্য বিশেষ করে এই কারণে যে সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রচিত এই পুস্তিকাটিতে ইংরেজি বা পাশ্চাত্য শিক্ষার এতটুকু ছাপ নেই। মনে হয় রামমোহন যখন এটি রচনা করেন তখন পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে নি। পরে তিনি ইংরেজি ভাষা শিখে সমকালীন ইউরোপের উদার ও সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার ফলে তাঁর পূর্বেকার চিন্তায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। বরং বলা যায় যে সম্পূর্ণ দেশজ ঐতিহ্যিক পরিবেশে লালিত তাঁর নিজস্ব যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চিন্তাধারা সমকালীন পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে অনেকখানি পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়েছিল মাত্র। পাশ্চাত্য সভ্যতার সব কিছু রামমোহন কখনোই চোখ বুঁজে গ্রহণ করেন নি। তাই দেখতে পাই ১৮২০-২১ সালে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে একটি বাংলা এবং *The Brahmanical Magazine or The Missionary and the Brahman* নামে একটি ইংরেজি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন; এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টীয় মিশনারি বা ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণকে প্রতিহত করা। আষাঢ় ১৮২৩ সালে তাঁর উদ্যোগে "গৌড়ীয় সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিকে বলা যেতে পারে ভারতের প্রথম দেশীয় জনসংস্থা। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর হিন্দু নেতাদের নিয়ে গৌড়ীয় সমাজ গঠিত হয়েছিল এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশীদের দ্বারা এদেশীয় ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার উপর আক্রমণকে প্রতিরোধ করা। এদিক দিয়ে রামমোহনকে যদি ভারতে আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তা বলে অভিহিত করি তা হলে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। রামমোহন ইংরেজ শাসনকে অন্ধভাবে সমর্থন

করেন নি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোম্পানির সরকারের নীতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। ১৮২৩ সালে সরকার যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ ক'রে একটি আইন জারি করে তখন রামমোহন তার প্রতিবাদে তাঁর নিজস্ব সম্পাদিত পারসিক পত্রিকা 'মিরাতউল-আখবার'-এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। শুধু তাই নয়, তাঁরই উদ্যোগে কলকাতার দেশীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এই আইনের বিরুদ্ধে একটি আবেদন সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা হয় যদিও কোর্ট সেটা নাকচ করে দেয়। আবার ১৮২৬ সালের ভারতীয় জুরী আইনের বর্ণবৈষম্যমূলক ধারার প্রতিবাদে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট কলকাতার হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের পক্ষ থেকে যে দরখাস্ত পাঠানো হয়েছিল সেটিতেও রামমোহনের স্বাক্ষর দেখতে পাই।

তবে রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজ শাসনের মাধ্যমেই ভারতবর্ষ আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে ভারতবাসীরা দ্রুত পরিচিত হয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পথে এগিয়ে যাক, এই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর সময়কালে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের ফলে যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল রামমোহন সে সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। সেজন্য অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসী এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার বিরোধী ইউরোপীয় বণিক ও ব্যবসায়ীদের ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করে শিল্পস্থাপন করতে তিনি উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল এর ফলে ইউরোপের উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ভারতে স্থানান্তরিত হয়ে ভারতেও শিল্প-বিপ্লবের সূচনা করবে। তাঁর ধারণা ছিল এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হবে।

সমকালীন ইউরোপের উপযোগবাদী দর্শন রামমোহনকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। এই মতবাদের প্রধান পুরোহিত জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২)-এর সঙ্গে রামমোহন পরিচিত হন কলকাতায় অবস্থানকারী বেন্থামের কিছু-সংখ্যক ইংরেজ অনুসারীদের মাধ্যমে। এঁদের মধ্যে কলকাতার ইংরেজি সংবাদপত্র *The Calcutta Journal*-এর সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নির্ভীক ইংরেজ সাংবাদিক রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে কোম্পানির কুশাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমত জাগ্রত করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন। এর ফলে তিনি কোম্পানির সরকারের বিরাগভাজন

হন এবং তাঁকে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। এই বাকিংহামই বিলেতে গিয়ে বেন্থাম প্রমুখ ইংরেজ উদারপন্থীদের কাছে রামমোহনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। রামমোহনের পরিচয় পেয়ে বেন্থাম এত অভিভূত হয়েছিলেন যে একটি পত্রে রামমোহনকে "Intensely admired and dearly beloved collaborator in the service of mankind" বলে অভিহিত করেন।[৩] বস্তুত শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের চিন্তার সঙ্গে উপযোগবাদী দর্শনের কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়।

রামমোহন জানতেন যে ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে কোনো সংস্কারই বাইরে থেকে কিংবা উপর থেকে জোর করে চাপানো যায় না। সংস্কারের অনুকূলে জনমত গঠন করলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বাস শুরু করার অনতিকাল পরই ১৮১৪ সালে তিনি "আত্মীয়সভা" গঠন করলেন। ঘরোয়া বৈঠকের মাধ্যমে কিছু-সংখ্যক বন্ধুকে তাঁর মতাদর্শের পক্ষে নিয়ে এলেন। ১৮১৮ সালে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধরলেন। ক্ষুরধার যুক্তির দ্বারা রামমোহন প্রমাণ করলেন যে এই জঘন্য মানবতাবিরোধী প্রথা হিন্দুধর্মশাস্ত্র-বহির্ভূত। কিন্তু তা সত্ত্বেও লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে এই কুপ্রথা আইন করে তুলে দেওয়ার পরামর্শ তিনি দেন নি। বেন্টিঙ্ক-এর নিজের উক্তিতে জানা যায় যে কোম্পানির সরকার আইন করে সতীদাহ প্রথা রহিত করুক এই প্রস্তাব রামমোহন সমর্থন করেন নি।[৪] কিন্তু বেন্টিঙ্ক-এর সরকার ১৮২৯ সালে যখন আইন করে সতীদাহ প্রথা তুলে দিল, তখন রামমোহন সেই আইনকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে কালক্রমে সতীদাহ প্রথার মতো কুপ্রথা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু শিক্ষার সংজ্ঞা কী সে সম্বন্ধেও রামমোহনের পরিষ্কার ধারণা ছিল। যে শিক্ষা মানুষকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে পারে না সে শিক্ষাকে কুশিক্ষা বলে চিহ্নিত করে তিনি তার বিরোধিতা করেছেন। তাই ১৮২৩ সালে কোম্পানির সরকার যখন

৩। J. Bowring (ed.), *The Works of Jeremy Bentham*, Edinburgh, 1843. Vol X. p. 589.

৪। Minute by Lord William Bentinck, *Bengal Criminal and Judicial Consultation*, 4 December 1829, no. 10.

কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন রামমোহন বড়োলাট লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত তাঁর বিখ্যাত পত্রে এই প্রস্তাবের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল যে প্রাচীন সংস্কৃত জ্ঞান প্রাক্-বেকন আমলের ইউরোপীয় মধ্যযুগের চর্বিতচর্বণ বিদ্যার সমতুল্য এবং অসার; বাস্তব জীবনের প্রয়োজন মিটাতে একেবারেই অসমর্থ। সুতরাং রামমোহন প্রস্তাব করেন যে সরকার সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করার মনস্থ করেছিলেন সেই অর্থ দিয়ে একটি নতুন কলেজ স্থাপন করা হোক যেখানে পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। এর জন্য ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করার পরামর্শও তিনি দিয়েছিলেন। সরকার অবশ্য রামমোহনের এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নি এবং ১৮২৪ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল।

রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। যে জন্য এমন-কি খৃস্টান পাদ্রীদের দ্বারা স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। ১৮৩০ সালে স্কটল্যাণ্ড থেকে আগত রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডফ্ যখন উত্তর কলকাতায় একটি স্কুল স্থাপন করেন, রামমোহন তাঁকে সেই স্কুলের জন্য ছাত্র সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছিলেন এবং স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিজে উপস্থিত ছিলেন। কথিত আছে যে ডফ্ সাহেব যখন তাঁর খৃস্টান উপাসনা শেষ করে প্রতি ছাত্রের হাতে একটি বাইবেল উপহার দেন, তখন ছাত্রদের মধ্যে এর বিপক্ষে সমবেত গুঞ্জন রব উঠল। সেটা লক্ষ্য করে রামমোহন নাকি তাদের আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে: "প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ড. হোরেস হাইম্যান উইলসন হিন্দুশাস্ত্রাদি ভালো করে পাঠ করা সত্ত্বেও হিন্দু হয়ে যান নি, আমি নিজে সম্পূর্ণ কুরান একাধিকবার পড়েছি, কিন্তু তার ফলে কি আমি মুসলমান হয়ে গেছি? শুধু তাই নয়, আমি সমগ্র বাইবেলও পাঠ করেছি, কিন্তু তোমরা জান যে এর ফলে আমি খৃস্টান হয়ে যাই নি। সুতরাং বাইবেল পাঠ করতে ভয় পাও কেন? তোমরা এটি পাঠ করো এবং নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করো।"[৫]

৫। S. D. Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Second ed. Calcutta 1914, p. 163.

বস্তুত রামমোহন যীশু খৃস্টের মহান শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর এই শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তিনি যীশুর বাণী ও উপদেশসমূহ সংগ্রহ করে ১৮২০ সালে ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় একটি পুস্তিকা রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর ইংরেজ বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম-এর সহযোগিতায় বাংলা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করতে শুরু করেন। এই-সব কারণে বোধ হয় কিছু-সংখ্যক খৃস্টান মিশনারিদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে রামমোহন গোপনে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কথিত আছে যে কলকাতার প্রথম লর্ড বিশপ মিড্‌ল্‌টন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যখন রামমোহনকে অভিনন্দন জানান তখন রামমোহন নাকি তাঁকে বলেছিলেন: "My Lord, you are under a mistake. I have not laid down one superstition to take up another."* বস্তুত রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে সেই চিরন্তন সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই হল একজন শিক্ষিত ও সমাজ-সচেতন মানুষের কর্তব্য। সুতরাং হিন্দুধর্মকে পরিত্যাগ করে খৃস্ট বা অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি।

ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে রামমোহনের সব চেয়ে বড়ো অবদান হল তিনি হিন্দুধর্মকে বিশ্বধর্মে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮২৮ সালে "ব্রাহ্ম সভা" স্থাপন করেছিলেন। পরের বছর তিনি *The Universal Religion : Religious Instructions Founded on Sacred Authorities* নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকাটিতে রামমোহনের ধর্মচিন্তার পরিণত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এটির বৈশিষ্ট্য হল এখানে কোন হিন্দু দেবদেবী এমন-কি ব্রহ্মারও উল্লেখ অনুপস্থিত। এমন-কি God বা ঈশ্বরের নামের পরিবর্তে Divine বা Supreme Being বলা হয়েছে। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের দ্বার সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য খোলা ছিল।

এটা অনস্বীকার্য যে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু সমাজে কখনো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। খৃস্টান বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কেউ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন কি না জানা যায় না। সাধারণত অধিকাংশ মানুষ যুক্তি-হীন ভাবাবেগ দ্বারা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। রামমোহন-কর্তৃক প্রবর্তিত

*। *India Gazette* (Calcutta, 8 October 1829).

ব্রাহ্মধর্ম ছিল মূলত যুক্তিভিত্তিক। এইজন্য বোধ হয় সে যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরাই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন; অধিকাংশ জনসাধারণ এই নতুন ধর্মকে গ্রহণ করে নি। এই সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজের অনুসারীরাই ভারতে সর্বক্ষেত্রে আধুনিকতার অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন।

রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের মাধ্যমে একটি সার্বজনীন বিশ্বধর্ম প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র মানবজাতিকে এক সূত্রে মিলিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন: তিনি এক অবিভাজ্য মানবজাতিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই স্বপ্ন সফল হয় নি সত্য, কিন্তু এটি একটি মহান আদর্শ হিসেবে আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষ করে এই কারণে যে ধর্ম, বর্ণ, জাতি নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে হানাহানি ও রক্তক্ষয় আজও বন্ধ হয়ে যায় নি। তাই বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তির অগ্রদূত হিসেবে রামমোহনকে আজও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তিনি প্রাচ্যের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান ও মূল্যবোধের মিলন ঘটিয়ে এক নয়া বিশ্বসংস্কৃতির গোড়াপত্তন করেছিলেন।

রামমোহনের সমসাময়িকরা তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তা ও মতাদর্শকে গ্রহণ না করলেও তাঁর মহত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারেন নি। ১৮৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডে রামমোহনের তিরোধানের কয়েকদিন পরই আয়ারল্যাণ্ডের বেলফাস্ট শহরের একটি গীর্জায় অনুষ্ঠিত শোকসভায় একজন খৃস্টান ধর্মযাজক রেভারেণ্ড স্কট-পোর্টার রামমোহন সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন তার মধ্যে এতটুকু অতিশয়োক্তি ছিল না। তাঁর ভাষায় রামমোহন ছিলেন: "One of the most extra-ordinary men whom the world has witnessed for centuries; whose freedom, vigour and independence of thought, commended the admiration even of his adversaries"[৭]

৭। Rev. Scott-Porter, *A Sermon Occasioned by the Lamented Death of the Rajah Rammohun Roy* (Belfast, 1833), p. 46.

রামমোহন ও বঙ্গসাহিত্য

দেবীপদ ভট্টাচার্য

যাকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য অর্থাৎ creative literature বলা হয় রামমোহন সে ধরনের বিশেষ কিছু রচনা করেন নি। তিনি আঠারোর শতকের শেষপাদে জন্মেছেন যখন বাংলাদেশে কবি-আখড়াই-পাঁচালি গানের আসর। সে আসরের পৃষ্ঠপোষক বা শ্রোতা সাধারণ উভয় গোষ্ঠীই নিম্ন রুচি সম্পন্ন। ব্যতিক্রম ছিলেন কবি-সাধক রামপ্রসাদ সেন। তাঁর শাক্ত-সাধন গীতি অথবা আগমনী-বিজয়া গান উভয়ই উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি। আমাদের দেশে চর্যাগীতি থেকে রাম-প্রসাদের বা বাউলদের গানের পরিক্রমায় বসলে দেখতে পাই আমাদের ধর্ম-সাধনা সতত ভাষাগীতকে আশ্রয় করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা, শাক্ত সাধনা, বাউল সাধনা সবই সংগীতের সঙ্গে যুক্ত। সংগীত ভাষাকে প্রাণ দিয়েছে, ভাষা সংগীতকে মূর্ত করেছে। আমাদের সংগীত সর্বদাই বাণী বা কথা-নির্ভর। কাজেই বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল গীতির সঙ্গে আর-একটি নূতন 'গীতি' বা সংগীত যুক্ত হল, তার নাম 'ব্রহ্মসংগীত'। সে-সংগীতের স্রষ্টা রামমোহন।

ধর্ম-সাধনার প্রয়োজনেই সৃষ্ট হয়েছিল ধর্মসংগীত। চৈতন্যদেব যে ভক্তি-ধর্মান্দোলন দ্বারা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তারই ফলে অজস্র 'পদ' রচিত হয়েছিল, সেই পদকে নিয়ে নূতন সংগীত জন্ম নিল 'পদাবলী-কীর্তন'। সেখানে ঘটল সংগীতের মুক্তি। অনুরূপ ভাব রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতে বা বাউলদের মরমিয়া গানেও সংগীতের নব নব রূপ প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ম, কবিতা ও গানের প্রয়াগ-সংগম ঘটেছে মধ্যযুগের বাঙালির গানে। অতএব নতুন ধর্ম দেখা দিলে নতুন সংগীতের জন্ম হয়েছে। সেই ধারাতেই এল 'ব্রহ্মসংগীত'।

রামমোহন রায় একটি নতুন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করলেন — ব্রাহ্মধর্ম। সে ধর্ম না বৈষ্ণব, না শাক্ত, না বাউল। রামমোহনের বিচারপ্রবণ জ্ঞানপন্থী মনের গভীরে একটি সংগীত রসিক চিত্ত ছিল। তিনি তাঁর ব্রহ্মসভায় সংগীতের নিয়মিত চলন করেছিলেন, হয়তো একেশ্বরবাদী খৃষ্টীয় চার্চ যেখানে রামমোহন যেতেন, তাদের অনুসরণে ব্রহ্মসভায় সংগীতের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুকে দিয়ে তাঁর 'ব্রহ্মসভা'য় ব্রাহ্মসংগীতের গান করিয়েছিলেন। ব্রহ্মসংগীত রচনা রামমোহনের বিশিষ্টদান বাংলা সাহিত্যে। যখন বিলেতে গেছেন, সেই ১৮৩২ সালে ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে রামমোহন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদকে একটি পত্রে লিখেছেন—

"এই অবকাশে ব্রাহ্মসমাজে কাজের নিমিত্ত এক গীত পাঠাইতেছি, যত্তপি তোমরা ও বিদ্যাবাগীশ [রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ] উচিত জান, গায়কদিগকে দিবে—

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া থাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা ;
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।"

কাজেই ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রহ্মসভার মতো রামমোহনের হাতে গড়ে উঠল ব্রহ্মসংগীত। রবীন্দ্রনাথের রচিত সংগীতে এই ধারার সম্পূর্ণতা। বাংলা সাহিত্যে রামমোহন তাই একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন।

রামমোহনের বাংলা সাহিত্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ উপনিষদের বঙ্গানুবাদ। মধ্যযুগে আমাদের বঙ্গদেশে মাতৃভাষায় শাস্ত্রচর্চার নিদর্শন নেই। তা ছাড়া বেদ-উপনিষদের চর্চা ছিল না বলা চলে। মধ্যযুগে বাঙালি যাঁরা উপনিষদ্ চর্চা করেছেন তাঁরা বৃন্দাবন বা উৎকল প্রবাসী। চর্চা বেশি ছিল নব্যন্যায়ের, নব্যস্মৃতির ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের। ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে উইলিয়ম জোনস্ যখন 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন তিনি তার পূর্বে কালিদাস-অভিজ্ঞ বেশি-সংখ্যক পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পান নি। বেদ-উপনিষদের চর্চা প্রায় ছিল না বলা চলে। রামমোহন যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এসেছেন তখন বাংলা মুদ্রণ সুপ্রচলিত। তিনি যে পাঁচখানি মুখ্য উপনিষদের বঙ্গভাষানুবাদ প্রকাশ করলেন (১৮১৬) তার দ্বারা বাংলা সাহিত্য প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম-চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য-পুস্তকগুলির গণ্ডি ভেঙে বাংলা গদ্য 'বেদান্তগ্রন্থ' রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করল। এর দ্বারা বাংলা সাহিত্যের মহিমা বেড়ে গেল। বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, উপনিষৎ প্রভৃতি রচনা দ্বারা তিনি প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসাকে নবীন বাংলার গদ্য ভাষায় রূপায়িত করলেন। ফলে

রেনেসাঁস ও রেফরমেশন একসূত্রে বাঁধা পড়ল। এই দুঃসাহিক, চিরকাম্য প্রচেষ্টার দ্বারা বাংলা সাহিত্য নবৈশ্বর্যে ভূষিত হল। গদ্য ভাষায় রচিত মুদ্রিত গ্রন্থ সর্বসাধারণের কাছে প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম সম্পদের দ্বার উন্মোচন করল। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'—

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিলাসী জীবনের মোড় ঘুরিয়ে তাকে ব্রহ্মমুখী করেছিল। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী সকলেই এই শ্লোকটি থেকে নব নব তাৎপর্য লাভ করেছেন। রামমোহন এই শ্লোকটির অনুবাদ ভাষ্য কীভাবে রচনা করেছিলেন, অনেকেরই তা জানবার জন্য কৌতূহল রয়েছে—

পরমেশ্বরের চিন্তন দ্বারা যাবৎ নামরূপবিশিষ্ট মায়িক বস্তু সংসারে আছে, সে সকলকে আচ্ছাদন করিবেক অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নামরূপবিশিষ্ট বস্তুসকল পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে এমত জ্ঞান করিবেক যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাসদ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এইরূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপনার ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না।

এ ভাষ্যানুবাদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বা অন্যান্যদের মিল হবে না। তার কারণ রামমোহন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যার অনুগামী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা হল, বাংলা সাহিত্যে উপনিষদ তাঁরই উদ্যোগে ও সাধু প্রচেষ্টায় স্থায়ী আসন লাভ করল।

রামমোহন যেখানে ভাষ্যের দিকে ঝোঁকেন নি, অর্থাৎ সরাসরি অনুবাদ করে দিয়েছেন সেখানে তাঁর গদ্য আশ্চর্য সহজতা লাভ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কঠোপনিষদের নচিকেতা প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যেতে পারে—

হে পিতা কোন ঋত্বিককে দক্ষিণাস্বরূপে আমাকে দান করিবে এইরূপ দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার রাজাকে কহিলেন। বালক পুত্রের এইরূপ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে রাজা কহিলেন যে তোমাকে যমেরে দিলাম ॥[৪]

অথবা—

সেইরূপ জীব মায়াঘটিত উপাধি হইতে দূর হইলে আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন এবং উপাধিজন্য সুখ দুঃখের যে অনুভব হইতেছিল সে অনুভব আর হইতে পারে নাই।—[বেদান্ত গ্রন্থ]

১৮১৫ সালে লিখিত এই গদ্যের চেয়ে সুগঠিত সরলতর রূপ কি এখনো বেশি পাওয়া যায়?

রামমোহন বাংলা সাহিত্যে 'ব্রহ্মসংগীত' রচনা ও উপনিষদের 'বঙ্গানুবাদ' প্রণয়নদ্বারা নূতন সম্ভাবনার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছেন এ সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে। অবশ্য স্মর্তব্য যে ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ এই কালপর্বে তাঁকে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, এবং নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধিবলে তিনি প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছেন। সেখানে তাঁর গদ্য যুক্তিবহ, যাকে বলতে পারি arguementative। তিনি পণ্ডিতী রীতিতে পূর্ব পক্ষ ও উত্তরপক্ষ স্থাপন ও খণ্ডন দ্বারা নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—

নিবর্তক ॥ যদি মনুস্মৃতির অনুরোধ করিয়া সহমরণের নিত্যতাবোধক যে বাক্য অঙ্গিরা হারীত বচনে আছে তাহাকে স্তুতিবাদ করিয়া সঙ্কোচ করিলে তার ঐ মনুস্মৃতি যাহাতে পতি মরিলে বিধবা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য করিবেক এই বিধির দ্বারা ব্রহ্মচর্যের নিত্যতা দেখাইয়াছেন তাহার অনুরোধ করিয়া অঙ্গিরা ও হারীতাদির সমুদায় বচনের সঙ্কোচ কেন না কর এবং স্বর্গাদির প্রলোভন দেখাইয়া স্ত্রীহত্যাদর্শনে ক্ষান্ত কেন না হও। অধিকন্তু পূর্বোক্ত শ্রুতিতে কামনাপূর্বক আত্মহননকে দৃঢ় করিয়া নিষেধ করিয়াছেন।—[সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নির্বতকের সম্বাদ]

এই সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য স্বভাবতই রামমোহনকে 'শাস্ত্র প্রামাণ্য'-এর 'পর নির্ভর করতে হয়েছে। কেননা, শাস্ত্রে-প্রামাণ্য ভিন্ন মানুষের মনে বিশ্বাস-উৎপন্ন বা আস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এ সত্য রামমোহন বুঝেছিলেন। তাই তিনি শাস্ত্র দিয়েই অশাস্ত্রকে আঘাত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একই পন্থা অনুসরণ করেন বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য। রামমোহন মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি শুধু শাস্ত্র-প্রামাণ্য দিয়ে বিপক্ষের সতীদাহ সমর্থনকে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি আবেদন করেছিলেন মানবতার নামে, তার ভাষা হৃদয়গ্রাহী—

দুঃখ এই যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানাদুঃখে দুঃখিনী তাহারদিগকে

প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।—[সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ]

রামমোহনের বাংলা সাহিত্যে আর-একটি উল্লেখযোগ্য কাজ মিশনরিদের পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রতিবাদী পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী'র (১৮২১) প্রকাশে ও প্রচারে আত্মনিয়োগ। রামমোহন খৃস্টের প্রতি গভীর ভাবে শ্রদ্ধাশীল হলেও 'myth' ও 'miracle'-এ অবিশ্বাসী ছিলেন। মিশনরিরা হিন্দুধর্মের বিশেষত পৌত্তলিকতাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করলে রামমোহন তার সমুচিত জবাব দেন—

মিশনরি মহাশয়দিগে৷ বিনয়পূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা মনুষ্যরূপ-বিশিষ্ট যিশুখৃস্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিনা আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর যিশু খৃস্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্মেন্দ্রিয়ের ভোগ তাহারা জানেন কিনা এবং তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-গ্রামবাসী ভূত স্বীকার করেন কিনা··ইত্যাদি।

এই গদ্যরীতি সংস্কৃত বা ফার্সি থেকে আসে নি, এসেছে ইংরেজি arguementative prose style থেকে, পরবর্তী কালে এ রীতি অনেকেই গ্রহণ করেছেন।

রামমোহনের বাংলা সাহিত্যে অপর একটি দান ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ রচনা। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় সনাতন চক্রবর্তী-কৃত ভাগবতের একাদশ স্কন্দের পদ্যানুবাদের প্রশংসা করে লেখেন—

"বোধ হয় রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ভগবদ্গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালি পদ্য গ্রন্থে তদ্রূপ হয় নাই।"—[১৭৮০ শক (১৮৫৮) আষাঢ]

রামমোহন তাঁর কালে বঙ্গভাষায় ধর্মোপদেশ করাকে সমর্থন করেছেন, দেবেন্দ্রনাথ সেই ধারাকে বহন করেছেন। রামমোহন লিখেছেন—

শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশ ভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন তাঁহাকে গুরু কহা যায়।—[প্রার্থনা পত্র, ১৮২৩]

বঙ্গভাষায় ব্রহ্ম সংগীত রচনা, ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ, মুখ্য উপনিষদ্গুলির গদ্যানুবাদ, বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশে সহায়তা, সহমরণ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি দ্বারা রামমোহন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন।

তিনি এই ভাষার ব্যাকরণ ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় রচনা করেছেন। তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণ নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উৎকলন করি :

> মাতৃভাষার ব্যাকরণে প্রযোজ্য নতুন পরিভাষা রচনা রামমোহনের অন্যতম কৃতিত্ব। মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষে বিশেষ পরিভাষার যে প্রয়োজন আছে এ কথা মানতেই হবে।··· রামমোহনের তৈরী কতকগুলি পরিভাষার সার্থকতা আর প্রযোজ্যতা আজও স্বীকার করতে হবে।

হ্যালেডের ব্যাকরণ *A Grammar of Bengal Language* (1778) থেকে বাংলা ব্যাকরণে 'ছন্দ' একটি অধ্যায় রূপে আলোচিত হয়ে আসছিল। রামমোহনও তাঁর ব্যাকরণে 'ছন্দ' নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন 'সিলেবল্' বোঝাতে নতুন পরিভাষা দরকার। তিনি লিখেছেন—

> প্রথমতঃ পয়ার, তাহার দুই চরণ, তাহাতে উভয়ের শেষ অক্ষরে একজাতীয় হল্ বা স্বর হয়, প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ 'অক্ষর' হয়, তাহাতে সাত হইতে ন্যূন নহে, চতুর্দশের অধিক নহে 'ধ্বন্যাঘাত' হইয়া থাকে।

রামমোহন 'সিলেবল' অর্থে 'ধ্বন্যাঘাত'—এই নতুন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় 'অক্ষর' আর 'সিলেবল'কে পৃথক করে দেখাতে চেয়েছেন। এটি তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

দূরদর্শী রামমোহন

সোমেন্দ্রনাথ বসু

রাজা রামমোহন রায়কে যে আধুনিক যুগের প্রথম এবং প্রধান পুরুষ বলা হয়েছে তার কারণ তিনি আগত নতুন যুগের সম্ভাবনাকে বোধে ও বুদ্ধিতে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর সমসাময়িককালের অনেক মানুষই ছোট ছোট সঙ্কীর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় গণ্ডিগুলি ভেঙে ফেলে প্রগতিশীল নানা সংস্কারে উৎসাহী হয়েছিলেন। তাঁদের সেই-সকল কৃতকর্ম তখনকার দিনে সমাজে তাঁদের একটি বিশেষ অগ্রণীর ভূমিকা দিয়েছিল। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারমূলক কর্ম, নতুন নতুন চিন্তার উদ্‌বোধন যে মিলিতভাবে একটি নতুন যুগের সূচনা করছে এবং সেই সূচনার বীজ যে পরবর্তীকালে একটি বিরাট জাগরণের মহীরুহ হয়ে উঠবে এ চেতনা অনেকেরই ছিল না। রামমোহন রায়ের জীবন শুধুমাত্র তাঁর কৃতকর্মের তালিকা নয়। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা সামাজিক সংকীর্ণতা ও মানসিক জড়তা থেকে জাগ্রত জাতিকে বহির্বিশ্বের বিপুল চিন্তা ও কর্মের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করার যে দূরদৃষ্টি ও সাধনা তা কেবলমাত্র রামমোহনেরই ছিল। তাই জীবনের সকল রকম প্রকাশেই তাঁর উৎসাহ দেখা গেছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি লৌকিক জীবনের আচরণীয় নীতি— কোনোটি থেকেই তিনি দূরে সরে দাঁড়াতে পারেন নি কারণ বিশ্বব্যাপী অগ্রগতির স্রোত তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে যোগযুক্ত হলে আমাদের কী পরিবর্তন হবে তাও তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার প্রমাণ যোগানো কঠিন নয়।

মানুষের মনকে গতানুগতিক চিন্তার খাত থেকে সরিয়ে এনে নতুন করে ভাবতে শেখানো একটা বড়ো কাজ। আপাতকালে সে কাজের গৌরব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু সময় যত এগিয়ে চলে ততই বোঝা যায় যে অন্ধতার বিরুদ্ধে যুক্তির জাগরণ ঘটানো সহজ নয় এবং বারবার মানুষের ইতিহাসে এমন চিন্তানায়কদের আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা বুদ্ধির মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন। সামাজিক বিপ্লব যাঁরা ঘটান, স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের উৎখাত করতে যাঁরা জনসংঘর্ষের আয়োজন করেন, বুদ্ধির মুক্তিদাতার তাঁদের চেয়ে কম বিপ্লবী নন। কোনো বাঙালি সমালোচক কিছুটা তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন যে

বাঙালি জাতিকে যুক্তির পথে উদ্‌বুদ্ধ করা ছাড়া রামমোহন আর বিশেষ বড়ো কাজ কিছু করেন নি। সেই সমালোচক এ কথা মনে রাখেন নি যে চিত্তের জড়তা ঘুচিয়ে বুদ্ধিকে জাগাতে পারলে অন্য বড়ো কাজগুলো অনুষ্ঠিত হবার পথ খুলে যায়। রামমোহন সেই কাজ অবলীলাক্রমে তাঁর স্বাভাবিক ও সহজ বুদ্ধিতে করতে নেমেছিলেন। উপনিষদের অনুবাদে যে ভূমিকাগুলি তিনি লিখেছিলেন সেগুলি পড়লে দেখা যাবে যে শুধু তৎকালের মানুষ নয় পরবর্তীকালের মানুষও স্বাধীনচিন্তায় প্রণোদিত হবে এই ইচ্ছা তাঁর মনের মধ্যে স্পষ্ট ছিল।

সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার আন্দোলন যদি তাঁর একমাত্র কাজ হত তা হলে বলতে পারতুম যে তিনি শুধু নির্যাতিত নারীদের প্রতি অনুকম্পাবশত এই কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। সেটাও কিছু কম কথা নয় কারণ সেই অনুকম্পার পেছনে শাস্ত্রবুদ্ধি, ধর্মজ্ঞান এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা মিলিত না হলে সংগ্রাম চালানো সম্ভব হত না। শুধু এইটুকু বলতে পারা যেত যে তৎকালের একটি প্রধান সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানেই তিনি তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তিনি সেদিন যা চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর ১৩০ বছর পরে স্বাধীন ভারতবর্ষ অনেক দ্বিধা এবং সংকোচ নিয়ে সেই কাজ করতে উদ্যোগী হয়েছে। সমাজে মেয়েদের ভূমিকা কী হবে এই নিয়ে তিনি শুধু চিন্তা করেন নি অন্যদেরও চিন্তায় প্ররোচিত করেছেন। তিনি দেখেছিলেন যে মেয়েদের সম্পত্তিতে কোনো অধিকার না থাকার ফলে আজ যিনি পরিবারের প্রধান কর্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সামাজিক প্রথা এবং অর্থনৈতিক অধিকার লুপ্তির ফলে পরিবারে দাসীর পর্যায়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। সুতরাং ঘরে ঘরে বিধবা গৃহকর্ত্রীদের লাঞ্ছনা, অযত্ন যে নিত্যরীতি চলেছিল তার থেকে তাদের মুক্তি পাবার কোনো পথ ছিল না। সম্পত্তিতে অধিকার নেই বলেই বহুবিবাহের লোভ ও উৎসাহে বাধা দেবার মতো কিছু ছিল না। সতীদাহে মৃত্যু না হলেও যারা বেঁচে রইল তাদের জীবন যে সমাজজীবনকেও কলুষিত করবে এ বিষয়ে রামমোহন সঠিক ধারণা করতে পেরেছিলেন। তাই বৈধব্যের পর কী পথ খোলা আছে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

১। অন্য স্বামীর সাহায্যের সম্ভাবনা না থাকায় সম্পূর্ণভাবে অন্যের ক্রীতদাসী হওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে জীবনযাপন করা।

২। অসৎ, অধর্মের পথে নিজেকে চালিত করে স্বাধীন জীবনযাপন করা।

৩। কিংবা স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা প্রতিবেশীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর হাততালির মধ্যে। কোনো জাতিই তার অর্ধেক সংখ্যক মানুষকে এই রকম জীবনযাপনের মধ্যে ফেলে রেখে এগোতে পারে না, প্রগতির পথে চলতে পারে না। ১৮২২ সালে মেয়েদের অধিকার নিয়ে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তাতে দেখিয়েছিলেন অতীতে একদিন স্ত্রী-পুরুষের সমান অংশই ছিল। সন্তানের সঙ্গে জননীও তার স্বামীর সম্পত্তির অংশ পেতেন কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাঁধন কঠিন হল এবং সে অধিকার নষ্ট হল। এমন অবস্থারও রামমোহন উল্লেখ করেছেন যখন কোনো বিধবা নারী তাঁর সামান্যতম ভরণ-পোষণের অধিকার চাইলেও দেশের ব্রাহ্মণদের এক সম্প্রদায় তার বিরোধিতা করেছেন এবং নিজের অধিকার নিয়ে বিচারালয়ে যাবার যে অসম্ভাব্যতা মেয়েদের পক্ষে ছিল তার সুযোগ সবসময়ই উল্টোপক্ষ নিয়েছে। ঐ প্রবন্ধের শেষে রামমোহন দাবি করেছিলেন যে হিন্দু-আইনে অভিজ্ঞ ইউরোপীয় ব্যক্তিরা সম্পত্তিগত উত্তরাধিকার তর্কে যদি নিজের মতামত সঠিকভাবে ব্যক্ত করেন তা হলে তা হিন্দুসমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হবেই। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন যে ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের মতো শিক্ষালাভ করলে এবং মর্যাদা-বোধে উদ্বুদ্ধ (Be brought up in the same notions of honour) তারাও, ইউরোপীয়দের মতোই দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করবে। মেয়েদের সমস্যার মূলে যে অর্থনৈতিক দাসত্ব এ কথা আজ সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে একটি প্রাথমিক সূত্রে পরিণত হয়েছে। তাও ভারত স্বাধীন হবার ৫ বছর পরে মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকারের আইন পাস হয়েছে এবং রামমোহনের দৃষ্টির সত্যতা প্রমাণ করতে শতাধিক বৎসর পার হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের পশ্চাৎপরতার প্রধানতম কারণ যেটি সেটি রামমোহনের বুঝতে অসুবিধা হয় নি। সেটি হল অশিক্ষা এবং তথাকথিত শিক্ষিতের মধ্যে অবিদ্যার প্রসার। এই অশিক্ষার কারণে ভারতবর্ষ বিশ্বের যোগবিচ্ছিন্ন বা এও বলা যায় যে বিশ্বযোগ বিচ্ছিন্ন বলেই ভারতবর্ষ অশিক্ষার দৈন্যদশা সম্বন্ধে সুচেতন হল না কোনোদিন। নানারকম লৌকিক ও স্থানীয় গালগল্প, চণ্ডীমণ্ডপী পরনিন্দা ও পরচর্চা আলোচনার উপজীব্য বস্তু হয়ে রইল। এই মানসিক অবস্থার জড়তাকে কাটাতে হলে শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন, এ আজকে অতি সাধারণ মানুষও অনুভব করে। তিনি যে উপনিষদের মন্ত্রানুবাদ করে ইংরেজি বাংলা ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ধর্মব্যবসায়ীর

শাস্ত্র আন্দোলন নয়। সাধারণ মানুষের মন দেশের সকল জ্ঞানের উৎসমুখ থেকে নতুন করে শক্তি আহরণ করবে এই দূরদর্শী চিন্তা তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিল। অন্য দিকে তিনি যে ইংরাজ সরকারকে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশিক্ষা দানে উৎসাহী হতে প্ররোচিত করেছিলেন সে কথাও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এদেশে যখন টোল ছাড়া কোনো বিদ্যালয় ছিল না, একটি দুটি ব্যক্তিগত চেষ্টাপ্রসূত ইংরেজি বিদ্যালয় সবেমাত্র হয়েছে তখনই তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানভিত্তিক কলেজের দাবি করেছেন যেখানে ভাল উন্নতমানের ল্যাবরেটারি থাকবে। সেদিন এই চাওয়াটা খুব বড়ো চাওয়া ছিল। ইংরাজ সরকার সে চাওয়ায় কর্ণপাত করেন নি কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যেই দেশজুড়ে কলেজ এবং গবেষণাগার উচ্চশিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। আসন্ন যুগ যে অনুসন্ধিৎসু মনের তাড়ায় বিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করবে এ কথা তিনি অনুভব করেছিলেন এবং সেই সময়ে আর কোনো দ্বিতীয় ভারতীয় করেন নি। এই বিদ্যাচর্চার উদ্যমকে তিনি কখনোই ভারতীয়তা বা প্রাচ্য চিন্তার মোহাবিষ্টতার মধ্যে বেঁধে রাখেন নি। তাই আলেকজাণ্ডার ডাফ্ যেদিন খৃস্টবাণীকে সম্বল করে বিদ্যাদানে উৎসাহী হয়েছিলেন সেদিন রামমোহন রায়ই তাঁর প্রধান সহায় হয়েছিলেন। অন্যত্র এমন কথাও তিনি বলেছেন যে পাশ্চাত্যকে আমরা আত্মিক উন্নতির শিক্ষা দিতে পারি কিন্তু তাদের কাছ থেকে যন্ত্র ও কারিগরী বিদ্যার শিক্ষাও আমাদের নিতে হবে। শিক্ষা যে আমাদের জীবনকে ভাবনা ও কর্মে একত্রে যুক্ত করে একটি নতুন ডাইমেনশন দেবে এই দৃষ্টি রামমোহনের কালে কোনো ভারতীদের তো ছিলই না, ইউরোপীয় শাসকদের মধ্যেও ছিল না।

ইংরাজ শাসনের কাছ থেকে আমরা কী পেয়েছি তার হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে ১৯৩৩ সালে, রামমোহনের মৃত্যুর ১০০ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র এই দুটি পাশ্চাত্যসভ্যতার উপহার ভারতীয় জীবনে। সমস্ত বিশ্বচরাচর একটি নিয়মে চালিত হচ্ছে সে নিয়ম এতই সুশৃঙ্খল যে কোনো চতুরানন বা পঞ্চাননের তার তিলমাত্র ব্যতিক্রমের অধিকার নেই। বিশ্বচরাচরের এই নিয়মকে ঠিকমত অনুধাবন করতে পারলে আমাদের জীবনের অনেক অনাবশ্যক উদ্বেগ কেটে যাবে, অনেক ভীতিপ্রদ বস্তু তাদের স্বরূপে উপলব্ধ হলে উৎপাতের কারণ বলে বোধ হবে না। সুতরাং ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চা যে আমাদের একটি নতুনকালে এনে ফেলেছে এ কথা রবীন্দ্রনাথ "কালান্তর"

প্রবন্ধে বলেছেন। অর্থাৎ যে শিক্ষা ও মানসিকতা রামমোহন ইউরোপীয় সভ্যতার কাছ থেকে আহরণ করে জাতিগঠনে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন ১০০ বছর পরে তারই প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ "কালান্তর" প্রবন্ধে আলোচনা করলেন। রবীন্দ্রসমকালে যা ঘটনা শতাব্দীর পূর্বপারে সেই সমুন্নত প্রসারিত দৃষ্টি মানুষের তাই স্বপ্ন বা দূরদর্শন।

"কালান্তর" প্রবন্ধেই আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা হল গণতন্ত্র। বস্তুজগতের যেমন নিয়ম আছে প্রত্যেক ঘটনার কার্যকারণ সূত্র আছে তেমনি মানুষের জগতেও পারস্পরিক আচরণে ও ব্যবহারে কতকগুলি নীতি ইউরোপীয় মহাদেশে সম্মানিত হয়েছে। সেখানে অধুনাতন কালে বংশগরিমায় কুলমর্যাদায় মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের দাবি আর স্বীকৃত হচ্ছে না। আমাদের দেশে যেমন এককালে দিল্লীশ্বরই জগদীশ্বর বলে গণ্য হতেন ওদেশেও তেমনি রাজঅধিকারকে ভগবৎবংশীদের অধিকার বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু দেখা গেল যে আইনের চোখে সবাই সমান এই চেতনা আধুনিকতার একটি প্রধান চিহ্ন বলে গণ্য হল। ভারতবর্ষে চতুর্দিকে যখন সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার ও শোষণ চলেছে যখন ইংরাজ রাজশাসনও সদৃচ্ছ অন্যায় সাধনের অধিকার ভোগ করে চলেছে তখনই দূরদর্শী রামমোহন ইংরেজি গণতান্ত্রিক চেতনার মূলসূত্রটি আয়ত্ত করে দাবি করেছেন যে মানুষ মাত্রেরই সমান অধিকারের নীতি, যা ইংরেজ আইনের একটি মূল কথা তা এদেশেও কার্যকরী করতে হবে। ভাগলপুরের কালেক্টারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন "Your petitioner is aware that the spirit of British laws would not tolarate and act of arbitrary aggression even against lowest class of individuals." পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আন্দোলনে এই সূত্রকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রতি ইংরাজ শাসকের বর্ণবোধ-উদ্ধত ব্যবহার দীর্ঘদিন আমাদের পীড়িত করেছে কিন্তু কালান্তর প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন অত্যাচারীর হাতে লাঞ্ছিত হতে হতে আমরা তাদেরই শিক্ষা প্রয়োগ করে বলেছি "বিনিপাত"। পরবর্তীকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল জপ-মন্ত্রটি লর্ড মিন্টোকে লেখা ১৮০৯ সালের ঐ চিঠির মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। এ শুধু মামুলি দূরদৃষ্টি নয়, আধুনিকতার মূল বাণী কী হবে তাও রামমোহন যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলেন।

পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ক কী হবে এ নিয়ে রামমোহন রায়ের সমসাময়িককালে মানুষের খুব মাথাব্যথা ছিল না। এক শাসনের পরিবর্তে অন্যতর শাসন—এর চেয়ে অতিরিক্ত চৈতন্য আশাও করা যেত না। তখন জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় নি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এ ভাবনাও কোথাও ছিল না বরং শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ই সাধারণত শ্বেতবর্ণ প্রভুর প্রসাদ পেলেই তুষ্ট হত। এই ইংরেজ শাসন যে কালে পশ্চিমী সভ্যতার চিত্তদূত হিসেবে আমাদের কাছে দেখা দেবে এ ভাবনা রামমোহনের মনে ধরা না দিয়ে পারে নি। ইংরেজ শাসন তাঁর কাছে পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে সম্ভাব্য যোগসূত্র বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তাই তার দর্শন তার বিজ্ঞান তার গণতন্ত্র চেতনা যে আমাদের জীবনে প্রচারিত হলে সুফলপ্রসূ হবে এ কথা তিনি স্পষ্টই অনুভব করেছিলেন। আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে স্বদেশীয়দের চিত্তমুক্তির জন্য যিনি সদাসচেষ্ট তিনি কিন্তু কখনো আজকের অর্থে জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। "আমার বাংলাদেশ" বা "আমার ভারতবর্ষ" এই জাতীয় কোনো উক্তি বা চিন্তা তাঁর লেখার মধ্যে কোথাও পাই না। বরং ফরাসী বিদেশমন্ত্রীর কাছে তাঁর লেখা চিঠি থেকে অনুভব করতে পারি যে সমস্ত মানুষকেই একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মনে করার চিত্ত তাঁর ছিল এবং ভৌগোলিক কোনো অপদেবতা তাঁর চিন্তার রাজত্বে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাই জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ যখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল তখনো আমাদের নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ মনে করেছিলেন যে সংকীর্ণ স্বাজাত্যবুদ্ধি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের বাণী হতে পারে না। আজকের ভারতবর্ষের সর্বদেহে যে বিষক্ষত দেখা দিচ্ছে তার মূলে আছে স্থানীয় স্বার্থ ও সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি যাকে স্বদেশপ্রেম বলে চালানো হচ্ছে। রামমোহনের এই বিষয়ে মনোভাব সম্বন্ধে জাতীয় আন্দোলনের নেত্রী সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন: "There is one lesson of his life which I would like to emphasise to young men and women and that is that Rammohun had no narrow patriotism. Today because of the tragic circumstances of our national life we think that patriotism and nationalism are great virtues. But Raja Rammohun in the wisdom of his vision and knowledge and experience realised that patriotism is not a virtue. It is a

process through which a nation passes towards freedom. Narrow patriotism is not a glory but a symptom of that thing called slavery and it must be cured by the panacea of liberty." খণ্ড খণ্ড চেতনা, স্থানীয় সংকীর্ণতার অনুগামিতা যে ভারতবর্ষকে শতধা বিদীর্ণ করে দেবে এবং ভারতবর্ষের মানুষের রাজনীতিকে প্রগতিশীল হতে দেবে না এ কথা রামমোহন রায় স্পষ্টাক্ষরে বলে গিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের বর্ণবিভেদের তিনি উল্লেখ করেছিলেন, ঐ কারণেই যে হিন্দু সমাজ কোনোদিন সুসংহত রাষ্ট্রনৈতিক সত্তা লাভ করতে পারল না তাও বলেছিলেন। আজ দেখা গেল যে খণ্ড ধর্মবোধ কূপমণ্ডুক জাতীয়তাবোধ এবং ভাষা বর্ণ ও গোষ্ঠীগত অহংকার কখনোই মানুষকে সংহতির পথে এগিয়ে দিতে পারে না। যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন রামমোহন দেখেছিলেন সে আর যেমনই হোক এই আত্মগ্লানি-পীড়িত অহংকৃত ব্যাভিচারের ভারতবর্ষ নয়।

নিজের গরজে রামমোহন রায় ইংরেজি ছাড়াও হিব্রু লাটিন প্রভৃতি বিদেশী ভাষা শিখতে উৎসাহী হয়েছিলেন। নতুন নতুন ভাষা শেখার ইচ্ছা এবং তর্কের বিষয়বস্তুর মূল পাঠের সঙ্গে পরিচয় রাখার কামনা তাঁকে এই কর্মে উৎসাহিত করেছিল। যে নতুন কাল আসছে তাতে পৃথিবীর ছোট ছোট দেশগত বেড়াগুলি ভেঙে গিয়ে আন্তর্জাতিক ভাব আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হবে এটা তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন। ফরাসী মন্ত্রীর কাছে তিনি যে পাসপোর্ট প্রথার বিরুদ্ধে চিঠি লিখেছিলেন তাঁর পিছনেও এই দূরদৃষ্টি কাজ করছে। আজকের দিনেও আমরা রামমোহনের এই উদার চিন্তার শরিক হতে পারি নি। আরো বহুদিন লাগবে, পাসপোর্টের শৃঙ্খলজাল থেকে মানুষের বিশ্ববিচরণের চেতনাকে মুক্ত করতে। লক্ষণীয় এই যে প্রয়োজনবোধে তিনি ফার্সী ইংরাজি হিন্দী ও বাংলা প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থ রচনা বা অনুবাদ করেছেন। ভাষাগত ছুৎমার্গ তাঁর তো ছিলই না বরং অন্যতর ভাষার প্রবেশপথ দিয়ে অন্যগোষ্ঠীর মানুষের চিত্ত ও হৃদয়কে জানবার সুযোগ তিনি কখনোই হারাতে চান নি।

অতি আধুনিককালে রামমোহন রায় সম্বন্ধে আর এক ধরনের গোঁড়ামির আলোচনা শুরু হয়েছে। ইতিহাসের ব্যাখ্যা সময় কাল স্থান নিরপেক্ষ নয়। এই প্রগতিশীল ইতিহাস ব্যাখ্যার যাঁরা উদ্গাতা বলে নিজেদের মনে করেন তাঁরা অনেকে কখনো কখনো ইতিহাস বিচারে যে কি রকম সংকীর্ণ কূপবদ্ধ

গোঁড়ামির জালে জড়িয়ে পড়েন তার উদাহরণ এই রামমোহন-সমালোচনা। এঁদের বক্তব্য রামমোহন রায় ইংরেজ অত্যাচারের ও শাসনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ তো করেনই নি উপরন্তু নানাভাবে ইংরাজ শাসনকে কায়েমী হতে সাহায্য করেছে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে ইংরাজ শাসন যখন এদেশে এসেছিল তখন এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল ছবিটা এই ঐতিহাসিকদের মনের মধ্যে নেই। পলিটিক্যাল স্বাধীনতার চৈতন্য তখন কোথাও নেই। ভাঙা ভাঙা নবাবী ছোটোখাটো লেঠেল জমিদারি দেশটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে। কোনো একটা জায়গায় কোনো সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাচ্ছে না এবং মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হবে এমন কোনো চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা যায় নি। এই অবস্থায় রামমোহন রায় ইংরেজ শাসনকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেই স্বীকরণের পিছনে এই জাগ্রত বুদ্ধি সচেতন ছিল যে ইংরেজ শক্তি ইউরোপীয় সভ্যতার চিত্তদূত হয়ে এসেছে। সেই শাসনে যে একটা ঐক্যবোধ জাগবে এবং এদেরই কাছ থেকে শিক্ষা পেলে আমরা আধুনিক বিদ্যায় উন্নত হব একথা রামমোহন বারংবার বলেছেন। তার পরে সেই আধুনিক বিদ্যায় উন্নত ভারতবর্ষ প্রয়োজন হলে ইংরেজকে বন্ধু করবে প্রয়োজন হলে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে এ সম্ভাবনাও রামমোহন রায়ের দৃষ্টির অগোচর ছিল না। ইউরোপের বিদ্যা আয়ত্ত করে সেই নতুন যুক্তিবাদে ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসে জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারলে তার মধ্যযুগীয় অন্ধকার ঘুচে নবযুগের সূচনা হবে এবং তারই জন্যে নবাবী শাসন বা জমিদারি ব্যবস্থার চেয়ে ইংরেজ শাসন যে আরো সুবিধামত একটা ব্যবস্থা সেটা রামমোহনের বুঝতে ভুল হয় নি। অকাল স্বাদেশিকতার হঠকারিতার দ্বারা তিনি যে জাতির মনোগঠনের প্রক্রিয়াটিকে গোড়াতেই ভেঙে তছ্‌নছ্‌ করে দেন নি সে কথা আজকের কালানুক্রমবোধবর্জিত ঐতিহাসিকেরা মনে রাখেন না। তাই ইংরেজ শাসনের প্রতিবাদী না হয়েও তিনি নানা অবস্থায় শাসক গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তের পরিবর্তে অন্যতম সিদ্ধান্ত দাবি করেছেন। তিনি যে হাত-পা ছুঁড়ে খোকামি-রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন নি (যাকে লেনিনের ভাষায় বলা যায় infantile disorder) তাতেই প্রমাণ তাঁর কালানুক্রম জ্ঞান ছিল। তাই আমাদের দেশে তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে যা সম্পূর্ণ নতুন এমন মতামত প্রকাশের কিছু পদ্ধতি তিনি প্রচলন করেছিলেন। তিনি ছাপাখানা করেছিলেন আত্মমত প্রচারের

জন্য। স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টির উপায় বার করেছিলেন। সভাস্থল গড়ে তুলে বক্তৃতার দ্বারা মানুষের যুক্তি জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে চিন্তার মুক্ত স্বাধীন আবহাওয়া তৈরির চেষ্টায় তিনি পত্রিকা প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আজ এই-সমস্ত প্রক্রিয়া অতি পরিচিত। কিন্তু তখনকার দিনে লোকমত গঠন এবং লোকমত প্রচারের জন্য এই-সব পদ্ধতিগুলির ব্যবহারে তিনি প্রথম পথপ্রদর্শক।

সুতরাং নানা বিষয়ে স্থিরবুদ্ধি ও বিচক্ষণ রামমোহন অপ্রস্তুত একটি দেশে ইংরেজ তাড়ানোর হুজুগ তোলেন নি বলেই তিনি নিন্দনীয় এ কথা মোটেই শ্রদ্ধেয় নয়। মানুষের মনের মুক্তি না হলে অন্তত কিছু পরিমাণে অন্ধতার বিরুদ্ধে চৈতন্য জাগ্রত না হলে মুসলমান, ইংরেজ, কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট কোনো শাসনই মানুষের স্বাধীনতার স্বাদ দেয় না। রামমোহন ভারতবর্ষীয় সমাজে চিত্তমুক্তির যে গোড়ার কাজটি করতে চেয়েছিলেন সে আরো বহু দীর্ঘদিন ধরে চলবে এবং যে-সমস্ত সরব উচ্চকণ্ঠ ঘোষণাকে তাৎক্ষণিক স্বাধীনতার দাবিতে আমরা জাগিয়ে তুলি তারা অচিরকালেই মিলিয়ে যাবে।

রাজা রামমোহন ও বাংলার নবজাগরণ : পুনর্মূল্যায়নের প্রশ্ন

নিমাইসাধন বসু

পঞ্চাশ বছর পূর্বে, ১৯৩৩ সালে, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় যে স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল তার লেখকদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, জগদীশচন্দ্র বসু, সরোজিনী নাইডু, সি ভি. রমন, সিলভিয়ান লেভি প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত মনীষীরা। গ্রন্থের মুখবন্ধে সম্পাদক লিখেছিলেন যে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে রামমোহনের অতুলনীয় ভূমিকা তুলে ধরাই ঐ স্মারক-গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ঐ যুগে এইরকম একটি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণ সম্বন্ধে শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষিত মানুষ কেন, ঐতিহাসিকদেরও ধ্যান-ধারণা তেমন সুস্পষ্ট ছিল না। বাংলার নবজাগরণের বিভিন্ন দিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সম্বন্ধে গবেষণা তখনো তেমন অগ্রসর হয় নি। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধেও পড়াশোনা, গবেষণা ও মূল্যায়নের প্রচুর বাকি ছিল। বাংলার বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো দূরের কথা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলার নবজাগরণ সম্বন্ধে স্নাতকোত্তর ইতিহাসের পাঠক্রমে কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৯৪৯ সালে সর্বপ্রথম 'বাংলার নবজাগরণ' নামে একটি বিষয় তৎকালীন অষ্টমপত্র বা Essay Paper-এর অন্যতম বিষয় করা হয়। যে-কজন ছাত্রছাত্রী এই বিষয়টি বেছে নিয়েছিল তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। নিয়মিত ক্লাসের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ অনুরোধে ইতিহাস বিভাগের তৎকালীন প্রধান ড. ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরোয়াভাবে কয়েকদিন কিছু আলোচনা করেছিলেন। কয়েকটি বই-এর নাম বলে দিয়েছিলেন। ইতিহাসের পাঠক্রমে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ বিষয়টির যথাযথ মর্যাদা পেতে আরো বেশ-কিছু সময় লেগেছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৬ সাল থেকে, অর্থাৎ সূচনা থেকেই, স্নাতকোত্তর ইতিহাসের পাঠক্রমের একটি আবশ্যিক 'পেপার' এই বিষয়টির ওপর ছিল। প্রয়াত অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রথম প্রধান রূপে এই বিষয়টি প্রবর্তন করেছিলেন।

গত প্রায় তিরিশ বছরে বাংলার নবজাগরণ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সব-কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ইতিহাসের পাঠ্যসূচীতে কোনো-না-কোনো ভাবে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশে-বিদেশে ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদগণ উনিশ শতকের প্রধান প্রধান চরিত্র, ঘটনাবলী, আন্দোলন, চিন্তাধারা ও গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা, আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও মূল্যায়ন করেছেন। স্বভাবতই যে-ক'জন মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশি আলোকপাত হয়েছে, যাঁদের নিয়ে লেখালেখি সর্বাধিক হয়েছে, তাঁদের অন্যতম হলেন রাজা রামমোহন রায়। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের নবজাগরণ ও রামমোহন রায় সম্বন্ধে গত তিন দশকে এত বেশি গবেষণা ও চর্চা হয়েছে যে কেউ কেউ মনে করছেন যে বিষয় ও চরিত্রটির মূল্যায়ন পুনর্মূল্যায়ন প্রায় saturation point-এ পৌঁছে গেছে। এই অভিমত অবশ্যই ঠিক নয়। ইতিহাস চর্চা ও গবেষণার কোনো শেষ নেই। শেষ মনে করা বাঞ্ছনীয় ও যুক্তিসংগত নয়। খুব সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের 'রামমোহন সমীক্ষা' গ্রন্থটি প্রমাণ করেছে রামমোহন ও তাঁর যুগ সম্বন্ধে এবং অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কয়েকখণ্ডে প্রকাশিত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' প্রমাণ করেছে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর যুগ সম্বন্ধে কত মূল্যবান তথ্য আমাদের এখনো অজানা ছিল।

কয়েক দশক আগে বাংলার নবজাগরণ ও রামমোহন রায় সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির ও রচনার যে প্রবণতা এবং বৈশিষ্ট্য ছিল বর্তমানে তা নেই। সে যুগের গ্রন্থ ও রচনাগুলিতে উচ্ছ্বাস ও আবেগের আধিক্য ছিল। রামমোহনকে 'আধুনিক ভারতের জনক', 'পথিকৃৎ' বলে অভিহিত করার ও তা প্রমাণ করার জন্য খ্যাত-অখ্যাত সব লেখকই সচেষ্ট ছিলেন। সব আন্দোলনের পিছনে একজন জনক বা পিতাকে সন্ধান করার প্রচেষ্টা ভারতীয় চিন্তাধারার এক দুর্বলতা বলা চলে। এই 'Father Concept'-এর ফলে বহুক্ষেত্রে প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটন ও রচনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য সমসাময়িক যুগের প্রয়োজনে ও পারিপার্শ্বিক কারণে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো অবশ্যম্ভাবী ছিল। বর্তমানে ঐ প্রবণতা অনেক কমে গেছে। তথ্য, যুক্তি ও স্বচ্ছ দৃষ্টি অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। তার সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে নিজের দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি মমত্ববোধ। বর্তমান ভারতের গঠনের পিছনে

যাঁদের অবদান আছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা। ভারতীয় নবজাগরণে রাজা রামমোহনের সার্বিক অবদান আজ সুস্থ মানসিকতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন যে-কোনো ঐতিহাসিকের কাছে স্বীকৃত। সাধারণ ইতিহাস-সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছেও তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। যে-কোনো বড়ো মাপের ঐতিহাসিক চরিত্রের মতো রামমোহনকে ঘিরে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু তাঁর কথা বাদ দিয়ে সমসাময়িক যুগের জীবন ও চিন্তার কোনো দিক সম্বন্ধেই আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এটাই তাঁর ভূমিকার সবচেয়ে বড়ো ও স্থায়ী স্বীকৃতি।

উনিশ শতকের নবজাগরণে, তথা আধুনিক ভারতের গঠন বা বিবর্তনের পিছনে রামমোহনের অবদান কতখানি এবং তাঁর ভূমিকার তাৎপর্য কী এই আলোচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নবজাগরণের চরিত্র, সীমা ও গুরুত্বের প্রশ্ন। বিষয়টি নিয়ে এত বেশি বিতর্ক ও লেখালেখি হয়েছে যে বর্তমান প্রবন্ধে তার পুনরাবৃত্তি অপ্রয়োজন। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে এই বিষয়টি নিয়ে দুটি প্রধান মত আছে। প্রথমটি হল যে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ, যা কালক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার যতই সংকীর্ণতা, দুর্বলতা, স্ব-বিরোধ থাকুক-না-কেন, সামগ্রিকভাবে তা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল যুগ। জীবন ও মননের সর্বক্ষেত্রে সৃজনী প্রতিভার এমন প্রকাশ ভারতের ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটেছে। উনিশ শতকের মনীষী ও চিন্তানায়কদের জীবন, চিন্তা ও কর্মধারা আধুনিক ভারতবর্ষের জন্ম দিয়েছে। দ্বিতীয় মতটি হল যে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণকে সঠিক অর্থে নবজাগরণ বলা যায় না। এই 'নবজাগরণ' ও নবজাগরণের ঐতিহাসিক চরিত্র ও আন্দোলনগুলিকে অযৌক্তিকভাবে অনেক বড়ো করে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে ভাবপ্রবণতা, পূর্বপুরুষ ও স্বদেশের ইতিহাসের প্রতি আবেগময় শ্রদ্ধা যতখানি আছে ততখানি স্বচ্ছ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। এই দ্বিতীয় মতে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকেরা উনিশ শতকের নবজাগরণকে অনেক সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। নবজাগরণের সব চরিত্র, চিন্তা ও আন্দোলনকে তাঁরা তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমিতে বিচার করেন। তাঁদের মতে ঔপনিবেশিক শাসন ও শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে এই তথাকথিত নবজাগরণ ও নবজাগরণের প্রধান নায়কদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল সর্বক্ষেত্রে এই

নবজাগরণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ — কেউই এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেন নি। তবে সকলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, স্ব-বিরোধ ও স্বার্থচিন্তা সমান ছিল না। এই অভিমতের প্রবক্তাদের মধ্যে অবশ্য কিছু মতভেদ আছে। সমালোচনার কঠোরতা এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 'shade' বা রঙের পার্থক্য আছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা গত শতাব্দীর ইতিহাসকে বিচার করেন তাঁরা কিন্তু ঐ যুগ ও যুগচরিত্রগুলির গুরুত্ব এবং অবদান সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন না। সামগ্রিকভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে যে দেশের প্রগতি হয়েছিল এবং বিভিন্ন আন্দোলনের যে কল্যাণকর লক্ষ্য ও দিক ছিল তা তাঁরা স্বীকার করেন।

উপরোক্ত দুটি প্রধান মত ছাড়া তৃতীয় একটি দৃষ্টিকোণও আছে। এই দৃষ্টিকোণের বিচারে উনিশ-শতকের নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ছত্রছায়ায় লালিত ও পুষ্ট হয়েছিল। উচ্চ শ্রেণীর কিছু বিত্ত ক্ষমতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি এর পুরোভাগে ছিলেন। তাঁরা আসলে ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁদের সব চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টা ছিল জনস্বার্থ বিরোধী। নবজাগরণের প্রধান ব্যক্তিদের "শ্রেণীচরিত্র", "রাজভক্তি" এবং "স্বার্থসিদ্ধি"র প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন করে জনচিত্তে তাঁদের ভাবমূর্তি নস্যাৎ করাই এই "বিপ্লবী" ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যক্রমে এই তৃতীয় মতে গুরুত্ব আরোপ করেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। তবুও দেশে বিদেশে মাঝে মাঝে মর্যাদাসম্পন্ন পত্র পত্রিকায় এইজাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর কারণ বক্তব্যের 'অভিনবত্ব' বা 'মৌলিকতা', বিতর্কিত বক্তব্য প্রকাশের আকর্ষণ, লেখার প্রসাদগুণ, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের স্বীকৃতি দান। প্রসঙ্গত স্মরণ করা প্রয়োজন যে এই অধিকারের প্রতি মর্যাদা দানের শিক্ষা ও উত্তরাধিকার আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস এবং উনিশ শতকের মনীষীদের কাছ থেকেই পেয়েছি। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে রামমোহনের ভূমিকার আলোচনা প্রসঙ্গে এই সমালোচকদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ, কোম্পানির শাসনের অন্যায়-অযৌক্তিক আইন ও নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা, অধিকতর রাজনৈতিক অধিকারের দাবি উত্থাপন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সূচনা ও নিয়মতান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে রামমোহনের অগ্রণী ভূমিকা সুবিদিত। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ,

দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশেষ করে ইংরাজ-শাসনের প্রতিষ্ঠা ও তার কল্যাণকর দিক-গুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিমতই সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু ঐ সমালোচনা বহুলাংশে একদেশদর্শী। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত। বর্তমানের ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ অতীতে আরোপ করা এবং সেই মত প্রত্যাশা করা ইতিহাস রচনার স্বীকৃত পদ্ধতি নয়। রামমোহন রায় অবশ্যই ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ভারতের তৎকালীন প্রয়োজনের স্বার্থে কল্যাণকর বলে বিবেচনা করেছিলেন। আরো কিছুকাল ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। দেশের সর্ব-শ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অধিকার লাভের কথা তিনি বলেন নি। অকারণ তাত্ত্বিক বিতর্কে না গিয়ে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা প্রয়োজন যে রামমোহনের যুগের বিচারে এই সব-ক'টি বক্তব্যই সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তবনিষ্ঠ ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দুর্নীতি, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক কুশাসন, ও তার কুফল কারো অজানা নয়। কিন্তু ইংরাজ শাসন, আইন ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার যে ইতিবাচক দিকও ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল, সাধারণ মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা ও অসহায়তা দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের সূচনায় ইংরাজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তার যে অনেকটা দূর হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংরাজ শাসন ও প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা জাগিয়েছিল কল্যাণ এবং অগ্রগতির। রামমোহনও সেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কালক্রমে সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ভারতীয়রা ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। রামমোহন নিজেও যে এ দেশে ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে হতাশাবোধ করছিলেন এবং তার সমালোচক হয়ে উঠছিলেন তার প্রমাণের অভাব নেই। তবুও সব-কিছু বিচার করে কঠোর বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন রামমোহন মনে করেছিলেন যে তখনই ব্রিটিশ শাসনের কোনো বিকল্প নেই, স্বাধীন ভারতবর্ষের চিন্তা তখন অবাস্তব ছিল। হিন্দু কলেজের অপরিণত-বুদ্ধি আদর্শবিলাসী কিছু ছাত্রের পক্ষে ভারতবর্ষে ফরাসী-বিপ্লবের রঙিন স্বপ্ন দেখা সম্ভব হলেও রামমোহনের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

রামমোহন কখনো ভারতে ইংরাজ শাসনকে চিরস্থায়ী বলে মনে করেন নি। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'রামমোহন সমীক্ষা'য় অনেক তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে এই কথাটি সুনিশ্চিতভাবে দেখিয়েছেন। ইংরাজ

শাসন, ইংরাজি শিক্ষা এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। রামমোহন এই নতুন শ্রেণীর বিন্যাস ও রূপান্তর সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, ভারতের অগ্রগতি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেতৃত্ব দেবে এই তাঁর স্থির প্রত্যয় ছিল। অবশ্যই রামমোহন আধুনিক অর্থে কৃষক নেতা, শ্রমিক নেতা, বা গণ নেতা ছিলেন না। হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আধুনিক সংজ্ঞা মতো ঐ ধরনের নেতা না হওয়া যদি 'প্রগতি-বিরোধী', 'জনস্বার্থ বিরোধী' বা 'শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ ও তল্পিবাহক' বলে অভিহিত হওয়ার কারণ হয় তা হলে ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮), আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৬), ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯), চীনের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১১) প্রভৃতি বিভিন্ন বিপ্লব ও আন্দোলনের নেতারা সকলেই একই-ভাবে চিহ্নিত হবেন। রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা অপরিবর্তিত থাকে নি। সারা জীবন তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। বহুমুখী কর্মব্যস্ত জীবনে নিয়তই নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন। বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ পেতেন। সেই সুযোগ তিনি গ্রহণ করতেন, খোলা মনের যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন তিনি। সুতরাং তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন খুবই স্বাভাবিক ছিল। তাঁর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এমন কি ধর্ম-চিন্তার মধ্যেও এই বিবর্তন লক্ষণীয় ছিল। দিলীপকুমার বিশ্বাস নতুন তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে শেষ জীবনে ইংলণ্ডের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের ওপর তাঁর আস্থা কমে গিয়েছিল। তিনি সাধারণতন্ত্রের অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন।

সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে শেষ জীবনে রামমোহন যদি জনপ্রতিনিধি-মূলক সাধারণতন্ত্রের অনুরাগী নাও হয়ে উঠতেন, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাঁর মনোভাবের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নাও ঘটত তবুও ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকারবোধের উন্মেষে এবং সংগঠিত হয়ে অন্যায় নীতি ও আইনের বিরোধিতা করার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থাপনের ক্ষেত্রে রামমোহনের অগ্রণী ভূমিকা অস্বীকার করা বা তাঁর অবদানকে খাটো করে দেখার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় হল যে রামমোহনের যে অবদানগুলি বিতর্কাতীত সেইগুলি নিয়েও তথাকথিত 'নবমূল্যায়ন'-এর নামে অপব্যাখ্যা এবং অপপ্রচার করার প্রবণতা এখনো দেখা যাচ্ছে। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। উনিশ শতকে ইংরাজ শাসন ও বিচার-ব্যবস্থার বর্ণবৈষম্য নীতি, শ্বেতাঙ্গদের

শ্রেষ্ঠত্ববোধ এবং এদেশীয়দের প্রতি তাদের উদ্ধত দুর্বিনীত আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সূচনা করেছিলেন রাজা রামমোহন। ১৮২৬ সালের ধর্ম ও বর্ণবৈষম্য-দুষ্ট জুরী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনই প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন। জুরী আইন বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রকৃত সূচনা হয়েছিল। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রামমোহন রায়। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ১৮৩২ সালে জুরী আইন সংশোধিত হয় ও বৈষম্যমূলক ধারাগুলি বাদ দেওয়া হয়। আইন সংশোধিত হওয়ায় এদেশীয় শ্বেতাঙ্গরা ক্ষিপ্ত হয়। তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হল রামমোহন। শ্বেতাঙ্গদের অন্যতম মুখপত্র 'মিরাট অবসারভার' লেখে (৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৩) যে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস গ্র্যান্টকে রামমোহন হতবুদ্ধি করেছেন। ক্ষোভের সঙ্গে কাগজটি মন্তব্য করে "কালক্রমে একদিন ইংরাজদের এদেশ থেকে উৎখাত অনিবার্য। কিন্তু আগে থেকেই ভারতীয়দের আমাদের মাথায় চেপে বসার শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই।" অর্থাৎ রামমোহনের প্রচেষ্টা ও জুরী আইন-বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্বন্ধে কাগজটি ইংরাজ সরকার ও এদেশীয় ইংরাজদের সতর্ক করে দিয়েছিল। এই আন্দোলনের সময় রামমোহন জোরাল ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন তিনি কতখানি বর্ণবৈষম্য বা যে-কোনো রকম বৈষম্যের বিরোধী। শ্বেতাঙ্গদের জন্মগত বা অন্তর্নিহিত কোনো শ্রেষ্ঠত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন যে আধুনিক 'জ্ঞান-বিজ্ঞানই' পাশ্চাত্যের প্রগতি ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। ভারতীয়রা এই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করলে পাশ্চাত্যদেশীয়দের সমকক্ষ হতে পারবে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে পৃথিবীর যে-কোনো সভ্যজাতির মতোই ভারতীয়দের উন্নত হবার ক্ষমতা আছে। যখন জাতি-শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ইউরোপীয়রা প্রচার করেছিল যে এশিয়ার মানুষ জন্মসূত্রেই দুর্বল বা পৌরুষহীন (Asiatic Effeminacy) তর্কে রামমোহন তাদের সগর্বে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে "...by a reference to history it may be proved that the world was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge, which sprang up in the East." তিনি আরো স্মরণ করিয়ে দেন যে স্বয়ং যীশু থেকে শুরু করে খৃস্টধর্মের প্রায় সব নায়করা এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সকল মানুষের

সমমর্যাদা ও অধিকারে রামমোহন বিশ্বাস করতেন। অথচ তাঁরই বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি নিজের দেশের মানুষকে নিকৃষ্ট এবং ইংরাজদের "superior race" মনে করতেন। ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপেক্ষা করে (বা সেই বিষয়ে অজ্ঞ থেকে) রামমোহনকে অভিযুক্ত করার জন্য বেন্থামের এক ভক্তের রামমোহন সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত পক্ষপাতদুষ্ট মত উদ্ধৃত করা হয়। এই জাতীয় তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে রামমোহনের সমাজ-সংস্কার-চিন্তা ও প্রচেষ্টার আসল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শাসন এবং নিজের শ্রেণীস্বার্থ সুরক্ষিত করা!

রামমোহন আধুনিক বা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তাঁর ভাষায় ইংরাজদের প্রাধান্যের কারণ ছিল "the magic of knowledge"। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয়দের এই "ম্যাজিক" শিখতে হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারে তাঁর কী ভূমিকা ছিল, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর অবদান ছিল কিনা এই-সব বিষয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আবো বিতর্ক হতে পাবে। যেমন লর্ড আমহার্স্টকে তিনি যে চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠির যুক্তি ও বক্তব্য ঠিক ছিল কিনা, সংস্কৃত বা প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে যে কঠোর সমালোচনা তিনি করেছিলেন তা অবাঞ্ছিত ও একদেশদর্শী ছিল কিনা সেই নিয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু রামমোহনের সমকালীন যুগে বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংবাজি শিক্ষা প্রবর্তনের যে একান্ত ও জরুরি প্রয়োজন ছিল তা অস্বীকাব করা যায় না। তেমনি কেন ইংরাজরা এবং খৃস্টান মিশনারিরা ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছিল সেই বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। অধিকাংশ ভারতীয়রাই যে নিজেদের বা নিজেদের সন্তান ও বংশধরদের রুজি-রোজগার এবং সামাজিক প্রাধান্যের জন্য ইংরাজি শিক্ষাব সমর্থক ছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে কিছু মানুষ ছিলেন যাঁরা ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার সমর্থন করার সময় দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ও অগ্রগতির কথা চিন্তা করেছিলেন। শুধুমাত্র নিজের সন্তান-সন্ততি বা নিজের শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের কথা ভাবেন নি। রামমোহন ছিলেন সেই দলভুক্ত। এই বিষয়ে বহু তথ্য রয়েছে। তবুও শিক্ষা ক্ষেত্রে রামমোহনের ভূমিকা যে ইংরাজ শাসকদের স্বার্থের অনুকূল ছিল তা প্রমাণ করার জন্য সি. ঈ. ট্রেভেলিয়ান ভারতে ইংরাজি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর *Education of the People in India* (1838)

গ্রন্থে কী লিখেছেন তা উদ্ধৃত করা হয়! প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে এ দেশে পাশ্চাত্যের 'scientific and liberal' শিক্ষা প্রবর্তনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে রামমোহন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই উদ্ভট বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তথ্য ও যুক্তির স্ব-বিরোধ প্রকট হয়ে পড়ে। একদিকে বলা হয় যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে লর্ড আমহার্স্ট'কে চিঠি লিখলেও রামমোহন প্রকৃতপক্ষে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের পিছনে লর্ড ওয়েলেসলির যে উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করেছিলেন। অন্য দিকে আবার রামমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি মেকলের শিক্ষা-বিষয়ক মিনিট-এর (১৮৩৫) ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। অবশ্যই ভালো অর্থে নয়! মেকলের সেই বিখ্যাত (বা কুখ্যাত) বক্তব্য, "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern— a class of persons Indian in blood and colour, but English in testes, in opinions, in morals and in intellect"—সেই লক্ষ্যে যাতে পৌঁছন যায়, তার চেষ্টা নাকি রামমোহন করেছিলেন! রামমোহন অবশ্যই তাঁর নিজের দেশের মানুষ ও ইংরাজ শাসক এবং (বহুলাংশে) পাশ্চাত্য সমাজের মধ্যে "দোভাষী"র কাজ করেছিলেন। "দোভাষী" কথাটি এক্ষেত্রে সঠিক নয়। রামমোহন উভয় দেশ ও সমাজ-সভ্যতার মধ্যে সেতুবন্ধের চেষ্টা করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন সেই যুগে ছিল। কিন্তু তারই সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয়রা নিজেরাই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠুক। নিজেদের বক্তব্য সুসংহত ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে শিখুক। তাদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠুক। ভারতীয়রা প্রকৃত অর্থে ভারতীয় হয়ে উঠুক, জাতি হিসাবে আপন স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে ক্রমশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠুক এই কামনা তিনি করেছিলেন। ভারতবর্ষ "Brown Saheb"-দের দেশ হোক তা রামমোহন কোনোদিন চান নি।

শিক্ষাক্ষেত্রে রামমোহনের ভূমিকার আলোচনা প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয় এসে পড়ে: সেটি হল হিন্দুকলেজের "চরমপন্থী" ডিরোজিয়ান বা নব্যবঙ্গীয় ছাত্রদের প্রতি তাঁর মনোভাব এবং পারস্পরিক সম্পর্ক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে রামমোহন ঐ তরুণ ছাত্রদের বল্গাহীন উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা,

আচার-আচরণ সমর্থন করেন নি। রামমোহন প্রচলিত হিন্দু সমাজ, আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-নীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সংস্কার তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু নব্যবঙ্গীয়দের মতো তিনি "সর্বান্তঃকরণে হিন্দুধর্মকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা" করতে পারেন নি বা হিন্দুধর্মের সব-কিছু "দূষিত, বিকৃত, ক্ষতিকর ও বর্জনীয়" বলে মনে করতে পারেন নি। তা যদি করতেন তা হলে তিনি আর একজন উগ্র অসহিষ্ণু আবেগপ্রবণ নব্যবঙ্গীয় রূপে ইতিহাসে উল্লিখিত হতেন মাত্র। 'ভারতপথিক', 'নবযুগের পথিকৃৎ' বা নবজাগরণের 'প্রথম আধুনিক মানুষ' বলে সম্মানিত হতেন না। এই নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন পর্যন্ত দেখা দিত না। এরই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে হিন্দু কলেজের যে নব্যবঙ্গীয়রা ছাত্রজীবনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এ জাতীয় বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন তাঁদের অধিকাংশের বয়স, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম, সমাজ তথা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অধ্যাত্ম-চিন্তার মর্মকথা সম্বন্ধে মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল।

রামমোহনের সঙ্গে নব্যবঙ্গীয়দের বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু সমাজ-সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, নারীর মর্যাদা, রাজনৈতিক অধিকার আদায় এবং রক্ষা আন্দোলন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি বহু বিষয়ে রামমোহন এবং ডিরোজিয়ানদের মধ্যে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মিল ছিল। এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত অনেক কাজ যা রামমোহন সূচনা করেছিলেন সেগুলি ডিরোজিয়ানরা সম্পন্ন করার ভার গ্রহণ করেছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নব্যবঙ্গীয়রা এবং পরবর্তীকালের 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত বলে চিহ্নিত কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখেরা রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁরা রামমোহনের কর্ম ও চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' কাগজের চতুর্থ খণ্ডে রামমোহনের কর্মময় জীবনের মূল্যায়ন করে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছিলেন, "The life of Rammohun Roy was commensurate with one of the most important and stirring periods in the annals of this country.···He helped to break the crust of that rigid and unbroken superstition which had braved the formidable

attacks of the Buddhist and the fierce persecution of the Mohammedan. No native had before been enlightened and bold enough to do anything of the kind. He was the first who opened the eyes of his countrymen to the monstrous absurdities of their national creed." কিশোরীচাঁদের এই বক্তব্যের সবটুকু হয়তো গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সেটা মূল কথা নয়। সমকালীন নব্যবঙ্গীয়রাও যাঁদের সঙ্গে রামমোহনের দৃষ্টি ও মতপার্থক্য বড়ো করে দেখানো হয় এবং যাঁদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে রামমোহনের ভূমিকাকে প্রগতি-বিরোধী বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়, সেই 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্তদের রামমোহন-মূল্যায়নের বিশেষ তাৎপর্য আছে। কিশোরী-চাঁদের মূল্যায়ন সেই কারণে মূল্যবান।

রামমোহনের ধর্মচিন্তা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও ধর্মসংস্কারক রূপে তাঁর সামগ্রিক ভূমিকা সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। বর্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এই বিষয়ে নতুন সংযোজনের তেমন কিছু নেই। ব্রাহ্মসমাজ যে একটি প্রগতিশীল শক্তি রূপে কাজ করেছিল, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উৎসাহ-অনুপ্রেরণার উৎস ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আধুনিক ভারতে কুসংস্কারমুক্ত, উদার মানবিকতাবাদী, সর্বজনীন ধর্মপ্রচার আন্দোলনের ইতিহাসে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। রামমোহন এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য ছিল। কিন্তু স্বামীজী রামমোহনের ঐতিহাসিক অবদান সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রামমোহনের বেদান্ত প্রচার স্বদেশ-প্রেমের শিক্ষা এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের প্রতিই সমভালোবাসা— এই তিনটি স্বামীজীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। রামমোহনের চিন্তা ও দূরদৃষ্টির ব্যাপ্তি স্বামীজী শ্রদ্ধা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলার নবজাগরণকে হেয় বা তাচ্ছিল্য করতে বদ্ধপরিকর মুষ্টিমেয় তথাকথিত উগ্র নির্ভেজাল মার্কসবাদীর প্রধান অভিযোগ হল যে এই 'তথাকথিত রেনেসাঁ' বেদ-বেদান্তের দর্শন ও চিন্তাশ্রয়ী ছিল। ধর্মীয় সংস্কার এই যুগে প্রাধান্য পেয়েছিল। ধর্মীয় ভাবধারা সম্পূর্ণমুক্ত হয়ে 'সেকুলার' পথে অগ্রসর হয় নি। বেদান্তের মাদকতা অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিচার এবং প্রগতির মানদণ্ড নির্ণয় পরিহাস না

পরিতাপের বিষয় জানি না। হয়তো উভয়ই। যে বেদান্ত মতের ভিত্তিতে রামমোহন উনিশ শতাব্দীর সূচনায় ভারতের পুনর্গঠন ও অগ্রগতি চেয়েছিলেন এবং শতাব্দীর শেষ পাদে যে ব্যবহারিক বা ফলিত বেদান্ত (Practical Vedanta)-এর অনুশীলন স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জীবন ও মননের সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ ও প্রগতির জন্য অপরিহার্য বলে মনে করেছিলেন সেই বেদান্ত মাদক দ্রব্য ছিল না। জীবনদায়ী ঔষধ ছিল। এই বেদান্ত মানবতাবাদ-বিরোধী নয়। মানবতাবাদের শ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ সংজ্ঞা। প্রগতির পথে অন্তরায় নয়। অন্তর এবং বহির্জগতের প্রগতির প্রশস্ত পথ। সকল মানুষের মধ্যে একই ঈশ্বরের অস্তিত্ব, দৈবশক্তির অধিষ্ঠান এবং সেই উপলব্ধি থেকে সকল মানুষের সমতায় বিশ্বাস মার্কসীয় দর্শনের মানুষের সমতা থেকে কোনো অংশে কম প্রগতিশীল নয়। এই বেদান্ত দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ কোনো মার্কসবাদী বা "প্রগতিবাদী" নাস্তিকের চেয়ে কম সেকুলার নয়।

রামমোহনের ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে এক মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর অভিমত উদ্ধৃত করা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। "হিন্দু, ইসলাম এবং খৃস্টধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল মানবিকতার সুরকে উপলব্ধি করে একেশ্বরবাদ বা বেদান্তের অদ্বৈতবাদকেই আবার আহ্বান জানিয়ে রামমোহন যে ধর্মসমন্বয়ের কথা ঘোষণা করলেন, যার ওপর ভিত্তি করে তিনি ব্রাহ্মসমাজের পত্তন করেন— তার মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতায় ক্ষতবিক্ষিত পঙ্গু সমাজজীবনকে মুক্ত করা।···মানবতাবাদের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ রামমোহন secular মানবতাবাদের পৃষ্ঠপোষক না হলেও তিনি একদিকে যেমন ধর্মীয় জগতের আবর্তিত জঞ্জাল থেকে মানুষের জীবন ও মনকে মুক্ত করে তার স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশকেই আনতে চেয়েছেন, অপর দিকে এরই পাশাপাশি এমন কতকগুলি সামাজিক সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছেন যা আসলে গোটা দেশে বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নবযুগের বার্তাই বয়ে এনেছে" (মানিক মুখোপাধ্যায়, 'ভারতীয় রেনেশাঁ ও রামমোহন', পথিকৃৎ, এপ্রিল ১৯৮৪)।

ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে রামমোহনের অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। সতীদাহ প্রথার অবসানের পূর্বে ও পরে তাঁর ভূমিকা, সরকারী সিদ্ধান্তের পিছনে বেন্টিঙ্ক ও রামমোহনের তুলনামূলক অবদান ইত্যাদি নিয়ে

গত দুই দশকে বেশ-কিছু গবেষণা হয়েছে। বেন্টিঙ্ক যে এ দেশে আসার পূর্বেই সতীদাহের অবসান সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেলেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রামমোহন যে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বেন্টিঙ্ককে তেমন কিছু প্রভাবিত করেন নি বরং তিনি তখনই আইন প্রবর্তন করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বিপক্ষে অভিমত দিয়েছিলেন সে বিষয়েও মতভেদের অবকাশ নেই। বহুদিন ধরে এর জন্য রামমোহন সমালোচিত হয়ে আসছেন। তাঁর বর্তমান "প্রগতিবাদী" সমালোচকরা বারবার রামমোহনের এই প্রগতি-বিরোধী "অপকর্মের" কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু যেটা তাঁরা এবং তাঁদের গুণগ্রাহী পাঠকরা বিস্মৃত হচ্ছেন সেটি হল যে রামমোহন দীর্ঘকাল ধরে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে আসছিলেন। সতীদাহ যাতে অনুষ্ঠিত না হয় তার জন্য সাধ্যমত সক্রিয় চেষ্টা করছিলেন। অবশ্যই এই বিষয়ে খৃস্টান মিশনারিরা ও কিছু কিছু পদস্থ সরকারী কর্মচারীরাও সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু তার জন্য রামমোহনের প্রচেষ্টার গুরুত্ব কমে নি বা কমানো যায় না। রামমোহন প্রমুখের প্রচেষ্টার ফলে জনমত গঠিত হয়েছিল বলেই বেন্টিঙ্কের পক্ষে সাহস করে সতীদাহ বিলুপ্তি আইন তখনই বলবৎ করা সম্ভব হয়েছিল। সবশেষে ও সবচেয়ে বড়ো কথা হল যে ঐ আইন পাস হবার পর রামমোহন সর্বতোভাবে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন, এ দেশে ও ইংলণ্ডে, যাতে কোনো রকমেই ঐ আইন প্রত্যাহৃত না হয়। মানুষের সহজাত দুর্বলতা প্রকাশ করে তিনি বলেন নি যে 'আমি তো জানতাম প্রবল বিরোধ-বিক্ষোভ দেখা দেবে। আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম। এখন আমার সতর্কবাণী ও পরামর্শ উপেক্ষা করার ফল ভুগতে হবে।' তিনি সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার সপক্ষে যে ভাবে জনমত গঠন করেছিলেন, প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রক্ষণশীল নেতাদের ও জনমতের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন তার স্বীকৃতি না জানালে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটবে। উত্তরসূরী রূপে আমরা অকৃতজ্ঞ বলে পরিচিত হব।

সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় ও ক্ষেত্রে রামমোহনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান ছিল। শুধুমাত্র তৎকালীন বাংলা বা ভারতবর্ষেই নয়, বহির্বিশ্বেও রামমোহনের সমতুল্য বুদ্ধিদীপ্ত, মৌলিক চিন্তাশীল ও বহুমুখী কর্মব্যস্ত মানুষ দুর্লভ ছিল। যে-কোনো

ঐতিহাসিক মাপের মানুষের মতো রামমোহনের চিন্তা ও কর্মে, ব্যক্তিগত ও বহির্জীবনে কিছু কিছু অসংগতি, অসম্পূর্ণতা এবং স্ববিরোধ ছিল। তাঁকে আধুনিক ভারতের "জনক" বলার বিরুদ্ধে সুযুক্তি থাকতে পারে। পূর্বেই বলেছি যে ইতিহাসে কোনো দেশ, জাতি, ঘটনা বা আন্দোলনের একজন জনক খোঁজার প্রবণতা বাঞ্ছনীয় নয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'জনক' ও জাতীয়তাবাদের 'জনক' কে এই প্রশ্ন তুলে অনাবশ্যক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এর অবসান হওয়া প্রয়োজন। তার থেকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম, সংহতি ও অগ্রগতির মূলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য বিশেষণটি—"Founding Fathers"। রামমোহনকে তর্কাতীতভাবে আধুনিক ভারতের প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপকদের অন্যতম বলে অভিহিত করা যায়।

গত শতাব্দীর সূচনা থেকে ভারতীয় জীবন ও চিন্তার সকল ক্ষেত্রে যাঁরা যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল, দূরদর্শী, মানবধর্মী উদার ধ্যান ধারণার প্রচার এবং কর্মযজ্ঞে উদ্যোগী ও ব্রতী ছিলেন রাজা রামমোহন রায় তাঁদের পুরোধা ছিলেন। কিন্তু কেউ যদি সংকীর্ণ তথাকথিত বৈপ্লবিক রাজনৈতিক আদর্শের রঙীন চশমা পরে এই স্থির সিদ্ধান্ত করে থাকেন যে যেহেতু সমস্ত সংস্কারকদের দর্শন হল 'শ্রেণী সমন্বয়' (class harmony) সুতরাং তাঁরা প্রগতি বিরোধী, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাঁরা ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের স্বার্থে কাজ করেছেন, তাঁরা তাঁদের "পৃষ্ঠপোষক" (patron) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও স্বার্থের সপক্ষে কথা বলেছেন—তা হলে লজ্জা, ক্ষোভ এবং অবজ্ঞা প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু দুঃখের ও উদ্বেগের কারণ হল এই জাতীয় "ইতিহাস" ও "প্রগতিশীল বিচার-বিশেষণ" যুবমানসে নানা ভাবে, নানা কৌশলে সংক্রামিত করার চেষ্টা চলেছে। সুতরাং যাঁরা ইতিহাস রচনায় সত্যনিষ্ঠায় বিশ্বাস করেন, নিজের রাজনৈতিক মতবাদের অন্ধ নির্দেশ ও নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ অপেক্ষা গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশ্বাস করেন এবং যাঁরা খোলা মন ও দৃষ্টিকে ঐতিহাসিকের ন্যূনতম যোগ্যতা বলে মনে করেন, তাঁরা 'রিভ্যালুয়েশন'-এর ছদ্ম নামে ঐতিহাসিক চরিত্র ও আন্দোলনের 'ডিভ্যালুয়েশন' বা অবমাননার প্রশ্রয় দেবেন না নিশ্চয়। রামমোহন রায় আদৌ প্রগতিপন্থী ছিলেন না বরং প্রগতি-বিরোধী ছিলেন, তিনি "anti-development" বা উন্নয়ন-বিরোধী

ভূমিকা নিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের আসল উদ্দেশ্য ছিল রাঢ়ী কুলীনদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও স্বার্থরক্ষা, বিবেকানন্দের জীবনদর্শন ও বেদান্ত প্রচার ভারতের সামাজিক অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল বা রবীন্দ্রনাথ কাপুরুষ ছিলেন বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছত্রছায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি ইত্যাদি মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বিকৃতি এবং বিচারবুদ্ধি ও মানসিক ভারসাম্যের অভাবের প্রকাশমাত্র।

বাংলার নবজাগরণের চরিত্র, গভীরতা এবং ব্যাপ্তি সম্বন্ধে অবশ্যই বিতর্ক হতে পারে। হওয়া প্রয়োজন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কোনো চিন্তানায়ক মনীষী সমালোচনা বা নতুন তথ্য ও দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়নেব উর্ধ্বে নন। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনিশ শতকের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা অসম্ভব। একই শতাব্দীতে একসঙ্গে এতগুলি উজ্জ্বল সৃজনী প্রতিভার জন্ম, জীবনের নানান্ ক্ষেত্রে পরিবর্তন, প্রাণস্পন্দন এবং অগ্রগতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ইতিপূর্বে হয়েছিল এবং দেখা দিয়েছিল কি না সন্দেহ। ঐ ঐতিহাসিক যুগের প্রথম মহানায়ক ছিলেন রামমোহন রায়।

নবচেতনার দুই অগ্রপথিক : দারা শিকোহ ও রামমোহন রায়

অমলেন্দু দে

ভারতীয় নবজাগরণের উপাদানগুলির উৎস সন্ধানে গবেষকরা সাধারণত ঊনবিংশ শতাব্দীর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, রামমোহন থেকেই তার সূচনাকাল। ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপনের পরে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে নবজাগরণের উপাদানগুলি পরিস্ফুট হলেও তার উন্মেষ ভারতের মধ্যযুগের জীবনধারায় লক্ষ্য করা যায়। সেকালের সাধকদের অবদানের বিষয়ে অনেককাল আগেই ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এমন-কি একসময়ে কিছু আলোচনা দারা শিকোহ সম্বন্ধেও হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মধ্যযুগের ধর্মতত্ত্ব ও সমাজ সংস্কার নিয়ে যে-সব ভাবনা-চিন্তার এবং আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাব প্রেক্ষাপটের কথা স্মরণ রেখে ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের যথার্থ বিশ্লেষণ বিশেষ হয় নি। স্বভাবতই মধ্যযুগের উদারনৈতিক-মানবিক-যুক্তিশীল ধারার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক-মানবিক যুক্তিশীল ধারাব তুলনা-মূলক আলোচনা সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ আছে। এই দুই পর্যায়ের সময়কালের, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের পার্থক্য অনেক। তা হলেও উভয় ব্যবস্থাতেই অর্থাৎ মধ্যযুগে এবং ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পরে, এক দিকে সামন্ততান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা ও তার আনুষঙ্গিক চিন্তধারা, অন্য দিকে ঔপনিবেশিক আধিপত্য, ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির ও রূপান্তরের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই দুই প্রতিবন্ধকতার অবসান না ঘটিয়ে কথনোই বহু ভাষাভাষী, ধর্ম ও বর্ণ অধ্যুষিত ভারতকে এক উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বিদেশী শাসনকে আশ্রয় করে যে ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয় তাঁদের দৃষ্টি প্রথমে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের দিকেই নিবদ্ধ হয়। সামন্ততান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রটি তৈরি হয়। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে এই উদীয়মান উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মধ্যযুগেও মননশীল চিন্তানায়ক ও সমাজ সংস্কারকদের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব দেখা

দেয়। সুতরাং এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রটি বুঝতে হলে মধ্যযুগের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই হবে। শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আলোচনা যথার্থ হবে না। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সৃষ্ট ও তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনকে মধ্যযুগের শাসন থেকে অগ্রসর ব্যবস্থা মনে করেছিলেন, তাই স্বাভাবিক কারণে তখনো তাঁদের ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী মনোভাব দেখা দেয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই শ্রেণীর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়। তখন থেকে ভারতীয় জীবনে দ্বন্দ্বের আর-একটি দিকও লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের যে-সব উপাদান মধ্যযুগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে ধর্মতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত ভাবনা-চিন্তা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতকে দুর্বল করে ফেলে, তারই একটি রূপরেখা উপস্থিত করা। আর এমন দুজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে, যাঁরা ভারতে আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে ও নবচেতনার উন্মেষে অসাধারণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন : একজন সপ্তদশ শতাব্দীতে, আর একজন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে। দারা শিকোহ ও রামমোহন, দুজনের সময়কালের ব্যবধান প্রায় দেড়শত বছর। ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় দুজনেই নতুন ভাবনা-চিন্তা করেন। তাঁদের আদর্শগত সংগ্রামের ফলে সমাজ জীবনে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আদর্শের জন্য দারা শিকোহ শহীদ হন ১৬৫৯ খৃস্টাব্দে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রামমোহনও রক্ষণশীলদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁদের দুজনের রচনার মাধ্যমে আদর্শগত যে-সব উপাদানের প্রকাশ ঘটল তার ফলে ভারতীয় নবজাগরণের সূচনা হল : মধ্যযুগের পটভূমিতে দারা শিকোহর চিন্তাধারা তার ভিত্তি স্থাপন করে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন তাকে পূর্ণ রূপ দান করেন।[১]

দারা শিকোহর জন্ম ভারতে, ১৬১৫ খৃস্টাব্দের ২০ মার্চ। তাঁর দেশবাসীর নিকট তিনি এখনো বিশেষ পরিচিত নন। অথচ তিনি ছিলেন একজন সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন পণ্ডিত, সৈনিক, প্রেমিক এবং চারুকলার দক্ষ বিচারক। তাঁর চরিত্রে ছিল বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মিশ্রণ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতে একজন সংস্কৃতিবান মুসলমান, আরবি, ফারসি, কিছুটা সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে সাহিত্যের যা-কিছু মহৎ ও মূল্যবান জিনিস তা আয়ত্ত করতেন, এইভাবে নৈতিক উৎকর্ষযুক্ত মননের

অধিকারী হতেন। দারা শিকোহও ছিলেন এইরকম একজন সংস্কৃতিবান মুসলমান। তাঁর আয়ত্তের মধ্যে ছিল এমন চার-পাঁচ জাতির সংগৃহীত জ্ঞান আহরণ করে তিনি নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেন।[২]

ইসলাম প্রবর্তনের পরে আরবীয়রা তাঁদের সংস্কৃতিতে এক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটান এবং সিরিঅ্যাক (Syriac) ভাষার মাধ্যমে গ্রীক এবং ইরানি ভাষা থেকে অনুবাদ করে তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা গ্রীসের সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতি হিসেবেই গ্রহণ করেন। কয়েক শতাব্দী পরে তাঁরা এই পণ্ডিতসুলভ মনোযোগকে প্রসারিত করেন ভারতের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করবার জন্য। তাঁরা সংস্কৃত থেকে বহু বিষয় অনুবাদ করেন এবং ভারতীয় মননের সাহায্যে ইসলামীয় সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করেন। এইভাবে আরবি ও ফারসি ভাষায় ইসলামীয় সাহিত্য পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হয়ে ওঠে।[৩]

এই সংস্কৃতির সহজাত উত্তরাধিকারী হলেন মুঘল রাজবংশের যুবরাজ দারা শিকোহ। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত সুফী। তিনি মানবজাতির ঐক্যের জন্য সত্যের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশে তিনি অন্যান্য ধর্ম অধ্যয়ন করেন। এমন একটি কাহিনী প্রচলিত আছে, সম্রাট শাজাহান যুবক দারা শিকোহকে বলেন, আরবি ও ফারসি ভাষার সাহায্যে গ্রীক, রোমান, আরব ও ইরানি জনসমষ্টির জ্ঞান এবং সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞান আহরণের পর তাঁর উচিত হবে এক নতুন দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার হওয়া, কারণ সমস্ত মুসলিম শাসকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হল তাই। কিন্তু তরুণ দারা শিকোহ তাঁর পিতাকে বিনীতভাবে বলেছিলেন, তাঁর আলেকজাণ্ডার হওয়ার আদৌ ইচ্ছা নেই, তাঁর একান্ত বাসনা হল গ্রীক পণ্ডিত ও দার্শনিক সোক্রাত (সক্রেটিস), আফলাতুন (প্লেটো) এবং আরিস্তু (অ্যারিস্টটল) প্রভৃতির সমকক্ষ হওয়া। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে তাঁদের চিন্তার মিল খুঁজে পাওয়ায় দারা শিকোহর মন গ্রীক পণ্ডিত-দার্শনিকদের দিকে ধাবিত হয়। দারা শিকোহর মনকে আলোড়িত করে বিভিন্ন ধর্মমত ও বিশ্বাস, তাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ; ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক আলোচনায় তিনি তখন নিমগ্ন। তাই আর-এক 'নতুন দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার' তিনি হতে চান নি।[৪]

অল্প বয়সেই দারা শিকোহ সুফী মতের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন।[৫]

সুফীদের রচনা গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেন এবং তাঁদের ধর্মমতের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করেন। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সকলেরই জানা আছে ভারতে ইসলাম দুটো রূপে প্রকাশ পায়। একটি হল শরিয়ৎ বা ইসলাম শাস্ত্র অনুমোদিত গোঁড়া ইসলামীয় বিধান, যার সঙ্গে অন্য ধর্মমতের সহাবস্থানের সুযোগ খুবই কম। আর-একটি হল সুফী মতের উদার ও সর্বজনীন ইসলাম, যার সঙ্গে হিন্দু দর্শনের ও হিন্দু উচ্চাঙ্গ চিন্তার সহজ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।[৫] বিভিন্ন ধর্মের দেশ ভারতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম যাতে বিভেদের প্রাচীর গড়তে না পারে, ধর্ম যাতে ভালোবাসার প্রীতির সম্পর্ক গড়তে সহায়ক হয়, এই উদ্দেশ্যে দারা শিকোহ্‌ ধর্মতত্ত্বের চর্চায় মিলনের উপকরণগুলি উদ্ধারে সচেষ্ট হন। সুফীমত চর্চা করতে গিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে সত্য (Truth) কোনো এক বিশেষ জাতির একমাত্র সম্পত্তি নয়, সব ধর্মেই এবং সর্বকালেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। যুক্তির পথ ধরে তিনি পবিত্র কোরান ও পয়গম্বরের 'ট্র্যাডিশনস' থেকে যে সিদ্ধান্ত করেন তা একান্তই তাঁর নিজস্ব। তাঁর বিচারে ও সিদ্ধান্তে স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি প্রচলিত পথ ধরে চলেন নি, অযৌক্তিকভাবে ভক্তি প্রদর্শন করে কোনো গোঁড়ামির আশ্রয় নেন নি।[৬] এইভাবে একটানা কয়েক বছরের সাধনায় দারা শিকোহ্‌র মনন সাধারণ স্তর থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। তাঁর মনের এই ক্রমবিকাশ তাঁর রচিত প্রথম দিকের চারখানি গ্রন্থেই দেখা যায়। দারা শিকোহ্‌ নয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন, ফারসি ভাষায় উপনিষদ ও ভাগবৎ গীতা অনুবাদ করেন, পারস্য দেশীয় কবিদের জীবনী সংকলন করেন, 'অ্যালবাম'-এর ভূমিকা লেখেন এবং সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ বহু পত্রও লেখেন। কবি হিসেবেও দারা শিকোহ্‌র খ্যাতি ছিল। 'ইকসির-ই-আজম' নামে তিনি একটি 'দিওয়ান' রচনা করেন। এই কাব্য-গ্রন্থে 'তৌহিদ' সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে। তা ছাড়া দারা শিকোহ্‌ চারুকলার অনুরাগী ছিলেন ; তিনি নিজেই ছিলেন সুপরিচিত ক্যালিগ্রাফার। তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষর অনেক গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। চিত্রশিল্পের তিনি শুধু একজন অনুরাগীই ছিলেন না, তার টেকনিক ও মূল্য সম্বন্ধে একজন দক্ষ বিচারকও ছিলেন। যে 'অ্যালবাম' বা 'আলেখ্য-কুঞ্চিকা' তিনি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী নাদিরা বেগমকে উপহার দেন তাতে দারা শিকোহ্‌ নিজের হাতে লেখেন, এই 'অ্যালবাম' মুঘল শিল্পকলার মূল্যবান সম্পদ। পার্সি ব্রাউন তাঁর বিখ্যাত *Indian Painting under*

The Mughals গ্রন্থে দারা শিকোহর 'অ্যালবাম'-এর শিল্পসৌন্দর্য সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। আরো অনেক শিল্প-সমালোচক 'অ্যালবাম'-এর বিষয় আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য এই, দারা শিকোহর উৎসাহে ও নির্দেশে কয়েকখান গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। চিন্তার ব্যাপ্তি ও শিল্প-সৌন্দর্যবোধ দারা শিকোহ-চরিত্রকে এক অনন্যসাধারণ রূপ দান করে, তিনি মধ্যযুগে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপেই বিরাজ করেন।[৭]

দারা শিকোহ-রচিত প্রথম গ্রন্থের নাম 'সাফিনাত উল-আউলিয়া' (১০৪৯ এ. এইচ. ; ১৬৭০ খৃস্টাব্দ)। তিনি এই গ্রন্থে ইসলাম ধর্মের সাধকদের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সুফীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন· কাদিরি, নকসবন্দী, চিস্তী, কুবরায়ী ও সোহবাওযার্দী সাধকদের এবং অন্যান্য সাধকদের কথাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া তিনি হজরত মহম্মদ, তাঁর স্ত্রীদের ও কন্যাদের, খলিফাদের এবং ইমামদের বিষয়েও আলোচনা করেছেন। এমন-কি তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী মুসলমান মহিলা সাধকদের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থ থেকেই জানা যায়, দারা শিকোহ ছিলেন ইমাম আবু হানিফার শিষ্য। তাই নিজেকে তিনি হানাফি কাদিরি বলতেন।[৮] তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'সাকিনাত-উল-আউলিয়া' (১০৫২ এ. এইচ ; ১৬৪২-১৬৪৩ খৃস্টাব্দ)। এই গ্রন্থে মিয়ান মির নামক সাধকের জীবনী আলোচিত হয়েছে। মিয়ান মির ছিলেন দারা শিকোহর পীর ও মুরশিদ মুল্লা শাহ-র আধ্যাত্মিক গুরু। মিয়ান মির-এর সাহচর্যে দারা শিকোহর চলার পথ স্বচ্ছ হয়। দারা শিকোহ ও তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু মুল্লা শাহ-এর সম্পর্ক ছিল খুবই অন্তরঙ্গ।[৯] দারা শিকোহ রচিত 'রিসালা-ই-হক নামা' (১০৫৫ এ. এইচ ; ১৬৪৫ খৃস্টাব্দ) ত্রিশ পাতার সুফী পুস্তক, তাতে সত্যের পরিধি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পুস্তকে তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন স্তর এবং কোন্ পথে ও পদ্ধতি অনুসরণ করে পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা অর্জন করা যায় তা আলোচনা করেছেন। এই সময়ে তাঁর নিকট 'তৌহিদ' বা একেশ্বরবাদ এবং 'ইরফান' বা পবিত্র জ্ঞান স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তিনি এই কথাও বলেছেন, তাঁর সমস্ত রচনায় তিনি পবিত্র কোরান থেকে 'পূর্বাভাস' সংগ্রহ করেছেন এবং তাদের স্বর্গীয় উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১০] প্রথম গ্রন্থে দারা শিকোহ পূর্ণ নৈতিক বিশুদ্ধতা অর্জনের জন্য অনুসন্ধান শুরু করেন, দ্বিতীয় গ্রন্থ রচিত হল তাঁর সঙ্গে এক দেবোপম ব্যক্তির সাহচর্যের পর

এবং তাঁর নিকট হতে তিনি সুফী সাধনপথের নানা স্তর আয়ত্ত করেন। আর তৃতীয় গ্রন্থ থেকে জানা যায়, 'তৌহিদ'-এর এবং 'ইরফান'-এর দুয়ারগুলি ঈশ্বর তাঁর নিকট উন্মুক্ত করে দেন।[১১]

দারা শিকোহ্‌-রচিত 'সাথীয়াত, বা হাসানাত উল-আরিফিন' (১০৬২ এ. এইচ ; ১৬৫২ খৃস্টাব্দ) নামক চতুর্থ গ্রন্থে সুফী সাধকেরা ভাবাবেশে যে-সব মন্তব্য করেছেন সেই-সব বাণী সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থখানি ইসলামের গোঁড়া তত্ত্ব লঙ্ঘন করেছে। এই-সব সাধকেরা ভাবাবেশে যে-সব সত্য কথা বলেন, তা তাঁর নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। দারা শিকোহ্ নিজেই লিখেছেন, তিনি প্রচলিত ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ পড়ে খুশি হতে পারছেন না। অবশ্য তিনি দেখতে পেলেন, কিছু বদমেজাজি ও কপট ব্যক্তি, যাঁদের জ্ঞান অগভীর, তাঁরা তাঁকে প্রচলিত ইসলাম ধর্মমতের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তি হিসেবে বিদ্রূপ ও নিন্দা করছে। তাদের সমালোচনার যোগ্য উত্তর দেবার অভিপ্রায়ে তিনি বিখ্যাত সাধকদের বাণীসমূহ সংকলিত করেন। এই গ্রন্থ থেকে বোঝা যায়, দারা শিকোহ্ তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের অতি উচ্চস্তরে পৌঁচেছেন। তিনি ধর্মতত্ত্বের যে বিষয় নিয়ে তখন সাধনা করেন তা আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা যাঁরা অর্জন করেন তাঁদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। তিনি 'একেশ্বরবাদ' এবং 'পবিত্র জ্ঞান' সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেন তা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।[১১]

ইতিমধ্যে সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করে দারা শিকোহ্ হিন্দু ধর্মতত্ত্বের ও দর্শনের জগতে প্রবেশ করেন। তিনি দেখতে পেলেন 'একেশ্বরবাদের' তত্ত্ব 'বেদ'-এ রয়েছে, আর একেশ্বরবাদের মহাসমুদ্র হল 'উপনিয়ত' বা 'উপনিষদ'। হিন্দু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তিনি বাবা লাল বৈরাগী নামক হিন্দু সাধককে স্থান দিতেন মুসলমান সুফী সাধকদের পাশে। তাঁর প্রতি দারা শিকোহ্ কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা উপলব্ধি করা যায়। তাঁর সঙ্গে এই হিন্দু সাধকের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনা হয়েছিল। বাবা লাল ছিলেন পাঞ্জাবের এক হিন্দু সাধক। দারা শিকোহ্ তাঁকে হিন্দুধর্ম এবং কঠোর তপস্বীর জীবন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। বাবা লাল তার উত্তর দেন। এই আলাপ-আলোচনার সময়ে দারা শিকোহ্‌র ব্যক্তিগত সেক্রেটারি চন্দর ভান উপস্থিত ছিলেন এবং দারা শিকোহ্‌র নির্দেশে তিনি দুজনের কথোপকথন সবটাই একখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন (দ্র 'মুকালিমা-ই-দারা শিকোহ্ উয়া বাবা লাল')।[১১]

১০৫০ এ. এইচ (১৬৪০-১৬৪১ খৃস্টাব্দ) মুসলিম সন থেকে দারা শিকোহ বিভিন্ন ধর্মের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাইবেলের অন্তর্গত প্রার্থনা সংগীতের গ্রন্থ বিশেষ, খৃস্টের উপদেশাবলী ও বাইবেলের অন্তর্গত 'পুরাতন নিয়ম' নামক গ্রন্থের প্রথম পাঁচখানি পুস্তক পরীক্ষা করতে থাকেন। বাইবেলের 'নতুন নিয়ম' যত্নসহকারে তিনি পাঠ করেন। কিন্তু ১০৬২ এ. এইচ. মুসলিম সনের আগে তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে অথবা বিশেষ করে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেন নি। 'সাখীয়াত বা হাসানাত উল-আরিফিন' নামক গ্রন্থে তিনি হিন্দু সাধক বাবা লাল-এর বাণী উদ্ধৃত করেন, তাতে স্পষ্ট করে বলা হল "সত্য কোন একটি ধর্মের একচেটিয়া অধিকারে নেই।"[১৪] তার কয়েক বছর পরই প্রকাশিত হল দারা শিকোহর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাজমা-উল-বাহরাইন' বা 'দুই সমুদ্রের মহামিলন' (১০৬৫ এ. এইচ ; ১৬৫৪-৫৫ খৃস্টাব্দ)। তখন তাঁর বয়স ৪২ বছর। এই গ্রন্থে দারা শিকোহ খুব পরিষ্কার করেই তাঁর মত ব্যক্ত করেন এবং বলেন, সত্য উপলব্ধির উচ্চস্তরে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয় সাধন করার উদ্দেশেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এই দুই ধর্মের মিলনের সূত্রগুলি উন্মোচন করেন। তুলনামূলক ধর্মের পণ্ডিত হিসেবে পার্থক্যের দিকগুলি বাদ দিয়ে মিলনের সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গ্রন্থের শুরুতে দারা শিকোহ ঈশ্বরের, হজরত মহম্মদের, তাঁর সহচরদের এবং বংশধরদের প্রশংসা করেন। তিনি ইসলামের সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং হজরত মহম্মদকে 'শেষ পয়গম্বর' বলে উল্লেখ করেন। 'মাজমা-উল-বাহরাইন' গ্রন্থ রচনার সময় থেকেই দারা শিকোহ গভীরভাবে হিন্দুধর্ম অধ্যয়ন করেন।[১৫] তার পর ১০৬৬ এ. এইচ. মুসলিম সনে তিনি 'যোগবাশিষ্ঠ' ফারসি ভাষায় অনুবাদ করান। তার এক বছর পরে দারা শিকোহ নিজেই উপনিষদের পঞ্চাশটি অধ্যায় সংস্কৃত থেকে ফারসি গদ্যে 'সির্‌র-ই-আকবর' (১০৬৭ এ. এইচ.) এই শিরোনামায় অনুবাদ করেন। খুবই সহজ ও সরল ভাষায় গ্রন্থখানি রচিত। হিন্দুধর্ম পরীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন, হিন্দুরা একেশ্বরবাদ অগ্রাহ্য করেন না। উপনিষদ অনুবাদে দারা শিকোহ হিন্দু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের সাহায্য গ্রহণ করেন। দারা শিকোহ 'ভগবদ্গীতা' গ্রন্থখানিও সংস্কৃত থেকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি 'বেদ'-কে প্রত্যাদেশমূলক গ্রন্থ বা revealed book বলেন।

তিনি আরো বলেন, 'বেদ'-এ কোরান গ্রন্থের সন্দেহাতীত নিগূঢ় সমস্যাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। এইভাবে দারা শিকোহর রচনার ফলে বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও দুই ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যের ভাবটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৬]

কিন্তু গোঁড়া মুসলমান নেতৃবৃন্দ, তাঁদের মুখপাত্র ঔরঙ্গজেব, ধর্মের এই উদার যুক্তিধর্মী ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন। তাঁরা দারা শিকোহকে স্বধর্মত্যাগী বলেন। 'মুজাদ্দিদিয়া রিভাইভ্যালিস্ট আন্দোলন' সাংস্কৃতিক জীবনের সমন্বয়ের ও উদারনৈতিক ভাবধারার ওপর আঘাত হানে। গোঁড়া-পন্থীদের প্রচারে ও ঔরঙ্গজেবের সমর্থনে শরিয়তী ইসলামের ধারাটির শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই দারা শিকোহর বিরুদ্ধে প্রচার তীব্রতর হয়। কিন্তু দারা শিকোহর মতামত থেকে কখনোই বলা যায় না, দারা শিকোহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য এই, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত ভারতীয় মুসলিম সাধক মীরজা জানজানান বলেন, 'ভারতীয়দের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় মানুষের সৃষ্টির সূচনায় ঈশ্বর 'বেদ' নামক চারখণ্ডের গ্রন্থ প্রেরণ করেন।' তাঁর মত দারা শিকোহর অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কেউ নিন্দা করেন নি।[১৭] পবিত্র কোরান গ্রন্থে বলা হয়েছে : "এমন কোন জাতি নেই, যাদের মাঝে কোন সতর্ককারীর আগমন হয় নি (৩৫ : ২৫)।" "প্রত্যেক জাতির জন্য একজন রসুল (দূত) প্রেরিত হয়েছে (১০ : ৪৭)।"[১৮] এই মত যদি ইসলাম-বিরোধী না হয়, তা হলে একই রকম মত প্রচার করার জন্য কী করে দারা শিকোহকে স্বধর্মত্যাগী বলে নিন্দা করা যায়, তা বোঝা কষ্টকর। তাঁর সমস্ত রচনা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, দারা শিকোহ একজন মুসলমানই ছিলেন এবং একজন সুফী হিসেবে নিজের মত ব্যক্ত করেন, তাকে স্বধর্ম ত্যাগ বলে না। প্রখ্যাত সুফীদের রচনায় এমন সব বাণী ও প্রচলিত মতবিরোধী মন্তব্য পাওয়া যাবে যা দারা শিকোহর তুলনায় 'অনেক বেশি নিন্দামূলক'। যদিও মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, দারা শিকোহ ইসলামের অবমাননার জন্য নয়, তাঁর 'ধূর্ত ফকির' ভাইয়ের সাম্রাজ্যিক আকাঙ্ক্ষার বেদীমূলে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়েন, তা হলেও মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশের নিকট দারা শিকোহ আজও স্বধর্মত্যাগীরূপে নিন্দিত।[১৯]

ভারতের ইতিহাসের আর এক সন্ধিক্ষণে দারা শিকোহর কণ্ঠস্বর আরো বলিষ্ঠভাবে এবং যুক্তিসংগতরূপে ধ্বনিত হল রামমোহন রায়ের কণ্ঠে, যিনি ছিলেন ব্রিটিশ বিজয়ের পর নবজাগ্রত ভারতের প্রথম মানুষ। নিঃসন্দেহে

দারা শিকোহর পাণ্ডিত্য, গোঁড়ামিমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, সকল ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক ঐক্য ও সহজাত সমন্বয় সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিভিন্ন পথে মানুষের জ্ঞান লাভের প্রয়াসের বিষয়ে সঠিক ধারণা, তাঁর সময়কাল থেকে তাঁর অগ্রসরতা প্রমাণ করে। এক অর্থে দারা শিকোহ ছিলেন আধুনিক এবং তাঁর ভাবনা-চিন্তার মধ্যে সর্বজনীনতা লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের সূচনা থেকে তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে ইসলামের যে পরিচিতি ঘটে তার সম্বন্ধে দারা শিকোহ সচেতন ছিলেন, একজন সংস্কৃতিবান মুসলমান হিসেবে তার উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতাও অর্জন করেন। তাঁর অনূদিত ফারসি ভাষার 'উপনিষদ' বিদেশে চলে যায়, ১৮০০ খৃস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় তা অনূদিত হয়। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থখানি জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার-এর চিন্তাকে প্রভাবিত করে। উপনিষদের মর্মবাণী দারা শিকোহর মাধ্যমে সুদূর ইউরোপে প্রচারিত হল।[২০] আধুনিকতার ও ভাবনা-চিন্তার সর্বজনীনতার যে ভিত্তটি স্থাপন করেন দারা শিকোহ, রামমোহন তাকেই আরো সুস্পষ্ট করে তোলেন।

রামমোহন রায় দারা শিকোহর রচনাসমূহের সঙ্গে কতটা পরিচিত ছিলেন তা আমাদের জানা নেই। তবে ফারসি ও আরবি ভাষায় অধিকার থাকায় তিনি গভীরভাবে ইসলাম ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেছেন। সেই সূত্রে তাঁর ভারতের মধ্যযুগের সাধনার, ধর্মশাস্ত্রের ও দর্শন চর্চার সঙ্গেও পরিচিতি ঘটে। খুব সম্ভব সূফী মতের ইসলাম চর্চা করার সময়ে তিনি দারা শিকোহর মতের সঙ্গেও পরিচিত হন। সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা ছিল বলেই রামমোহনের পক্ষে প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করাও সহজ হয়। আরো পরে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে তাঁর খৃস্টধর্মের সঙ্গে পরিচয়। দারা শিকোহর মতো রামমোহনও নানা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উভয়েই উপনিষদের একেশ্বরবাদের সঙ্গে পরিচিত, ইসলাম দর্শনের মাধ্যমে গ্রীক চিন্তার সঙ্গেও তাঁদের পরিচয়। ফারসি ভাষায় রামমোহন রায় -রচিত 'তুহ্‌ফত্‌-উল্‌ মুওয়াহিদ্দিন : একেশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে উপহার' পুস্তক ১৮০৪ খৃস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। মূল ফারসি থেকে এর ইংরেজি ভাষান্তর (১৮৮৪ খৃ.) করেছিলেন মৌলবী ওবেদুল্লা। এই ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ (১৯৪৯ খৃ.) করেন জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ দাস। এশিয়াটিক সোসাইটি -প্রকাশিত 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকায় ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে উইলিয়ম জোনস এবং তাঁর পরে কোলব্রুক-লিখিত

যে-সব রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তখনো তার সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হয় নি, অনেক পরে রামমোহন তাঁদের ইংরেজি রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। 'তুহ্ফত্-উল্-মুওয়াহিদ্দিন্' পুস্তক রচনার সময়ে ডিগবির সঙ্গেও রামমোহনের দেখা হয় নি। এই পুস্তক থেকেই জানা যায়, এর আগে আরবি ভাষায় তাঁর 'মানাজারাতুল্ আদিয়ান' বা 'নানা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা' নামে আর-একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই পুস্তক এখনো উদ্ধার করা যায় নি।[২১]

রামমোহন 'তুহ্ফত্-উল্-মুওয়াহিদ্দিন' পুস্তকে কোরান, হাফিজ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। উদারনৈতিকতা-মানবিকতা-যুক্তিবাদ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এই পুস্তকে রামমোহন লিখেছেন, বিভিন্ন দেশ ঘুরে তাঁর মনে হয়েছে সব দেশের লোকেরা একটি বিষয়ে একমত যে, "এই জগতে সব কিছুরই আদি কারণ ও তাঁর বিধাতারূপে এক পরমসত্তা বিদ্যমান আছেন।" কিন্তু "সেই সত্তার বিশেষ বিশেষ স্বরূপ লক্ষণ এবং ধর্মের বিভিন্ন মত ও বিধি-নিষেধের বিচিত্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে" সকলে একমত নন। তবে রামমোহন জানতে পেরেছেন, "সাধারণভাবে মানুষের পক্ষে এক অনন্ত সত্তার দিকে তাকানো অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সর্বমানবের যেন এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য।" উপরন্তু "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ গুণবিশিষ্ট এক বা বহু দেবতার দিকে আকর্ষণ এবং কোন বিশেষ উপাসনা বা পূজা প্রণালীর বশবর্তী হওয়া" দেখা যায়। এই সবই বাইরের লক্ষণ, যা 'অভ্যাস ও দলগত শিক্ষা থেকে উদ্ভূত' হয়। এইসবই বাইরের জিনিস, 'অবাস্তব গুণমাত্র'। 'স্বভাব ও অভ্যাসের' মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখে রামমোহন খুবই বিস্মিত হন। তিনি অভ্যাসকে 'অবাস্তব গুণ' বলে উল্লেখ করেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেন।[২২]

যাঁরা মনে করেন তাঁদের পূর্বপুরুষরা 'যা বলে গেছেন তা নির্ভুল'; রামমোহন তাঁদের বিরোধিতা করেন। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের ধর্মকেই অভ্রান্ত মনে করেন, অন্য ধর্মমতের সঙ্গে নিজেদের মতের মিল নেই বলে ভিন্ন ধর্মকে অগ্রাহ্য করেন। এই মনোভাব তাঁর নিকট যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তিনি স্পষ্ট করেই বলেন, তাঁদের 'পূর্বপুরুষরাও তো অন্যান্য মানুষের মতই অন্যায় বা ভুল করতে পারেন।' রামমোহন এই সিদ্ধান্ত করেন, "কোন বিশেষ পার্থক্য না করে বলা যায় যে সকল ধর্মেই সাধারণভাবে কিছু কিছু ভ্রান্তি রয়েছে।"[২৩] রামমোহন যেভাবে বিষয়টি উত্থাপন করেন তা হল,

যুক্তিবাদের অভাবেই মানুষ "সাধারণতঃ অন্ধ গোঁড়ামি ও তার আনুষঙ্গিক হিংসাদ্বেষ ও অন্যান্য নীচতাব প্রশ্রয় দিয়ে থাকে।" যারা ধর্মের নামে নরহত্যা বা নির্যাতন করাকে পুণ্য কাজ বলে মনে করে, তাদের তীব্র সমালোচনা করেন রামমোহন। তিনি মিথ্যাচার, চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার প্রভৃতি নিকৃষ্টতম দুষ্কার্য আত্মার পক্ষে অমঙ্গলজনক এবং মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর মনে করেন।[২৪] বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে যাঁরা সত্যাসত্য নির্ধারণ করে চলতে চান তাঁরা কিভাবে নির্যাতিত হন তার প্রসঙ্গ তুলে রামমোহন লেখেন: "তবে তাদের মধ্যে যদি একটী চিন্তাশীল ব্যক্তিও হঠাৎ ঐ মত ও বিশ্বাসের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করবার একটু আগ্রহ দেখায়, তাহলে সেই ধর্মাবলম্বীবা সাধারণতঃ এরূপ প্রচেষ্টাকে শয়তানের প্রবোচনা বলেই ধরে নেয়। এতে তাঁর সাংসারিক বা ধর্মজীবনের বিনাশ অনিবার্য বলে তারা মনে করে। তাই সে অচিরে সেই সন্ধানের পথ থেকে ফিবে আসে।"[২৫] এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, যুক্তিবাদী পথে চলতে গিয়ে মানুষ কেন ধর্মীয় গোঁড়ামিব চাপে আর এগুতে পারে না। মধ্যযুগে দাবা শিকোহ মত ও বিশ্বাসের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে রামমোহনও এই পথেই চলেন নির্ভীকভাবে। দারা শিকোহর মতো তিনিও 'সত্য নির্ণযের আনন্দ' লাভে আগ্রহী ছিলেন, অজ্ঞানতার আবরণ উন্মোচিত করে সত্য উদ্‌ঘাটন করেন। রামমোহন আবো অগ্রসর হয়ে অলৌকিকতাব (miracles) আড়ালে যে অসত্য ও অন্যায় থাকে তা উদ্‌ঘাটিত করেন।[২৬] প্রশ্ন হল: কোন্ অবস্থায় মানুষ 'ধর্মমতের সত্যিকার প্রকৃতি নির্ণয়' করতে অক্ষম হয়? রামমোহন বলেন, অপরিণত বয়সে মানুষ যখন ক্রমাগত পূর্বপুরুষদের আজগুবি ও আশ্চর্যজনক ঘটনা অনবরত শোনে, তা তাদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সম্প্রদায়ের মতে বিশ্বাস করলে কত সুফল পাওয়া যায়, তার কথা আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হতে শুনতে পাওয়ার ফলে সেই-সব মতের সত্যতা সম্বন্ধে তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়, অনেক ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও নিজ গোষ্ঠীর মতকেই অধিক মূল্য দেয়। তাব ফলে এই মতেই আসক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এই মতের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান না করে নির্বিচারে বহু বছর বিশ্বাস করার পর, এই-সব ধর্মমতের 'সত্যিকার প্রকৃতি নির্ণয়' করতে মানুষ পারে না।[২৭]

তা ছাড়া রয়েছে সাধারণ মানুষের ওপর 'মুজ্‌তাহিদ্' বা ধর্মগুরুদের প্রভাব। নানা যুক্তি জাল বিস্তার করে তাঁরা নিজের ধর্মবিশ্বাসকেই শ্রেষ্ঠ বলেন, অন্যের

ধর্মের নিন্দা করেন। তাঁরাই সাধারণ লোককে ধর্মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেন, ন্যায় ও সততাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ ধর্মমতের সপক্ষে যুক্তিশূন্য ও অর্থহীন কথা বলেন। এইভাবেই "অন্তর্দৃষ্টি বা ভালোমন্দ বিচারশক্তিহীন সাধারণ লোকদের অন্ধ বিশ্বাসকে আরো কঠিন বা দৃঢ় করে তুলতে চেষ্টা করে।" ধর্মগুরুদের ভূমিকার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন কোরান থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করেন: "আমাদের নিকৃষ্টসত্তার এই সব প্রলোভন ও দুষ্কর্মজনিত অপরাধ হতে রক্ষা পাবার জন্য ঈশ্বরের শরণ মাগি।"[১৮]

রামমোহন বলেন, ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যে-সব নিরর্থক বিধিনিষেধ জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাতে সমাজের উন্নতি না করে অনিষ্টের কারণ হয়েছে, সাধারণ লোকদের উদ্‌ভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করছে। যে-কোনো সুস্থ মনের মানুষ যদি বিভিন্ন জাতির ধর্মমতের উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করেন, তা হলে আশা করা যায় তিনি অসত্য থেকে সত্যকে ও ভ্রান্তমত থেকে সত্যমত বেছে নিতে পারবেন। তার ফলে বিভিন্ন ধর্মের যে-সব অসার বিধিনিষেধ আছে, যা কুসংস্কারের এবং শারীরিক ও মানসিক অশান্তির কারণ হয়, তা থেকে মুক্ত হয়ে "পরমেশ্বর যে বিশ্বের সকল সুসঙ্গত ব্যবস্থার উৎস, তারই দিকে মানুষ মুখ ফিরাবে ও সমাজের কল্যাণে মনোনিবেশ করবে।" নিজের মতের সপক্ষে রামমোহন কোরানের এই অংশ উদ্ধৃত করেন: "যাকে ঈশ্বর সুপথে নিয়ে যান, তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না, যাকে তিনি বিপথে নেন, তার পথপ্রদর্শক আর কেউ নেই।"[১৯]

যাঁরা দাবি করেন, সৃষ্টিকর্তা একমাত্র তাঁদের ধর্মের মতগুলি পালন করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরা যাঁরা তাঁদের মত মানেন না তাঁরা 'ভবিষ্যৎ জীবনে শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করবে', এই চিন্তার সঙ্গে রামমোহন একমত নন। এই মনোভাবের জন্য পবিত্রতা ও সরলতার পরিবর্তে কেবলমাত্র পক্ষপাত ও অপ্রেমের বীজই তাঁদের অন্তরে বপন করা হয়। দারা শিকোহ ও রামমোহন উভয়েই ধর্মশাস্ত্র আলোচনায় এই 'অপ্রেমের বীজ' বিনাশ করতে প্রয়াসী হন। রামমোহন নিজের মত ব্যাখ্যা করে বলেন, সকল মানুষই "কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুবর্তী না হয়েও ইহলোকে যেমন জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আলোক, বসন্তের আনন্দ, বর্ষার বৃষ্টিধারা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, দেহ ও মনের সৌন্দর্য প্রভৃতি এই পৃথিবীতে প্রাপ্য সব স্বর্গীয় আশীর্বাদই সমভাবে

সম্ভোগ করছে, তেমনি মানুষ সর্ব-ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে একই রকম অসুবিধা, যন্ত্রণা, অন্ধকার ও শীতের প্রকোপ, মানসিক ব্যাধি, আর্থিক অবস্থার দৈন্য, দেহ ও মনের বিকৃতি ইত্যাদি অবস্থাও সমান ভাবেই সহ্য করে এই পৃথিবীতে বাস করছে।"[৩০] রামমোহন এই কথাও বলেন, "প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই অন্য কারো শিক্ষা বা নির্দেশ না নিয়েও প্রকৃতির রহস্য বুঝতে পারা সম্ভব। কেবলমাত্র গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তিদ্বারা মানুষ প্রকৃতির নানা রহস্য" আবিষ্কার করতে পারে। তা জানবার একটি স্বাভাবিক মনোবৃত্তি মানুষের আছে, একই সঙ্গে মানুষ এও অনুমান করতে পারে তার ওপর "এক পরম সত্তা আছেন, যিনি তাঁর দিব্যজ্ঞানে এই বিশ্বকে পরিচালন করেন।"[৩১]

তবুও মানুষ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বড়ো হওয়ায় "তারই অনুকরণে নিজ নিজ সম্প্রদায়েব বিধানগুলিকেই চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস করে।" তারা "কার্য ও কারণের ক্রমপরম্পরার অনুসন্ধানে অভ্যস্ত না থাকতে" নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপে "সারাজীবনের পাপক্ষালনের ও মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস করে।" ধর্মগুরুরা বা ধর্মমতের প্রবর্তকরা "অলৌকিকত্বের (miracle) এমন সব ব্যাখ্যা করেছেন যে তারাই যেন ভক্তহৃদয়ে ছাড়পত্রের (passport) মালিক। তার ফলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ধর্মগুরুদের প্রতি বেড়েই চলেছে।" সাধারণ লোক এমন কোনো কিছু দেখতে পায়, যার রহস্য তাদের বুদ্ধির অগম্য অথবা যার কোনো কারণ তারা দেখতে পায় না, তখন তারা তাকে "এক অলৌকিক বা অতি প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া বলে বর্ণনা করে।" প্রকৃতপক্ষে তার রহস্য "আসলে এই যে জগতের যাবতীয় বস্তুর বর্তমানতাই কোনো-না কোনো আপাত-কারণের এবং বিভিন্ন অবস্থার (condition) ও ন্যায় বিধির (modes of justice) উপর নির্ভর করে।" রামমোহন এই কথাও বলেন, "যখন অভিজ্ঞতার অভাবে এবং মতের সংকীর্ণতার জন্য কোন কিছুর কারণ কারো নিকট অপ্রকাশিত থাকে, তখন তার সুযোগ নিয়ে অন্য যে-কোন মতলবী মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব ঘটনাকে নিজের অলৌকিক শক্তি বলে বর্ণনা করে. তার দলেই লোককে আকর্ষণ করে।"[৩২]

রামমোহন লক্ষ্য করেন, তাঁর সময়কালের অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক বস্তুতে বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ সুযুক্তির উপর নির্ভর করছে না। তা করলে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার কারণ জানা যায়। রামমোহন দ্বিধাহীন চিত্তে বলেন, "আমাদের সুযুক্তির উপর নির্ভর করা উচিত।" শত শত বছর আগে

কে মরা মানুষ বাঁচিয়ে তুলেছে অথবা কেউ স্বর্গে আরোহণ করেছে, এই-সব "অসম্ভব ও অযৌক্তিক ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধান করবার" কোনো প্রয়োজন নেই বলেই তাঁর মনে হয়েছে।[৩৩]

রামমোহন 'যুক্তিবাদের সার্থকতা' আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কার্য-কারণ সম্বন্ধ মানুষের জানা উচিত। ধর্মনেতারা তাঁদের শিষ্যদের নিকট ব্যাখ্যা করে বলেন, "ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপারে যুক্তি-তর্কের কোন স্থান নেই, এবং ধর্মের ব্যাপারে শুধু বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র নির্ভর।" এই-সব ধর্মনেতাদের উদ্দেশে রামমোহন বলেন, "যে বিষয়ের কোন প্রমাণ নাই, যা যুক্তি বিরুদ্ধ, তা একজন যুক্তিবাদী কি করে গ্রহণ বা স্বীকার করতে পারেন?" তিনি কোরানের বাণী উদ্ধৃত করে অন্ধবিশ্বাসীদের সতর্ক করেন: "যাঁদের চোখ আছে, তারা এ থেকেই সাবধান হও।"[৩৪]

যাঁরা সত্য না জেনে 'সম্ভব ও অসম্ভব তর্ক' জুড়ে দেন, যার ফলে তর্কের ও ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়, তাঁদের সমালোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন হাফিজ থেকে উদ্ধৃতি দেন : "৭২টী সম্প্রদায়ের বিবাদ সহ্য করতে হবে, কারণ তারা সত্য না জেনে আজগুবী অর্থহীন গালগল্পের পথ মাড়িয়ে চলেছে।" জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবশ্য জানেন "সৃষ্টিকর্তা অসম্ভব কিছু সম্ভব করেন না।"[৩৫] যাঁরা এইভাবে তর্ক করেন যে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ধর্মগুরু বা ভবিষ্যৎ বক্তার সাহায্যে এই জগতে মানুষের চলার পথ খুলে দিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্য রামমোহনের নিকট অর্থহীন মনে হয়েছে। যে-সব ধর্মগুরুদের সঙ্গে সঙ্গে পয়গম্বরী উদ্দেশ্য শেষ হয়ে গেছে বলা হয়, তাঁদের শত শত বছর পরেও ভারতে অন্যান্য দেশে নানক এবং অন্যান্য সাধুরা নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন এবং বহুলোক তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রামমোহন হজরত মহম্মদের পরেও আরো পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছে মনে করেন। পবিত্র কোরানে ঈশ্বরের নির্দেশ বলে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যে-সব কথা বলা হয়েছে, তার সমালোচনা করতে রামমোহন দ্বিধাবোধ করেন নি। পৌত্তলিকদের বধ করা ও তাদের নানাভাবে নির্যাতন করা ঈশ্বরের নির্দেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রামমোহন বলেন, যিনি স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, দয়ালু, বদান্য এবং অনাসক্ত সেই ভগবানের পক্ষে বিরুদ্ধ মতের উপদেশ ও আদেশ দেওয়া কি করে সম্ভব। এ সবই ধর্মানুবর্তীদের মনগড়া জিনিস। রামমোহনের ধারণা, সুস্থ মনের লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারেন[৩৬] তাই যে-সমস্ত

অনুশাসন অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ করে তোলে তাকে রামমোহন যুক্তিসংগত বলে মেনে নিতে পারেন নি। রামমোহনের মতে, "সর্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্মের মূলসূত্র। জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পূজা।" যাঁরা এইভাবে হৃদয় জয়ের চেষ্টা না করে, তথাকথিত মনগড়া প্রত্যাদেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে শুধু সম্প্রদায়গত জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, তা ছাড়া কোনো বিশেষ তন্ত্র মন্ত্র বা যোগাদি অঙ্গচালনাকেই মোক্ষের কারণ এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট হতে পুরস্কার লাভের উপায় মনে করেন, একটু চিন্তা করলেই তাঁদের মতের অসারতা ধরা পড়বে। যাঁরা ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করেন, তাঁদের রামমোহন 'প্রতারক' বলেছেন। তাঁর মতের সমর্থনে তিনি হাফেজ থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করেন। "কারো অনিষ্টের চেষ্টা করো না আর যা খুশী তাই কর। কারণ অন্যের অনিষ্ট করা ভিন্ন আমাদের কাছে আর কোন পাপ নাই।" সুস্থ মনের লোকেরা এই দিকে 'সত্য ও শুভ দৃষ্টি দেবেন', এই আশা রামমোহন ব্যক্ত করেন।[৩৭]

রামমোহনের ধর্মচিন্তা, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মত, আলোচনা করলে সুস্পষ্ট হয় তিনি উদার-মানবিক-যুক্তিধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন। দারা শিকোহর মতো তাঁরও ধর্মমত নানা ধর্মের দেশ ভারতে এক নতুন চেতনার বিকাশে সহায়ক ছিল. ধর্মকে আশ্রয় করে যে ভেদবুদ্ধি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত গণ্ডিতে জীবনকে আবদ্ধ করে তার বেড়াজাল থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করে ধর্মের এক উদার ভূমিতে স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়। তৎকালীন পটভূমিতে তাঁদের চিন্তা খুবই অগ্রসর ছিল। ভারতীয় মনন যদি তাঁদের চিন্তায় উজ্জীবিত হত তা হলে আমাদের এই বিশাল দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠত তার ফলে প্রকৃত অর্থে এক আধুনিক গণতান্ত্রিক ভারতের আবির্ভাব হত, দেশভাগের রক্তক্ষরণ আমাদের অন্তরকে পীড়িত করত না। দারা শিকোহ ও রামমোহন এই সুন্দর ভারতের স্বপ্নই দেখেছিলেন। এমন-কি ভারতের বর্তমান পরিবেশেও তাঁদের চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে অনুভূত হবে।

সূত্র নির্দেশ

১। অমলেন্দু দে, 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ', কলিকাতা, পৃ. ১-৮; অমলেন্দু দে, 'সমাজ ও সংস্কৃতি', কলিকাতা, পৃ. ২৫-৩০। 'সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে "যুক্তিবাদী মানবতাবাদী ভাবধারা ও বাংলার নবজাগরণ" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। ঔপনিবেশিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতে নবজাগরণের যে-সব উপাদান উন্মোচিত হয় তার বিশ্লেষণ রয়েছে। রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও আলোচনা সভায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম। 'ইতিহাস' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। মুসলিম মানস ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত।

২। Amalendu De, *Islam in Modern India*, Calcutta, 1983, Chapter I and Appendix A.

৩। *Ibid.*

৪। *Ibid*; also see my "Introduction" to *Majma-Ul-Bahrain*, Reprint of The Asiatic Society.

৫। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৩২-৩৩

৬। Prince Muhammad Dara Shikuh, *Majma-Ul-Bahrain*, English Translation by M. Mahfuz-Ul Huq, published by the Asiatic Society, Calcutta, 1929, "Introduction," Reprinted by The Asiatic Society (Henceforth abbreviated as *Majma-Ul-Bahrain*);

৭। *Majma-Ul-Bahrain*, Introduction, pp. 20-23.

৮। *Ibid.*, pp. 4-6.

৯। *Ibid.*, pp. 6-9.

১০। *Ibid.*, pp. 9-10.

১১। *Ibid.*, pp. 4-10.

১২। *Ibid.*, pp. 10-11.

১৩। *Ibid.*, pp. 23-25.

১৪। *Ibid.*, pp. 26-27.

১৫। *Ibid.*

১৬। *Ibid*, pp. 12-14. দারা শিকোহর সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছিলেন কলকাতা মাদ্রাসার এইচ. ব্লচম্যান (দ্র *Facsimiles of Autographs of Prince Dara Shikoh with Notes on the Literary Character of Dara Shikoh*, by H. Blochmann, in the *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XXXIX, 1870, pp. 272-74 ; See also *Persian Literature* by C. A. Storey, vol. I, Part 2, London, 1953, p. 992)

১৭। *Majma-Ul-Bahrain*, p. 28.

১৮। *Ibid.*, p. 29.

১৯। *Ibid.*,

২০। *Islam in Modern India*, Appendix-A,

২১। রামমোহন রায়, 'তুহ্‌ফত্‌-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন্‌', অনুবাদক : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, কলিকাতা, ১৯৪৯। এই অনুবাদ গ্রন্থের 'সূচনা' লেখেন কালিদাস নাগ। তাতে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য আছে।

২২। ঐ, রামমোহন রায় লিখিত ভূমিকা।

২৩। ঐ

২৪—৩৭। তদেব, পৃ. যথাক্রমে ২-৩, ৩, ২, ৩-৪, ৪-৫, ৭-৮, ৮-৯, ৯, ৯-১২, ১২-১৩, ১৩-১৭, ১৪-১৫, ২২-২৩, ২৭-৩০।

আধুনিক যুগ, সংবাদপত্র ও রামমোহন

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

সংবাদপত্র হল আধুনিক যুগের ফসল। একথা মনে রাখা দরকার যে আজ যে সংবাদপত্র ছাড়া আমরা সভ্যজীবন কল্পনাই করতে পারি না, সেই সংবাদপত্র খুব বেশিদিন আগে প্রচলিত হয় নি। দুশো বছর আগে এদেশে সংবাদপত্র সম্বন্ধে লোকেদের কোনো ধারণা ছিল না। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অনেক দেশের সম্বন্ধেই একথা বলা যায়।

এই দুশো বছর হল আধুনিক যুগ গড়ে ওঠার সময়। মধ্যযুগ থেকে মানুষ যখন আধুনিক যুগে প্রবেশ করছে, বাইরের জগতের সব-কিছুর দিকে যখন ফিরে তাকিয়েছে কৌতূহলভরে, তখনই প্রকৃতি এবং মানুষ সম্পর্কিত সব তথ্য জানবার আগ্রহ বোধ করেছে এবং সংবাদপত্রের প্রয়োজন অনুভব করেছে। রামমোহন আমাদের দেশেব আধুনিক যুগের জন্মসময়ে এসেছিলেন—প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতাকে এদেশে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সেজন্য সংবাদপত্রের মধ্যেও তাঁর বহুক্ষেত্রচারী প্রতিভার এবং বিচিত্র কর্মোদ্যমের পরিচয় ধরা পড়ে।

এই পরিচয় সঠিকভাবে বোঝবার জন্যই আধুনিক যুগের সংবাদপত্র আবির্ভাবের পটভূমিকাটি স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার।

সংবাদ জানাব জন্য লোক পাঠানো, সে ফিরে এলে তার মুখ থেকে সব জেনে নেওয়া সেকালে এই ছিল বিশেষ সংবাদ জানার রীতি। বড়োলোকেরা রাজাবাদশা আমীর-ওমরাহরা চর নিয়োগ করতেন— তারা দেশের খবর নিয়ে আসত। রামরাজত্বেও 'দুর্মুখ' চর এসে সীতা সম্বন্ধে প্রজাদের সন্দেহ ও কানাকানির কথা জানিয়েছিল। রাজারা অনেক সময়েই দূত পাঠাতেন সংবাদ পৌঁছে দিতে এবং নিয়ে আসার জন্য। অনেক সময় বিভিন্ন স্থানে যে-সব প্রতিনিধি থাকতেন তাঁরাই দরকারমত সংবাদ পাঠাতেন। সে সংবাদ কখনো গুপ্ততথ্য কখনো বা প্রকাশ্য সংবাদ। বণিকরা বাণিজ্যসূত্রে এদেশ-সেদেশ ঘুরে আসতেন বলে নানান খবর বয়ে আনতে পারতেন। এ-সবই আগে ছিল। কিন্তু বর্তমানকালের সংবাদপত্রের নতুনত্ব হল অনেক লোককে একই সঙ্গে সংবাদ জানিয়ে দেওয়া, নিয়মিতভাবে নানা বিষয়ের সংবাদ সমাজের নানা স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

এই যে একসঙ্গে অনেক লোককে নিয়মিতভাবে সংবাদ যোগান দিতে সংবাদপত্রের প্রচলন হল, সেটা সম্ভব হত না যদি না মুদ্রাযন্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটত।

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর মানুষকে আধুনিক যুগে এনেছে তো মুদ্রাযন্ত্রই। মুদ্রাযন্ত্র বা প্রেস না থাকলে এক বইয়ের বহু কপি যেমন থাকত না তেমনি সংবাদপত্রও ছাপা যেত না। বস্তুতপক্ষে মুদ্রণ ব্যাপারটিই বিপ্লব আনয়নকারী, যুগান্তকারী। যে যুগের অন্ত হল সেটা হল মধ্যযুগ। মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে শিক্ষাপ্রসারের প্রশ্নই উঠত না। যে বিপ্লব তাই এল তা বহুর মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে আবার তা নিবৃত্ত করার দ্বারা আনীত— সাধারণ মানুষের বিপ্লব। ছাপাবার মূল উদ্দেশ্যই হল দ্রুতভাবে একই জিনিসের অনেক অভিন্ন প্রতিলিপি তৈরি করা। হাতে লিখে কাগজ চালাবার চেষ্টা অনেককাল আগে ইংলণ্ডে একবার হয়েছিল কিন্তু তার প্রচারসংখ্যা আর কত হবে।

অন্যদিকে লোকে দেশের বিদেশের সংবাদ তখনই জানতে চাইবে যখন তার মন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠবে। এই কৌতূহলটাই আধুনিক। পারলৌকিক জগৎ নয় ইহলোক, স্বর্গ নরকের বিভিন্ন বিষয় নয়— ঘরের কাছের বা বাইরের মানুষের সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় এই-সব দিকে দৃষ্টি ফিরেছিল ইউরোপের ইতিহাসে নবজাগরণের সময় থেকে আর আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দী থেকে। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এই কৌতূহল ফিরবার দিকটি স্পষ্ট হবে যদি পাশাপাশি বুনো রামনাথ ও দ্বারকানাথ এই দুজনকে চিন্তা করি। রামনাথ পণ্ডিত, নগরের উপান্তে প্রায় বনের মধ্যে তাঁর টোল, তাঁর ভাঙা ঘর, অঙ্গনে কেবল একটি বিরাট তেঁতুলগাছ। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কী তাঁর অভাব, সেটা তিনি পূরণ করবেন। বুনো রামনাথ ভেবেই পাননি তাঁর অভাব কী? তাঁর ভাঙাঘর কোনো অভাবের প্রতীক নয়, তাঁর যে আহার্য জোটে না সেটা অভাব নয়, ঘরে যে কাউকে কিছু বসবার জন্য পেতে দেবেন তার অভাব কিংবা সেরকম জায়গার অভাবও অভাব নয়। ইহজগৎ ও পরিপার্শ্বচেতনাহীন এ এক জীবনদর্শন।

আর দ্বারকানাথ ঠাকুর? এক পুরুষের মধ্যেই বিশাল সম্পত্তি অর্জন, অপরিসীম ঝুঁকি নিয়ে বিরাট বাণিজ্য পরিচালন, চূড়ান্ত বিলাসব্যসন— অন্য দিকে প্রবল শিক্ষানুরাগ, পাশ্চাত্য কর্মোদ্যমের প্রতি সপ্রশংস মনোভাব, আইন-

কানুনে দক্ষতা, বন্ধুবৎসলতা, দৈহিক গঠনে অপরিসীম সৌন্দর্যের অধিকার ইহলোকের প্রতিটি বিষয়ে জাগ্রত কৌতূহল এই সবই তাঁকে নতুন যুগের মানুষে পরিণত করেছিল। জীবনকে রামনাথ যে ভাবে দেখেছিলেন তার সঙ্গে রামমোহন-সহচারী দ্বারকানাথের জীবনদর্শনের ততটাই তফাত যতটা রয়েছে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে।

বাইরের জগৎকে জানবার আগ্রহ আর মুদ্রাযন্ত্র এই দুইই আধুনিক ও নতুন যুগের উপকরণ। সেই উপকরণকে পুরোপুরি কাজে লাগালেন রামমোহন। কিন্তু কীভাবে কাজে লাগালেন তা আলোচনার আগে মুদ্রাযন্ত্র এবং সংবাদ-পত্রের ক্ষেত্রে যতটা অগ্রগতি রামমোহনের আগে হয়েছে সেটা জেনে নিই।

ইউরোপীয় বণিক্‌রা ব্যবসায়সূত্রে প্রাচ্যদেশে যাত্রা শুরু করার পরপরই মুদ্রাযন্ত্র এবং সংবাদপত্র দুইই এসে গিয়েছিল। ১৭৫৭ র পরেকার কথা নয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সূত্রে আসা ইংরেজদেরও আগে মুদ্রাযন্ত্র এদেশে চলে আসে। গোয়া-তে পর্টুগীজরা প্রথম মুদ্রাযন্ত্র নিয়ে এসেছিল সেই বছর যে বছর মোঘল সম্রাটশিরোমণি আকবর সিংহাসনে বসেছিলেন, অর্থাৎ ১৫৫৬ খৃস্টাব্দে। ইংরাজরা বোম্বাই দ্বীপের মালিকানা পেলে সেখানেও রথদেখা কলাবেচা অর্থাৎ খৃস্টধর্ম প্রচার ও অর্থাগম দুই কাজই একসঙ্গে করার উদ্দেশ্য নিয়ে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার করার চেষ্টা ১৬৭৪ সালেই হয়েছিল। কিন্তু কাজ খুব হয় নি। কাজ হল দিনেমার পাদ্রীরা যখন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীদের প্রচারে আতঙ্কিত হয়ে ত্রাঙ্কোবারে মুদ্রাযন্ত্র নিয়ে আসে (১৭১৩)। তামিল লিপিতে বাইবেল এখানে ছাপানো হয়, কাগজকলও এখানে স্থাপিত হয়। তামিল লিপিতে ছাপা বইই এদেশে পাওয়া সবচেয়ে পুরানো ছাপা বই— সেটা ১৫৭৭-এ কুইলনে ছাপা 'তাম্বিরন বনক্কম'।

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র এল ১৭৭৮ এ শ্রীরামপুরে এবং ১৭৭৯-তে কলকাতায়। শ্রীরামপুরে প্রোটেস্টান্ট মিশন প্রথমে খুলেছিলেন ডেনমার্কের বণিক্‌রা। আর সেখানেই উইলিয়াম ক্যারির উদ্যোগে স্থাপিত হল ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস।

বহু লোকের কাছে বিতরিত হবার জন্য বাইবেল ছাপার উদ্দেশ্যে নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস। কিন্তু প্রেসের বা মুদ্রাযন্ত্রের এমনই শক্তি যে দেশী লোকেরা এর কায়দাকানুন আয়ত্ত করে নিল এবং অচিরে নিজেরাই এর ব্যবহার শুরু করে মিশনের পাদ্রীদের অন্যায় যুক্তিরও প্রতিবাদ

করল। পঞ্চানন কর্মকার অক্ষর ঢালাই করেছিলেন— এ তথ্য সবার জানা। সেটা বড়ো কথা কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হল জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে মুদ্রণালয় স্থাপন করতে বাঙালিরাও ক্রমশ উৎসাহী হল।

রামমোহন কলকাতায় পাকাপাকিভাবে চলে এলেন ১৮১৪ খৃস্টাব্দে। যখন তাঁর চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ বছর বয়স। এ পর্যন্ত তিনি নিজেকে তৈরি করে চলেছিলেন অন্যূন ন'টি ভাষা পড়ে চর্চা করে (বাংলা, উর্দূ, আরবী, ফারসী, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ও ইংরেজি), বিত্ত ও সম্পত্তি তৈরি করে। কলকাতায় এসে তাঁর মনে হল যে ব্রহ্মসূত্রের কথন ও ব্যাখ্যানের প্রচারসূত্রে তিনি কিছু যুক্তিশীল শিক্ষিত লোকের কাছে তাঁর কথা পৌঁছে দিতে পারবেন। সুতরাং বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫) ছাপালেন ফেরিস কোম্পানির প্রেস থেকে, আর বেদান্তসার ছাপালেন ১নং মিশন রো-র গভর্নমেণ্ট গেজেট প্রেস থেকে ১৮১৭-তে। এর মুদ্রাকরের নাম হল এ. জি. বেলফোব। ১৮১৯-এ সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ ছাপালেন মিশন প্রেস থেকে। প্রথম সংবাদের ছাপাখানার নাম পাই নি। জনৈক 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' রামমোহনকে অশালীনভাবে আক্রমণ করে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে একটি বই লিখেছিলেন। এই বইটি ছাপা হয়েছিল সমাচারচন্দ্রিকা প্রেসে। রামমোহন এরই উত্তরে লিখলেন 'পথ্যপ্রদান'। এটা ছাপা হয়েছিল সংস্কৃত প্রেসে ১৮২৩ সালে। ঐ সালেই 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ছাপা হয়েছিল স্কুল বুক সোসাইটির প্রেসে।

সব বইয়ের প্রথম সংস্করণ বা জীবৎকালে প্রকাশিত সংস্করণ পাওয়া যায় নি। ফলত সব প্রেসের খবর আমরা জানি না। কিন্তু এটুকু বোঝা যাচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে বেশ কয়েকটি মুদ্রণালয় স্থাপিত হয়ে গেছে এবং লোকে সে-সব মুদ্রণালয়ে ছাপাবার সুযোগ গ্রহণ করছে। রামমোহন তো করছেনই। ফোর্ট উইলিয়মে সিভিলিয়ানদের জন্য স্থাপিত কলেজের পাঠ্য বই ছাপাও রীতি হয়েছিল।

এ তো গেল বই বা পুস্তিকা ছাপানো—। যেটা আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় সেই সংবাদপত্র ছাপাবার ব্যাপারটি রামমোহনের আগে কতটা হয়েছিল ?

বাংলা হরফ তৈরির কাজে সময় লেগেছিল কিন্তু ইংরেজি প্রেস তো আগেই এসে গেছে। এদেশে আসা ইংরেজরা স্বদেশের সংবাদ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। অথচ বিলেত থেকে খবর চিঠিপত্র সংবাদপত্র আসতে ন'মাস সময় লেগে যেত। জেমস অগাস্টাস হিকি বলে একজন একটি প্রেস

কিনে 'বেঙ্গল গেজেট' নামে একটি সংবাদপত্র বার করে ফেললেন (২৯ জানুয়ারি ১৭৮০)। Bengal Gazette সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকৃত অর্থেই সাময়িকপত্র। সংবাদপত্রের দুটি ধারা একটি নিছক খবরের কাগজ অপরটি সাময়িকপত্র (একটি Newspapers এবং অপরটি Periodicals) একটি থেকে অপরটির প্রকাশনকালের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি। প্রথম দিকের সংবাদপত্র বলতে ওই periodicals বা সাময়িকপত্রই। আজকের দৈনিক সংবাদপত্রের কথা তখনকার দিনে ভাবাই যেত না। কেবল জনপ্রিয়তার দাবি মেটাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র দৈনিক সংস্করণ বার করতে হয়েছিল—সেও ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে।

Bengal Gazette-এর পাঠক আবার সেই ইংরেজরা যারা কোম্পানির চাকরি সূত্রে এদেশে এসেছিল। ঔপনিবেশিকতাই ইংরেজদের এদেশে আসার কারণ। শিল্প-বিপ্লবের কারণে নতুন বিত্তশালী শিল্পপতি ব্যবসায়ী সমাজ যৌথভাবে কোম্পানি তৈরি করে পৃথিবীর বিভিন্নদেশে বাজার স্থাপন করার জন্য ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই সূত্রেই নানান শ্রেণীর ভাগ্যান্বেষী মানুষ ভারতবর্ষে এসেছিল। কিন্তু তারা সকলেই তো মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে আসা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ। তাদের স্মরণে তো দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য রয়েছে— যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে ভৌগোলিক আবিষ্কারে, রাজা ও পার্লিয়ামেণ্ট রাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রীদের বিরোধে, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট বিরোধে, পিউরিটানদের উপর অত্যাচারে Magna Carta বা Petition of Rights-এর ব্যাপারে, প্রথম চার্লসের স্বেচ্ছাচারী আচরণের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে, মিলটনের ক্রুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টিতে, গৃহযুদ্ধ অথবা গৌরবময় বিপ্লবে।

যে ইংরেজরা এদেশে এসেছিল তাদের অনেকেই এদেশের আবহাওয়ায় এসে নবাব বাদশার মতো চালচলন নিয়ে থাকত— একথা যেমন সত্য তেমনি তারা স্বদেশের খবর পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত এটাও সত্য। জাহাজে কাগজ আসতে ন' মাস লাগে লাগুক, তবু জাহাজ আসামাত্র স্বদেশের টাটকা গন্ধ নেবার জন্য তারা ছুটত।

Bengal Gazette-এর কাগজের উপর লেখা থাকত A weekly political and commercial paper open to all parties but

influenced by none, কার্যত এ কাগজ নবাবের মতো চালচলন যাদের —কোম্পানির সে-সব কর্মচারীসাহেবদের নানান দুর্নীতিমূলক কীর্তিকলাপ তুলে ধরত। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যবোধ যাঁরা আত্মস্থ করেছেন সেই ইংরেজই দেখালেন যে তথাকথিত শাসকশক্তি সমালোচনার উর্ধ্বে অবস্থান করেন না। অবশ্য হিকির এ-সব সমালোচনা নিছক গঠনাত্মক ছিল না— কেচ্ছাকাহিনীব প্রকাশে ও আলোচনায় ছিল তাঁর বেশি উৎসাহ। তাঁর এই কেচ্ছাকাহিনীর মূল বিষয় ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। হেস্টিংস তাই হিকির উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ ছিলেন।

হেস্টিংসের এই ক্রোধের সুযোগ নিয়ে মেসিংক ও রীড নামে দুই সাহেব India Gazette বার করলেন। হেস্টিংস আদেশ দিলেন India Gazette বিনা মাশুলে ভারতেব যে-কোনো স্থানে কাগজ পাঠাতে পারবে— অন্য দিকে Bengal Gazette-এর মাশুল ঠিকই লাগবে। আজকের দিনেব ডাক ব্যবস্থাব সঙ্গে তখনকার দিনের তুলনাই হয় না, মাশুলও ছিল অত্যন্ত বেশি। ফলে কাগজ চালাতে গিয়ে হিকিকে যে ব্যয়াধিক্যের সম্মুখীন হতে হল তাতে তাব গালাগালি ও কুৎসার পরিমাণ ও প্রকার দুইই বেড়ে গেল। হিকির জেল হল, মুদ্রণযন্ত্র সবকার-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হল। ১৭৮২-তে এই পত্রিকাটি উঠে গেল কিন্তু পরপব কতগুলি ইংবেজী কাগজ বেবোল—

The Calcutta Gazette (১৭৮৪), The Bengal Journal (১৭৯১), The Oriental Magazine (১৭৮৫), The Calcutta Chronicle (১৭৮৬), Indian World of Tradesman (১৭৯৪)।

কালেব হস্তক্ষেপ এড়িয়ে এর মধ্যে 'ক্যালকাটা গেজেট'ই অদ্যাবধি রয়েছে কাবণ প্রকাশনের কিছুকাল পর থেকেই এটি সবকারেব সাপ্তাহিক মুখপত্রে পরিণত হল। Bengal Journal বার কবেছিলেন আমেরিকাবাসী আইরিশ উইলিয়াম ডুয়ানি (William Duane)। পরে ইনিই বাব করেছিলেন Indian World of Tradesman. কিন্তু কোম্পানির শাসনে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোবেব (১৭৯৩-১৭৯৮) আমলে সব উঠে গেল। ডুয়ানিকে লাটভবনে ডেকে এনে বন্দী করা হয়েছিল, লক্ষ টাকার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

১৭৯৯ সালে প্রথম প্রেস অ্যাক্ট চালু হল। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সংবাদপত্রের জন্মের আগেই সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ বাংলা সংবাদপত্রগুলি বেরোতে শুরু করে ১৮১৮ খৃস্টাব্দ থেকে। প্রেস অ্যাক্টে বলা

হল সরকার-কর্তৃক পরীক্ষিত না হয়ে কোনো সংবাদ বেরোতে পারবে না। ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ গোপন রাখা—কিন্তু বোঝা-ই যাচ্ছে যে কোম্পানির কর্মচারীদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রোধ করা ছিল এর আসল অঘোষিত উদ্দেশ্য। অ্যাক্টে আরো বলা হল এই বিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি হিসাবে লাইসেন্স বাতিল ক'রে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সংবাদ ও মতামত অবাধে প্রকাশ করার স্বাধীনতা সরকারের হাতে তুলে দিতে যারা অস্বীকার করল না— আইন মেনে সংবাদপত্র চালাবার অঙ্গীকার করে এল তারা হল Bengal Hurkaru (বেঙ্গল হরকরা), Calcutta Morning Post, Calcutta Courier, Telegraph, Oriental Star ইত্যাদি। ১৮১৩ সালের মধ্যেই Press Act সম্পর্কে কোম্পানি কী করছে সে বিষয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে খবর নেওয়া হচ্ছিল। এ দিকে এই ক বছরে সংবাদপরীক্ষকরা খবরের উপর এমনভাবে কাঁচি চালাতেন যে শেষ মুহূর্তে শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব হত না। তখন বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রকাশের আগে সরকারের কাছ থেকে অনুমোদিত করে নিতে হত।

কিন্তু মর্নিং পোস্ট কাগজের সম্পাদক হিট্‌লী সরকারের নিষেধ না মেনে ছাপাতে না করা খবরও ছাপিয়ে দিলেন। হিট্‌লী ছিলেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, কলকাতায় তাঁর বাড়ি। তাঁর লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া যায় কিন্তু বিলেতে পাঠানোর শাস্তি তাঁকে দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল ইউরোপীয় সম্পাদকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য Press Act কাজে লাগছে দেশীয়দের জন্য নয় এ-সব ভেবে হেস্টিংসের আমলে সংবাদপত্র পরীক্ষক বেলী-র সুপারিশে ১৮১৮ সালের ১৯শে আগস্টের আদেশে Press Act-এর প্রাক্-মুদ্রণ পরীক্ষার ও অনুমোদনের আইন উঠে গেল। অন্তত তিনটি বাংলা কাগজ এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সে তিনটি হল দিগ্‌দর্শন, সমাচারদর্পণ আর বাঙ্গালগেজেটি।

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় দিগ্‌দর্শন নামে মাসিক কাগজ বেরোল। মে মাসে ওঁরাই বার করলেন সমাচারদর্পণ নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। কাগজের ওপরে ছাপা থাকত :

দর্পণে মুখসৌন্দর্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

> কার্যে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সমাচারদর্পণ থেকে সব বৃত্তান্ত জানুন, দর্পণে মুখসৌন্দর্য যেমন (লোকে দেখে)।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য আর তাঁর বন্ধু হরচন্দ্র রায় ১৮১৮ সালে 'বাঙ্গাল গেজেটি' বলে একটি কাগজ বার করলেন জুন মাস থেকে।

১৮১৯-এ খৃষ্টীয় তত্ত্ব বিষয়ে একটি সাময়িকপত্র (মাসিক) বেরোল। নাম গসপেল ম্যাগাজিন। কালানুক্রমিকভাবে এরপর থেকেই রামমোহনকে আমরা সংবাদপত্রের আলোচনার মধ্যে পেলাম। সেটা ১৮২১ সালের কথা।

সমাচারদর্পণে জনৈক পাত্রী ১৮২১ খৃস্টাব্দের ১৪ জুলাই একটি পত্র প্রকাশ করেন। সেই পত্রে ন্যায় বেদান্ত মীমাংসা পাতঞ্জল সাংখ্য পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রকে ভ্রান্ত বলে মত প্রকাশ করে আক্রমণ করা হয়েছিল। রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মা এই ছদ্মনামে এর একটা প্রতিবাদপত্র লেখেন এবং পূর্বোক্ত পত্রে প্রকাশিত মতগুলি খণ্ডন কবেন। এই প্রতিবাদপত্র 'সমাচারদর্পণে' ছাপাবার জন্য পাঠালেন তিনি। বলা বাহুল্য, তাঁর যুক্তিপূর্ণ সমালোচনভঙ্গি খৃষ্টীয় মিশনারিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। তাঁরা ১লা সেপ্টেম্বর ১৮২১ তারিখে মন্তব্য করলেন :

> যদি পত্রখানির অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড্‌দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই। অন্যথা সর্বসমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।

রামমোহন কেটেছেঁটে ছাপাতে দিতে রাজি হলেন না তাই সমাচারদর্পণ সেটি ছাপালেন না। ছাপালেন না বলে ফেলে রাখবার লোক আর যেই হোক রামমোহন নন। সুতরাং 'সর্বসমেত' লেখাটি তিনি তিনটি সংখ্যায় প্রকাশ করলেন। যাতে ছাপালেন তার নাম দিলেন 'ব্রাহ্মণসেবধি'। নামপত্র এইরকম :

ব্রাহ্মণসেবধি / Brahmunical Magazine / The Missonary & the Brahmun / ব্রাহ্মণমিসিনরি সম্বাদ / সংখ্যা ১

'সেবধি' কথাটিকে Monier-Williams-এর অভিধানে wrong reading বলে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সেব+√ধা+ই এই-ভাবে শব্দটিকে নিষ্পন্ন করে মানে করেছেন 'নিধি'। শেবধি শব্দের ব্যবহার প্রাচীন, মানে একই। ব্রাহ্মণসেবধি মানে দাঁড়াল ব্রাহ্মণদের নিধি। তিনটি

সংখ্যা এর বেরিয়েছিল। পাদ্রীসাহেবের নিন্দার উত্তর দেওয়া হল— তারপর এটা বন্ধ হয়ে গেল।

এটা কি সংবাদপত্র? বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এটা খুবই উল্লিখিত। আর উল্লেখের কারণ রামমোহন নিজেই এটিকে magazine বলেছেন। আর magazine মানে periodicals বা সাময়িকপত্র। প্রথম সংখ্যাতে তিনি লিখেছিলেন :

> সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনারি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ অযুক্তিসিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল পরে পরে উভয় উত্তর প্রত্যুত্তরকে এইরূপে ছাপান যাইবেক। ইতি।

-ছাপিয়েও ছিলেন। কিন্তু বিতর্কে অপর পক্ষ যোগ দেন নি। রামমোহন একাই প্রশ্নগুলি উদ্ধৃত করে বিচার করলেন।

'ব্রাহ্মণসেবধি। ব্রাহ্মণ ও মিসিনরী সম্বাদ' নামে এই magazine-এর এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ থাকত। তাই সাময়িকপত্র বললে এটিকে দ্বিভাষিক সাময়িক পত্র বলতে হত। বস্তুত এটিকে সাময়িকপত্র বা periodical না বলে তিন সংখ্যায় বা তিন কিস্তিতে প্রকাশিত বিতর্ক পুস্তিকা বলতে পারি। কিন্তু নিঃসন্দেহে এর উদ্ভব সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পত্রের প্রতিবাদ থেকে। সমাচারদর্পণে শাস্ত্রবিষয়ক প্রশ্ন যা বেরিয়েছিল— সে যুগের সবচাইতে শিক্ষিত মানুষ হিসাবে রামমোহন তাকে একটুও উপেক্ষা করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাঁর। সেই প্রতিক্রিয়ার ফলই 'ব্রাহ্মণসেবধি' বা Brahmunical Magazine।

১৮১৫ থেকে ১৮২১-এর মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য রামমোহন অনেকবার নিয়েছেন। এই পর্বের মধ্যে বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, কেনোপনিষদের 'তলবকার উপনিষৎ' (জুন ১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (জুলাই ১৮১৬), উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬-১৭), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), কঠোপনিষৎ (আগস্ট ১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (অক্টোবর ১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (জুন ১৮১৮), সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (নভেম্বর ১৮১৮), গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), মুণ্ডকোপনিষৎ (মার্চ ১৮১৯), সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯), আত্মানাত্মবিবেক

(১৮১৯), কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০), সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার — এই-সব বই ও পুস্তিকা মুদ্রিত করে বিতরণ করে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত হয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, এটাও বোঝা যাবে যে এ যাবৎ যা ছাপিয়েছেন— ব্রাহ্মণসেবধি সমেত— সে সবই তাঁর ধর্মসংস্কার প্রেরণার ফল। ব্যতিক্রম কেবল 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'। এর মূল সামাজিক সংস্কারপ্রেরণা শুধু নয় সুগভীর মানবিকতাবোধও। তবু এজন্য তাঁকে লড়তে হয়েছিল শাস্ত্রমূঢ়দের বিরুদ্ধে।

কিন্তু রামমোহন তো কেবল ধর্মের সংস্কারকই নন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনাবলী সম্পর্কে একজন সচেতন মানুষ। মানবতাবাদ এবং যুক্তিনিষ্ঠা এই দুইই তাঁর চলবার মূলমন্ত্র। স্বদেশহিতৈষা, স্বদেশবাসীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁর কর্মোদ্যমের প্রেরণা।

সুতরাং এ যাবৎ বাঙালিরা এবং মিশনারি ও অমিশনারি সাহেবরা যে-সব সংবাদপত্র বার করছিলেন সবগুলি সম্পর্কেই তাঁর কৌতূহল স্বাভাবিক। কৌতূহলের মূলও সবসময় ইহলোকসচেতনতা মাত্র নয়, কখনো কখনো তার স্বাভাবিক সূত্রও থাকত। 'বাঙ্গালগেজেটি'র এক সম্পাদক হরচন্দ্র রায় রামমোহন-স্থাপিত 'আত্মীয়সভা'র সভ্য ছিলেন। অর্থাৎ স্বয়ং রামমোহনের সঙ্গে এ পত্রিকার যোগ প্রত্যক্ষ ছিল না কিন্তু পরোক্ষ যোগ নিশ্চয়ই ছিল। অন্য দিকে অপর সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রথমে শ্রীরামপুরে মিশন প্রেসে পরে ফেরিস সাহেবের সেই প্রেসে কাজ করেছিলেন যে প্রেস থেকে ১৮১৫-তে রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ প্রথম ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল।

এই তথ্যগুলি একটাই ইঙ্গিত দেয় যে রামমোহনের মতো মানুষ এ-সব সংবাদপত্র সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন না। বস্তুত ছিলেনও না। বাঙ্গাল গেজেটির একটিও কপি পাই নি, তবু, ১৮১৯-এর এশিয়াটিক জার্নালের পত্র পাঠে এ তথ্য জানা যাচ্ছে যে সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ বাঙ্গালগেজেটিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

বাঙ্গাল গেজেটি এক বছরের বেশি চলে নি। অর্থাৎ জুন ১৮১৯ পর্যন্ত এর আয়ু। ১৮২১-এর ডিসেম্বরেই আর একটি কাগজ বেরোল, তার নাম সম্বাদ কৌমুদী। এটিও ছাপা হত সংস্কৃত প্রেসে। ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক আলোচনা, দেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা, বিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ— এইগুলিই এর লক্ষ্য ছিল। এক কথায়

লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রকাশের প্রধান লক্ষ্য দেশবাসীর অভাব-অভিযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে আলোচিত হইবে।'

এর সম্পাদক ছিলেন কলুটোলার তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাচারদর্পণে যেমন 'দর্পণে সৌন্দর্যমিব…' ইত্যাদি শ্লোকটি বেরিয়েছিল তেমনি সম্বাদকৌমুদীতে একটি শ্লোক ছিল :

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যাশীতলং জগৎ॥

প্রদীপের কাছে যে মুখ তা আয়নাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। [কৌমুদী মানে জ্যোৎস্না।] জ্যোৎস্নায় সেই জগৎ শীতল হয় যা রবির কিরণে তপ্ত হয়ে ওঠে।

রামমোহনের সঙ্গে এই কৌমুদীর খুব যোগ ছিল। প্রত্যেক মঙ্গলবার সম্বাদকৌমুদী ৮ পৃষ্ঠা করে প্রকাশিত হত। রামমোহন এতে নিয়মিত লিখতেন। প্রায় দশবছর পর্যন্ত উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে কাগজটি চলেছিল। রামমোহনের নানান সংস্কারপ্রস্তাব এতে ছাপা হওয়ার জন্য গোঁড়া হিন্দুদের একাংশ সম্বাদ-কৌমুদীর উপর চটে যান। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সম্বাদকৌমুদী ছেড়ে দেন এবং ১৮২২-এ সমাচারচন্দ্রিকা বার করেন।

সম্বাদকৌমুদীর কোনো কপি এখন পাওয়া যায় না। তবে এতে প্রকাশিত বহু আলোচনার চুম্বক বেরোতো Calcutta Journal-এ। এর সম্পাদক জেমস সিল্‌ক বাকিংহাম পরের সম্পাদক মিঃ আর্নট দুজনেই রামমোহনকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। আর্নট তো রামমোহন বিলেতে গেলে তাঁর সেক্রেটারি রূপে কাজও করেছেন। সম্বাদকৌমুদীতে প্রকাশিত রামমোহনের লেখার চুম্বক যা এঁদের পত্রিকায় ছাপা হত তা থেকে কত বিচিত্র জাগতিক বিষয়ে যে রামমোহনের ভাবনা ছিল তা বেশ বুঝতে পারা যায়। কয়েকটি নির্বাচিত বিষয় নিচে দেওয়া হল :

অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থে গভর্নমেন্টের নিকট প্রার্থনা, কৃপণ রাজার গল্প।

সংবাদপত্রদ্বারা বাঙালীর উপকারিতা প্রদর্শন।

চিৎপুর রোডে জলসেচনার্থে চাঁদা তোলার আবশ্যকতা।

পঞ্চদশবর্ষ উত্তরাধিকারের পরিবর্তে দ্বাবিংশ বৎসর হওয়ার ইঙ্গিত।

জুরিপ্রথা সম্প্রসারণের জন্য আবেদন।

কৃপণ ও অদাতা ব্যক্তিদের পারলৌকিক কার্যে যে অজস্র ধন ব্যয়িত হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা।

নদীতীরে হিন্দুদের শ্মশানস্থাপনের জন্য আবেদন।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে চাল রপ্তানী বন্ধ করার জন্য আবেদন কেননা এটাই তাদের খাদ্য।

দরিদ্রগণের সাহায্যার্থে বিনামূল্যে ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য রাজপুরুষদের কাছে প্রার্থনা।

দেবপ্রতিমা বিসর্জনকালে ইউরোপীয়গণের বেগে জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে দুধারের লোকের উপর চাবুক চালিয়ে চলে যাওয়ার তীব্র প্রতিবাদ।

নেটিভ ডাক্তারের পুত্রগণ যাতে ইউরোপীয় ডাক্তারদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

কুলীনদের বিয়ে।

ধনবানবাবুদের অর্থের অপব্যয়।

এই রকম ভাবে ইউরোপীয় চিকিৎসকদের কাছে বাঙালী যুবকের শিক্ষানবিশী; দীনহীনের শবদাহার্থে চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব; অসহায়া হিন্দু বিধবাদের অনুকূল্যের জন্য সঞ্চয় অনুষ্ঠান; ইংরেজী শেখবার আগে বাঙালি বালকদের ব্যাকরণে জ্ঞান থাকার আবশ্যকতা ইত্যাদি নানান বিষয়ে যে-প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় ছাপা হত তাতে রামমোহনের যে হাত ছিল এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। রামমোহন যখন বিধবা মেয়েদের পুড়িয়ে মারার বিরুদ্ধে লোকমত সংগ্রহে ও আইন-প্রণয়নের জন্য আবেদন করতে ব্যস্ত—যখন নিজেই তিনি কাগজগুলিতে এ-সব বিষয়ে লিখছেন তখন তার প্রতিক্রিয়ায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচারচন্দ্রিকা' বার করে রক্ষণশীলদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে গেলেন। বাঙালিসমাজের পৃষ্ঠপোষকতা সম্বাদকৌমুদী পায় নি বলে ১৮৩২ পর্যন্ত চলে এ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

৩

রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে যে কাগজ ছাপালেন তা একটি ফারসী ভাষার কাগজ। নাম দিয়েছিলেন 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার'। শব্দটির মানেও খবরের আয়না বা সমাচারদর্পণ। ফারসী ভাষাতে কাগজ বার করার কারণ ছিল।

১৮৩৫ সালের আগে পর্যন্ত রাজদরবার এবং আদালতে ফারসীই ছিল একমাত্র ব্যবহৃত ভাষা। শিক্ষিত লোককে তাই ফারসী শিখতেই হত। রামমোহন তো তাঁর 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' ফারসীতে লিখে লিথো করে ছাপিয়েছিলেন। এটা লেখা হয়েছিল ১৮০৩ সালে। এ ভাষায় পত্রিকা বার করলে তা ভারতবর্ষের সব শিক্ষিত লোকেই বুঝতে পারবে এই ছিল সম্ভবত রামমোহনের মনোভাব।

এ পত্রিকা ছাপানো শুরু হল ১৮২২ সালের ১২ এপ্রিল থেকে। ২২ মার্চ ১৮২২ তারিখে সম্বাদকৌমুদীর প্রথম সম্পাদকদ্বয়ের একজন হরিহর দত্ত 'জাম-ই-জাহান-নুমা' নামে একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু উর্দু খুব চলে নি বলে ওটি উর্দু-ফারসী মিশ্রিত রূপে বার করা হল, পরে শুধু ফারসীতে বেরোত। শুধু ফারসীতে কাগজ বার করার পরিকল্পনায় তাই রামমোহনই অগ্রপথিক। কিন্তু 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার'-কেও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত আইনের প্রতিবাদে ১৮২৩ সালেই বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ফলে সংবাদপত্র শাসন ও রামমোহনের প্রতিবাদের বিষয় একটু পৃথক্‌ আলোচনার অবকাশ রাখে।

আসলে যে মুহূর্তে ছাপানোর ব্যাপারটা শুরু হয় সেই মুহূর্ত থেকেই শাসকসমাজ বুঝতে পেরেছিল যে এর ফলে সর্বসাধারণের কাছে অতি সহজেই যে-কোনো বাণী পৌঁছে দেওয়া যায়। সেই মুহূর্ত থেকেই শাসকসমাজ মুদ্রাযন্ত্র ও প্রকাশন, সংবাদপত্র পুস্তক বা পুস্তিকা এগুলির উপর নজর রাখতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, এগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ, বিধি-নিষেধ আরোপ, দমনপীড়ন ইত্যাদি শুরু হয়ে যায় মুদ্রণব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই। মুদ্রণ-ব্যবস্থার শক্তি যে কতটা তা সাধারণ মানুষের চেয়ে পুরোহিত ও শাসকবর্গ আগেই বুঝেছিল। তাই দেখি মুদ্রণব্যবস্থার ধাত্রীভূমি জার্মানীর Mainz শহরে, যেখানে ১৪৩৩ খৃস্টাব্দে জোহান গুটেনবার্গ (Johann Gutenberg), জোহান ফাস্ট (Johann Fust), পিটার শুফার (Peter Schoffer) এঁদের দানে ছাপার টাইপ ঢালাই করে ছাপাবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়, সেইখানেও ১৪৮৬ খৃস্টাব্দের মধ্যেই Censorship চালু হয়ে যায়।

Censor শব্দটি এসেছে জনৈক রোমান কর্মচারীর নাম থেকে যার কাজ ছিল নাগরিকদের কার্যাবলীর উপর কঠোর নজর রাখা এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ নৈতিকতা ইত্যাদি সবই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা। এই কাজই কোনো-

না-কোনো আকারে পৃথিবীর সব দেশেই চালু হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসকশক্তি আগেই মুদ্রণালয়ের শক্তি বুঝে নিয়েছিল বলে এর ওপর কমবেশি কঠোর নিয়ন্ত্রণাদেশ চালু করে।

ইংলণ্ডে রাজার নিজস্ব বিচারালয় বা Star Chamber ও রাজা স্বয়ং এই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ১৬শ শতকেই। লাইসেন্স ছাড়া কেউ কিছু ছাপতেই পারত না। পার্লিয়ামেণ্টপন্থী ও গণতন্ত্রী পিউরিটানদের সঙ্গে রাজার বিরোধ ১ম জেমস ও ১ম চার্লসের আমলে তুঙ্গে ওঠে, তার পর লং পার্লিয়ামেণ্ট, গৃহযুদ্ধ, অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা— এর মধ্যেও লাইসেন্স নেওয়ার প্রথা বজায় ছিল। ১৬৪২-এ গৃহযুদ্ধের শুরু, ১৬৪৯-এ চার্লসের মৃত্যুদণ্ডের পর এর প্রকৃত সমাপ্তি। এরই মধ্যে ১৬৪৪ সালে পিউরিটান কবি মিলটনকে আমরা ক্রুদ্ধ লেখনী ধারণ করতে দেখলাম। ১৬৪৪-এ মিলটন লিখলেন Areopagitica নামক গ্রন্থ।— প্রকাশনের আগেই অনুমতি নেবার নিয়ম করে প্রকাশন-সম্ভাবনা বিনষ্ট করার চালাকির বিরুদ্ধে এই লেখা। Licensing Act কিন্তু ১৬৯৫ পর্যন্ত চালু ছিল। ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত রাজার কোনো সমালোচনাকে রাজদ্রোহ বলে মনে করা হত, ফলে কেউ কোনো বিরোধী মত ছাপলেই তাঁর বাড়ি তল্লাশ করে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে পীড়ন করা হত। ১৭৬৬ সালে John Wilkes-এর নেতৃত্বে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হতে এই আইন তুলে নেওয়া হয়। এখন ইংলণ্ডে Libellous (রাজদ্রোহমূলক) Indecent (অশালীন) এবং blasphemous (নিন্দাসূচক) বিষয় কিংবা copyright আইনভঙ্গকারী, কিংবা Official Secrets Act কিংবা Incitement of Mutiny Act ইত্যাদি বিভিন্ন আইন অনুসারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিষয়ের জন্য মামলা এনে শাস্তি দেওয়া চলতে পারে। আলাদা কোনো প্রেস-অ্যাক্ট নেই।

আমাদের দেশেও ছাপাখানা ও নিয়ন্ত্রণাদেশের ইতিহাস প্রায় একযোগেই শুরু হয়েছিল। ১৭৮০-তে হিকির বেঙ্গল গেজেট বার হবার পর পরই কোম্পানির শাসকরা বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। বণিক্ হিসাবে তাঁরা নিশ্চয়ই রাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ছিলেন— কিন্তু যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তাঁদের নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে বা তাঁদের দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রকে তুলে ধরে সেখানে তাঁদের অস্বস্তি হবেই। ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪-৮৫), বা অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল ম্যাক্ফারসন (১৭৮৫-৮৬) অস্বস্তি বোধ করলেও কিছু করেন

নি, কেবল অপর কাগজ ইণ্ডিয়াগেজেটের ডাকমাশুল মকুব করে দিয়েছিলেন। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত লর্ড কর্নওয়ালিশ গভর্নর জেনারেল হয়েও কিছু করলেন না। কিন্তু ১৭৯৪ সালে স্যার জন শোর অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হয়ে উইলিয়াম ডুয়ানির Indian World of Tradesman কাগজটিকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এরপর লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করলেন ১৭৯৯ সালে। এতে বলা হয়েছিল যে পত্রিকায় যা ছাপা হবে এমন-কি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত তার পাণ্ডুলিপি আগে সেক্রেটারির কাছে জমা দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। প্রিন্টার বা মুদ্রাকরদের, সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীদের নাম ঠিকানা ছাপাতে হবে, খ্রীষ্টীয় রীতি অনুসারে রবিবার কাগজ বার করতে পারা যাবে না।

১৭৯৯ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত এই আইন বলবৎ ছিল। (এর মধ্যে ১৮০৫-এ পুনর্বার কর্নওয়ালিশ, পরে বার্লো (১৮০৫-০৭), মিণ্টো (১৮০৭-১৩) এঁরা এসে গেছেন।) আগেই বলেছি Morning Post কাগজের হিট্‌লীর প্রতিরোধেই তা তুলে নেওয়া হল। কারণ তখন শাস্তি হিসাবে বলা হয়েছিল যে আইনভঙ্গকারীর লাইসেন্স বাতিল করে বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অন্য দিকে হিট্‌লী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তার দেশ কলকাতা-ই। সুতরাং বিলেতে তাকে কী ভাবে পাঠানো যায়? এ আইন তাই একমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে বলে লর্ড হেস্টিংস (লর্ড ময়রা—১৮১৩-২৩) সেনসরের পদ তুলে দিয়ে সাধারণ কতকগুলি নির্দেশ চালু রাখলেন।

আমরা আগেই দেখেছি এই পর্বের মধ্যেই বাংলা সংবাদপত্রগুলির জন্ম হয়ে গেছে। কিন্তু যতটুকু স্বাধীনতা ১৮১৮-তে দেওয়া হয়েছিল তা আবার ১৮২৩ সালেই তুলে নেওয়া হল। এই পাঁচ বছরের মধ্যে কতকগুলি ঘটনা ঘটেছিল।

আগে আইন ছিল কোনো খৃস্টান পাদ্রী কোম্পানির অনুমতি ছাড়া এদেশে আসতে পারবে না। তার কারণ এঁদের ভয় ছিল পাছে পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারে ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। ১৮১৩ সালে কোম্পানির এই-সব আইন করবার স্বাধীনতা চলে যেতে স্কচ প্রেসবিটারিয়ান (Presbytarian) চার্চের পাদ্রী স্যামুয়েল ব্রুসকে (Samuel Bruce) এদেশে আসতে দেখা গেল। স্কচ প্রেসবিটারিয়ান চার্চের লোকেরা ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র অ্যাংলিকান (Anglican) চার্চের বিরুদ্ধবাদী গণতন্ত্রী। ইনি 'এসিয়াটিক জার্নাল' নামে একটি কাগজ বার করে এদেশের বণিক্‌দের নিন্দাবাদে নামলেন। বণিক্‌রা তখনই পালটা

কাগজ বার করলেন The Calcutta Chronicle of Political, Commercial and Literary Gazette নাম দিয়ে। সম্পাদক হিসাবে পেলেন James Silk Buckinghamকে। কিন্তু বাকিংহামও তাঁর Calcutta Chronicle-এ কোম্পানি কর্মচারীদের সমালোচনা করলেন— সে সমালোচনা এত তীব্র যে তিনি এদেরকে Gangrene of the State বলে পর্যন্ত অভিহিত করলেন। বাকিংহামের বিরুদ্ধে তখন John Bull in the East নামে একটি কাগজ নেমেছে। John Bull পত্রিকা বিনা মাশুলে যাতে ডাকে পাঠানো যায় সে ব্যবস্থা সরকার নিলেন। অন্যদিকে লর্ড হেস্টিংসের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল যাতে Freedom of Press বলে কিছু না থাকে।

এই হল শাসক ইংরেজের দুমুখো নীতি। স্বদেশে গণতন্ত্রী হয়ে সে Freedom of Press-এর জন্য Licensing Act বাতিল করার দাবিতে লড়াই করে— কিন্তু উপনিবেশে সে সাম্রাজ্যবাদী, তাই Freedom of Press-কে ধ্বংস করে ফেলে। হেস্টিংস নিজে গণতন্ত্রী ইংল্যাণ্ড থেকে এসে প্রেসের স্বাধীনতা নষ্ট করবার উদ্যোগ নিতে পারছিলেন না— অন্যদিকে ডিরেকটররা লিখে বলেছেন : স্বাধীন সরকারের প্রেস জনসাধারণকে শিক্ষিত ও আলোকিত করে, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তো স্বাধীন সরকারের প্রশ্ন ওঠে না, আর এখানে 'পাবলিক ওপিনিয়ন' (Public Opinion) বলে কিছু নেই।

বিলেত থেকে হুকুম এল সেনসর ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হোক। ১৮২৩-এর জানুয়ারিতে হেস্টিংস দেশে চলে গেলে তাঁর জায়গায় এলেন জন অ্যাডাম, অবশ্য অস্থায়ীরূপে, তাঁর সঙ্গে বাকিংহামের লেগে গেল। জন অ্যাডাম নিজেও ছিলেন স্কচ। তিনি স্কচ পাদ্রী স্যামুয়েল ব্রুসকে কোম্পানির অধীনে একটা চাকরি দিলেন। বাকিংহাম তাঁর কাগজে লিখলেন : 'যাঁর উচিত ছিল রবিবারের প্রার্থনান্তিক ভাষণে তৈরির জন্য ব্যস্ত থাকা, তিনি কিনা সীল-গালা গুণছেন।'—এ-সব ঠাট্টা আক্রমণে অ্যাডাম চটে গিয়ে প্রেসের অবাধে লেখার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, যার জন্য সুপ্রীম কাউনসিলের সদস্য Bailey-কে একটি রিপোর্ট লিখবার ভার দিলেন। বেলি যা লিখলেন তা ঔপনিবেশিকতা-বাদী ইংরেজদের উপযুক্তই বটে :

> Unfettered liberty, as it exists in our native country (England) is totally unsuited to the present state of our dominion in the East.

সুতরাং ১৭৯৯ সালে ওয়েলেসলি যে প্রেস আইন করেছিলেন তারই একটি কড়া ও বিস্তারিত সংস্করণ অ্যাডাম চালু করলেন। ১৮২৩ সালের ১৪ মার্চ অর্ডিনান্স বার করা হল।

বেলি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে সম্বাদকৌমুদী, সমাচারচন্দ্রিকা, মীরাৎ-উল্-আখ্বার ও জাম-ই জাহান-নুমা, এই চারটি দেশীয় সংবাদপত্রের উল্লেখ ছিল। রামমোহন সম্পর্কে ছিল ক্ষুব্ধ অভিযোগ। তাঁর ধর্মসংক্রান্ত বিতর্কে যোগ দেবার প্রবণতা—খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এইগুলি বেলির প্রতিবেদনে বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হয়েছিল।

অন্য দিকে মীরাৎ-উল্-আখ্বারে প্রকাশিত হয়ে চলেছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষ, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি, দেশীয় জনগণ সম্পর্কে ব্রিটিশদের তীব্র ঔদাসীন্য। এ-সব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ব্রিটিশ শাসকদের সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠছিল।

মীরাৎ-উল্-আখবারের প্রতি সংখ্যায় ১৮২২-এর ১২ এপ্রিল থেকে সাপ্তাহিক রূপে বেরোতে না বেরোতেই অজস্র বিষয়ে রামমোহনের লেখনী মুখর হয়ে উঠেছিল। ১৮২১ সালে প্রতাপনারায়ণ দাস নামে একজনের উপর চাবুক মারার আদেশ হয়। চাবুক মেরে জেলে ফেলে দিতেই দেখা যায় সে মারা গেছে। তখন John Hayes নামে কুমিল্লার যে বিচারকের আদেশে চাবুক মারা হয় তার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা রুজু হলে রামমোহন সম্পাদকীয় লিখলেন। Calcutta Chronicle-এ তার ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়। —(শুধু এই রকম বিষয় নয়, ধ্বনি-বিজ্ঞানের অন্তর্গত প্রতিধ্বনিতত্ত্ব, চুম্বকের ধর্ম, মাছের আচরণ, বেলুনের বিবরণ ইত্যাদি নানা বিষয়েও রামমোহন তাঁর কাগজে লিখতেন)।

১৮২৩-এর প্রেস অ্যাক্ট চালু হতে রামমোহন এর বিরুদ্ধে সরব হলেন। রামমোহন বললেন, গভর্নর জেনারেল যে এই আইন প্রবর্তন করলেন যে অতঃপর কেউ হলফ না করে লাইসেন্স না নিয়ে কাগজ ছাপাতে পারবে না—আবার হলফ নিলেও গভর্নমেণ্ট যে-কোনো সময় লাইসেন্স ফিরিয়ে নিতে পারবেন এবং এই আইন যে সুপ্রীম কোর্ট অনুমোদন করলেন—এর পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি বাধার জন্য তিনি কাগজ বন্ধ করলেন।

সেগুলি এই :

১। চীফ সেক্রেটারির কাছে যার পরিচয় আছে সে যেতে পারে কিন্তু

উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে সবাই যেতে পারে না— দারওয়ানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়— এটা মেনে নেওয়া যায় না। কথায় আছে :

আব্রু কে বা-সদ্ খুন্-ই জিগরদস্ত দিহদ
বা-উমেদ্-ই করম্-এ খাজা, বা দ্বারবান্ মা ফরোশ।

যে সম্মান শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে কেনা, ওহে মহাশয়, কোনও অনুগ্রহের আশায় তা দারোয়ানের কাছে বিক্রি করো না।

২। এ সমাজে স্বেচ্ছায় হলফ নেওয়া অসম্মানকর। তা ছাড়া কাগজ বার করার এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই যার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করবার মত বে-আইনী গর্হিত কাজ করতে হবে।

৩। অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি বরণ করে এবং শপথ গ্রহণ করে অসম্মান-ভাজন হয়েও নিষ্কৃতি নেই। গভর্ণমেণ্ট এরপরও লাইসেন্স ফিরিয়ে নিতে পারেন। ফলে লোক সমাজে অপদস্থ হওয়ার আশঙ্কা রইল। মানুষ ভ্রমশীল, তা ছাড়া সত্য কথা বলতে গিয়ে এমন ভাষা প্রযুক্ত হতে পারে যা গভর্ণমেণ্টের অপ্রীতিকর। তাই মৌনব্রত অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করলাম।

গদা-এ গোশানশিনী ! হফিজা ! মাথরোশ,
রুমজ্-ই-মস্‌লিহৎ-এ খেশ খুসরোয়ান দানন্দ।

হাফিজ তুমি কোণ ঘেঁষা ভিখারি মাত্র! চুপ করে থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

প্রেস আইন সংক্রান্ত অর্ডিনান্স বার হতেই রামমোহন এর যৌক্তিকতা নিয়ে সুপ্রীমকোর্টে প্রশ্ন করতে তখনকার সুপ্রীমকোর্টের (অস্থায়ী) বিচারপতি স্যার ফ্রানসিস ম্যাকনটনের নির্দেশে একটি memorandum পেশ করলেন। কিন্তু বিচারপতি শেষ পর্যন্ত অর্ডিনান্স চালু রাখার পক্ষেই নির্দেশ দিলেন। ফলে এটা আইন হিসাবে চালু হল।

সুপ্রীম কোর্টে রামমোহন পক্ষের ব্যারিস্টার মিঃ টারটন (Mr. Turton) বলেছিলেন :

"A very short time after my arrival in the country an Act was passed by the Government which met with the general reprobation of those who were governed, but no one came forward with the manliness and

boldness that Rammohan did to express his sentiment in the odious measure. A man born and brought up in Britain could not have come forward more completely heart and soul in support of that which was the cause of his country; than what Rammohan did in 1823.

এই স্মারকপত্রে যা লেখা হয়েছিল তা রামমোহনের রচনাবলীতে পাওয়া যাবে। দেখা যাবে এর ভাষা খুবই উদ্দীপিত। শুধু এই স্মারকপত্র নয়, সুপ্রীম কোর্টে তাঁর আবেদন নাকচ হয়ে গেলেও রামমোহন আরো কয়েকজনের স্বাক্ষরসমেত আগের মতো ইংলণ্ডে স-কাউন্সিল রাজার আর-একটি ৫৪টি অনুচ্ছেদসমেত আপীল স্মারকলিপি পাঠালেন। কাজ অবশ্য তাতেও হয় নি। কেবল প্রতিবাদস্বরূপ মীরাৎ-উল্-আখ্বার তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রয়ে গেল কেবল উদ্দীপিত ভাষায় সেই স্মারকলিপি দুটি— যার একমাত্র তুলনা মিলটনের Areopagitica.

রামমোহন বিলাতে চলে গেলেন ১৮৩০ খৃস্টাব্দে আর তাঁর দেহান্ত হল ১৮৩৩-এ।

১৮২৩ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে আরো কয়েকটি কাগজের সঙ্গে তাঁর পরোক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ১৮২৯-এ শল্যচিকিৎসক মণ্টগোমারী মার্টিন দ্বি-সাপ্তাহিক বেঙ্গল হেরাল্ড (Bengal Herald) বার করেছিলেন। এর পার্টনার ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মণ্টগোমারী মার্টিন এবং রামমোহন রায়। এর বাংলা সংস্করণের নাম ছিল 'বঙ্গদূত'। নীলরত্ন হালদার নামে রামমোহনের একজন সহচর তার ভার নিয়েছিলেন। Bengal Herald অবশ্য Bengal Hurkaru-র সঙ্গে মিশে যায়। তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারা অনুকরণ করে পরে পরে The Reformer, The Pioneer, জ্ঞানান্বেষণ, সর্বতত্ত্বদীপিকা এইগুলি বেরিয়েছিল।

এই হল মোটামুটি রামমোহনের সঙ্গে সে আমলের সংবাদপত্রের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের মধ্যে আধুনিক যুগ ও যন্ত্রকে বরণ করে নেওয়া, তাকে ব্যবহার করা এবং প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য নিয়ত চেষ্টিত থাকার যে পরিচয় ধরা পড়ে— সংবাদপত্রের প্রচার ও প্রসারে তাঁর যে নিয়ত চিন্তা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তিগত সম্মানবোধ থেকে তাঁর যে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ছবি ফুটে ওঠে তাতেই বুঝতে পারি যে এ মানুষটি যদি ধর্ম আন্দোলনে ব্রতী

না হতেন, যদি সতীদাহপ্রথা নিরোধের জন্য চেষ্টা নাও চালাতেন, যদি ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের জন্যও চেষ্টা না করতেন— তবু কেবল সংবাদপত্রের কারণেই তিনি এদেশে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

এ প্রবন্ধ লিখতে কলেট-কৃত রামমোহনের জীবনী ছাড়াও নিচের বইগুলি থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত হয় নি এমন বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। এখানে কেবল বিশেষ উল্লেখ্যগ্রন্থের নাম করা হল।

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত রামমোহন সম্পর্কিত আলোচনাচক্রের বক্তৃতামালার অংশ।

বৈয়াকরণ রামমোহন রায়

নির্মল দাশ

রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণের দুটি সংস্করণ : ইংরেজি ও বাংলা। ইংরেজি সংস্করণটি 'Bangalee Grammar in the English Language' নামে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে, আর বাংলা সংস্করণটি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা বইটিকে আপাততঃ ইংরেজি বইটির ভাষান্তর বলে মনে হলেও বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাসে দুটি সংস্করণেরই পৃথক গুরুত্ব আছে, কারণ দুটি ব্যাকরণ বাংলা ব্যাকরণের দুটি ধারার সঙ্গে সংযুক্ত, এবং দুটি বইতে ভাষাবিচারের ব্যাপারে যে সূক্ষ্ম তারতম্য আছে রামমোহনের ভাষা-তাত্ত্বিক কৃতিত্ব বিচারে তার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যাক।

বাংলা ভাষা বাঙালির নিজস্ব সম্পদ হলেও তার ব্যাকরণ-বই লেখার সূত্রপাত বিদেশীদের উদ্যোগে। ইতিহাস থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, বাংলায় আগত পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে বাংলা শেখেন এবং সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রণয়নে সচেষ্ট হন। এ ব্যাপারে বিশদ তথ্য পাওয়া না গেলেও এটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে পর্তুগীজ যাজকেরাই সর্বপ্রথম তাঁদের নিজেদের ভাষায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লেখেন এবং পর্তুগীজ যাজক মানোএল দা আসসুম্পসাঁও-এর ব্যাকরণ ও শব্দকোষই (১৭৪৩) এই উদ্যোগের এ-যাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন। এর পর ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজরা এ দেশের ভাষা শেখার ব্যাপারে মনোযোগী হয় এবং সেই সূত্রে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সংকলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ব্রিটিশ উদ্যোগে রচিত বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের 'A Grammar of the Bengal Language' (১৭৭৮) কালানুক্রমিক ভাবে সর্বপ্রথম। ইতিহাসের দিক থেকেও এই ব্যাকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ মানোয়েলের পর্তুগীজ ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ পরবর্তীকালে অনুসৃত হয় নি, কিন্তু হ্যালহেডের ব্যাকরণ ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনার একটি ধারাবদ্ধ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত হ্যালহেডকে অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে কেরি (১৮০১।১৮০৫।১৮১৫।১৮১৮),

হটন (১৮২৩) প্রমুখ ব্যক্তি ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, এবং হ্যালহেড-কেরি-হটনকে ধরেই ইংরেজিতে রচিত বাংলা ব্যাকরণের ধারাটি বিকাশ লাভ করে। বাংলা ব্যাকরণের অপর ধারাটি বাংলা ভাষায় লেখা বাংলা ব্যাকরণের ধারা। এই ধারার সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, যখন তদানীন্তন দেশীয় শিক্ষাবিদেরা দেশীয় ছাত্রদের মাতৃভাষার মান্য (standard) রূপটি শেখাবার প্রয়োজন বোধ করেন। এই প্রয়োজন আগে অনুভূত হয় নি, স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত (১৮১৭) হবার পর সোসাইটির ইংরেজি জানা সদস্যরা অনুভব করেন যে, ইংরেজ শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন ইংরেজিতে ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ প্রচলিত আছে, তেমনি বাঙালি ছাত্রদের জন্য বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যে রাধাকান্ত দেব ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' প্রকাশ করেন এবং প্রায় একই সময়ে (১৮২০) 'স্পষ্ট প্রশ্নোত্তর ধারাতে' রচিত রেভারেণ্ড কীথের 'বঙ্গভাষার ব্যাকরণ' বইটি প্রকাশিত হয়। কীথ ও রাধাকান্তর প্রয়াসকে অবলম্বন করেই বাংলায় রচিত বাংলা ব্যাকরণের ধারাটি বিকশিত হয়েছে (এখানে বলা দরকার, গত শতকের প্রথম দশকে কেরির ইংরেজিতে রচিত বাংলা ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮০৫) বঙ্গানুবাদ তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় বাংলার বৃহত্তর শিক্ষাজগতে এই বঙ্গানুবাদ ব্যবহৃত হয় নি)।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের দুটি ব্যাকরণ বাংলা ব্যাকরণের দুটি ধারার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে রামমোহন শুধু পূর্বাগত ধারাগুলিকেই সম্প্রসারিত করেন নি, স্বকীয় মৌলিকতায় তাদের সমৃদ্ধতর করেছেন। প্রথমত ইংরেজি ধারাটির কথা ধরা যাক। ইংরেজি ধারার প্রবর্তক হ্যালহেড ভাষাবিচারে সমসাময়িক কথ্য বাংলা অবলম্বন না করে দু-তিনশো বছরের পুরনো বাংলা কাব্যভাষা অবলম্বন করেছিলেন, অন্যদিকে কেরির প্রথম সংস্করণে সমসাময়িক কথ্যভাষা অবলম্বিত হলেও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তিনি কথ্য ভাষার বদলে লেখ্য সাধুভাষার দিকেই ঝুঁকে পড়েছিলেন, হটনেও এই প্রবণতার অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, প্রখর বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন রামমোহন বুঝেছিলেন যে, যে-সব ইংরেজ প্রশাসক বা ব্যবসায়ী বাংলা শিখবেন তাঁদের বাংলা শেখার উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্য-পাঠ নয়, বাংলার জনজীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ, এবং এ কাজে সাহিত্যবদ্ধ

সাধুভাষার বদলে লোকপ্রচলিত কথ্যভাষাই সবচেয়ে সহায়ক। এজন্য তিনি তাঁর ব্যাকরণে বাংলার কথ্য ও নিজস্ব উপাদানের বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছিলেন, যা তাঁর পূর্ববর্তী বিদেশী বৈয়াকরণদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। রামমোহনের এই বাস্তবসম্মত ভাষাবিশ্লেষণ পরবর্তীকালে ইংরেজিতে রচিত বাংলা ব্যাকরণগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'র আগে এ বিষয়ে বাংলায় যে দু-একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে, ব্যাকরণ হিসেবে সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নয়। রাধাকান্ত দেবের বইতে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে বাংলা ভাষার বিষয়ে কতকগুলি নিতান্ত প্রাথমিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে, আর কীথের বইতে প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত উত্তরের দিক থেকে উত্থাপিত বলে বাংলা ভাষার বিশদ পরিচয় তাতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, গদ্যলেখক এবং সংবাদপত্রসেবী হিসাবে রামমোহন বাংলা গদ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থে'র (১৮১৫) ভূমিকাতেও তিনি সমকালীন গদ্য তথা লেখ্য ভাষার দুরবস্থাব কথা উল্লেখ করে বাংলা বাক্যগঠনবিধির আদর্শ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং একজন সচেতন গদ্যলেখক হিসাবে বাংলা গদ্য ভাষার দুর্গতিমোচনেব জন্য কিছু বিধিব্যবস্থা (prescription) তাঁর মনের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' তারই লিখিত অভিব্যক্তি। রামমোহনের ব্যাকরণ তাই তাঁব সচেতন ভাষাচিন্তার পরিণাম।

সমকালীন অন্যান্য বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে প্রথম যে ব্যাপারে রামমোহনের ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় তা হল সংজ্ঞা ও পরিভাষার অভিনবত্ব। তাঁর পূর্ববর্তী বিদেশী বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণের উল্লেখ করলেও তাদের তত্ত্বগত সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু বহুভাষাবিদ্ হিসাবে রামমোহনের হয়তো ধারণা হয়েছিল যে ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণের সংজ্ঞা-গুলি তাত্ত্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট থাকলে ভাষা সম্পর্কে তাদের দ্রুত ধারণা জন্মাবে। এইজন্য ব্যাকরণে তিনি প্রত্যেকটি প্রকরণের অল্পবিস্তব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই ব্যাখ্যায় কোথাও সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্বজনবিদিত সংজ্ঞা ও পরিভাষা গ্রহণ করেছেন, কোথাও আবার বাংলা ভাষার প্রকৃতির প্রয়োজনে নতুন সংজ্ঞা ও পরিভাষা রচনা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ভাষার উৎপত্তি নিয়ে তাঁর আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও সেকালের বৈয়াকরণ-সমাজে অকল্পনীয়। অন্যান্য বৈয়াকরণেরা

শুধু ভাষা-বিশেষের নিয়মাবলী দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করেন, এজন্য তাঁদের ব্যাকরণ শুরু হয় বর্ণ ও উচ্চারণ-প্রক্রিয়া দিয়ে, কিন্তু রামমোহনের আলোচনা শুরু হয় আরো পেছন থেকে—ধ্বনি, ধ্বনির বিবিধ রূপান্তর, ধ্বনির সঙ্গে ভাষা ও অক্ষরের সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ দিয়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত আধুনিক। তাঁর দেওয়া ব্যাকরণের সংজ্ঞাও অত্যন্ত প্রগতিশীল। তাঁর মতে : 'Grammar ব্যাকরণ explains the principles on which conventional sounds or marks are composed and arranged to express thoughts' অর্থাৎ ব্যাকরণ তাঁর মতে ঔচিত্যমূলক নয়, ব্যাখ্যামূলক।

প্রথম অধ্যায়ে বাংলা বর্ণমালার বিবরণ, উচ্চারণশুদ্ধি ও লিপিশুদ্ধি বিষয়ে আলোচনা আছে। তাতে সংস্কৃতের অনুসরণে স্বর ১৬+ব্যঞ্জন ৩৪টি নির্দেশ করলেও ণ্, ষ্, ষ্, ঋ, ৠ, ৯, ৡ-কে কেবল সংস্কৃতমূল শব্দের ক্ষেত্রেই ব্যবহার্য বলে নির্দেশ করেছেন। উচ্চারণ প্রকরণে সন্ধির আলোচনা থাকলেও সন্ধির বিশদ নিয়মাবলী বর্জিত হয়েছে এবং সন্ধি সম্পর্কে আগ্রহী পাঠককে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়বার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অথচ সমকালীন কেরির ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণে সন্ধি ছিল না, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে নতুন করে সন্ধি সংযোজিত হয়েছে। শুধু কেরি নয়, তখনকার অন্য কোনো বৈয়াকরণই বাংলা ব্যাকরণে সন্ধিপ্রকরণের আলোচনা বাদ দেবার কথা ভাবতে পারেন নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে case, number, gender আলোচিত হয়েছে। এখানে তাঁর মৌলিকতা লক্ষণীয়। সমকালীন কেরি সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে সমস্ত পদকে তিনভাগে ভাগ করেছেন, কিন্তু রামমোহন সমস্ত পদকে substantive 'বিশেষ্য' ও attributive 'বিশেষণ'-ভেদে দুভাগে ভাগ করেছেন এবং বিশেষ্য ছাড়া ক্রিয়াসহ অন্য সমস্ত পদই বিশেষণের অন্তর্গত। এই ধরনের শ্রেণীবিভাগে তিনি যে তখনকার প্রচলিত ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ অনুসরণ করেছিলেন সে কথা পাদটীকায় স্বীকার করেছেন। বিদেশী পদ্ধতিতে পদবিভাগ করতে গিয়ে তিনি যে-সব বাংলা পরিভাষা নির্মাণ করেছেন তার সবগুলি পরবর্তী কালে গৃহীত হয় নি, তবে তাঁর প্রয়াস তাঁর সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ প্রশংসনীয়।

তাঁর অভিনবত্বের সব চেয়ে ভালো নিদর্শন পাওয়া যায় case-এর আলোচনায়। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে case-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'কারক' এবং সংস্কৃতের অনুসরণে কারক ছয় রকম ও ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয়হীনতার জন্য

সম্বন্ধ কারকশ্রেণীতে অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু রামমোহন case শব্দটিকে বিদেশী অর্থে গ্রহণ করে বিদেশী প্রযোগ-তাৎপর্য অনুসারে তার বাংলা নাম দিয়েছেন 'পরিণমন'। তিনি case-এর ক্ষেত্রে শুধু ক্রিয়ার সঙ্গেই নামপদের সম্পর্ক স্বীকার করেন নি, বিদেশী রীতি অনুসারে নামপদের সঙ্গে নামপদের case-সম্পর্ক স্বীকার করে সম্বন্ধকেও case-এর শ্রেণীভুক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "ইংরেজি case শব্দটি এসেছে লাতীন casus থেকে (শব্দটি গ্রীক ptosis-এর লাতীন অনুবাদ)। casus-এর মূল অর্থ ধরে রামমোহন case-এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'পরিণমন'। এ ক্ষেত্রে রামমোহন সংস্কৃত বৈয়াকরণদের পরিবর্তে প্রাচীন গ্রীক বৈয়াকরণদের মতই অনুসরণ করেছেন। এই মতে, কর্তৃকারকে নামপদটির যেন 'খাড়া, উন্নত বা দণ্ডায়মান অবস্থান' (casus rectus ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'খাড়া পতন'), এর পাশে অন্যান্য case বা কারকগুলি হচ্ছে oblique অর্থাৎ তির্যক বা পতনের নিদর্শন। এই ব্যাখ্যা ধরেই রামমোহন ইংরেজি বইতে case-এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'পরিণমন'। আর বাংলা বইতে 'পরিণাম'" (ব্যাকরণকার রামমোহন: তত্ত্বকৌমুদী, মাঘোৎসব সংখ্যা, ১৩৭৩, পৃ ২২)।

Case-এর শ্রেণীবিভাগেও নতুনত্ব আছে। সাধারণভাবে বাংলা ব্যাকরণে কারকের সংখ্যা ছয়টি, কিন্তু রামমোহনের মতে "In Bengali, case may be reduced to four ; the nominative, accusative, locative and genitive"। স্বতন্ত্র বিভক্তির অভাবে করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও সম্বোধন case-শ্রেণীভুক্ত নয়। কর্মের রূপ দেখাতে গিয়ে রামমোহন বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া, কর্তৃকারকের আলোচনায় (রামমোহনের পরিভাষায় Nominative = অভিহিত পদ) সামাজিক অবস্থান অনুসারে নাম পদের কী কী রূপান্তর ঘটে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বচন, লিঙ্গ ও প্রত্যয়ের আলোচনাতেও তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন-ঘনিষ্ঠতার পরিচয় আছে. সেইজন্য উদাহরণে সংস্কৃতের চেয়ে বাংলা দৃষ্টান্তের অনুপাত বেশি।

সমাস-প্রকরণ নূতন পদ্ধতিতে আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে অর্থের দিক থেকে বিভিন্ন পদের সন্নিকর্ষ বিচার করে সমাসের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। কিন্তু রামমোহন সংস্কৃত ব্যাকরণের শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীনাম গ্রহণ করেন নি। তিনি সমাসের শ্রেণী-বিভাগে সমস্যমান পদসমূহের

অর্থসন্নিকর্ষ ছাড়াও 'সমস্ত'পদের রূপের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন এবং তদনুযায়ী সমাসকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: (১) 'a noun in the nominative form' + 'a passive participle', যথা: হাতভাঙা; (২) পূর্বপদে 'the nominative form is substituted for the genitive or locative case'+উত্তর পদ 'though in the nominative form, may end in either এ, ও, or আ', যথা: তালপুকুরে, কানতুলসে; (৩) বিশেষণ+বিশেষ্য, 'সমস্ত'পদ 'though in the nominative form, ends in ও or এ', যথা: মিষ্টমুখো, কটাচুলে; (৪) 'Compounded of two words, generally signifying mutual or vehement action, having the final vowel changed into ই', অর্থাৎ ব্যতিহার বহুব্রীহি, যথা: মারামারি, হাতাহাতি, ইত্যাদি। সমাস পর্যায়ের শেষে পদাশ্রিত নির্দেশক ও শব্দদ্বৈত আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সর্বনামের আলোচনায় বাংলা সর্বনামের লেখ্য রূপ ও কথ্য রূপের পার্থক্য তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে বিশেষণের আলোচনাতেও সংস্কৃত উপাদানের বাহুল্য বর্জন করেছেন এবং এ ব্যাপারে আগ্রহী পাঠককে Dr. Wilson-এর Sungskrit Dictionary পাঠের পরামর্শ দিয়েছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'আখ্যাতিক পদ' তথা ক্রিয়াপদের আলোচনাতেও তিনি নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃতে mood-এর পৃথক আলোচনা নেই, রামমোহন mood-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ক্রিয়ার 'mode' (mood)-এর নাম দিয়েছেন 'প্রকার'। তাঁর সমকালীন কেরিও mood-প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, কিন্তু তিনি moodগুলির প্রতিশব্দ হিসাবে যে-সব পরিভাষা নির্মাণ করেছেন সেগুলি অর্থের দিক থেকে এত জটিল ও অনির্দিষ্ট যে তাতে অভিপ্রেত অর্থ সহজে ধরা পড়ে না, পক্ষান্তরে রামমোহনের পরিভাষা যথার্থবাদী। ক্রিয়ারূপের গঠন দেখাতে গিয়ে তিনি কথ্য ভাষায়, পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় ও পদ্যে ব্যবহার্য রূপান্তরগুলি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে 'ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ' (Participles), অষ্টম অধ্যায়ে 'বিশেষণীয় বিশেষণ' (adverb), নবম অধ্যায়ে 'সম্বন্ধীয় বিশেষণ' (preposition), দশম অধ্যায়ে 'সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ' (Conjunctions) ও একাদশ অধ্যায়ে 'অন্তর্ভাব বিশেষণ' (Interjections) সম্পর্কে আলোচনা আছে। আলোচনার পক্ষপাত বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদানের দিকে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে Syntax বা 'অন্বয়ে'র আলোচনায় মোটামুটি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রণীত নিয়মাবলীরই পুনর্নির্দেশ করেছেন। এই পর্যায়ে তিনি যে-সব নিয়ম নির্দেশ করেছেন তার সবগুলিই হয়তো কঠোরভাবে অনুসরণযোগ্য নয়, তবু বাংলা গদ্যের সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার যুগে তাঁর প্রয়াস অনেকখানি গঠনমূলক। অন্বয়ের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বাংলা ইডিয়মের কথা এসে পড়েছে। বাংলা ইডিয়মে হিন্দুস্থানীর মাধ্যমে আগত পারসী প্রভাবও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। ইডিয়মের আলোচনা বিশদ না হলেও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

বিষয়বস্তু, অধ্যায়সংখ্যা ও পরিচ্ছেদ-বিভাগের দিক থেকে ইংরেজি সংস্করণ ও বাংলা সংস্করণের মধ্যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়, তবে সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে বাংলা সংস্করণকে ইংরেজি সংস্করণের অবিকল বঙ্গানুবাদ বলা চলে না। ইংরেজি বইটি বয়স্ক বিদেশীদের জন্য রচিত, আর বাংলা বইটি অল্পবয়স্ক বাঙালি ছাত্রদের জন্য রচিত। এই উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের জন্য দুই সংস্করণে কিছু অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পার্থক্য উচ্চারণ-প্রকরণের আলোচনায়। ইংরেজি বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত তৃতীয় পরিচ্ছেদ ও বাংলা বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের ৩ প্রকরণের তুলনা করলেই এই পার্থক্য ধরা পড়ে। বাঙালির পক্ষে বাংলা ধ্বনির উচ্চারণ কতকাংশে সহজাত এবং অনেকাংশে আশৈশব পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত। সেজন্য বাঙালি ছাত্রদের পক্ষে বাংলা ভাষার উচ্চারণ-প্রকরণের বিস্তৃত আলোচনার তেমন প্রয়োজন নেই, কিন্তু বিদেশীদের পক্ষে বাংলা ভাষার উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য বাংলার চেয়ে ইংরেজি বইতে রামমোহন এ ব্যাপারে কিছু অতিরিক্ত অভিনিবেশ দিয়েছেন। দুই সংস্করণের আর-একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ক্রিয়ারূপের বিচার-ক্ষেত্রে। ইংরেজি বইতে বিদেশীদের প্রয়োজন বিবেচনা করে বাংলা ক্রিয়াপদের লেখ্য সাধু রূপের সঙ্গে পাদটীকায় তার কথ্য রূপগুলি নির্দেশ করেছেন, কিন্তু বাঙালি ছাত্রদের বাংলা ব্যাকরণ পাঠের লক্ষ্য মাতৃভাষার শিষ্ট মান্য রূপটির পরিচয় লাভ, এজন্য বাংলা বইতে ক্রিয়াপদের কথ্য রূপান্তরগুলি বর্জিত হয়েছে। এ ছাড়া, আর একটি ব্যাপারেও দুই সংস্করণের মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়— সেটি পরিভাষা রচনায় ইংরেজি বইয়ের চেয়ে বাংলা বইয়ের আপেক্ষিক পরিপূর্ণতা। ইংরেজি বইতে তিনি প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করেছেন, যেগুলি অবশিষ্ট ছিল বাংলা বইতে সেগুলি

স্থান পেয়েছে। এজন্য কোথাও তিনি ইংরেজি পরিভাষার আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, কোথাও সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত পরিভাষা সংগ্রহ করেছেন, কোথাও বা ইংরেজি ব্যাকরণের ভাব বজায় রেখে বাংলায় তার জন্য সংস্কৃত নিরপেক্ষ নতুন পরিভাষা রচনা করেছেন।

তবে আশ্চর্যের বিষয়, রামমোহন বাংলা সংস্করণে দেশীয় ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে কিছু কিছু পরিবর্তন করলেও উনবিংশ শতাব্দীর স্কুলের পাঠ্যতালিকায় তাঁর ব্যাকরণ ক্রমশ বর্জিত হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর ব্যাকরণ যেসব বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় গৃহীত হয়েছিল সেই-সব বিদ্যালয়ে মূল ব্যাকরণ বেশি দিন অপরিবর্তিতভাবে পঠিত হয় নি। বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য অনতিবিলম্বে মূল ব্যাকরণের একখানি সংক্ষেপিত ও ইতস্ততঃ পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছিল (১২৪৭ বঙ্গাব্দ)। রামমোহনের মূল রচনা সম্পর্কে সমকালীন শিক্ষা-জগতের এই পরিবর্তনশীল মনোভাব থেকে বোঝা যায় সমকালীন শিক্ষাজগতে তাঁর মূল রচনা ক্রমশই অনুপযোগী বিবেচিত হচ্ছিল। এই বিবেচনার কারণ তাঁর রচনার অযোগ্যতা নয়, সমকালীন শিক্ষা-জগতে বাংলা ভাষা-শিক্ষার পরিবেশের পরিবর্তন। রামমোহনের ব্যাকরণে বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্য দিকে দেশীয় বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা-শিক্ষণে সংস্কৃত পণ্ডিতদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে বাংলা ব্যাকরণের পাঠ্যসূচীতে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বেড়ে চলছিল। এজন্য রামমোহনের ব্যাকরণের পুনর্বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পুনর্বিন্যাস বা সংক্ষেপীকরণেও রামমোহনের রচনার মৌল চরিত্রটি পরিবর্তিত হয় নি, এজন্য বাংলা শিক্ষার সংস্কৃতানুগামী পরিবেশে তাঁর ব্যাকরণ উত্তরোত্তর উপেক্ষিত হয়েছে। বহুদিন পর গত শতকের শেষ দিকে ও বর্তমান শতকের গোড়ায় যখন বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদান ও প্রকৃতি নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনার সূত্রপাত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ পেশাদার ও অপেশাদার ভাষা-আলোচকদের রচনায় রামমোহন পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন। ব্যাকরণ-চর্চার ব্যাপারে রামমোহনের প্রতি একদিকে নিকটবর্তী উত্তরকালের সাময়িক উপেক্ষা এবং অন্য দিকে দীর্ঘকাল-ব্যবহিত পুনরভ্যর্থনায় বোঝা যায় যে সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার প্রভৃতি অন্যান্য প্রগতিশীল কর্মের মতো ভাষাচিন্তাতেও রামমোহন তাঁর নিজের সময়ের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।

পুনরায় রামমোহন

চিত্তব্রত পালিত

যুগন্ধর রামমোহন ভারতের নতুন যুগের ধারক ও বাহক হিসেবে কিংবদন্তীর নায়ক। তাঁর নতুন চেতনা কি ব্রিটিশ যুগের অভিনব ভাবধারার অভিঘাতের ফসল না চৈতন্যদেবের কাল থেকে যে চেতনাপ্রবাহ ফল্গুধারার মতো প্রবহমান ছিল তারই সংহত চৈতন্য? চৈতন্যের মানবধর্ম, আউল-বাউল, সহজিয়া, সত্যপীর ইত্যাদি মরমী উপাসক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উদারতা ও সমন্বয়ী সাধনা কি রামমোহনের পশ্চাৎপট রচনা করে নি? এর সঙ্গে আছে তাঁর পাটনায় আরবী-ফরাসী শিখে মুতাজিলা ইলম-উল-কালাম, কোরাণ শরীফ ও সুফী দর্শনের সার সংগ্রহ, বেনারসে বেদ-উপনিষদের চর্চা, তিব্বতে তন্ত্র পরিক্রমা এবং ত্রিপিটকের তথা বজ্রসূচীর পাঠ্যসূচী। প্রাচ্যজ্ঞানের ত্রিবেণী সংগম ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির গভীর ছাপ পড়েছিল তাঁর জীবনে। অধ্যয়নের কাল উত্তীর্ণ হবার পর চাকরি ও ব্যবসায় সূত্রে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের চর্চা করেন তিনি। পরিণত বয়সে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন এবং খৃস্টধর্মের প্রগাঢ় পাঠ নেন। তবু প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বের পাঠক্রমই রামমোহনকে পরিণতমনস্ক করেছিল। তিনি সেই সময়েরই দ্বিতীয় দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান। ব্রিটিশ যুগের সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে রামমোহনের চিৎপ্রকর্ষের অভ্যস্ত তত্ত্ব মানতে দ্বিধা হয় যদিচ পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁর মানসকে সমৃদ্ধ করেছিল। তাঁর তুহ্‌ফাত্‌-উল-মুয়াহিদীন প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বের বৈদগ্ধ্যের ফলশ্রুতি। ব্রিটিশ যুগেও এমন একখানি রচনা দুর্লভ। ১৮০৪ সালে ফার্সীতে লেখা এই বইয়ের আরবীতে ভূমিকা লেখা হয়েছিল। রামমোহন এর কোনো ইংরেজি তর্জমা করে যান নি। ১৮৮৪ সনে শেখ ওবেদুল্লা ওবেইদি এর ইংরেজি অনুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। যুক্তিসিদ্ধ একেশ্বরবাদ এই 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি নিবেদন' গ্রন্থের মূলকথা। বিশ্ব চরাচরের একজন স্রষ্টা ও নিয়ামক আছেন, এই ধারণা স্বতঃসিদ্ধ এবং বদ্ধমূল মানুষের মনে। কিন্তু যত মত তত পথ। অভ্যাস ও চর্চার ফলে গোঁড়ামির সৃষ্টি হয়। পরস্পরবিরোধী সব মতগুলিই সত্য হতে পারে না। কোন একটিকে সত্য বলাও অযৌক্তিক। তাই সব ধর্মীয় মতেই মিথ্যার প্রশ্রয় আছে

মানতেই হয়। আস্তিক মনে ধর্মীয় আচার বিচার সহস্র নিষেধের বেড়াজাল রচনা করায় স্বাভাবিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অলীক, ঐন্দ্রজালিক তত্ত্ব আশ্রয় করে বিধাতার যুক্তিগ্রাহ্য সরল ভুবনকে প্রহেলিকাময় করে তোলে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। এই চিন্তার আলোড়ন বাইবেলে নেই, হিউমেও নেই, কারণ এই যুক্তিনিষ্ঠ আস্তিকতা তিনি ইসলাম থেকে আত্মস্থ করেছিলেন মুতাজিলা তর্কনির্ভর ঐতিহ্য থেকে যার প্রেক্ষিত ছিল ভারতবর্ষের সমন্বয়ী সাধনায়।

ধর্মীয় প্রসঙ্গের অপর কথা রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ ধর্মবিশ্লেষণ। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় আলোচনায় তিনি যেমন ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার তেমনই খৃস্টধর্মের অসংগতিও তাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণে বিদ্ধ। যে কালে শাসক-গোষ্ঠীর যাবতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপাদান পরাজিত ভারতীয়ের শিরোধার্য ছিল এবং খৃস্টধর্মাবলম্বী হবার ও হিন্দুত্ব বর্জন করার প্রবণতা প্রবল, সেই কালে রামমোহনের বলিষ্ঠ মত আত্মপ্রত্যয়ের উজ্জ্বল উদাহরণ, প্রথমে ডাফ্, টাইটলার আদি যত পাদ্রী রামমোহনের হিন্দু পৌত্তলিকতার সমালোচনায় উল্লসিত হন। খৃস্টের বাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখে ধর্মপ্রচারে রামমোহনকে সহায় ভাবতে শুরু করেন কিন্তু তারপর যখন খৃস্টধর্মের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায় তিনি ত্রীশ্বরবাদের বিরোধিতা শুরু করেন, তখন দুই পক্ষের লেখনীর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। রামমোহন তাঁর গভীর ধর্মজ্ঞান, যুক্তিমত্ত এবং রচনাশৈলী সংহত করে যে বিচারে বসেন তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ধার করা আলোয় পথ চলা নয়, নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলার ভারতপথিক এই রামমোহন রায়।

রামমোহনের স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষাসংক্রান্ত বক্তব্যে বিধৃত। লর্ড আমহার্স্ট‌কে লিখিত পত্রে রামমোহন জোর দিয়েছেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর, মানবিকী বিদ্যার উপর নয়। ভারতে মানবিকী বিদ্যার, বিশেষ করে দর্শনশাস্ত্রের প্রগাঢ়তা পাশ্চাত্যের মনীষীরাও স্বীকার করেছিলেন। রামমোহন এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ যে জাগতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে বৈষয়িক উন্নতির শিখরে ধাবমান, সেই জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বৈষয়িক দীনতা শাস্ত্রীয় সাফল্যকেও কৈবল্যে টেনে নিয়ে যায়। তিনি নিজে ছিলেন একাধারে বহু ভাষায় পণ্ডিত। বেশি বয়সে ইংরেজি শিখে পাশ্চাত্য বিদ্যার পাঠ

নিয়েছিলেন তিনি। একাধিক ইংরেজি বিদ্যালয় তাঁর প্রযত্নে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর সমর্থন ও প্রয়াস নগণ্য নয়। আবার বাংলা ভাষারও ভগীরথ তিনি। বাংলাভাষায় উপনিষদের অনুবাদ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা, সাংবাদিকতা ও সংগীত রচনায় তিনি বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদানকে আত্মীকরণ করে রামমোহন ভারতীয় সুষম বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত করেন। তাই তিনি দুই শতাব্দী পরেও অবিস্মরণীয়।

রামমোহন একাধিক সংবাদপত্রের জনক। 'মীরাতুল আখবর', 'ব্রাহ্মি-নিকাল ম্যাগাজিন' (বাংলায় 'ব্রাহ্মণসেবধি')। চতুর্ভাষিক 'বঙ্গদূত' (ইংরেজিতে 'বেঙ্গল হেরাল্ড'), 'সংবাদ কৌমুদী' প্রভৃতি সংবাদপত্রের মাধ্যমে রামমোহন জনমত সৃষ্টির প্রাথমিক প্রচেষ্টা চালান। 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'সমাচার দর্পণ' দেশীয় সংবাদ পরিবেশন করলেও জনমতের জন্ম দিতে ততটা সফল হয় নি। পরাধীন ভারতবর্ষে সংসদীয় ব্যবস্থা না থাকায় সংবাদপত্রের এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে ভারতীয় জনমত জানাবার মাধ্যম হিসেবে রামমোহন সংবাদপত্রের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। জনশিক্ষাও ছিল তাঁর অপর উদ্দেশ্য। চার ভাষায় সাংবাদিকতার এই আদি দৃষ্টান্ত বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। জনমতের পরিধি এতে বিস্তৃত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন তিনি। বন্ধু জেম্‌স্ সিল্ক-বাকিংহামের রাজদ্রোহের অপরাধে নির্বাসন দণ্ড হলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে বিদেশী সরকারকে সচেতন করেন। ১৮২৩ সালের প্রেস আইনের বিরুদ্ধে তিনি যে প্রতিবেদন রচনা করেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামে সেই রচনা অবিস্মরণীয় দলিল। সুশোভন সরকার এর ভাষাকে মিলটনের 'এরিওপেজিটিকা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর এই মসী দিয়ে অসির সঙ্গে যুদ্ধ রামমোহনের আধুনিক মানসিকতার পরিচায়ক এবং আজকের বুদ্ধি-জীবীকেও মোহিত করে।

দেশীয় মতামতের সংসদীয় প্রকাশের অভাব রামমোহন মেটাতে চেয়েছিলেন বিচারের ক্ষেত্রেও। দেশীয় জুরী নিয়োগের জন্য তাঁর আবেদন এই কারণেই। য়ুরোপীয়দের স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থার অধিকার বা কালা কানুনের কাছে নতি স্বীকার এর বিরুদ্ধাচরণ মনে হতে পারে। কিন্তু সেই ছাড় রামমোহনকে দিতে হয়েছিল আরো গুরুতর দেশীয় স্বার্থরক্ষার জন্য 'য়ুরোপীয়

সমর্থন লাভের আশায়'। ১৮২৮ সনে সরকার লাখিরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে উদ্যোগী হলে সেই আইন রদ করার জন্য তিনি জনমত সংগঠনে অগ্রণী হন এবং কিছু য়ুরোপীয় নীলকর ও ব্যবসায়ীকে সামিল করতে সক্ষম হন। লাখিরাজ সম্পত্তি মন্দির-মসজিদ, মাদ্রাসা-চতুষ্পাঠীর পোষকতার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। রামমোহন সাময়িক কূটনীতি প্রয়োগে বাধ্য হয়েছিলেন। আইনের শাসনের গোড়াপত্তনের কালে দেশীয় স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে রামমোহন যেভাবে তার মোকাবেলা করেছিলেন, অতীতচারী-মাত্রকেই তা বিস্ময়াভিভূত করে।

নীলকরদের পক্ষে রামমোহনের বক্তব্য বহুল সমালোচিত। কিন্তু কেবল-মাত্র খোরাকী নির্ভর, পশ্চাৎপদ কৃষি-অর্থনীতির দিকে তাকিযে রামমোহন তার উন্মোচন ও প্রগতির উপায় হিসেবে নীলকরদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর সময়ে নীলকরদের দৌরাত্ম্য নীলবিদ্রোহের প্রাক্ কালের মতো স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠেনি। পারদর্শী নীলকরদের উদ্যোগ গ্রামের উন্নতির বিধায়ক বলে তার সমকালে বহুক্ষেত্রে বিবেচিত হয়েছিল। খেজুর-তালগুড়ের উদ্যোগও ছিল উন্নতির সোপান। রামমোহন-দ্বারকানাথ নীল-চাষে তালিম নিয়ে যথেষ্ট লাভবান হন এবং গ্রামের সমৃদ্ধির পক্ষে এই চাষ সহায়ক বলে রায় দেন। তবু রামমোহন অভিজাত এবং বজ্জাত নীলকরের প্রভেদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং প্রথমোক্তদেরই স্বাগত জানান। স্থাবর কৃষি-অর্থনীতিকে জঙ্গম করার কারিগর হিসেবে নীলকরকে দেখে-ছিলেন তিনি ১৮২৪-২৮এ। নীলবিদ্রোহের ছায়ায় বিচার করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। ফলশ্রুতি তিক্ত হলেও নীলের সুদিনে রামমোহনের নীলাশ্রয়ী অর্থনীতি প্রগতিশীল বলা যায়।

ভারতীয় কৃষকের সমস্যাকে শাসকগোষ্ঠীর সামনে প্রথম তুলে ধরেন যে মনীষী তিনি রামমোহন। ভারতীয় রাজস্বব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান তাঁর বিশ্লেষণকে সারবান করেছিল। ইংলণ্ডে বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের কাছে প্রতিবেদনে (১৭৩১-৩২) তিনি কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার কারণগুলি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে পর্যালোচনা করেন। শস্যের অর্ধেক খাজনা হিসেবে নির্ধারণ করা তিনি মাত্রাতিরিক্ত বলে রায় দেন, বিশেষ করে ফসলের বীজ, লাঙল এবং পরিশ্রম দেবার পর। জমির গুণানুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে জমিকে ভাগ করে বিভিন্ন হারে সরকারি কর এবং জমিদারি খাজনা

চাইবার নীতিরও তিনি নিন্দা করেন। এর উপর মাপামাপির কারচুপিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। দরিদ্র কৃষক এই রাজস্ব ব্যবস্থায় যে কত অসহায় তার চিত্র তাঁর লেখনীতেই এমনভাবে প্রথম পাওয়া যায়। ফসল কাটার সময় শস্যের দাম কমে গেলে জমিদারের খাজনা মেটাতে গেলে প্রায় সমস্ত ফসলটাই ধরে দিতে হয়। পরিবারের ভরণপোষণ বা বীজধানের জন্য আর কিছুই থাকে না। বিচারব্যবস্থার ত্রুটিও এ প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। আদালতগুলি সংখ্যায় কম এবং দূর দূরান্তরে ছড়ানো থাকায় কৃষকের স্বার্থরক্ষায় কোনোই কাজে লাগে নি। যারা ধনী এবং প্রভাবশালী তারাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। দরিদ্র ও নিরীহ কৃষক এই ব্যয়বহুল এবং বিপজ্জনক ব্যবস্থার থেকে দূরে থেকেছে। রামমোহন এই অবিচারের প্রতিকার হিসেবে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন।

তিনি সরকারের অবশ্যকরণীয় হিসেবে রাজস্ব বৃদ্ধি থেকে একেবারে বিরত হতে বলেছেন। জেলাশাসককে, সমস্ত কৃষকের নাম, জমির পরিমাণ, খাজনার পরিমাণ পাকাপাকিভাবে নথিভুক্ত রাখতে বলেছেন। বিচারব্যবস্থা প্রজাহিতে নিয়োজিত রাখতে বলেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বৈপ্লবিক চিন্তার পরিচয় তাঁর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবিবেচনার দিকটি তুলে ধরার মধ্যে। তিনি জমিদারের হাত শক্ত করার এই অর্থনীতিকে ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন এই বন্দোবস্তে মুষ্টিমেয় লোক ধনী হয়েছেন এবং তার খেসারত দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন অগণিত দরিদ্র কৃষিজীবী। চাষীর জমিতে অধিকার মৌল অধিকার এবং কোনোমতেই হস্তান্তরযোগ্য নয়। যদি জমিদারের দেয় রাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা যায়, চাষীর খাজনা নয় কেন, এ প্রশ্ন প্রজাহিতৈষী রামমোহনের। তাঁর দাবি, যে-কোনো অন্যায় ব্যবস্থা প্রথাসিদ্ধ বলে মানা যায় না। অন্যায় দীর্ঘমেয়াদী হলেও সরকার তার নিরাকরণ করবেন, এটাই সভ্যতা। তিনি খোদকস্তা কৃষককে জমির প্রকৃত মালিক বলে বর্ণনা করেছেন। রামমোহন কৃষকদরদী হিসেবে যে মত ব্যক্ত করেছেন তাঁর পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম কৃষকের অনুকূলে এরকম, বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখতে পারেন নি। স্মর্তব্য তিনি নিজে একজন সম্পন্ন তালুকদার ছিলেন। ইংলণ্ডে গিয়ে সরকারের এমন নির্ভীক সমালোচনা রামমোহনের সম্মোহনকে তীব্রতর করেছে, পরবর্তী কালে দ্বারকানাথের বিলাতপ্রবাস স্মরণ করলেই এর তাৎপর্য বোঝা যাবে।

এও দেশপ্রেম। ব্রিটিশ-বিতাড়নের মন্ত্রোচ্চারণের চেয়ে এর মূল্য কিছু কম নয়। রামমোহন এই দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন নানা ক্ষেত্রে। পাদ্রী-পীড়িত হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় আচারসর্বস্ব আবিলতা থেকে উদ্ধার করে বেদান্তের নির্যাস নিয়ে যুক্তিমতে তার প্রতিষ্ঠার পিছনে দেশপ্রেম সক্রিয়। সতীদাহ প্রথার অনাচারে কবলিত হিন্দু সমাজের মিশনারি-সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের শাস্ত্রবিচার, সতীদাহকে অসিদ্ধ ঘোষণা এবং ধর্মসভার বিপরীতে কঠিন সংগ্রাম ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই প্রথা বিলোপের জন্য বারংবার আবেদন। সর্বশেষে প্রাণনাশের চেষ্টা উপেক্ষা করে অবিরাম আন্দোলন একাধারে মানবিক অধিকার, নারীমুক্তি এবং দেশপ্রেমের পরম পরিচয়। দেশপ্রেমের অপর নাম স্বাজাত্যাভিমান ও আত্মমর্যাদাবোধ। ভাগলপুরে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট পাল্কী থেকে তাঁকে নামতে বাধ্য করলে রামমোহন সরকারকে যে জোরালো প্রতিবাদপত্র লেখেন তাতে এই বোধ ফুটে উঠেছে। দেশে ও বিদেশে সম্ভ্রান্ত ভারতীয় পোশাকে তাঁকে দেখা যেত। আহারে বিহারেও ছিলেন খাঁটি ভারতীয়। সমকালীন ফিরিঙ্গীয়ানায় তিনি গা ভাসিয়ে দেন নি। ভারতীয় ঐতিহ্যের বরণীয় দিকগুলি সম্বন্ধে সগর্ব উল্লেখ তাঁর দেশপ্রেমের স্বাক্ষর। ডাঃ টাইটলারের সঙ্গে বিতর্কে তিনি এই ঐতিহ্য প্রসঙ্গে বলেছেন, "By a reference to history, it may be proved that the world was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge which sprang up in the East and thanks to the goddess of wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own which distinguishes us from other nations which cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners."

তাঁর হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে আহৃত তুহফাতের ধর্মীয় চেতনার মধ্যে ব্রহ্মবাদ, একেশ্বরবাদ ও যুক্তিবাদের সমন্বয় ঘটেছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানের ফলশ্রুতি এই মনীষা নয়।

দেশপ্রেমের আরেক দর্পণ জাতীয়তাবোধ এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। রামমোহনের রচনায় এর নজির কম নয়। তুহফাতের ভূমিকায় লিখেছেন, "I proceeded on my travels and passed through countries chiefly within but some beyond the bounds of

Hindoostan, with a feeling of great aversion for the establishment of the British power in India."

এরকম উক্তি তাঁর স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু রামমোহন আরো পরিণত চিন্তায় তাঁর জাতীয় মনোভাব অন্যভাবে প্রকাশ করেছিলেন। আঠেরো শতকের শেষে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের পটভূমিতে ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক সুফল লক্ষ্য করে রামমোহন সাময়িকভাবে এই শাসন মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর একান্ত সচিব আর্নটকে বলেছেন, অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর এই শাসন জনহিতের জন্যই চালু থাকা প্রয়োজন। ইংলণ্ড থেকে লেখা চিঠিতে প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, "Though it is impossible for a thinking man not to feel the evils of political subjugation and dependence on foreign people, yet when we reflect on the advantages which we have derived from our connection with Great Britain, we may be reconciled to the present state of things which promises permanent benefit to our posterity."

একই কথা বলেছেন, ভিক্তর জাঁকমঁকে, মের্টন ও ক্রফোর্ডকে। পরাধীনতার গ্লানি রামমোহনকে স্পর্শ করে নি বা স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি দেখেন নি এই অপবাদ উপরের বক্তব্যগুলি সামনে রেখে আর দেওয়া যায় না। তবু ব্রিটিশ শাসনের সাময়িক উপযোগিতার কথা বলার কারণে হয়তো নবীন চরমপন্থী ঐতিহাসিক তাঁকে ব্রিটিশের তল্পিবাহক মনে করবেন। কিন্তু মার্কসও এক বিশেষ অর্থেই এশীয় উৎপাদন নীতিতে আবদ্ধ ভারতবর্ষের প্রগতির নিয়ামক হিসেবেই ব্রিটিশ শাসনকে দেখেছিলেন। পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞানের প্রসার, বৈষয়িক উন্নতির প্রযত্ন, শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা এবং মধ্যবিত্তের বিকাশের জন্য ব্রিটিশ তত্ত্বাবধানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসঙ্গে কমিনটার্ণের নির্দেশ (১৯২০--২৮) স্মরণ করা যেতে পারে। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে থাকলে দীর্ঘায়িত ঔপনিবেশিক শাসনই শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রখর করতে পারে। এই অভিমত তাতে ব্যক্ত হয়েছে। কার্ল কাউটস্কিও এই যুক্তিতে জাতীয়

সংগ্রামকে শ্রেণীসংগ্রামের আগে স্থান দিয়েছেন। ফরাসী ইন্দোচীনে হো চি মিনের অস্থায়ী ভিয়েতমিন্ সরকার এই নীতিতেই নিয়ন্ত্রিত ছিল।

রামমোহন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে যুক্ত করে জাতীয় ভাবধারার যুক্তবেণী রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রথমাংশ মুসলমান শাসন ও সংস্কৃতির ছায়ায় লালিত হয়েছে। তিনি অভিজাত মুসলমানী পোশাক পরতেন এবং মুসলমানী খানা তাঁর প্রিয় ছিল। পাটনায় আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দীর যথেষ্ট অনুশীলন করেছিলেন এবং এই-সমস্ত ভাষায় লেখা ও বলার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। এ বিষয়ে আর্নটের সাক্ষ্য আছে। তিনি যে সময়ে অজ্ঞাতবাস করেন, তখন তিব্বত ছাড়াও পারস্যে, আরব দেশে গিয়ে থাকতে পারেন বলে অনুমান করা হয়। কোরান শরীফ এবং সুফী ধর্মগ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রাক্-ওয়াহাবী মুতাজিলা যুক্তিবাদী ধর্মচর্চায় নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁর এই যুক্তিবাদ পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যবিদ্যার চর্চার ফলে প্রখর হলেও প্রাচ্যবিদ্যারই অবদান। তুহ্‌ফাত-উল-মুয়াহ্‌হিদীন [১৮০৪] ঐস্লামিক ধর্ম ও সংস্কৃতির নির্যাস নিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা এবং সেকালের ক্রান্তিকারী গ্রন্থ। তিনি মীরাতুল আখবর সংবাদপত্র ফরাসীতে এবং বঙ্গদূত চার ভাষায় প্রকাশ করে বহুমাত্রিক ভারত-বর্ষের সর্বস্তরের জনতাকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। জাতীয় সংহতি তাঁর চিন্তায় ও কর্মে প্রকাশ পেয়েছে। খৃস্টান মিশনারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীকেই বাঁচাতে চেয়েছেন। *An Appeal to the Christian Public* গ্রন্থে তিনি স্পষ্টই লিখেছেন, "Hindusthan is a country of which nearly three-fifths of the inhabitants are Hindus and two-fifths Mussalmans—weighing these circumstances and anxious from his long experience of religious controversy with natives, to avoid further disputations with them, the Compiler selected those Precepts of Jesus, the obedience to which he believed most peculiarly required of a Christian and such as could by no means tend in doctrine, to excite the religious horror of Muhammedans or the scoffs of Hindoos..."

সাম্প্রদায়িক সহযোগিতাই যে ভারতবর্ষের হিতকর বনিয়াদ গড়ে তুলতে পারে, এ বিষয়ে রামমোহন ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে তাঁর সাক্ষ্য প্রসঙ্গে বলেছেন। তাঁর উক্তি, "The Mohammedans are more active and capable of exertion than the Hindus but the latter are also generally patient of labour and diligent in their employments."

এই সাক্ষ্যেরই আরেক প্রসঙ্গে তিনি প্রচলিত ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রাধিকারের কথা বলেছেন। "Since the criminal law has hitherto been administered by the Mohammedans, to conciliate this class, the assessors should still be selected from among them until the other classes may have acquired the same qualifications and the Mohammedans may become reconciled to co-operate with them."

১৮২৬-এর জুরী আইনের বিরুদ্ধে দরখাস্তেও তিনি দুশো একুশটি স্বাক্ষরের মধ্যে একশো ছাব্বিশ জন হিন্দু এবং পঁচানব্বই জন মুসলমানের সই নিয়েছিলেন।

অথচ এই রামমোহনই বেনারসে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, বেদান্তের বিচার করেছেন, পৌত্তলিকতার সাকার সাধনা থেকে নিরাকার ব্রাহ্মধর্মে হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। উপনিষদের বাণী অনুবাদ করে প্রচার করেছেন। ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে হিন্দুসমাজকে সচেতন করতে চেয়েছেন কিন্তু হিন্দু সমাজের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যেতে চান নি। ব্রহ্মবাদ এবং আত্মীয়সভার প্রাণপুরুষ হলেও ব্রাহ্মসমাজ গড়াতে তাঁর সায় ছিল না। হিন্দুধর্মকে যুক্তিসিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ না গড়ে রামমোহন-প্রদর্শিত ধর্ম সংস্কারের পথে গেলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ বেশি উপকৃত হত না ব্রাহ্ম-সমাজ না গড়লে তাঁর মতবাদ হিন্দু গোঁড়ামির আবর্তে বিলীন হয়ে যেত, এ বিষয় তর্কসাপেক্ষ। তবে নানা প্রতিবাদী সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়ের মত ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী রূপ রামমোহনের ধর্মীয় আন্দোলনের জোয়ারকে সংকীর্ণ খাতে সঞ্চালিত করেছিল বলে সংশয় জাগে।

সর্বধর্মের সারাৎসার থেকে যিনি বিশ্বজনীন সত্যকে নিরূপণ করেছিলেন,

তিনি জাতীয়তার ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতারও পথিক হতে পেরেছিলেন। য়ুরোপীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি নিরন্তর উৎসুক ছিলেন। চীন-গ্রীস-আয়ার্ল্যাণ্ডের সমস্যা নিয়ে তিনি সম্পাদকীয় লিখেছেন। ১৮২১-এ নেপল্‌সে বিপ্লব ব্যর্থ হলে বিষাদগ্রস্ত হয়ে তিনি সমস্ত কর্মসূচী বাতিল করেছেন। আবার লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের সাফল্য তাঁকে হর্ষোৎফুল্ল করেছে এবং তিনি ভোজসভা ডেকে সেই সাফল্যকে অভিনন্দিত করেছেন। স্পেনের সংবিধান-সংকলিত এক বই তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছে। ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব তাঁকে আত্মহারা করে তুলেছে এবং ১৮৩০-এ ইংলণ্ড যাবার পথে কেপ টাউনে তিনি ফরাসী তেরঙা পতাকাকে ফরাসী নৌবহরের উপর উড়তে দেখে ভাঙা পা নিয়ে অভিবাদন করার জন্য তৎপর হয়েছেন। ইংলণ্ডে রিফর্ম বিল আন্দোলনকে তিনি সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার লাভের সংগ্রাম বলে দেখেছেন এবং এই বিল প্রত্যাহৃত হলে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছেদ করবেন বলে সঙ্কল্প নিয়েছেন। তিনি স্বাধীন জাতিসংঘের নির্বাধ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রথম প্রবক্তা। বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং মানবিক অধিকারের আদি ঋত্বিক। তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন যেমন ছিলেন না তেমনই ধোঁয়াটে মানবতাবাদের বশবর্তী হয়ে জাতীয় চেতনা এবং ভারতমুক্তির সন্ধানেও বিরত হন নি। এইজন্যই তিনি বড়ো মাপের মানুষ এবং তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব দুশো বছর পেরিয়ে এসেও চুম্বকের মতো টানে।

রামমোহনের বাংলা ভাষায় কৃত্রিমতা ও নীরসতা এবং তাঁর সংগীতের ধর্মীয় ও ধ্রুপদী গুরুভার নিয়ে মতভেদ থাকলেও এই দুই ক্ষেত্রে এই যুগন্ধর মনীষীর প্রাথমিক অবদান নিয়ে বিতর্ক নেই। তাঁর কর্মবহুল জীবনের বিচিত্রগামী প্রতিভার নানা ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ বিচরণের ফাঁকে এই দুই বিষয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। উপনিষদের অনুবাদ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের মতো দুরূহ বিষয়ে বাংলায় আলোচনা, গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা এবং বঙ্গদূত, ব্রাহ্মণ-সেবধি, সংবাদকৌমুদী ইত্যাদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলাভাষার নির্মাণ এবং অবশেষে সংগীত রচনায় তাঁর নিপুণ প্রয়োগ বাংলাভাষাকে রসলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

ধর্মীয় প্রেরণা এবং উপযোগিতা থেকে উদ্ভূত তাঁর ব্রহ্মসংগীতকে কিন্তু

রামমোহন সুরের নিজস্ব স্বাধীন গগনে বিহার করার মতো স্বয়ম্ভরতা দিয়েছেন। কথা ও সুরের ভাবগম্ভীর মেলবন্ধন, টপ্পার লালিত্য ও চটুলতার প্রতুলতার যুগে সংগীতের এক বিশিষ্ট মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যার উত্তরসূরী।

রামমোহনের কাছে আমাদের জাতীয় ঋণ বহুমুখী এবং অপরিশোধ্য। আজ যারা প্রদীপ নিয়ে সূর্যকে দেখাতে গিয়ে অন্ধ হচ্ছেন এবং প্রদীপটিকেও নিভিয়ে ফেলছেন, এ প্রবন্ধ তাঁদের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হল।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। K. Nag and D. Barman, eds. *The English Works of Raja Rammohun Roy*, I-VI, Calcutta, 1945-51.

২। J. K. Majumdar, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India (1775-1845)*, Calcutta 1941.

৩। J. K. Majumdar, *Selections from Indian Speeches and Documents on British Rule (1821-1910). Calcutta, 1397*

৪। J. K. Majumdar and R. P. Chandra, *Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy*, Vol. I (1791-1831) Calcutta, 1938.

রামমোহনের ধর্মচিন্তা

দিলীপকুমার বিশ্বাস

সাধারণের কাছে রামমোহনের মুখ্য পরিচয় ধর্মসংস্কারকরূপে হলেও তাঁর ধর্মসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে তাঁর জীবনীকারেরা একমত হতে পারেন নি। তর্কটা উঠেছে প্রধানত তাঁর প্রকৃতির মূল প্রবণতা কোন্ দিকে ছিল তাই নিয়ে। জীবনে তিনি সমাজসংস্কার ও নানাবিধ জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বহুবিচিত্র কর্মকাণ্ডের পত্তন করেছিলেন এবং তাঁর সেই দ্বন্দ্বসংঘাতবিক্ষুব্ধ কর্মজীবনই ইদানীং যেন আমাদের দৃষ্টি কেড়েছে বেশি করে। এই সূত্রেই এমন প্রশ্ন অনেকে তুলেছেন, বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও প্রেরণাই কি তাঁর জীবনচর্যাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল? অথবা ধর্মের প্রতি ভারতবাসীর স্বাভাবিক অমোঘ আকর্ষণকে স্বীকার করে এবং এই বিশিষ্ট জাতীয় সংস্কারকে যথোচিত মূল্য দিয়ে তিনি লোককল্যাণ-রূপ লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন? সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রশ্নটি হল রামমোহনচরিত্রে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসাই মৌল উপাদান এবং সমাজচিন্তা তারই আনুষঙ্গিক না আদৌ তিনি সমাজসংস্কারক, ধর্মসংক্রান্ত অনুসন্ধান ও আলোচনা তাঁর মনের সেই বিশিষ্ট প্রবণতার পরিপূরক?

প্রশ্নটি নূতন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এটি প্রথম তোলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। কিশোরীচাঁদ রামমোহনের অনুরাগী ছিলেন এবং সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন তদানীন্তন হিন্দু কলেজের ছাত্র, সেখানকার মুক্ত চিন্তার আবহাওয়ায় সর্বাংশে তাঁর মন সমৃদ্ধ ছিল। ধর্মের সঙ্গে লোক-কল্যাণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর রামমোহন সর্বদা যে জোর দিতেন রামমোহনের ধর্মচিন্তার এই দিকটি তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই তিনি এই মতের নাম দিয়েছিলেন theo-philanthropy বা ঈশ্বর-বিশ্বাসভিত্তিক জীবসেবাকর্ম। তাঁর সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে খুব স্পষ্ট: "All speculations as to his belief in the absract truth of any religion founded on his advocacy of certain doctrines connected with it or his attendance at its place of worship, are

obviously futile. For Rammohun Roy was a religious Benthamite and estimated the different creeds existing in the world not according to his notion of their truth or falsehood, but his notion of their utility, according to their tendency, in his view, to promote the maximization of human happiness and the minimization of human misery.... He was according to our humble opinion a theo-philanthropist."। কিশোরীচাঁদের সমকালীন অক্ষয়কুমার দত্ত ও একালে স্বর্গত কাজি আবদুল ওয়াদুদের সিদ্ধান্তও অনেকটা অনুরূপ। অপরপক্ষে রামমোহন যে আদৌ এক গভীর অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এ কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রচুর তথ্য ও যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাঁর দুই জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সোফিয়া ডবসন কলেট এবং উত্তরকালে এই সিদ্ধান্ত সমর্থনে অগ্রণী হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ মনীষিবৃন্দ। এঁদের বলবার কথা ছিল, তরুণ বয়স থেকেই নানা ধর্মের মূল সত্য অন্বেষণের মধ্য দিয়ে রামমোহনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে একটি বিশুদ্ধ সার্বভৌম ও যুক্তিসিদ্ধ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। এখানে তিনি অন্যান্য সাধক ও ধর্মজিজ্ঞাসুদেব মতো উপনিষদেব যুগ থেকে সকল বাহ্য সংকীর্ণতামুক্ত অধ্যাত্মসাধনার যে ধাবা ভাবতবর্ষে প্রবাহিত তারই অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায, "এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী।" তথ্যসাক্ষ্যেও এই মতের সমর্থন মেলে। রামমোহনের বিভিন্ন সময়ের বহু উক্তি ও আচরণ থেকে প্রমাণিত হয়, ধর্ম তাঁর কাছে বিশুদ্ধ বুদ্ধির স্তরে আবদ্ধ বা মাত্র সমাজসংস্কারের অস্ত্রস্বরূপ ছিল না। 'তুহ্ফাৎ-উল মুওহাহিদিন্'-এর যুক্তিবাদে বিশ্বাস জীবনে না হারিয়েও কালক্রমে তাকে তিনি অনেকখানি সংশোধিত করেছিলেন এবং উত্তরজীবনে বিভিন্ন শাস্ত্রের ও সাধনপদ্ধতির মাধ্যমে অভিব্যক্ত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর জ্ঞানভক্তি-শ্রদ্ধাবিশ্বাসমূলক একটি গভীর ধর্মজীবন গড়ে উঠেছিল। এই অকৃত্রিম ভাবদ্বিশ্বাস ও ঈশ্বরনির্ভরশীলতা তাঁর অনেক উক্তিতে ও আচরণে

পরিস্ফুট। *Translation of an Abridgment of the Vedant* (১৮১৬)-এর ভূমিকায় তিনি লিখছেন: By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong. ....But these however accumulated I can tranquilly bear, trusting that a day will come when my humble endeavours will be viewed with justice, perhaps acknowledged with gratitude. At any rate I cannot be deprived of this consolation: my motives are acceptable to that Being who beholds in secret and compensates openly." দেখা যাচ্ছে চূড়ান্ত নির্ভরস্থল এখানে মানুষের পরিবর্তে ঈশ্বর। এর পাশাপাশি পাঠ করা যেতে পারে কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় (১৮১৭) সংযোজিত এই প্রার্থনা; "হে অন্তর্যামিন পরমেশ্বর, আমাদিগো আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয়, অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী ও সর্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর।" এই প্রার্থনা ব্যাকুলাত্মা সাধকের। ১৬ জুলাই ১৮৩১ তারিখে উইলিয়াম আলেক্জাণ্ডারকে লিখিত পত্রে তাঁর নিভৃত হৃদয়ের আর এক চিত্র প্রকাশিত: "However I thank the supreme Author and Ruler of the universe, that by a firm reliance on his goodness and overruling providence which bring good out of evil, I have been able to overcome these severe afflictions and to learn from them resignation to the Divine Will, of humility and distrust of human strength and the vain and transitory nature of wordly affairs. "Whom the Lord loveth He chasteneth"; by temporal calamities we are taught to withdraw the heart from things which are perishable and to fix it upon those which are eternal." এই উক্তি ভক্ত ও বিশ্বাসীর যাঁর দৃঢ় প্রত্যয় সমস্ত দুঃখ ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ক্রমান্বয়ে তাঁকে আরো বেশি করে নিজের কোলে

টেনে নিচ্ছেন। অন্য এক কথোপকথন প্রসঙ্গে (১৮৩২) তিনি মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে বলেন, "I would reflect how weak and poor and sinful I am, rather than how perfect in my morals and how pure and great and good I am become—Pride is not for man—worm of dust! he cannot think of himself too humbly." এই উক্তি প্রকৃত দীনাত্মার। উপাসনা ও প্রার্থনা রামমোহনের নিত্যকর্ম ছিল এমন নির্ভরযোগ্য দেশী ও বিদেশী সমকালীন সাক্ষ্য আছে। তাঁর পরিচারকের উক্তি অনুসারে উপাসনা ও প্রার্থনা দিয়ে রামমোহনের দিনযাত্রা আরম্ভ হত। ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্রী জ্যানেট হেয়ার ইংলণ্ডে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছিলেন এবং মৃত্যুশয্যায় তাঁকে সেবা করেছিলেন; তিনি বলেছেন, "He was....in a constant habit of prayer and was not interrupted in this by her presence; whether sitting or riding he was frequently in prayer. He told Miss H. that whenever an evil thought entered into his mind he prayed. She said, 'I do not believe you ever have an evil thought.' He answered, 'Oh yes, we are all liable to evil thought." দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের ধর্মচিন্তা ও ধর্মসংস্কারের মূলে একটি একান্ত ব্যক্তিগত বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রেরণা আজীবন ক্রিয়াশীল ছিল এ বিষয়ে প্রমাণের অভাব নেই। এই সত্যটিকে মেনে নিলে তাঁর সংস্কারকসত্তার সামগ্রিক মূল্যবিচার সহজ হয়। এই অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা ও তৎসংক্রান্ত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের ভূমিতে রামমোহন ভারত-ইতিহাসে তাঁর পূর্বসূরী বহু মনীষী ও সাধকের সগোত্র। এই আধিকারিক পুরুষদের সাধনার মূল লক্ষ্য ছিল সমগ্র ব্যক্তিসত্তার আমূল পরিবর্তন। তাঁদের দৃষ্টিতে ব্যক্তির এই রূপান্তরই মুখ্য; শুভকর সামাজিক পরিবর্তন এরই আনুষঙ্গিক মাত্র। সমাজসংস্কারের উপর রামমোহনের পূর্ববর্তী ধর্মগুরুরা যে কেউই জোর দেন নি, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্যই এর হেতু। রামমোহনের অন্তর্জীবনের পরিচয় আমরা যেটুকু পাই তার থেকে দেখা যায় আধ্যাত্মিকতার আলোয় ব্যষ্টিচেতনার এই পরিবর্তনকে তিনিও অগ্রাধিকার দিতেন। এখানে তিনি পূর্বসূরীদের ধারাকেই অনুসরণ

করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে এই দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতা বর্তমান যুগে উত্তরোত্তর স্বীকৃত হতে আরম্ভ করেছে। সমাজসংস্কারই হোক বা সমাজবিপ্লবই হোক, ব্যক্তিসত্তার মৌল পরিবর্তন বিনা তা সাধিত হলে পৃথিবী কোনো কালে স্বর্গরাজ্য হবে মানুষের অভিজ্ঞতাই এমন রূপকথায় মানুষের বিশ্বাস শিথিল করছে। বিশ্বাসী হোন বা নাস্তিক হোন চিন্তাশীল মনীষীরা সভ্যতার সংরক্ষণ ও অগ্রগতির জন্য মানুষের ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক পরিবর্তনকে সার্বিক সামাজিক পরিবর্তনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করছেন। এ বিষয়ে আমরা নাস্তিক-শিরোমণি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতামত উদ্ধৃত করতে পারি: "We are able to realize more fully, through music or poetry, through history or science, through beauty or through pain, that the really valuable things in human life are individual, not such things as happen in a battlefield or in the clash of politics or in the regimented march of masses of men towards an externally imposed goal. The organized life of community is necessary as mechanism, not something to be valued on its own account. What is of most value in human life is more analogous to what all the great religious teachers have spoken of." (*Power : A New Social Analysis*, Fourth Impression, 1939, p. 316.)

কিন্তু ব্যক্তিচেতনার রূপান্তরকে ভারতের অন্যান্য আধ্যাত্মিক ধর্মগুরুদের মতো অগ্রাধিকার দেওয়া সত্ত্বেও রামমোহন একটি ক্ষেত্রে এঁদের সকলের চেয়ে পৃথক ও মৌলিক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ধর্ম যেমন একদিকে কতকগুলি নিত্য অপরিবর্তনীয় দেশকালোত্তীর্ণ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি তার একটি সমাজবদ্ধ বা সামাজিক রূপও আছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও তৎসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান তার সামাজিক সত্তার মতোই পরিবর্তনশীল এবং তা সমাজবিবর্তনের নিয়মের দ্বারা শাসিত। যে লোকশ্রেয়সের আদর্শকে রামমোহন তাঁর ধর্মসংস্কারের পক্ষে আবশ্যিক মনে করেছিলেন তার মূল এইখানে। বহুদিন পূর্বে রামমোহনের ধর্মচিন্তার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী: "রামমোহন রায়ের পূর্বে আমাদের দেশে কোনো জ্ঞানী বা সাধক ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের এমন-কি আইন প্রভৃতি লোকবিধিতত্ত্বের এমন যে ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য বরাবর দেখা যায়, আমাদের দেশের ধর্মপ্রবর্তকগণ সমাজকে কোথাও ঘাঁটান নাই। সমাজকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার কৈলাসশিখরে তাঁহারা ভক্তবৃন্দকে লইয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় যেমন ধর্মের জঙ্গল সাফ করিতে লাগিয়া গেলেন তেমনি সমাজের সঙ্গে ধর্মের সেতু বাঁধার কাজেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল। এ একেবারে আধুনিক কালের ভাব।" ভারতবর্ষের ধর্মগুরুদের মধ্যে রামমোহনের অনন্যতা হল ধর্ম ও সমাজের অচ্ছেদ্য যোগবিষয়ক তাঁর এই বিদগ্ধ চেতনায়। এই দৃষ্টির মূলে পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের প্রভাব অবশ্যই ক্রিয়াশীল। ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন বলতে রামমোহন বুঝতেন জোড়াতালি দেওয়া কোনো মেরামতী কাজ নয় বা বিচ্ছিন্নভাবে হিন্দুধর্মের বহুযুগসঞ্চিত অসংখ্য কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের কোনো কোনোটির উচ্ছেদ নয়, তা সমগ্রভাবে ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন,—যেমনটি ঘটেছিল পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁস-প্রভাবিত রিফর্মেশান বা ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের বেলায়। সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তা এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি এ বিষয়ে তাঁর চিত্তকে গভীর-ভাবে আন্দোলিত করেছিল। এই মনোভাব বুঝতে তাঁর কয়েকটি উক্তি আমাদের বিশেষ সাহায্য করে। ১৮২৭ সালে লেখা এক পত্রে হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "It is I think necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort." পুনশ্চ ১৮৩২ সালে লণ্ডনে প্রদত্ত এক ভাষণপ্রসঙ্গে তাঁর উক্তি: "The struggles are not merely between reformers and anti-reformers but between liberty and tyranny throughout the world, between justice and injustice and between right and wrong."

সুতরাং ধর্মপ্রবক্তারূপে রামমোহনকে যথার্থভাবে বুঝতে গেলে প্রথমে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন তিনি ব্যক্তিগতভাবে গভীর অধ্যাত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন

পুরুষ ছিলেন এবং অন্যান্য আধিকারিক পুরুষদের মতো ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক পরিবর্তনই তাঁর ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁর চিন্তায় এবং কর্মকাণ্ডে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধর্ম ও সমাজের অন্যান্য যোগ-সম্পর্কিত একটি নিবিড় বোধ। এর ফলে তিনি প্রণোদিত হয়েছিলেন সামাজিক স্তরে লোককল্যাণকে ধর্মচর্যার আবশ্যিক অঙ্গ ভাবতে। এই দিক দিয়ে দেখলে স্বীকার করতে হয় কিশোরীচাঁদ মিত্র-প্রযুক্ত religious Benthamite, theo-philanthropist প্রভৃতি অভিধাও রামমোহন সম্পর্কে সার্থক—তবে বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, তাঁর মৌল ও গভীর অধ্যাত্ম-ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই এগুলিকে গ্রহণ করতে হবে।

রামমোহনের রচনাবলী কালানুক্রমিক ভাবে পড়লে তাঁর ধর্মবিষয়ক চিন্তার অভিব্যক্তির কয়েকটি স্তর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েকটি গ্রন্থকে এই বিষয়ে দিক্‌নির্দেশক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে প্রথম হল 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওহাহিদিন্' (১৮০৩-০৪)। আরবী ভূমিকা সংবলিত এই ফার্সী পুস্তিকা এখন পর্যন্ত রামমোহনের প্রথম রচনারূপে পরিচিত। এখানে রামমোহন ধর্মচিন্তায় একজন বিশুদ্ধ যুক্তিপন্থী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন প্রচলিত সমস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মই মিথ্যা। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত সর্ববিধ সংস্কারের নির্মম সমালোচনা করে সেগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস, অবতারবাদ, মধ্যবর্তিত্ববাদ, গুরুবাদ, গুরুপরম্পরাবাদ, প্রত্যাদেশবাদ, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, পুরোহিততন্ত্র, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুই তাঁর সমালোচনার হাত থেকে নিস্তার পায় নি। কিন্তু এখানে তাঁর সিদ্ধান্ত নেতিবাচক নয়। তিনি এই রচনায় এক স্বাধীন ও সার্বভৌম ধর্মের পরিকল্পনা করেছেন যার ভিত্তিস্বরূপ চারটি সূত্র অপরিহার্য বলে স্বীকৃত: (১) জগতের স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা, এক অদ্বিতীয় অক্ষয় অনন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস; (২) মানবাত্মার অস্তিত্ব ও পরলোকে বিশ্বাস; (৩) উক্ত দুটি প্রত্যয়ের ভিত্তিস্বরূপ মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধির (intellectual faculties and senses) এবং সহজাত স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির (intuitive faculty) কার্যকারিতায় আস্থা; এবং (৪) সর্বজনীন মানবপ্রীতির মনোভাব।

মনে রাখতে হবে 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুওহাহিদিন' যখন রচিত হয় তখন

রামমোহন ইংরেজি ভাষা শিখলেও তাঁর ইংরেজিজ্ঞান এতদূর অগ্রসর হয় নি যার সাহায্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞানদর্শনে তিনি পূর্ণ অধিকার অর্জন করতে পারেন। তবুও 'তুহ্‌ফাৎ'-এ যে শাস্ত্রনিরপেক্ষ প্রখর যুক্তিবাদের উপর ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তার সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্ত যুগের যুক্তিবাদের সাদৃশ্য বিস্ময়কর। উক্ত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী তাঁরা শাস্ত্রবিশ্বাস বা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপাদির (miracles) ধারণা-বর্জিত এক ধর্মের পরিকল্পনা করেন যাকে বলা হত নৈসর্গিক ধর্ম বা natural religion। 'তুহ্‌ফাৎ'-এর যুগে রামমোহন ছিলেন মনেপ্রাণে এই নৈসর্গিক ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু তখন পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানরাজ্য থেকে প্রেরণা লাভ করবার মতো ভাষাজ্ঞান তিনি অর্জন করেন নি। তাই এমন অনুমান নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত, 'তুহ্‌ফাৎ'-এর প্রায় প্রতি ছত্রে প্রকাশিত বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উৎস রাম-মোহনের প্রথম জীবনে সযত্নে অর্জিত ইসলামীয় বিদ্যা। এর ছাপ 'তুহ্‌ফাৎ'-এর আলোচনায় এবং রচনাভঙ্গিতে সর্বত্র সুস্পষ্ট। রামমোহনের ইসলামীয় বিদ্যাচর্চা কেবলমাত্র কুরান-হাদীসেই আবদ্ধ থাকে নি, ইসলামীয় ধর্মসাহিত্যের ইতিহাসে কালক্রমে উদ্ভাবিত 'ইলম্-উল্-কালাম্' (scholastic theology) এবং সুফী মতবাদও তিনি যত্নপূর্বক আয়ত্ত করেছিলেন। 'ইলম্-উল্-কালাম'-এ যাঁরা পাণ্ডিত্য অর্জন করতেন তাঁরা ইসলামের ইতিহাসে 'মুতকল্লিম্' নামে পরিচিত। প্রথমে যুক্তিবাদী 'মুতাজিলা' সম্প্রদায়ই 'মুতকল্লিম্' আখ্যা লাভ করেছিলেন। কট্টর শাস্ত্রবিশ্বাসীদের সঙ্গে কুরান-শরীফ্ সম্পর্কে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য ছিল। রক্ষণশীল শরীয়ৎ-বিশ্বাসীরা মনে করতেন কুরান নিত্য, ঈশ্বরের অব্যক্ত বাণীর সমষ্টি, এক দিব্য আকররূপে তা সপ্তম স্বর্গে নিত্যবিরাজমান। এই অনাদি নিত্য উৎস থেকে জিব্রাইল কুরানের বাণী মহম্মদের অন্তরে প্রেরণ করেছেন। এই মতের সমালোচনায় মুতাজিলা সম্প্রদায় বলেছেন, কুরান অনাদি ও নিত্য হতে পারে না, এই গ্রন্থ ঈশ্বরের বাণী হলেও তা সৃষ্ট বস্তু [খাল্‌ক]। একে অনাদি ও নিত্য বললে ঈশ্বরের অতিরিক্ত আর একটি অনাদি ও নিত্য বস্তু স্বীকার করতে হয় এবং তাতে ইসলামের মূল তত্ত্ব একেশ্বরবাদ খণ্ডিত হয়। তা ছাড়া মুতাজিলাপন্থীগণ ঈশ্বরের গুণ স্বীকার করেন নি। মানুষের পাপ-পুণ্য, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কর্তব্য-

কর্তব্য নির্ধারণের দায়িত্ব মানুষের নিজের এই তত্ত্ব স্বীকার করে মানুষের ইচ্ছাকে তাঁরা খানিকটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। শিয়াসম্প্রদায়ের গুরুবাদকে এঁরা আক্রমণ করেছেন। প্রচলিত প্রত্যাদেশবাদের ধারণায় এবং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে এঁদের আস্থা ছিল না। এই যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের মতবাদ তাই স্বভাবতঃ রামমোহনকে আকর্ষণ ও প্রভাবিত করেছিল। মরমী স্ফী কবিদের মধ্যে রুমী, সাদি, হাফিজ প্রভৃতি রামমোহনের প্রিয় ছিলেন। এঁরা শাস্ত্রীয় সংকীর্ণতা থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিলেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ এবং ঈশ্বর ও জীবজগতের ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। এই কারণে এঁদের প্রভাবও রামমোহনের উপর নগণ্য নয়। 'তুহ্‌ফাৎ'-এর যুগে রামমোহনের বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের মূলে ইসলামীয় চিন্তার এই বিশিষ্ট ধারাগুলির প্রেরণা কার্যকরী হয়েছিল একথা মেনে নিতে বাধা নেই। তবে রামমোহন মুতাজিলাপন্থী বা স্ফীগণের থেকে এক হিসাবে আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। ইসলামীয় জগতে যে-সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের কেউই কুরান-শরীফের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন নি, এমন-কি যে মুতাজিলা সম্প্রদায় কুরানের নিত্যতা স্বীকার করেন নি, তাঁরাও নন। সুবিখ্যাত মনীষী আল-গজ্জালি [১০৫৮–১১১১]-র প্রযত্নে শেষ পর্যন্ত শরীয়তের সঙ্গে স্ফীমতবাদেরও সমন্বয় সাধিত হয়। 'তুহ্‌ফাৎ'-এ প্রতিফলিত যুক্তিবাদ কিন্তু সম্পূর্ণ শাস্ত্রকে অস্বীকার করেছে।

রামমোহনের এই যুক্তিনির্ভর ধর্মবিশ্বাস অল্প পরেই পরিপুষ্ট হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানদর্শন অধ্যয়নের দ্বারা। এই অধ্যায়কে দুটি পর্বে ভাগ করা চলে। এক পর্বে তাঁর চিত্তের অবলম্বন ইউরোপে নূতন চিন্তার নায়ক ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মননরাজ্যের তিন মনীষী, বেকন, লক্‌ ও নিউটন; এরই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি গভীর ভাবে অনুশীলন করেন অনেকাংশে এঁদের দ্বারা প্রভাবিত ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানবিভাসিত যুগের মনীষী ও দার্শনিকগণকে, ভোলতেয়ার, ভোলনে, রুশো, দিদিরো, যাঁদের মধ্যে প্রধান। এঁদের সমসাময়িক দুই ইংরেজ মনীষীরও তিনি সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন, দার্শনিক হিউম ও ঐতিহাসিক গিবন। তা ছাড়া ছিলেন কলিন্‌স, টিণ্ডাল, টোলাণ্ড, ম্যাক্‌ টুসবেরী প্রমুখ শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিমূলক একেশ্বরবাদের (Deism) প্রবক্তাগণ। নিজমনীষা ও ইসলামীয় দর্শনের প্রভাবে

রামমোহন আদৌ যে নৈসর্গিক সার্বভৌম ধর্মের প্রভাবে উপনীত হয়েছিলেন তৎকালীন ইউরোপীয় বিজ্ঞানদর্শনে উত্তরকালে তিনি তার সমর্থন পেলেন। অবশ্য এই-সব পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তিবাদের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের একটা সমন্বয়সাধন করেছিলেন, অন্যদল ছিলেন সংশয়বাদী বা নাস্তিক। রামমোহন প্রথম থেকেই তার প্রখর যুক্তিবাদ সত্ত্বেও আস্তিকদেরই দলভুক্ত। 'তুহ্ফাৎ' রচনাকালেই হোক বা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনপর্বেই হোক ধর্মের মূল সত্যে তিনি কখনো বিশ্বাস হারান নি। যুক্তির সঙ্গে অনুভূতির একটি সুষ্ঠু সমন্বয় তিনি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিছক যুক্তিতর্ক যে আধ্যাত্মিক সত্যলাভের সহায়ক নয় এই বোধ তাঁর পূর্ণমাত্রায় ছিল। এই বিষয়ে তাঁর অন্ততঃ দুটি স্পষ্ট উক্তি আছে। 'বেদান্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদ, *Translation of an Abridgment of the Vedant* (১৮১৬)-এর ভূমিকায় তিনি বলেছেন : "... the reasoning faculty which leads men to certainty in things within its reach, produces no effect on questions beyond its comprehension." অন্যত্র কেনোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের (১৮১৬) ভূমিকায় এই ভাবটিই প্রকাশ পেয়েছে আরো বিস্তারিত ভাষায় : "When we look to the traditions of ancient nations we often find them at variance with each other; and when discouraged by this circumstance we appeal to reason as a surer guide we soon find how incompetent it is, alone, to conduct us to the object of our pursuit We often find that, instead of facilitating our endeavour or clearing up our perplexities it only serves to generate our universal doubt incompatible with the principles on which our comfort and happiness mainly depend. The best method perphaps is, neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other; but by a proper use of the lights furnished by both, endeavour to improve our intellectual and moral faculties, relying on the goodness of the Almighty Power,

which alone enables us to attain that which we earnestly and diligently seek for."

রামমোহনের ধর্মজীবনের ক্রমাভিব্যক্তির পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করি শাস্ত্রবিশ্বাস ও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশবাদ বা revelation-এ বিশ্বাসে তাঁর আংশিকভাবে প্রত্যাবর্তন। দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন এসেছিল ব্যাপক ও গভীরভাবে হিন্দু, ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে। *The Precepts of Jesus the guide to Peace and Happiness* (১৮২০) নামক সংকলন-গ্রন্থে দেখা যায় যদিও রামমোহন বাইবেলভুক্ত খৃষ্টের নিজস্ব উপদেশগুলিকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে সেগুলিকে এই শাস্ত্রের অন্যান্য অংশের থেকে পৃথকীকরণের পথই অবলম্বন করেছিলেন তবু বাইবেল যে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল না। ভূমিকায় তিনি স্বাভাবিক ও সার্বভৌম ঈশ্বর-বিশ্বাসের যে দুটি উৎস নির্দেশ করেছেন তা হল শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য (tradition) ও পরম্পরাগত শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি স্মরণীয়: "Besides in matters of religion particularly men in general through prejudice and partiality to the opinions which they once form, pay little or no attention to opposite senti-ments (however resonable they may be) and often turn a deaf ear to what is most consistent with the laws of nature, and conformable to the dictates of human reason and divine revelation." লক্ষ্য করবার বিষয় আদৌ 'তুহ্‌ফাৎ'-এ বর্ণিত এবং এখানে পুনরুক্ত নৈসর্গিক নিয়ম ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির নির্দেশের সঙ্গে এখানে একটি নূতন মাত্রা যুক্ত হয়েছে divine revelation বা ঐশ প্রত্যাদেশ। কিন্তু এই শব্দ মাত্র খৃষ্টীয় শাস্ত্র সম্পর্কেই রামমোহন ব্যবহার করেন নি। তাঁর খৃষ্টীয় বিতর্কের স্থানে স্থানে তাঁকে মুসলমান ধর্ম-শাস্ত্রের সাক্ষ্যও ব্যবহার করতে দেখা যায় যেমন *Second Appeal to the Christian Public*-এর তৃতীয় অধ্যায়ের উপসংহারে। এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না, এই পর্বে বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খৃষ্টীয় শাস্ত্রের মতো তিনি মুসলমান শাস্ত্রকেও প্রত্যাদিষ্ট বলে স্বীকার করতেন। তা ছাড়া উক্ত বিচারগ্রন্থগুলিতে প্রায় সর্বত্র প্রত্যাদিষ্ট ইহুদী ধর্মশাস্ত্র বা

Jewish Revelation-কেও Christian Revelation-এর সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তেমনি তাঁর রক্ষণশীল হিন্দু প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বিচারপ্রসঙ্গে রামমোহন হিন্দুশাস্ত্রকেও প্রত্যাদিষ্ট বলে স্বীকার করেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রপ্রামাণ্যসংক্রান্ত তাঁর বক্তব্যকে গুছিয়ে প্রকাশ করতে হলে তা এইভাবে সাজাতে হবে: (১) বেদ (বা শ্রুতি) সর্বাধিক প্রামাণিক; যা বেদবিরোধী তা শাস্ত্ররূপে গণ্য হবার যোগ্য নয়; (২) জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এবং সেই সূত্রে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদভাগ তার কর্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; (৩) পুরাণতন্ত্র প্রভৃতি বেদোত্তর কালে রচিত গ্রন্থগুলি শ্রুতিবিরুদ্ধ না হলে শাস্ত্ররূপেই গণ্য হওয়া উচিত। এগুলির এক অংশ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক। সে অংশ সর্বথা মান্য। অন্যত্র যেখানে সাকার দেবতা ও সাকারোপাসনার বর্ণনা আছে সেগুলি দুর্বল অধিকারীদের জন্য প্রদত্ত বিধান মাত্র। চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানোদয় হলে এ-সব কাল্পনিক উপাসনার প্রয়োজন হয় না; (৪) শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হ'লে শ্রুতি সর্বত্র মান্য, প্রমাণ হিসাবে স্মৃতির স্থান শ্রুতির অনেক নীচে; স্মৃতিসমূহের মধ্যে মনুস্মৃতির প্রামাণ্য সর্বোচ্চ।

সুতরাং জীবনের উত্তরপর্বে দীর্ঘকাল বিভিন্ন শাস্ত্রাধ্যয়নের পর এবং প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারবিতর্ককালে রামমোহন তাঁর 'তুহ্‌ফাৎ'-পর্বের কট্টর যুক্তিবাদকে কতকাংশে নমনীয় করেছিলেন এবং শাস্ত্রের প্রতি তাঁর মনে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল একথা মানতে হবে। কিন্তু এখানেও তিনি আক্ষরিক অর্থে সমগ্র শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করতে বিরত রইলেন এটিও লক্ষ্য করবার বিষয়। তাঁর কাছে শাস্ত্র নিত্য এই অর্থে যে তা প্রজ্ঞালব্ধ ঈশ্বরীয় বাণীর সঞ্চয়। সর্বদেশে সর্বকালে এই বাণী ঋষি দ্রষ্টা ও মহাপুরুষগণের অন্তরে তাঁদের স্বাভাবিক প্রজ্ঞাদৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যাদেশের আকারে উদ্ভাসিত হয়। সুতরাং শাস্ত্র কোনো বিশেষ দেশে বা কালে বদ্ধ নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাষায় বিভিন্ন শাস্ত্রকে বলা যেতে পারে repositories of the collective wisdom of the human race। অনুভূতিমূলক এই সার্বভৌম আধ্যাত্মিক সত্যগুলি নিছক যুক্তি বা লৌকিক বিচারবুদ্ধির অগম্য। এর পাশাপাশি কালক্রমে ধর্মজীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর বহু প্রসঙ্গ, বিশ্বাসের

অযোগ্য অলৌকিক কাহিনী, অনিষ্টকর কুসংস্কার ইত্যাদি শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলি বর্জনীয়। কিন্তু এই গ্রহণবর্জনের প্রক্রিয়ায় আমাদের নির্ভর করতে হবে সম্পূর্ণ নিজ বিচারবুদ্ধির উপর। যা প্রত্যাদিষ্ট উপলব্ধিগম্য সত্য তার একটি সুনিশ্চিত লক্ষণ এই যে, তা কখনো আমাদের যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে যাবে না। সুতরাং ধর্মজীবনগঠনে শাস্ত্রীয় চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্য এবং মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি পরস্পরের পরিপূরক। *The Precepts of Jesus*-এর ভূমিকায় যীশুর উপদেশ-সংগ্রহের প্রধান কারণ তিনি দেখিয়েছেন যে, এগুলি হল "most consistent with the laws of nature and conformable to the dictates of reason and human revelation." এই reason (বিচারবুদ্ধি) ও revelation ছাড়া ধর্মজীবনগঠনের একটি তৃতীয় উপাদানের উপর তাঁকে এই পর্বে জোর দিতে দেখি—সেটি হল common sense বা সহজ-বুদ্ধি। কিন্তু কথাটা নূতন নয়। 'তুহ্‌ফাৎ'-এর পর্বে একেই তিনি চিহ্নিত করেছিলেন মানুষের সহজাত স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি (intuitive faculty) বলে। এই বৃত্তিটিকে অনুশীলনের দ্বারা পরিমার্জিত করে বিচারবুদ্ধি বা reason-এর সহায়করূপে প্রয়োগ করলে তা জীবনকে প্রজ্ঞার পথে অগ্রসর করবে সন্দেহ নেই। সুতরাং রামমোহনের পরিণত ধর্মচিন্তায় ধর্মজীবন গঠনের তিনটি উপাদান পাওয়া গেল, reason (যুক্তি), scripture (শাস্ত্র) এবং common sense (স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি)। ১৮৩২ সালে লণ্ডনে প্রদত্ত এক ভাষণে তাঁকে বলতে শুনি: "There is a battle going on between reason, scripture and common sense and wealth, power and prejudice. These three have been struggling with the other three." ধর্মসাধনা এবং ধর্মজীবন গঠনের ক্ষেত্রে এই তিনটি বৃত্তির উপযুক্ত সংমিশ্রণই ছিল তাঁর মতে আদর্শ। সুতরাং 'তুহ্‌ফাৎ'-পর্বের বিশুদ্ধ যুক্তি-বাদ থেকে উত্তরপর্বে যে তিনি কতকটা সরে এসেছেন এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এখানে তাঁর পূর্বের যুক্তিবাদ কিছু পরিমাণে সংশোধিত হয়েছে, বর্জিত হয় নি। অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য এ পর্যায়েও তাঁর তীব্র সমালোচনার বিষয়। শাস্ত্রোক্ত আধ্যাত্মিক সত্য গ্রহণ করবার মাপকাঠি এ পর্বেও তাঁর কাছে বিচারবুদ্ধি

বা reason, যার দ্বারা পরিশোধিত না হলে কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। প্রকৃত আত্মিক উপলব্ধি কখনো যুক্তিবিরোধী হতে পারে না এই সিদ্ধান্তে তাঁর এখনো দৃঢ় বিশ্বাস। ধর্মজীবনের তিনটি বৃত্তির যে ক্রমনির্দেশ তিনি করেছেন সেখানেও reason-এর স্থান সর্বাগ্রে।

রামমোহনের ঈপ্সিত ধর্মসংস্কারের ভিত্তি তত্ত্বগতভাবে ছিল সর্বাত্মক ও বিশ্বজনীন, কিন্তু তার প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে তিনি নির্বাচন করেছিলেন ভারতীয় হিন্দুসমাজকে। এ ছাড়া সম্ভবতঃ তাঁর অন্য উপায় ছিল না, কেননা কোনো হিন্দু ব্রাহ্মণের পক্ষে (অন্ততঃ সে যুগে) অপর কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কারের কর্মসূচী নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া অকল্পনীয় ছিল। মুসলমানধর্মের মাত্র স্বাধীন তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য সে-সমাজের রক্ষণশীল মহল রামমোহনের উপর বিরূপ হয়েছিলেন এবং তাঁর জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। *The Precepts of Jesus*এর মতো খৃষ্টের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসূচক গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য খৃষ্টীয় মিশনারীগণ কর্তৃক তিনি বিশেষ তিরস্কৃত হন এবং হিন্দুধর্ম (যে ধর্মে রামমোহন জন্মেছিলেন) সম্পর্কে বাছাবাছা গালাগালি সে মহল থেকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। তাঁর হিন্দু প্রতিপক্ষগণও তাঁকে অশেষ নির্যাতন করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সমানে কুৎসা রটিয়েছিলেন. কিন্তু একমাত্র এই ভূমিতেই রামমোহনের পক্ষে বলা সম্ভব ছিল তিনি জন্মগত ভাবে হিন্দু বলেই নিজের ধর্ম ও সমাজসংস্কারের প্রয়াসী হওয়ার নৈতিক অধিকার তিনি দাবি করতে পারেন। তাই এটা খুব স্বাভাবিক. নানা ধর্মতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ধর্মের এক সার্বভৌম ভিত্তি আজীবন অন্বেষণ করলেও সেই সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গিকে কার্যতঃ প্রয়োগ করবার জন্য তিনি হিন্দু ধর্মকেই বেছে নেবেন। এ বিষয়ে তিনি ভারত-ইতিহাসের প্রাক্তন হিন্দুধর্মপ্রবক্তাদের মতোই বেদান্তমতকে অবলম্বন করে তাঁর সংস্কার কর্মসূচী রূপায়িত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। শংকর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি প্রাক্তন বেদান্তাচার্যগণ এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরী। এঁদেরই প্রবর্তিত ধারায় তিনি আধুনিক কালে বেদান্তের এক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিলেন এবং তারই ভিত্তিতে এক নূতন ধর্মসংস্থা গড়ে তুললেন। বেদান্তের তিনটি প্রস্থান। এর শ্রুতি-প্রস্থান উপনিষদ, ন্যায়প্রস্থান ব্রহ্মসূত্র এবং স্মৃতিপ্রস্থান ভগবদ্‌গীতা। পূর্বকথিত আচার্যবৃন্দ প্রায় সকলেই এই প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্য রচনা

করে তার মাধ্যমে নিজ নিজ বিশিষ্ট মত প্রচার করেছেন। রামমোহনকেও দেখা যায় এই চিরায়ত ধারা অনুসরণ করতে। তিনি সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করেছেন, পাঁচখানি উপনিষদের ব্যাখ্যা সহ বাঙলা ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন (শোনা যায় অন্ততঃ আরো দুখানি উপনিষদেরও তিনি অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু সে গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় নি), এবং গীতার বঙ্গানুবাদও করেছেন। সুতরাং ঐতিহ্যগত ভাবে এদিক থেকেও হয়তো তাঁকে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে ভারত-পথিক আখ্যা দেওয়া চলে। অবশ্য বেদান্তব্যাখ্যায় পূর্বাচার্যদের সঙ্গে রামমোহনের এক বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য ছিল। এই-সব আচার্যরা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভিন্ন মানুষের অপর কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ করেন নি। কিন্তু রামমোহন ছিলেন সর্বাংশে রেনেশাঁসের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এই আদর্শের বিশেষত্ব হল এতে মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির ভূমিকাস্বরূপ তার ইহলৌকিক কল্যাণকেও পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইহলৌকিক জীবন তার সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বৈচিত্র্য ও জটিলতা নিয়ে আধুনিক মননের দৃষ্টিতে উপেক্ষণীয় তো নয়ই, বরং একমুখী ঈশ্বরান্বেষণ অপেক্ষা তার গুরুত্ব বেশি। একালে লৌকিক জীবনেই মানুষ অসংখ্য সমস্যায় পীড়িত. অজস্র জিজ্ঞাসায় উদ্‌ভ্রান্ত। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অপেক্ষা সে-সব প্রশ্নের উত্তর তার কাছে কম কাম্য নয়। এখানেই মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। আধুনিক যুগোপযোগী জীবনদর্শন গড়ে তোলা রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল বলেই তিনি পূর্বাচার্যদের নিকট প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগী অনুসন্ধানপ্রণালী লৌকিক জীবনের সমস্যা সমাধানকল্পে কোথাও প্রয়োগ করেন নি। সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নূতন পথের অনুসন্ধানপ্রসঙ্গে কখনো তাঁকে শাস্ত্রপ্রমাণের দোহাই দিতে দেখা যায় না। এ-সব ব্যাপারে সর্বদা তিনি পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী। যুক্তি ও অনুভূতি —দুটি রাজ্যের পার্থক্য তিনি মানতেন আমরা দেখেছি এবং এদের প্রয়োগ-ভূমির প্রভেদ সম্পর্কেও তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। এইভাবে তাঁর চিন্তায় আধুনিক জীবনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাসমূহের মর্যাদা রক্ষা করেছে তাঁর সযত্নানুশীলিত যুক্তিবাদ। আচার্য শংকরের একটি তাৎপর্য-পূর্ণ উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্-ভাষ্যভূমিকায় তিনি বলেছেন,-যা দৃষ্ট বিষয়, অর্থাৎ ইহলোকে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-নিবারণের

উপায়, তার জন্য শ্রুতিপ্রমাণ অন্বেষণ করবার প্রয়োজন নেই, তা প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণ প্রয়োগের দ্বারাই জানা যেতে পারে (দৃষ্টবিষয়ে চ ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি-পরিহারোপায়জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামেব সিদ্ধত্বাৎ ন আগমান্বেষণা)। শংকর রামমোহনের অর্থে আধুনিক ছিলেন না, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গির মিল আমাদের চমৎকৃত করে।

রামমোহনের বেদান্তব্যাখ্যাকে অনুসরণ করলে দেখা যায় পূর্বাচার্যগণের মধ্যে আচার্য শংকরের প্রতিই তিনি সর্বাধিক শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন এবং শংকরের সঙ্গেই তাঁর বেদান্তচিন্তার সর্বাধিক সাদৃশ্য বর্তমান। নিজেকে আচার্যের (আচার্য শংকরের) শিষ্য বলতে তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। একালের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রমথনাথ তর্কভূষণ তাঁকে 'নব্য ভারতের শংকরাচার্য' আখ্যা দিয়েছেন। শংকরের প্রতি রামমোহনের আকর্ষণের কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ শংকর বেদান্তশাস্ত্রের সম্পূর্ণ ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করেছেন, কোনো সাম্প্রদায়িক দেবতাপর ব্যাখ্যা করেন নি। তাছাড়া বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে শংকর বহুলাংশে পৌরাণিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। প্রচলিত পুরাণগুলি তিনি আকর হিসাবে কোথাও ব্যবহার করেন নি। শংকরের নামে প্রচলিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের একখানা ভাষ্য পাওয়া যায়। এর ভূমিকায় অবশ্য কয়েকখানি পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। কিন্তু এই ভাষ্যটিকে পণ্ডিতগণ শংকরের রচনা বলে গণ্য করেন নি। শংকরের সমস্ত শাস্ত্রবিচার প্রধানতঃ শ্রুতিনির্ভর এবং সে ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ। তাঁর উদ্ধৃত প্রায় সকল শাস্ত্রবাক্যই চয়ন করা হয়েছে শ্রুতি থেকে। রাধাকৃষ্ণন্ তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, "He tried to bring back the age from the brilliant luxury of the Puranas to the mystic truth of the Upanishads." তৃতীয়তঃ শংকর ছিলেন নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী; স্বয়ং অদ্বৈতবাদী রামমোহন তাই শংকরের বেদান্তব্যাখ্যায় নিজমতের দৃঢ় সমর্থন পেয়েছিলেন।

শংকরের সঙ্গে বৈদান্তিক হিসাবে কয়েকটি প্রধান বিষয়ে রামমোহনের মিল ছিল। শংকরের মতোই রামমোহন ব্রহ্মের নির্গুণত্ব মেনেছেন। ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ নির্ধারণেও তাঁর সিদ্ধান্ত শংকরের অনুরূপ। শংকরের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের নিকৃষ্টতায়। সর্বোপরি জীব

ও ব্রহ্মের অভেদচিন্তনে ও মোক্ষের স্বরূপ সংক্রান্ত ধারণাতেও রামমোহন শংকরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অভেদ ও মোক্ষ সম্পর্কে রামমোহনের বহু উক্তির মধ্যে উদাহরণস্বরূপ দুটি এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে: "…পরমার্থদৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা…কেবল এক ব্রহ্ম মাত্র সত্য আর নামরূপময় জগৎকে মিথ্যা জানিবেন…।" অন্যত্র: "…এই ভাবে মন অহংকার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্বব্যাপী অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণা করিবেন পরে মরণান্তে এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্যত্র গমন না হইয়া উপাধি হইতে সর্বপ্রকার মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।" কিন্তু শংকরের সঙ্গে এতগুলি বিষয়ে মতৈক্য থাকলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও ছিল। এর মধ্যে একটি প্রধান বিষয় হল সন্ন্যাস-আশ্রমের গুরুত্ব। শংকর একথা দ্বিধাহীন ভাবেই ঘোষণা করেছেন ব্রহ্মজ্ঞান ও নির্বাণমুক্তিতে একমাত্র সন্ন্যাসীরই অধিকার আছে। তাঁর দৃষ্টিতে গৃহী এই অধিকারে বঞ্চিত। কিন্তু রামমোহন শংকরের অনুরাগী ও নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী হওয়া সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে ব্রহ্মজ্ঞান সন্ন্যাসীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, গৃহীরও এতে পূর্ণ অধিকার আছে। বেদান্তভাষ্যকাররূপে রামমোহনের দ্বিতীয় মৌলিকত্ব মায়াতত্ত্ব ও বস্তুজগৎসংক্রান্ত তাঁর ভাবনায়। শাংকর অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ মিথ্যা। দেশকালকার্যকারণগত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি অনিত্য ও অলীক প্রবাহমাত্র যা পূর্বে ছিল না, পরেও থাকবে না— কেবল মধ্যে কিছুকালের জন্য আমাদের ব্যবহারের গোচর হয়েছে মাত্র। এই সাময়িক জগৎপ্রতীতি মায়াপ্রসূত। অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হওয়া মাত্র এই মায়া বা অজ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে এবং মায়াজনিত জগৎ-প্রতীতিও লোপ পায়। এই মায়ার স্বরূপ নিয়ে বৈদান্তিকগণ বহু আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে অদ্বৈত-বেদান্তমতে মায়া ভাবরূপ, ত্রিগুণাত্মক, সৎও নয়, অসৎও নয়, এর স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সুতরাং বর্ণনা করতে গেলে একে বলতে হয় অনির্বচনীয়। ব্রহ্মকে এক অদ্বিতীয় তত্ত্বরূপে স্বীকার করলে এবং জীব ও জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব না মানলে সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যা করবার জন্য মায়ার ন্যায় কোনো একটি ধারণাকেও স্বীকার করা প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। অদ্বৈতবেদান্তী হিসাবে

রামমোহনকেও তাই মায়াপ্রত্যয়ে বিশ্বাসী হতে হয়েছে। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এতে একটু অসুবিধা আছে। মায়িক জগৎকে মিথ্যা ঘোষণা করে প্রাক্তন অদ্বৈতবেদান্তীগণ বেদান্তকে সংসারবিমুখ বৈরাগ্যশাস্ত্রে পরিণত করেছিলেন। অদ্বৈতবাদস্বীকৃত বস্তুজগতের ব্যবহারিক যাথার্থ্যের কোনো স্বতন্ত্র মর্যাদা তাঁরা দেন নি। জীবনের সুখ, দুঃখ আত্মীয়তা-বন্ধন, নানা জটিল সামাজিক সমস্যা, কর্তব্যাকর্তব্য প্রভৃতি যখন ভ্রমাত্মক ভেদজ্ঞানপ্রসূত তখন সেই ভূমি থেকে যথাশীঘ্র মুক্তিলাভ করে ব্রহ্মে লীন হওয়াই তাঁদের মতে চরম ও পরম পুরুষার্থ। কিন্তু রামমোহন রেনেসাঁসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আধুনিক মানুষ, তাঁর দৃষ্টিতে জগৎসংসারের গুরুত্ব কিছু কম নয়। সুতরাং জগৎ-প্রতীতি মায়াজনিত এ বিশ্বাস তাঁর থাকলেও এই জগৎকে অবজ্ঞা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি যেমন মায়াবাদে বিশ্বাসী তেমনি এই ব্যবহারিক জগতের কল্যাণসাধনেও বিশ্বাসী। যে শাস্ত্রীয় সূত্রটির দ্বারা তাঁর পক্ষে মায়াবাদের সঙ্গে সামাজিক প্রগতির সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব হয়েছিল সেটি তিনি লাভ করেছিলেন তন্ত্রশাস্ত্র থেকে এমন কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। মাতৃবংশের প্রভাবে ও তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সাহচর্যে তিনি কৈশোর থেকেই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং উত্তরজীবনে তন্ন তন্ন করে তন্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। দার্শনিক ভিত্তিতে তন্ত্র অদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবেদান্তের সঙ্গে এখানে তার সিদ্ধান্তের মিল আছে। কুলার্ণবতন্ত্রের একটি বচন (৯/৩২) এই প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্যাদাত্মচিন্তনম্।
স সর্বং পাতকং হন্যাত্তমঃ সূর্যোদয়ো যথা॥

অদ্বৈতবাদী শাস্ত্র হিসাবে অদ্বৈতবেদান্তের মতো তন্ত্র ও সৃষ্টির মূলে মায়া-শক্তিকে স্বীকার করেছে। কিন্তু বৈদান্তিক মায়া ও তান্ত্রিক মায়াশক্তির মধ্যে তত্ত্বগতভাবে কিছু প্রভেদ আছে। অদ্বৈতবেদান্তশাস্ত্রের মায়া জ্ঞান-নাশ্য এবং মিথ্যা; কিন্তু তান্ত্রিক মায়াশক্তি নিত্য, সৎ এবং পরমাত্মস্বরূপের অংশবিশেষ। বেদান্তের মায়িক জগৎ যেখানে পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা, তান্ত্রিক মায়াপ্রসূত জগৎ সেখানে নিত্য ও চিরন্তন। বৈদান্তিক মায়া ব্রহ্মস্বরূপে আরোপিত শক্তিরূপে কল্পিত হলেও তা জড়শক্তিরূপে কল্পিত; তান্ত্রিক মায়াকে কিন্তু বলা হয়েছে চিৎশক্তিরই রূপান্তর বা আবৃত চিৎ-

শক্তি। বস্তুতঃ তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম ও মায়া একই তত্ত্বের স্থির ও চঞ্চল দুই রূপ হিসাবে কল্পিত। মায়াভাবনার এই বিশেষত্বের ফলে অদ্বৈতবাদী তন্ত্রশাস্ত্রে সংসারবিমুখতার স্থলে এক বলিষ্ঠ জীবনবাদ সঞ্চারিত হয়েছে। সংসারকে তার সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ, বাধা, প্রলোভন প্রভৃতি সমেত সর্বতোভাবে স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে যাওয়াই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। কুলার্ণবতন্ত্রে (২/২৪,৯/৬৩) এই আদর্শ অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত :

ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ পাতকং সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্মে কুলেশ্বরি ॥
মৃত্যুর্বৈদ্যায়তে দেবি, সাক্ষাৎ স্বর্গায়তে গৃহম্।
স্বর্গঃ সাক্ষাৎ গৃহায়তে কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥

রামমোহনের চিত্তে তন্ত্রের গভীর প্রভাবের কথা মনে রাখলে জোর করেই বলা চলে তন্ত্রশাস্ত্রে প্রদত্ত মায়াবাদের অভিনব ব্যাখ্যা তাঁকে ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিরূপে অদ্বৈত-বেদান্ত ব্যাখ্যাত মায়ার ঋণাত্মক মিথ্যা অপেক্ষা তার ইতিবাচক সৃজনশীলতার উপর অধিক জোর দিতে প্রণোদিত করেছিল। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদকে ত্যাগ না করেও তান্ত্রিক শক্তিবাদের প্রভাবে তিনি তাকে যথেষ্ট মার্জিত ও যুগোপযোগী করে নিয়েছিলেন। এখানে শংকরের মায়াভাবনা থেকে কার্যতঃ তাঁকে বেশ খানিকটা সরে আসতে হয়েছিল। অদ্বৈতবেদান্তীরূপে রামমোহনের আর এক বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মোপাসনার উপর অসীম গুরুত্ব আরোপ। শংকরের মতে উপাস্য-উপাসকের পরস্পরসম্বন্ধ ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মায়িক ভেদজ্ঞানের জগৎ অতিক্রম করে জীব অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলে আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। জীব তখন ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, স্বতন্ত্র উপাস্যের অস্তিত্বও লোপ পায়। কিন্তু রামমোহন শংকরের মত অদ্বৈতজ্ঞানভিত্তিক মুক্তিকে সাধনার চরম লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নিলেও খুব জোর দিয়েই বলেছেন যে ব্রহ্মোপাসনাই চরম মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় এবং মোক্ষপ্রাপ্তির পরেও উপাসনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। তাঁর 'আপ্রায়ণাত্তত্রাপি দৃষ্টম্' এই ব্রহ্মসূত্রটির (৪।১।১২) ব্যাখ্যা এইরূপঃ "মোক্ষপর্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক, জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনা ত্যাগ করিবেক না যেহেতু বেদে

মুক্তি পর্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক এমত দেখিতেছি।" এ বিষয়ে শংকরোত্তর অদ্বৈতবেদান্তীদের মধ্যে রামমোহনের মিল দেখা যায়, 'পঞ্চদশী' প্রণেতা বিদ্যারণ্যের সঙ্গে যিনি উক্ত গ্রন্থে (৯।৭৪) বলেছেন :

উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ।
নান্যঃ পন্থা ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুধ্যতে॥

"উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; অতএব জ্ঞান-ব্যতীত মুক্তির উপায়ান্তর নেই শাস্ত্রের এই উক্তির সঙ্গে উপাসনার কোনো বিরোধ নেই।" কিন্তু উপাসনাতত্ত্বে রামমোহনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য সর্বপ্রকার প্রতীকবর্জনে। প্রতীকে আত্মদৃষ্টি না করবার প্রেরণা অবশ্যই তিনি শংকরের কাছে পেয়েছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তই হোক বা তন্ত্রই হোক প্রচলিত প্রতিমাপূজা কেউ বর্জন করেন নি। একতত্ত্ব-বাদী শংকর এজাতীয় পূজার্চনাকে গুরুত্ব না দিলেও এগুলির ব্যবহারিক যথার্থতা অস্বীকার করেন নি। রামমোহন কিন্তু এখানে অধিকতর একনিষ্ঠ। তর্কের খাতিরে পুরাণতন্ত্রপ্রোক্ত প্রতিমাপূজাকে নিম্নাধিকারীর জন্য প্রদত্ত বিধান বলে স্বীকার করে নিলেও তিনি আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়েছেন, প্রচলিত প্রতিমাবদ্ধ দেবোপাসনায় দেবদেবীতে ঈশ্বরভাব আরোপ করবার পরিবর্তে উপাসকগণ সর্বপ্রকার তামসিক মানুষীভাবের আরোপই সর্বত্র করে থাকেন। হিন্দুসমাজের প্রচলিত উপাসনাবিধিতে নামরূপে ব্রহ্মসত্তার আরোপের পরিবর্তে ব্রহ্মসত্তায় নামরূপের আরোপেরই প্রাধান্য। ঈশোপনিষদের অনুবাদের ভূমিকায় তিনি এর সামাজিক ও নৈতিক কুফল সম্পর্কে অতি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুতরাং রামমোহন-পরিকল্পিত নির্গুণ আত্মোপাসনা ও সগুণ সামাজিক উপাসনা উভয়ই অনিবার্যভাবে প্রতীকের সংস্রববর্জিত। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের সঙ্গে বিচারে তাঁর অন্যতম বক্তব্য ছিল সগুণ উপাসনার অর্থ সাকার উপাসনা নয়।

'উপাসনা' সম্পর্কে রামমোহন তাঁর মতামতের যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন তা অনুধাবন করলে দেখা যায় তাঁর প্রবর্তিত ব্রহ্মোপাসনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুটি অঙ্গ আছে। ব্যক্তিগত উপাসনাতে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণই অবলম্বনীয়। স্বরূপচিন্তন সম্পর্কে তাঁর উপদেশ "পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা

তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন।" এই উপাসনার নাম তিনি দিয়েছেন সাধন। এর লক্ষ্য নির্বিশেষ আত্মজ্ঞানলাভ এবং এর জন্ম প্রয়োজন শম, দম উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই ছয়টি সাধন-সম্পদ। সমষ্টিগত বা সামাজিক উপাসনা সম্পন্ন করতে হবে সগুণ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ অনুশীলনের দ্বারা: "পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে আপনার আয়ুর এবং দেহের এবং সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্বদা তাঁহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্বদা কর্তব্য যে যাহা করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।" ব্রহ্মোপাসকের লোকব্যবহারের মান কী হবে এবিষয়েও রামমোহনের নির্দেশ সুস্পষ্ট। 'সাধন'পন্থী আত্মোপাসক বা আত্মজ্ঞানী ভুলতে পারেন না তিনি সামাজিক জীব। সুতরাং যুক্তি ও ন্যায়সম্মত লোকব্যবহার তাঁর অবশ্যকর্তব্য: "বশিষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন আর রাজনীতি এবং গৃহস্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন···ভগবান কৃষ্ণ অর্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অর্জুনও ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া লৌকিক জ্ঞানশূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।" অপর পক্ষে সামাজিক উপাসকগণের প্রতি রামমোহনের দুটি অনুশাসন: (১) সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রাতৃভাবে প্রীতিপূর্ণ আচরণ কর্তব্য; (২) "অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয় সেরূপ ব্যবহার অন্যের সহিত কদাপি করিব না।" রামমোহনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনা পরস্পরের পরিপূরক, একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। সামাজিক উপাসনা দ্বৈতভূমির অন্তর্গত, এতে ভক্তি ও অনুরাগের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ব্যক্তিগত উপাসনা বা সাধনের লক্ষ্য অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা সম্পন্ন সগুণ সামাজিক উপাসনা প্রথমাধিকারীর জন্য; অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের তা প্রস্তুতিপর্ব। এইভাবে রামমোহন তাঁর উপাসনার ধারণায় দ্বৈতাদ্বৈতক্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বেদান্ত ব্যাখ্যাতারূপে রামমোহনের আর এক বৈশিষ্ট্য লোকহিত বা সমাজকল্যাণের আদর্শের সঙ্গে ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্যবিধান করা। 'তুহ্‌ফাৎ'-পর্বে তাঁর বিশুদ্ধ যুক্তিনির্ভর নৈসর্গিক ধর্মবিশ্বাসের একটি লক্ষণ ছিল সর্বমানবের প্রতি প্রীতিপূর্ণ মনোভাব, তা আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখা গেছে। তাঁর অন্তরের স্বাভাবিক মানবপ্রীতি উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হয়েছিল কয়েকটি প্রভাবের ফলে। রেনেশাঁসোত্তর পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান স্বভাবত এই সমাজকল্যাণমুখী দৃষ্টির প্রেরণার উৎস ছিল। এই প্রসঙ্গে বেন্থামের হিতবাদ, রবার্ট ওয়েনের সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতির বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তদানীন্তন পাশ্চাত্য চিন্তার এই ধারাগুলির সঙ্গে রামমোহন ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত ছিলেন। খৃষ্টধর্মের মানবপ্রীতি ও জনসেবার আদর্শও তাঁর সামনে সে যুগে খুব বড়ো হয়েই দেখা দিয়েছিল। মরমী ফার্সী কবি সাদির যে বাণীটি তাঁর অতি প্রিয় ছিল তা এই: "মানবসেবাই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। এই উদার মানবিকতাবাদী মনোভাব তাঁর বেদান্ত-ভাষ্যেও (১৮১৫) প্রতিফলিত। ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত 'পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ (৩৩৫৩) সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি লেখেন': "পরমেশ্বর এবং তাঁহার জনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি ও তাদ্বিধ্য অর্থাৎ প্রীতানু-কূল ব্যাপার এই দুই মুখ্য উপাসনা হয়।" ঈশ্বরপ্রীতিকে ব্যক্তিস্তরে আবদ্ধ না রেখে তাঁর সৃষ্ট সর্বপ্রাণীর মধ্যে সম্প্রসারিত করে দেওয়া এবং এই প্রেমের দ্বারা লোকব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশের মধ্যেই লোকসেবার আদর্শটি এখানে রূপ পেয়েছে। সার্বভৌম প্রীতিদ্বারা উদ্বুদ্ধ মানবকল্যাণের এই আদর্শ নূতন যুগের নূতন মন্ত্র। এই উত্তরাধিকার রামমোহন রেখে গিয়ে-ছিলেন ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য। পরবর্তী এক শতাব্দীরও অধিক কাল এই সেবাদর্শ নানা রূপে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-রচিত ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" (ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্যসাধনই তাঁর উপাসনা) বা স্বামী বিবেকানন্দের "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"—উক্ত মূল বাণীরই বিভিন্ন রূপ। সাধারণ মানুষের প্রতি এই অনুরাগকে রামমোহন 'প্রীতি', 'স্নেহ', 'দয়া' ইত্যাদি নামে তাঁর রচনায় নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনি তাঁর শাস্ত্র-বিচার মূলক প্রথম গ্রন্থই ('বেদান্তগ্রন্থ,' ১৮১৫) এই প্রত্যয়টিকে তাঁর বৈদান্তিক

তত্ত্বসিদ্ধান্তের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। লৌকিক ভূমিতে এই উদার মানবপ্রীতির মন্ত্রে রামমোহনের পূর্ববর্তী কোনো বেদান্তভাষ্যকারই দীক্ষিত ছিলেন না। এখানে রামমোহন অনন্য, নবযুগের নূতন আধ্যাত্মিকতার প্রবক্তা যা সংসারবিধি নয় সর্বাংশে সমাজমুখী।

রামমোহন রায়

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

প্রকৃতি ও ইতিহাসের সৃজনীশক্তি যে বিশ্বকর্মা, তিনি সাধারণত তাঁর কর্মশালায় নির্মাণ করে দেন সাধারণ মাপের জিনিস। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কোনো অদ্ভুত ক্ষমতার আবির্ভাব ঘটে যা সেই প্রচলিত ছাঁচ থেকে একেবারেই ভিন্নধর্মী।

প্রকৃতিতে রয়েছে হিমালয়প্রমাণ উচ্চতা আর প্রশান্তসাগরীয় গভীরতা। দিবসের রয়েছে সূর্যোদয়, রয়েছে সূর্যাস্ত। সভ্যতার ইতিহাসে রয়েছে গ্রীস, রয়েছে ভারত, রয়েছে রোম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। এ সবই হল সেই অনন্ত শক্তির কেন্দ্র।

যদি আমরা মানব-ইতিহাসে মহামানবদের আবির্ভাব পর্যবেক্ষণ করি, যদি পর্যবেক্ষণ করি কুলপতিদের, বিধানদাতাদের, ঋষি ও মহান গীতি-কারদের আবির্ভাবধারা, তবে আমরা লক্ষ্য করব সেই আবির্ভাব ও ক্রমপরম্পরার মধ্যে একটা অমোঘ নিয়ম। মহামানবদের প্রাচীনতর জাতিগুলি ছিল অতিমানবের জাতি। তারা আরোহণ করেছিল মহা উচ্চতায়, প্রত্যেক জাতি প্রকাশ করেছিল এক বিশেষ ধরনের উৎকর্ষ —সে উন্নত অবস্থা আর কখনোই অর্জিত হয় নি। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ হয়ে দেখা দিয়েছিলেন বুদ্ধ বা খৃস্ট, কাব্য সৃজনে দেখা দিয়েছিলেন হোমার, বাল্মীকি, দান্তে বা শেক্সপীয়র। কিন্তু তাঁদের উত্তরাধিকারী যাঁরা—যেমন রবার্ট ব্রাউনিঙ—তাঁদের মহত্ত্ব অন্য দিক দিয়ে প্রকাশ করেন, উচ্চতার দিক দিয়ে নয়, প্রসারতার দিক দিয়ে, পূর্ণতার অতুলন ঐশ্বর্যে নয়, এক প্রকার সমন্বয়ে। নানা গুণাবলীর সুষম বিন্যাসে যে-সব বৈশিষ্ট্য পূর্বতন ইতিহাসে দেখা দিত স্ববিরোধী হয়ে, এই-সব মিশ্র গঠনবিন্যাস কয়েক প্রজন্মের মধ্যে একটা স্পষ্ট আকার ধারণ করেছে, হয়ে উঠেছে অখণ্ড চরিত্রবৈশিষ্ট্য, পূর্ণতার অনন্ত ঐশ্বর্যের সমন্বয়। এগুলি থেকেই আবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে জাতীয় অভিজ্ঞতার আত্মপ্রকাশের সমন্বয়ের।

এই হল ইতিহাসের প্রগতির তাৎপর্য। ইতিহাস হল বিরোধী রীতিনীতি ও সংস্কৃতির, বিরোধী জাতীয় ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের বহুমুখী স্রোতোধারার সঙ্গম। এই-সব বিরোধী স্রোতের শান্তিপূর্ণ সমাধান যাঁরা সন্ধান করতে পারেন, তাঁরাই পরবর্তী মানবসমাজের প্রকৃত নায়ক। তাঁরা হলেন এমন মানব যাঁরা তাঁদের জীবনেতিহাসে বিভিন্ন জীবনকে সমন্বিত করতে পারেন, সমন্বিত করতে পারেন নিজেদের বিশিষ্ট চরিত্রবৈশিষ্ট্যে বিরোধী চরিত্রবৈশিষ্ট্য। এঁরাই হলেন শান্তির নায়ক। সমন্বয় ও সম্প্রীতির নায়ক।

এই সমন্বয়ের মহিমাই রাজা রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। আজ তাঁর স্মৃতিচারণেই আমরা সমবেত, আর সেই স্মৃতিচারণই হবে পরম সার্থক যদি আমরা উপলব্ধি করি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিল কী ধরনের দ্বন্দ্ব আর তিনি তাঁর নিজের জীবনে ও ব্যক্তিত্বে কীভাবেই ঘটিয়েছিলেন তার সমাধান।

যে কালে রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর বর্ধিত হয়েছিলেন, তা ছিল আধুনিক ভারত-ইতিহাসের, সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অন্ধকার যুগ। প্রাচীন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তখন ভেঙে পড়েছে, আর তার স্থানে গড়ে ওঠে নি নতুন কোনো ব্যবস্থা, সারা দেশ জুড়ে তখন প্রসারিত ধ্বংস-লীলা, সমাজের সকল প্রাণবান প্রত্যঙ্গ হয়ে গেছে অসাড়; ধর্মপ্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, গ্রাম, গৃহ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, আইন, শাসন— সমস্তই বিশৃঙ্খল। তখন সমাজজীবন ও শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এক সার্বিক পুনর্গঠন ও নবসৃজনের। কী ছিল সেই নব সংগঠনের আদর্শ? তখন বর্তমান ছিল হিন্দু, মুসলিম আর খৃস্টান বা পাশ্চাত্য— এই তিনটি পরস্পর-বিরোধী সংস্কৃতি রূপ, তিনটি সভ্যতা। এই বিষম বিরোধী যুযুধান শক্তি-গুলির মধ্যে সম্মিলন মৈত্রী আর অবস্থান বিন্দু খুঁজে পাওয়াই ছিল প্রধান সমস্যা। সেখানেই নিহিত ছিল আধুনিক ভারতের উৎস।

এই মৈত্রী ও ভাবসঙ্গমের সন্ধান লাভ করেছিলেন বলেই রাজা হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক ভারতের জনক, কুলপতি— যে ভারত মিশ্র জাতি ও সমন্বয়-সৃষ্ট এক সভ্যতার দ্বারা হল গঠিত। তাঁর দ্বারা স্থাপিত এই মিলনরেখাপথগুলি দ্বারা তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতায় বিকশিত ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের

দ্বারা তিনি মানব-ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ও সভ্যতার বৃহত্তর সমস্যার সমাধানের পথ প্রদর্শন করে হয়ে উঠেছিলেন আগামী যুগের মানবজাতির নায়ক চরিত্র ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি। জাতীয় সংস্কৃতিসমূহের সমাবেশে তিনি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সত্যকার জাতিসংঘের।

তাঁর মানসবিকাশে কত প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃতি কাজ করেছিল তা এবার দেখা যাক। তাঁর মাতৃকুল ও পিতৃকুলে পূর্বপুরুষের কুলদেবতা-রূপে শিব ও বিষ্ণু তাঁর উপর আশিস দৃষ্টি রেখেছিলেন শৈশবাবধি। কিন্তু তাঁর বালক মানসকে জাগিয়ে তুলেছিল এক ভারতীয় মাদ্রাসার মধ্য দিয়ে ক্ষরিত ইসলামী সংস্কৃতি, বাগদাদ ও বসরার সংস্কৃতি, ইয়ুক্লিডের জ্যামিতি, পরফাইরি। ন্যায়শাস্ত্রের আরবী 'মন্তক্', পারসিক গজলের গীতি-রসোচ্ছ্বাস তিনি অনুভব করেছিলেন রক্তের দোলায় (যদিও তখন অতি অস্পষ্টভাবে) আর তা উন্মীলিত করে দিয়েছিল তাঁর মনের নয়ন। এ-ভাবেই প্রাচীন গ্রীসের প্রাচীন আফলাতুন এবং আরিস্তু এক ব্রাহ্মণ বালকের মানসে দর্শন দান করেছিল আরবী ছদ্মবেশে।

তাঁর ফারসী ও আরবী শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয় পাটনায়। আর তার ফলেই পরবর্তীকালে তাঁর কোরান শরীফ-এ অনুরাগ, ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থায় পাণ্ডিত্য এবং মুসলমানী ধর্মতত্ত্বের তেষট্টিটি ধারায় অধ্যয়ন-জাত পাণ্ডিত্যে তিনি পরিণত হন একজন 'জবরদস্ত মৌলবী'তে।

কথনোই বিস্মৃত হলে চলবে না যে রাজার মানস গঠনে সবচেয়ে জোরালো প্রভাবগুলির অন্যতম ছিল ইসলামী যুক্তিবাদীদের (অষ্টম শতকের 'মুতাজিলা'দের) বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি। একথা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে তাঁর একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতা-বিরোধী প্রথমদিকের রচনাগুলি রচিত হয়েছিল ফার্সীভাষায়।

ফার্সী ও আরবী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের কয়েক বছর পরে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় লাভ করেন আর তা-ই তাঁর কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তাঁর উত্তরাধিকার হিসাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সম্পদকে। একথা না বললেও চলে যে তিনি ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে পণ্ডিত হয়ে উঠে-ছিলেন, কেবলমাত্র বৈদিক সংহিতাগুলি ব্যতিরেকে যার গভীর অধ্যয়ন তিনি কথনোই করেন নি। কারণ সেই সংহিতাগুলির রূপক ব্যাখ্যা

দেবার মানসিকতা ছিল তাঁর। কারণ তিনি মনে করতেন যে বৈদিক দেবতারা রূপকমাত্র অথবা ঈশ্বরের অনন্ত সত্তার বা কার্যের ব্যক্তিরূপায়ণ মাত্র। তিনি সযত্ন অধ্যয়ন করেছিলেন হিন্দু 'স্মৃতিশাস্ত্রের'— যার অন্তর্গত ছিল বিধিবিধান ও বিচারব্যবস্থা, মীমাংসা সমেত দর্শনের সামাজিক রূপায়ণগুলি আর পুরাণসমূহ, তন্ত্রসমূহ, উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ সমেত সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সাহিত্য। তবে তাঁকে সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত করেছিল শংকরের ভাষ্যসহ ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও উপনিষদ— বা অন্যরূপে বলতে গেলে বেদান্তশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয় তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মচেতনা ও জীবনদর্শনকেও প্রভাবিত করেছিল।

ব্যক্তিগত মূল্যবোধের জন্য তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন জৈন শাস্ত্র ও মহাযান পন্থের বৌদ্ধ চর্যাসমূহ তবে এ দুটি বিষয় তিনি যতটা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও প্রমাণের মাধ্যমেই অবগত হয়েছিলেন, ততটা গভীর পড়াশুনার মাধ্যমে নয়। তিনি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের কবীরপন্থী, নানকপন্থী, দাদূপন্থী প্রভৃতি ধর্মীয় আন্দোলনের আচরণ বিধি, তত্ত্ব ও সম্ভবত সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন আর পরিচিত হয়েছিলেন উত্তর ভারতের রামায়েৎ সম্প্রদায়গুলির সঙ্গেও। একেশ্বরবাদী হিসাবে উত্তরাঞ্চলের এই-সব একেশ্বরবাদী মতবাদ ও আচারের সাধকদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বচেতনা ছিল তাঁর।

এর বহু কাল পরে, যখন তিনি উত্তরবঙ্গে কালেক্টরের অফিসে একটি নিম্নপদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি ইংরেজি ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। কয়েক বছরের দ্বিধা ও অল্পস্বল্প আগ্রহের পর তিনি তাঁর অসাধারণ ভাষাজ্ঞানের মেধাকে নিবদ্ধ করলেন তাঁর এই লক্ষ্যে। পাশ্চাত্যের এই নব জ্ঞান— সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির যা ছিল আধার— তা অধ্যয়ন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং প্রথম ফরাসী বিপ্লব যা তিনি কালেক্টর মিঃ ডিগবির কাছ থেকে অবগত হন— তা জাগ্রত করল তাঁর তীব্র ঔৎসুক্য।

এবার তাঁর অধ্যয়ন নিবদ্ধ হল ধর্মের যুক্তিবাদী সাহিত্যের দিকে আর রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেতনার দিকে। বেকন থেকে আরম্ভ করে লক ও নিউটনের প্রয়োগবাদী (empirical) দর্শনচর্চা শুরু হল তাঁর, আর সেইসঙ্গে হিউম, গিবন, বোলত্যের, ভলনি, টম পেইন-এর যুক্তিবাদ ও নব্য র্মতত্ত্ব ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব দর্শনের স্বাধীন চিন্তার প্রচার ও নব্য "আলোকে"র চর্চা

শুরু করলেন তিনি। সমকালীন স্বাধীনতা-চেতনার উৎসমুখ থেকে তিনি আকণ্ঠ পান করলেন স্বাধীনতার উন্মাদনী রস, উদ্দীপিত হলেন তিনি নবযুগের আলোকের চেতনায়। এই-সব অধ্যয়ন তাঁর সবরকম আচার-বিধি, গোঁড়ামি ও অলৌকিকতা বর্জনের মানসিকতাকে দৃঢ়তর করেছিল —যে চেতনা স্বদেশের ধর্ম ও শাস্ত্রের সম্পর্কে তিনি নিজে থেকেই গঠন করে ফেলেছিলেন। এ চেতনাব বিকাশে তাঁকে সাহায্য করেছিল মুতাজিলাদের শিক্ষা, সূফী ও উত্তরমীমাংসাব অধ্যয়ন। বস্তুত তিনি শাস্ত্র ও সব রকমের ঐতিহ্যবাহী ধর্মমতের সম্পর্কেই হয়ে উঠলেন সন্দিহান। তবে তাঁর এই প্রাথমিক উন্মাদনার আবেশ ক্রমে অপসারিত হল। বেদান্তের গভীরতর অধ্যয়ন তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এল বিশ্বসম্পর্কে ঈশ্বর-বাদী চিন্তায় আর বিশ্বইতিহাসের চেতনায়। এর পরেই শ্রীরামপুরের খৃস্টান মিশনারিদের সঙ্গে আলোচনায় দেখা গেল তাঁর চেতনা সরে এসেছে খৃস্টধর্মের দিকে। এবার শুরু হল তাঁর অতি গভীরভাবে বাইবেল পাঠ। তিনি শিখে ফেললেন হিব্রু, সিরিয়াক ও গ্রীক ভাষা। কেবলমাত্র যে হিব্রুতেই তিনি ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট অধ্যয়ন করলেন তা নয়, তিনি তালমুদ, তারজুম এবং সিরীয় রচনাগুলিও পাঠ করলেন কেবল শাস্ত্রভাষ্য-লক্ষ্যে নয়। ইহুদী ও খৃষ্টীয় মতবাদ-এর বিকাশধারা অধ্যয়নের জন্য এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে। ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বাদানুবাদকালে তিনি খৃষ্টীয় ধর্মমত ও আচারবিধির উৎস ও ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান করেছিলেন প্রামাণিক চার্চ-ইতিহাস-এর মধ্যে— বিশেষ করে আরীয়ান, স্যাবেলিয়ান ও পেোলাসীয়ান মতদ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে। শুধু তাই নয়, ইহুদী র‍্যাব্বিদের খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকের রচনায় যে উদার চিন্তা ও নীতিগত যুক্তিশীলতা ছিল, বিশেষ করে জোনাথান ও হিলেল-এর 'তারজুম'গুলিতে, তাও তিনি খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন। এভাবে হিব্রু ও আরব উভয় ঐতিহ্যের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেমেটিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করে তুলেছিল রাজার মানসলোক। সর্বোপরি তিনি গ্রহণ করলেন খৃষ্টীয় সংস্কৃতির পক্ষপাতমুক্ত চেতনাকে যা তিনি পেয়েছিলেন—হিব্রু ও গ্রীক, রোমান ও অপরাপর বিধর্মী চিন্তা ও আচরণের মিশ্রণের মধ্যে। কিন্তু তাঁর প্রথম মানসদীক্ষার প্রতি খাঁটি থেকে তিনি সবসময় খৃস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই মত পোষণ করেছেন যে মিশ্র খৃষ্টীয় ঐতিহ্য ছাড়াও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্য

ভিত্তি ছিল—তা হল বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি—এ হল সপ্তদশ শতকের বেকনীয় ভাববিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রকৃতির ওপরে মানবের প্রভুত্ব স্থাপনে বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা, শিল্পোৎপাদন এবং যন্ত্রের বিকাশের ক্রমোন্নতি। পরবর্তী জীবনে তিনি উত্তরোত্তর আত্মনিয়োগ করেছেন মতবাদের চেয়েও প্রতিষ্ঠানের দিকে। যে মনস্বিতা তিনি তুলনামূলক ধর্ম-তত্ত্ব অধ্যয়নে প্রদর্শন করেছিলেন, সেই মনস্বিতা নিয়েই তিনি ধর্মসংস্কারের বাদানুবাদ থেকে অর্থনৈতিক, আইন ও রাজনৈতিক গ্রন্থগুলির সাহায্যে আত্মনিয়োগ করেছেন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনামূলক অধ্যয়নে ও বিশ্লেষণে।

রাজার মানসলোকের মিশ্র প্রকৃতির বয়নে এই-সব সংস্কৃতি-সূত্রগুলি হয়েছিল উপাদান। তবে এগুলি হল তাঁর মানস ইতিহাসের বহিরঙ্গ রূপের প্রধান দিক। এবার আমি সংক্ষেপে সন্ধান করব সেই আন্তর ইতিহাসটি। সৌভাগ্যক্রমে তথ্য রয়েছে প্রচুর আর সেগুলি তাঁর মানস-বিকাশের প্রধান স্তরগুলির ওপরে করে আলোকপাত। আগেই দেখেছি, কিশোর বয়সেই তিনি পৌত্তলিকতা ও বহুদেবতা-মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এ পর্যন্ত তা ছিল তাঁর মতে যা অসত্য তার বিরুদ্ধে সত্যের এবং ভ্রান্তি ও মোহের বিরুদ্ধ সত্য বিচারবুদ্ধির সংগ্রাম। এই বিশুদ্ধতাবাদী দেববিরোধী উত্তেজনা তাঁকে তাঁর গৃহ থেকে নির্বাসিত করে নিয়ে যায় হিমালয় পর্বতের বিপদসংকুল পথে, যে পথে তিনি এক-দিন উপনীত হয়েছিলেন তিব্বতে। তিনি কিছু ফার্সী রচনা লিখেছিলেন, মাতৃভাষায়ও লিখে থাকতে পারেন, কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই। তাঁর এই প্রথম বয়সের ভ্রমণ তাঁর মানসদৃষ্টিকে করেছিল প্রসারিত। কয়েকটি বিষয় তাঁর মনে ছাপ কেটে দেয়—ধর্মের আচারবিধি অধোগতি লাভ করেছে কুসংস্কার-এর আচারে। নানা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের গোঁড়ামি ও পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব। সে-সব সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলি কেবল নিরত ছিলেন কুসংস্কার-এর সমর্থনে। বিশ্বাসের সারসত্তায় নয়, আর এই-সব ধর্মীয় গোঁড়ামি ও দুর্নীতির গভীরে ছিল যে পুরোহিততন্ত্র, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। যখন তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ, ততদিনে তিনি মনে হয় যুক্তিবাদী ও চিন্তায় মুক্তির সমর্থকদের রচনা অধ্যয়ন করে ফেলেছিলেন, নিশ্চিতভাবে মুওয়াহিদ্দীন, সূফী ও মুতাজিলাদের রচনা

এবং সম্ভবত হিউম, বোলত্যের এবং ভল্‌নির দার্শনিক চিন্তাধারাগুলিও অধ্যয়ন করেছিলেন। নিজে তিনি ছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামী নায়ক, তাই তিনি পৃথিবীর সমস্ত তথাকথিত পুরাণেতিহাস শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় ধর্ম-মতগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তাঁর আরবী-ফার্সী পুস্তিকা 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থটিতে তিনি একটি মহান প্রতিরোধী শঙ্খ-নিনাদ ধ্বনিত করেন 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার' হিসাবে। বোল্‌ত্যের (এবং ভল্‌নির)-এর কায়দায় তিনি মানবজাতিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন— যারা প্রতারক, যারা প্রতারিত, যাবা প্রতারক এবং প্রতারিত, যারা প্রতারক ও নয়,প্রতারিতও নয়। তাঁর এই রচনায় লক এবং হিউম-এর প্রভাব লক্ষিত হয় যাতে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কুসংস্কারের হেতুগুলি এবং তার প্রভাবগুলি, এ বিশ্লেষণে ইতিহাসের চেয়ে মনস্তত্ত্বই গুরুত্ব পেয়েছে সমধিক। কিন্তু তথাপি তিনি বিশ্বাসী ছিলেন সত্য ধর্মের মূল অস্তিত্বে। বিশ্বাসী ছিলেন এক স্রষ্টায়, এক নৈতিক নিয়ন্তায় এবং আত্মার আধ্যাত্মিক সত্তার অস্তিত্বে। পৃথিবীব সমস্ত ধর্মমতগুলিতে আব সব-কিছুই তাঁর কাছে হয়েছে অসার এবং প্রায়শই মনে হয়েছে সত্যের কেন্দ্রীয় সত্তার অবিশুদ্ধ বা মিথ্যা বিকৃতির সঞ্চয় বলে। তাঁর মুক্ত চিন্তা এইখানেই স্তব্ধ হয় নি। মনে হয় এ সময়ে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন একদিকে ষড়্‌দর্শন (বিশেষ করে পূর্ব মীমাংসা) আর অপর দিকে হিউম ও অপরাপর মুক্ত চিন্তাবিদ্‌দের রচনা। জগৎসৃষ্টি নিয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল এবং তিনি দার্শনিক চিন্তা করেছেন (জগতের গতিধারার রক্ষায়) বস্তুর চিরন্তন সত্তা নিয়ে, প্রকৃতির স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে এবং প্রকৃতির নিয়মাবলী নিয়ে।

কিন্তু এই সময়েই তিনি বত ছিলেন বেদান্ত পাঠে। শংকর-প্রবর্তিত ব্রহ্মসূত্রের দর্শন তাঁর সন্দেহ ও সংশয় তৃপ্ত করেছে বলে মনে হয়। ব্রহ্ম-তত্ত্বে তিনি স্থিতিলাভ করেছেন, সগুণ ও নির্গুণ দুই তত্ত্বকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, জগতের অন্তর্নিহিত বস্তুসত্তার মধ্যে সর্বাতিশয়ী গুণকেও তিনি সমানভাবেই উপলব্ধি করেছেন। সগুণ ব্রহ্ম, অর্থাৎ আরো যথাযথভাবে বলা যায় সগুণ ব্রহ্মের 'মায়া' হয়েছে মূল উৎস ও আশ্রয় সকল বহিরঙ্গ সত্তার (প্রপঞ্চের), যা সগুণ ব্রহ্মের মায়া। তাই হল জীবের মধ্যে অবিদ্যা। সৃষ্টির প্রক্রিয়া হল অনাদি প্রক্রিয়া, যাকে বলা হয় মায়ার 'বিক্ষেপ' অথবা জীব-এর দিক থেকে অবিদ্যার দ্বারা 'আবরণ'; যার ফল হয় জীবের মনে

পৃথিবীর প্রতীয়মান সত্তার বিক্ষেপ— পরম সত্যের ওপরে (যেমন ভ্রান্তির দ্বারা রজ্জুতে হয় সর্পভ্রম)। জীব কিন্তু এই মায়িক জগৎকেই প্রকৃত জগৎ বলে, স্বাধীন সত্তা বলে মনে করে। প্রকৃতির বস্তু 'চিৎ'-এর ওপরে হয় স্থাপিত— দ্বৈত সত্তা রূপে; এই হল জীবের বিভ্রম. এ ভাব থেকে যায় যতদিন না জীবের হয় 'ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান'— একের উপলব্ধি। তখন জীব-এর নিকটে মায়া আর থাকে না বিদ্যমান। এর দ্বারাই জীব, মায়া ও প্রপঞ্চের (জগতের) সঙ্গে সগুণ ব্রহ্মের সম্পর্কের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃত সত্তা মায়ার শর্তে বাঁধা নয়। মায়ার সীমাবদ্ধতা বা অপূর্ণতা (যার ফলেই জগতের যত-কিছু পাপ ও ক্লেশ) তা স্পর্শ করে না ব্রহ্মকে, তাই ব্রহ্মের প্রকৃত সত্তা— অদ্বৈত ও নির্গুণ। অপর পক্ষে জগৎ হল ব্রহ্মের সগুণ প্রকাশ— তা ব্রহ্মের পরম সত্তা বা পারমার্থিক সত্তা নয়। এর অস্তিত্ব আপেক্ষিক— অর্থাৎ জীবের জন্য এবং জীবের মাধ্যমেই এর অস্তিত্ব। এ অস্তিত্ব স্থায়ী হয় যতক্ষণ অর্জিত হয় না জ্ঞান (পরম একের উপলব্ধি) আর তার সঙ্গে সঙ্গে লব্ধ মোক্ষ বা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি। কিন্তু এই অর্জনের জন্য প্রত্যেক জীবকে অতিক্রম করতে হয় কয়েকটি স্তর। তাকে গ্রহণ করতে হবে এ জগৎকে 'ব্যাবহারিক' সত্তা বলে, তার নিজের ব্যবহার বা সাধনার জন্য। জগৎ বা প্রকৃতির নিয়মাবলী হল ঈশ্বরেরই নিয়মাবলী আর মানবের কর্তব্য হল এই নিয়ম পালন। আত্মার পরম লক্ষ্য হল ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা, এই ঐক্য ঘটে জ্ঞানের দ্বারা বা অদ্বৈতের উপলব্ধির দ্বারা। এই উপলব্ধি ঘটে যখন চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় কর্ম ও আরাধনার দ্বারা এবং আলোকিত হয় ধ্যান ও যোগের দ্বারা। এ ব্যাখ্যায় দুটি বিষয় উল্লেখনীয়। তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন 'উপাসনার' ওপর— যা হল ধ্যান ও আরাধনার পালনীয় তপস্যা এবং নিষ্কাম কর্মের ওপর। এই সাধনা পদ্ধতি চলবে যতদিন না মোক্ষ হবে উপলব্ধ। ব্রহ্মজ্ঞানীর জন্য তিনি বিকল্প দিয়েছেন— কর্ম (নিষ্কাম কর্ম) বা অকর্ম, আশ্রমী বা অনাশ্রমী যে-কোনো অস্তিত্ব। এদিক থেকে এ কথা বললেই সত্যকথা হবে যে রাজার ব্রহ্মবিদ্যা— ব্যক্তিআত্মা ও জগৎ এই দুয়ের প্রতি দর্শনে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয়কেই গ্রহণ করেছিল। ঈশ্বরের প্রতি গুরুত্ব আরোপ তাঁর অদ্বৈতবাদকে করেছে সমন্বয়ধর্মী, বাস্তব, ব্যবহারের উপযুক্ত।

উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই দর্শন প্রভাবেরও

বিকাশ ঘটিয়ে চললেন। সেখানেই নিবৃত্ত থাকলেন না। তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের প্রামাণিকতার নতুন অর্থ ও লক্ষ্যও তিনি পেলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে ব্যক্তির যুক্তিবোধের আলোককে মিলিয়ে নিতে হবে জাতির সমষ্টি-প্রজ্ঞার আধারস্বরূপ শাস্ত্রের সঙ্গে। যুক্তি বা প্রামাণিকতাই জীবনের লক্ষ্য পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয়, মানুষের নৈতিক ও মননশক্তির দুর্বলতা ও অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, আর সেই দুটি জিনিসের (যুক্তি ও প্রামাণিকতা) মিলনেই মানুষের যথার্থ চালনা সম্ভব।

রামমোহন রায় তাঁর বিশ্বাস ও আচরণের স্থায়ী ভিত্তির নিকটবর্তী হলেন।

তাঁর পরবর্তী আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে তিনি হিন্দু, মোসলেম ও খৃস্টান এই ত্রিবিধ ধর্মের শাস্ত্রগুলির মূলভাষার গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ফেলেছেন এবং তিনি দেখেছেন যে ধর্মের সত্যের সারসত্তা, ঈশ্বরকে পরমাত্মারূপে উপলব্ধি, আধ্যাত্মিকতায় এবং সত্যের উপলব্ধিতে তাঁর আরাধনা, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তিরূপে নৈতিক জীবনচর্যা— সমস্ত ঐতিহাসিক ধর্মীয় শাস্ত্রগুলির মূল শিক্ষা। তিনি দেখেছেন, ঈশ্বরতত্ত্ব মাত্র এক, ধর্ম-ইতিহাসে তার কিছু বিবিধ সত্তার রূপ রয়েছে মাত্র— যেমন হিন্দু ঈশ্বরবাদ, ইসলামিক ঈশ্বরবাদ এবং খৃস্টীয় ঈশ্বরবাদ — প্রতিটি ভিন্ন তত্ত্বই বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে— তা বেদ বা বেদান্ত হোক, কোরান বা বাইবেল হোক। এদের মধ্যে ইসলাম বা খৃস্টধর্ম কেন্দ্রীভূত হয়েছে দিব্য প্রচারক বা ঐতিহাসিক প্রবক্তাকে অবলম্বন করে, অপর-পক্ষে হিন্দু ঈশ্বরবাদের কোনো নির্দিষ্ট বা একক ঐতিহাসিক কেন্দ্র নেই, তার সঙ্গে যুক্ত দিব্য প্রচারকমালা— যেমন, রাম, কৃষ্ণ, শিব— এঁরাই হলেন গুরু। প্রত্যেকেরই ছিল বিশিষ্ট দীক্ষারীতি, আচারবিধি এবং বিশেষ প্রতীক— এগুলি আবার হয়েছিল ভৌগোলিক, নৈসর্গিক ও জাতিগত উপাদানের প্রভাবাধীন।

এভাবে তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রাথমিক অধ্যয়ন থেকে উপনীত হলেন এক বিশ্বজনীন শাস্ত্রে, এক বিশ্বজনীন প্রমাণ কর্তৃত্বের ধারণায়— যা সমস্ত ঐতিহাসিক শাস্ত্রগ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রমাণের মধ্যেই ছিল অন্তর্নিহিত। তাঁর তুহ্‌ফাৎ- উল-মুওয়াহিদ্দীন-এর সার্বিক খণ্ডন থেকে তিনি বিশ্বজনীনতায়

উপনীত হয়েছেন তাঁর বেদান্তগ্রন্থের (সংক্ষেপ ও অনুবাদ) ভূমিকায়।

তিনি এবার অনুভব করলেন যে বিশ্বজনীন সত্যই প্রকাশ পেয়েছে নানা পথে, নানা শব্দে, নানা ঐতিহাসিক প্রবচনে। বেদান্ত, যা তাঁকে ফিরিয়ে দিল বিশ্বাসে— তাকে তিনি জেনেছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী জ্ঞান-রূপে— ব্রহ্মের মধ্যে জগতের সকল আত্মার ও সকল জ্ঞানের ঐক্য রূপে। যে ইসলাম তাঁকে প্রথম জীবনে দেববিরোধী উন্মাদনা জাগ্রত করেছিল —তাকে তিনি মনে করতেন দিব্য প্রশাসনের শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে এবং মানুষের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্যের আদর্শ বলে। খৃস্টধর্ম তাঁকে দেখিয়েছিল দিব্য সত্তার মূর্ত আদর্শ। তাকে তিনি মনে করতেন। জীবনের পথে সুখ ও শান্তির দিকে নৈতিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে। এভাবেই ধর্মে তাঁর বিশ্বজনীনতা উপনীত হল এক ঐতিহাসিক সমন্বয়ে আর ধর্ম-সমন্বয়বাদীদের থেকে এ প্রয়াস দুটি দিক থেকে ভিন্ন ছিল— প্রথমত, এই ধর্মমতগুলির কোনোটাই সত্যের অংশমাত্র ছিল না, এদের প্রত্যেকটি আদিম বিশুদ্ধতার কালে ছিল বিশেষ অবস্থায় ও জাতিগতভাবে ব্যক্ত সত্য। দ্বিতীয়ত, তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিটি ধর্মমতই নিজস্ব ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যময় অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করবে এবং পারস্পরিক সংযোগ, সমন্বয় ও সম্মিলনের মাধ্যমে উপনীত হবে এক সাধারণ লক্ষ্যে।

এখানে তিনি দুটি অসুবিধার সম্মুখীন হলেন :

১. প্রতিটি দেশে ধর্মাচরণবিধির বাইরে যে বিশাল ধর্মীয় সাহিত্য, চর্যা, সংঘ প্রভৃতি গড়ে উঠেছে— শাস্ত্রের আদিম সরল সত্যকে সমাচ্ছন্ন করে— তার কী হবে ?

রাজার উত্তর ছিল স্থির— ধর্মের এই পরবর্তী বিকাশ-এর অধিকাংশই বিকৃত ও অবনতির ফল, অংশত পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং অংশত মানবমনস্তত্ত্বের বিচিত্র গতি ও সামাজিক পরিস্থিতির ফলেই এ-সব ঘটে। মানব-ইতিহাসে অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তনবাদের প্রয়োগরীতির আগেই ঘটে গেছে রামমোহনের জীবনকাল। প্রতি ধর্মসংস্কারের মধ্যেই তিনি দেখেছেন ধর্মতত্ত্বের ও চর্চার আদিম সরলতা। তিনি দেখেন নি বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালে আবির্ভূত ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও তাদের রীতিকৃত্যের মধ্যে কোনো ক্রম-বিকাশের রূপ।

২. বিভিন্ন ধর্মের আচার আচরণ, নিয়ম ও প্রতীকগুলির কী হবে ?

আচারগুলি তিনি মেনে নেবেন, কিন্তু তাঁর কাম্য ছিল সরলতা। তিনি জোর দিয়ে চেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে থাকবে সামাজিক চারিত্র্য, সামাজিক পবিত্রতা আর সামাজিক সুখ ভেঙে দেয় এমন আচার নয়। তাঁর স্বদেশবাসীর মধ্যেই যে ছিল এমন বহু ধর্মাচার—যার তিনি নিন্দা করতেন। আর প্রতীকগুলিকেও হতে হবে সত্য প্রকাশের উপযোগী, যা সত্যকে কলুষিত বা অবনমিত করবে না। তাঁর প্রথম দিকের আচার ও প্রতীক-বিরোধিতার মূলে ছিল তাঁর এই ধারণা যে সেগুলি প্রায়শই আচ্ছন্ন করে সত্যকে আর সত্যবোধের মানসিক শক্তিকে তারা রুদ্ধ করে মনকে করে জড়-কঠিন, রীতিসর্বস্ব। তার পরবর্তী বাংলা রচনায় দেখা যায় যে তিনি এ-সবের রীতিসম্মত প্রয়োগমূল্য স্বীকার করেছেন এই শর্তে যে নব নব আচার ও প্রতীক ব্যবহারে স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত ও বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড দেখা যাবে, যাতে তাঁরা আত্মিক চেতনাকে সাহায্য করে তার মুক্তি অর্জনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন বৈদান্তিক হিসাবে তিনি প্রতীক-উপাসনার দেবমূর্তি পূজার তীব্র বিরোধিতাই করে গেছেন—একেশ্বর সাধনায়।

আর একথাও বলা প্রয়োজন যে ধর্মাদর্শের ক্ষেত্রে ঈশ্বর সাধনায় ভ্রাতৃত্ব চেতনায় তিনি কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসী হিন্দু, মুসলিম ও খৃস্টানদেরই গ্রহণ করেন তিনি, তিনি এই ভ্রাতৃত্ব সম্প্রসারিত করেছিলেন তাদের মধ্যে যারা যে নামেই হোক-না কেন, বিশ্ববিধানকে স্বীকার করে তার ধ্যানকে মঙ্গলময় মনে ক'রে (জীবনের মূল আদর্শরূপে) মানুষের প্রতি প্রেম ও সেবার মানসিকতায় পূর্ণ হয়। বৌদ্ধ, জৈন বা অন্য যারাই প্রকৃতির বিশ্ববিধানকে স্বীকার করেন তাঁদের সকলকেই তিনি ঈশ্বরবাদীদের সৌভ্রাত্রমণ্ডলে গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

এভাবে যখন তিনি তাঁর ধর্মের দর্শন ও আচারবিধির তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করছিলেন তখন তিনি সেকালের পণ্ডিত, মৌলবী ও পাদ্রীদের সঙ্গে সংঘাতে আসেন। এই সংঘাতই তাঁকে নিয়ে যায় সেই চিন্তা ও কর্মধারার স্রোতে যা পরিণত হয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর সমন্বয়সাধনে, তাঁকে সুচিহ্নিত করে দেয় আগামীযুগের মানবতার ঋষি ও পথদ্রষ্টা রূপে।

এই ধর্মীয় বিতর্কে তাঁকে মূল হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও খৃস্টধর্মের সমর্থনে সংগ্রাম করতে হয় এই-সব ধর্ম প্রতিষ্ঠানের গোঁড়া ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে।

আবার তাঁকে হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও খৃস্টধর্মের প্রতিটির হয়ে সংগ্রাম করতে হয় অন্ত দুই ধর্মের পাণ্ডাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে। এ কাজ তিনি সম্ভব হবে বলে মনে করেছিলেন নিম্নোক্ত ভিত্তিতে—

১, প্রথমত প্রতিটি ঐতিহাসিক ধর্মমতকে প্রদর্শন করতে হবে পরবর্তী কালে যুক্ত হওয়া তীব্র ঘৃণা গোঁড়ামিপূর্ণ অসূয়া এবং অজ্ঞ অভিমান থেকে মুক্ত করে ধর্মের প্রাথমিক পবিত্র রূপে।

রাজা দেখেছিলেন যে ,মানুষকে মানুষরূপে ভালোবাসাকেই ঈশ্বরের ভালোবাসা বলে প্রামাণিক প্রকাশ করেছিল হিন্দুধর্ম, ইসলাম এবং খৃস্টধর্ম। সকল সত্য ধর্মের সার কথাই হল বিবেকের স্বাধীনতা, পূর্ণ আত্মাকেই আত্মা বলে সম্মান করা।. তিনি জোর দিয়েছিলেন (এ বক্তব্যে যে,) জীবনকে সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে রয়েছে পরমতসহিষ্ণুতা। যে-সব ধর্মের আচার এই আদর্শ লঙ্ঘন করে অথবা সামাজিক নীতিকে নষ্ট করে, তা রাষ্ট্রের দ্বারা দমিত করতে হবে।

২. দ্বিতীয়ত সকল ধর্ম, তা জাতিভিত্তিক ,হোক বা বিশ্বাসভিত্তিক হোক. যার আশ্রয়ে সমাজের সমষ্টি হিসাবে জনসমষ্টি বাস করেছে, তাদের মেনে নিতে হবে ইতিহাসের ঐতিহ্যধারায় বিশ্বজনীন আদর্শের দিকে বা এক মহাসম্মিলনের কেন্দ্রের দিকে প্রবহমান বলে। এই আদর্শ হল বিশ্বধর্মের আদর্শ। আমাদের যুগের ভাষায় রাজার বক্তব্যকে প্রকাশ করলে বলতে হয়, এটি একটি স্থির আদর্শ নয়, একটি বিকাশশীল আদর্শ। যেমনই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ,তাদের নিজস্ব অগ্রগমনের পথে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় এবং এক সাধারণ কেন্দ্রের দিকে অভিযাত্রা করে, ততই মহামিলন কেন্দ্রও তার স্থান পরিবর্তন করে হয় অগ্রসরমান; যার ফলে আদর্শ চিরকালই আদর্শ থেকে যায়, নিরন্তর সম্মুখের দিকে, উচ্চতার দিকে, আহ্বান করে চলে ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা ও করুণার দিকে।

তাই, একথা ধরে নেবার প্রয়োজন নেই যে মহান ঐতিহাসিক ধর্মমতগুলি, বিশ্বজনীনতার সেই জাতীয় প্রকাশগুলি, রুদ্ধ হবে বা একে অপরের সঙ্গে মিশে যাবে; একমাত্র জাতিগুলির ঐতিহাসিক সমন্বয়মিলনের কথা অবশ্য পৃথক। রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই আন্তর্জাতিকতা বা অতি-জাতীয়তা বা বিশ্বরাষ্ট্র বলতে এই বোঝাবে না যে জাতিসমূহের পার্থক্য বা

বৈচিত্র্য লুপ্ত হবে এবং ঐতিহাসিক ধর্মমতগুলি যে একে অপরের মধ্যে মিশে যাবে এরও আবশ্যকতা নেই। কিন্তু প্রতিটি মহান জাতীয় বা ঐতিহাসিক ধর্মমত পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উঠবে পরস্পরের সংসর্গে, স্বাঙ্গীকরণে এবং আদর্শের সম্মিলনে; তারা অবশ্য বিকশিত হবে তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক প্রবাহের ধারায়, এক সাধারণ বিশ্বধর্মের বিশেষ বিশেষ মূর্ত রূপ হিসাবে। যেমন বিভিন্ন নৃজাতিগোষ্ঠী বা জাতিগুলি বিবর্তের পথযাত্রী হবে বিশেষ জাতিগত, ঐতিহাসিক পরিবেশে বিশ্বজনীন মানবতার বিশেষ মূর্ত প্রকাশ হয়েই।

৩. তৃতীয়ত, যেখানেই ধর্মীয় প্রভুত্ব (সামাজিক) আচার-আচরণকে অচল, স্থবির করে ফেলেছে, যেমন খাদ্য, পানীয়, বিবাহ, ব্যক্তিগত বিধিবাধন-এর নিয়মবন্ধনে, বা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বন্ধনে, সেখানে প্রথম পদক্ষেপেই হবে ধর্মের বিকার থেকে তাদের মুক্ত করা এবং তাদের সুস্থির ভিত্তিতে স্থাপন করা— গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের হিত বা সুখের আদর্শে ভিত্তি করে। মানুষের সকল আগ্রহের বিষয় সকল বিজ্ঞান ও শিল্পকলা হবে স্বাধীন, নিজস্ব আঞ্চলিক প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে। ধর্ম সেখানে হবে মানবের সকল কর্মবৃত্তের সমন্বয় সাধনে তার নিজস্ব আদর্শের ও লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত। সে লক্ষ্য হবে 'লোকশ্রেয়স' বা বিশ্বজনের মঙ্গল। এই মৌলিক লক্ষ্য অনুসারেই জাতীয় ধর্মগুলির প্রগতিশীল সম্মিলন ঘটবে: হিন্দুস্মৃতি, মুসলিম শরিয়ৎ এবং খৃস্টান বিধানগুলি নিজের নিজের মৌলিক ধর্মাদর্শ পূরণ করে বিজ্ঞান, প্রকৃতি ও সমাজ-এর নিয়মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সত্য প্রকাশের সঙ্গে হবে সমন্বিত।

এই পথেই, ভাবী ভারতের এবং বস্তুত ভাবী মানবতার বিকাশ সম্ভব. এটা যদি কার্যকরী বলে মেনে নেওয়া যায়, (আর তা যে সম্ভব রামমোহন স্পষ্ট, বাস্তব এবং কার্যকরী বলে প্রমাণও করেছেন) তবে এদিক দিয়ে তাঁর প্রয়াস হল এক ত্রিবিধ সংস্কারের— হিন্দু, মুসলিম এবং খৃষ্টীয় ধর্মের সংস্কার সাধনের।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সকল ধর্মের মিলন সাধনের প্রয়োজনেই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্মসমাজ— সবধর্মের এবং সর্বমানবের ঈশ্বরের আরাধনার জন্য এক প্রতিষ্ঠান রূপে। ঈশ্বর-পূজকেরা নিজের নিজের ধর্মের মধ্যেই থাকতে পারেন— শৈব বা বৈষ্ণব, স্মার্ত বা বৈদান্তিক, তত্ত্ববিশ্বাসের দিক থেকে

হতে পারেন খৃস্টান বা মুসলিম, ইহুদী বা জৈন—যে-কেউ যোগ দিতে পারেন উপাসনায়, কাউকেই সরে আসতে হবে না তার নিজের ধর্মীয় ঐতিহ্য, সম্প্রদায় বা মঠ গীর্জা ছেড়ে। প্রধান ভাবধারা ছিল এই যে একজন মানুষ সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খৃস্টান, ইহুদী, জৈন বা বৌদ্ধ হোক তথাপি সে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের ভ্রাতাদের সঙ্গে সম্মিলনে মিলিত হতে পারবে যাতে এরকম সাধারণ উপাসনা এবং প্রার্থনা তাদের বিশ্বজনীন ধর্মের সাধারণ ভিত্তির ধারণা এনে দিতে পারবে এবং প্রতিটি ধর্মীয় ঐতিহ্যকে চলমান হতে সহায়তা করবে আরো যথার্থ আরো সত্য হবার পথে, বিশ্বজনীন সম্মেলনের আদর্শ কেন্দ্রের অভিমুখে।

প্রকৃত চর্চার ক্ষেত্রে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ যে ছিল বিশেষ ধরনের ঈশ্বরবাদী আচার ও প্রতীক-আশ্রয়ী হিন্দু ঈশ্বরবাদীদের সম্মেলন—এতে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ সর্বসাধারণের উপাসনা কোনো নির্দিষ্ট রূপরীতি গ্রহণ করবেই। কিন্তু সর্বনিয়ন্তা ভাবটি ছিল, সমকালের ধর্মমতগুলির সামাজিক সংহতিকে শক্তিশালী করা। এই ভাবটির পূর্ণতার জন্য এটাই প্রয়োজন হয়েছিল যে, রাজার ব্রাহ্মসমাজের মতোই গড়ে উঠবে একটি খৃস্টান ও মুসলমান উপাসকদের সংস্থা: বস্তুত, ব্রিটিশ এবং বিদেশী ইউনিটারিয়ান সমিতির সঙ্গে রাজার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, তা থেকেই এই লক্ষ্যাভিমুখে খৃস্টানদের অগ্রগতির ওপর গুরুত্ব অর্পিত হয়। একথাও বিস্মৃত হলে চলবে না যে পাশ্চাত্য দেশে ইউনিটারিয়ান খৃস্টধর্মের ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায় ইউনিটারিয়ান আন্দোলনের একজন উজ্জ্বল জনকরূপেই পরিচিত হয়েছেন। আধুনিক ভারতবর্ষে উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল মুসলিম চিন্তাধারার অধ্যয়নকারীদের কাছে বিশ্বজনীন ইসলামের পক্ষে রাজার প্রয়াস অতি পরিচিত। তাঁর শরিয়ৎ ও হাদিশ-এর ভাষ্য আর মৌলবীদের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক দেখিয়ে দিয়েছিল যে শিয়া ও সুন্নী উভয় মতের জন্যই ইসলামের দিব্য শান্তির পথ হল বিশ্বজনীনতা ও মুক্তি; আর এদিকেই প্রথম পদক্ষেপ হবে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রগতির আলোকে সামাজিক বিধান ও আচরণগুলি ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলা। আন্তর্জাতিক 'বাহাই' আন্দোলন বা ইসলামের সাম্প্রতিক মিশরীয় বা তুর্কী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কোনো প্রকার রূপই জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ঐতিহাসিক ও আদর্শের লক্ষ্যের বিরোধকে ততটা মেলাতে পারে 'নি যতটা পেরেছিল রাজা রামমোহনের ইসলামের

স্বপ্নাদর্শ। কিন্তু রাজার সমাজ আদর্শ— ব্রাহ্ম সমাজ— তাঁর নিজের ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে উপলব্ধ বিশ্বজনীনতার আদর্শের এক ক্ষীণ বহিরঙ্গ রূপ মাত্র। কারণ হল অদ্ভুত একটি ব্যাপার— রাজার ছিল এক বহুধাবিচিত্র ব্যক্তিত্ব। জনতার সম্মুখে তিনি যেন পরে থাকতেন ক্রমান্বয়ে বহুব্যক্তিত্বের মুখোস। বস্তুত, তিনি ছিলেন একাই এক জনসমষ্টি।

প্রথমত, তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণদেরও মধ্যে ব্রাহ্মণ, সেই বর্ণের ঐক্যের বহিরঙ্গ লক্ষণ, উপবীত তিনি ধারণ করতেন। আবার নানা জাতের খাদ্য ও পানীয় ছিল তাঁর। দত্তক নিয়েছিলেন একটি মুসলমান শিশুকে— রাজারাম নাম দিয়ে। সংসর্গ ছিল তাঁর মিশনারীদের সঙ্গে, সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি; সংগ্রাম করেছিলেন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে, বর্ণ বা জাতিগত সংস্কারের বিরুদ্ধে, যে-সব সমকালীন সংস্কারকারী শূদ্রদের দমিত রেখেছিল— তাদের বিরুদ্ধে। মাদ্রাজের সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর মতো সমকালের পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর বিতর্কে তিনি শাস্ত্রবাক্যকেই অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বজনীনতার প্রতিষ্ঠায়, ঠিক পূর্বকালের শংকরাচার্য প্রমুখ আচার্যদের মতো। তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন 'প্রস্থানত্রয়ের', তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের মধ্যেই বৈদিক আচার বা মূর্তিপূজা বাদ দিয়ে একেশ্বরবাদী গৃহস্থের (তাঁর মতে 'বেদসন্ন্যাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ') ধর্মাদর্শের ওপর।

দ্বিতীয়ত, তিনি ছিলেন হিন্দুদের মধ্যে সেরা হিন্দু আবার মুসলমানদের মধ্যেও ছিলেন মুসলমান, খৃস্টানদের মধ্যে খৃস্টান। তিনি ছিলেন "জবরদস্ত মৌলবী", অদীক্ষিত পাদরী যিনি রেভারেণ্ড এডামকে ইউনিটারিয়ান খৃস্টমতে দীক্ষিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুসলমানরা তাঁকে দাবি করেছিলেন ইসলামের বলে, খৃস্টানরা দাবি করেছিলেন খৃস্টধর্মের মণ্ডলে। অন্য সবাই বিমূঢ় হয়ে ভাবেন— তিনি কি সবই ছিলেন? এর ব্যাখ্যা সরল। জাতীয়তাবাদী সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় তিনটি পৃথক ধ্বজা উড্ডীন করেছিলেন তিন ভিন্ন বাহিনীর জন্য— যারা আবার একে অন্যের সঙ্গে ছিল সংগ্রামে রত। বিশেষ মতের বিতর্কমূলক তাঁর কিছু রচনা লেখা হয়েছিল তাঁর শিষ্যদের নামে, যদিও গোপন কথাটি ছিল সকলেরই জানা। আর-সব রচনা তাঁর নামেই হয়েছিল লেখা। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর খৃস্টধর্মের সমর্থন আর খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের সমর্থনকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়— যদিও এ ব্যাপারটা

অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। আরো চমকপ্রদ ব্যাপার এই যে তিনি খৃস্টধর্ম যেভাবে বুঝেছিলেন তার সমর্থনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মিশনারিদের বিরুদ্ধে। এ কাজে কিন্তু তিনি খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রগুলির প্রামাণিকতা নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন। একজন খৃস্টানের মতোই তিনি যুক্তি দেন, শাস্ত্রগ্রন্থ এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও স্বীকৃত আচার-বিধানগুলির সমন্বয় করে তিনি এই-সব শাস্ত্রগ্রন্থে প্রচারিত বিশুদ্ধতম বিশ্বজনীন ধর্মের মহান সত্য উপলব্ধি করেন। ইসলামের ক্ষেত্রেও তাই; হিন্দু শাস্ত্রের ক্ষেত্রের অনুরূপ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ক্ষেত্রেও হয়তো তিনি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করতেন। এভাবে নানারকম ভূমিকায় অবতীর্ণ থেকেও ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর অটুট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিভিন্ন ভূমিকাগুলি যেন এক মহান জ্যোতির্মণ্ডলের চারপাশে আবর্তিত হত গ্রহ-উপগ্রহের মতো। সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের দ্বারাই হত পরিচালিত।

তৃতীয়ত, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মাদর্শে মিলিত করতে পেরেছিলেন হিন্দু, খৃস্টান ও ইসলামী ধর্মের মৌলিক অভিজ্ঞতাগুলি। তিনি এই-সব মূল্যবোধ-গুলির অন্তরপরিক্রমা করে তাঁর নিজস্ব জীবনের অখণ্ড মূল্যবোধ পরিণত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যোগ সাধনা করেছিলেন, সাধনা করেছিলেন মোশায়ক (ঈশ্বরপ্রেমিক) তন্ত্র, সাধনা করেছিলেন খৃস্টান সন্তদের সাধনতন্ত্র। তাই যথেষ্টভাবেই তিনি ছিলেন বহুব্যক্তিত্বের মানুষ। এই-সব ঐতিহাসিক সাধনতন্ত্র ও সংস্কৃতি তাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়েছিল তাঁর আত্মার এক বিশ্বজনীন মানবতার সাধনতন্ত্রে। ইতিহাসের রয়েছে বহু কেন্দ্র, আর তিনি ইতিহাসের সারমূর্তিরূপে পরিণত হয়েছিলেন এক বহুকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বে। কিন্তু তাঁর নিজের মধ্যে সকল কেন্দ্রের অন্তঃস্থ ছিল যে কেন্দ্র তা অতিক্রম করেছিল এই-সব বিশেষ কেন্দ্রগুলি। সেই কেন্দ্রটি ছিল তাঁর সমাধির মধ্যে পরমসত্তা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মার অভিজ্ঞতা— যার মধ্যে তিনি সব খণ্ড অভিজ্ঞতার সমন্বয় করতে পেরেছিলেন। এভাবেই তিনি দেখতে পেরেছিলেন কীভাবে ভাবীকালের বিশ্বজনীন মানবতা সকল মহান ঐতিহাসিক ধর্মসাধনাতন্ত্রগুলির সমন্বয়ে ব্যক্তিজীবনে ঘটানো যাবে বিশ্বজনীন সমন্বয় (সাধনা)। এ তো সুনিশ্চিত যে, মানব-ইতিহাস ভাবীকালে দর্শন করবে বৌদ্ধধর্ম, খৃস্টধর্ম, ইসলাম ও বেদান্তধর্মের সম্মিলন— কেবল একটি মূর্ত বিশ্বধর্ম নয়— প্রতিটি ধর্মের পারস্পরিক সংযোগ ও সংশ্লেষ। এই দিক দিয়ে রাজা হলেন আগামী কালের মানবতার পথপ্রষ্টা ঋষি।

চতুর্থত, এই-সমস্ত রূপাবরণের অন্তরালে ছিলেন আরেক রামমোহন রায়— সরল, বিশুদ্ধ মানবতাবাদী— যিনি তাঁর সমুচ্চ দর্শনমঞ্চ থেকে দর্শন করেছেন বিশ্বইতিহাসে বিশ্বজনীন মানবতার মহান শোভাযাত্রা। তাঁর কাছে ভেঙে গিয়েছিল সব মূর্তিরূপ, উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল সব রহস্য। সাত-সমুদ্রপারের বোলত্যের, ভল্‌নি, দিদেরো ও হার্ডারদের তিনি ছিলেন সহচর, আধুনিক ইউলিসিসের মতো তিনি তাঁদের থেকেও করেছেন দূরতর পরিক্রমা, অস্তসূর্যের দেশ পর্যন্ত, বহুবার নেমে গেছেন অন্ধকার রাজ্যে প্রাচীন ঋষিদের বাণী বহন ক'রে।

এই হল আধুনিক ভারতের সৃজনকালে সংঘাতশীল তিনটি সংস্কৃতির রামমোহন-কৃত সমন্বয়ের তত্ত্বগত ভিত্তি। কিন্তু পূর্বেই দেখেছি, পরবর্তী স্তরে তাঁর মত ক্রমশ সরে গেছে তত্ত্ব থেকে প্রয়োগের দিকে, মতবাদের থেকে প্রতিষ্ঠানের দিকে, বাদানুবাদের থেকে সংস্কারের দিকে। এক্ষেত্রেও স্পষ্ট হয়ে পড়ে তাঁর সমন্বয়শীল ব্যক্তিত্ব। দর্শনের ঐতিহাসিকের যে সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিদ ও প্রয়োগবিদের মধ্যে চিরপার্থক্য নির্দেশ করছে— তিনি ছিলেন তার জ্বলন্ত ব্যতিক্রম— একই সঙ্গে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগবিদ— এখানেই তাঁর মহিমা। তিনি প্রাচী ও প্রতীচীর আদর্শের সমন্বয় সাধন করে চরম মূল্য ও চরমাদর্শের নিরিখেই স্থাপন করেছিলেন তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক, কৃষি বা শিল্পের সংস্কারকার্যধারা। ঐতিহাসিক ধর্মমতগুলির সমন্বয় তিনি করেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করে। ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এ কাজ তাঁর কাছে উপস্থিত করেছিল অনিবার্য কর্তব্যরূপে। দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যুক্তি বিচারের সঙ্গে তিনি মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন সমষ্টি-প্রজ্ঞাকে আর শাস্ত্রীয় নির্দেশকে। তেমনি আবার সামাজিক গঠনকর্মের ক্ষেত্রে তাঁর অন্বিষ্ট ছিল ব্যক্তির হিতের সঙ্গে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের হিতের সমন্বয় সাধন, এক কথায় বলা যেতে পারে ব্যক্তিবাদের সঙ্গে সমাজবাদের সমন্বয়।

সামাজিক বিন্যাসে ব্যষ্টির ওপরে গোষ্ঠীকে স্থাপন করছে প্রাচী, পরমার্থের সন্ধানে আবার ব্যক্তিকে স্থাপন করেছে সকল সমাজবন্ধনের ঊর্ধ্বে। প্রতীচী কিন্তু সামাজিক রাজনৈতিক বিচারে ব্যক্তির দাবিকেই করেছে প্রধান, অথচ সামাজিক মঙ্গলকেই প্রধান করেছে ঈশ্বরের রাজ্যে। রাজা কিন্তু এ মত পোষণ করতেন যে সামাজিক প্রগতির কষ্টিপাথর

হবে ব্যক্তির উন্নতি। কিন্তু সামাজিক প্রগতির পরিবেশ ও শর্ত প্রতিষ্ঠা করেই হবে ব্যক্তির উন্নতি। তাই তাঁর কাছে নৈতিক আচরণের আদর্শ ছিল ব্যক্তির আচরণ ও সামাজিকতার আন্তর-সম্পর্ক। আবার নৈতিক বিচারের গভীরতায়— আত্মার উচ্চতম সংযমে গীতায় প্রদর্শিত নিষ্কাম কর্মই ছিল তাঁর আদর্শ। সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি জোর দিয়েছেন মানুষের প্রাকৃতিক অধিকারের ওপর। এই অধিকারের অন্তর্গত হবে কেবল জীবন ও সম্পত্তির অধিকারই নয়, বাক্য, মতামত, বিবেক ও সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার। আইন প্রতিটি নাগরিকের প্রাকৃতিক অধিকার এমনভাবে সুরক্ষিত করবে যাতে অন্যদের সমান অধিকার লঙ্ঘিত না হয়। তবে অধিকাংশ সময়েই তিনি অধিকারের চেয়ে হিত ও সুখের ওপরই জোর দিয়েছেন, সমাজ গঠনে সামাজিক চুক্তির ভ্রান্ত ধারণাকে পরিহার করে গেছেন। সে কারণেই, তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রাকৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্যে রেখেও আইন প্রণয়ন করতে হবে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের চরমতম সুখের দিকে লক্ষ্য রেখে। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির প্রতি সুবিচারের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে "লোকশ্রেয়স" বা সর্বসাধারণের মঙ্গলের অধীন করেই। ভারতীয় প্রাচ্য প্রজ্ঞার যথার্থ আদর্শেই তিনি এই মতাদর্শগুলিকে তুলে ধরেছিলেন ধর্ম ও কর্তব্যরূপে, সামাজিক রাষ্ট্রচেতনায় তিনি পরিচালিকাশক্তিরূপে গ্রহণ করেছেন তাঁর মানবতাবাদী ধর্মকে।

অনুরূপভাবে, ভারতসভ্যতার ইতিহাস তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিল আরো অনেক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:— যেমন রাষ্ট্রচিন্তায় আইন ও কার্যকরী ক্ষমতার পৃথকীকরণ, বিচার চিন্তায় আচারগত ধর্ম এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ-ক্ষমতার নির্দেশের মধ্যে যোগস্থাপন, রাজস্ব পরিচালনা চিন্তায় গ্রাম ও পঞ্চায়েৎকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় স্থাপন আর ভূমিতে রায়তের নিজস্ব অধিকার। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার তিনি আধুনিক ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য উপস্থিত করেছিলেন। এই-সব চিন্তা ও আদর্শের সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন, জুরীর দ্বারা বিচার, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা। তিনি হিন্দু বিবাহের, উত্তরাধিকারের, ধর্মোপাসনার, নারীর অধিকার, স্ত্রী-ধন ও বর্ণাশ্রমধর্মের ব্যক্তিগত বিধানগুলি সংশোধন

করে পূর্ণাঙ্গ করেছিলেন—তাব মধ্যে সাম্য ও সুবিচারের উদারনৈতিক আদর্শ সঞ্চারিত ক'রে। প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধানেই তিনি এ-সবের নির্দেশ পেয়েছিলেন। এভাবেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজবিধান ও আদর্শগুলি তিনি সমন্বিত করেছিলেন বিশ্বমানবতার পটভূমিতে স্থাপন করে। কিন্তু নব রাষ্ট্রধর্মের আইনতন্ত্র শুধু নয়, তিনি এশিয়ার মাটিতে রোপণ করতে চেয়েছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতা। সে কারণেই ভারতে জন-সাধারণের জন্য তিনি যে শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করেছিলেন, তা ছিল বাস্তব ও প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান এবং শিল্পে বিজ্ঞানের প্রযুক্তির জ্ঞান। এভাবেই তিনি ফিজিওক্র্যাটিক অর্থনীতিবিদদের প্রচারিত কৃষির বিরুদ্ধে শিল্পোৎপাদনকে দাঁড় করাবার ভ্রান্তপথ পরিহার করে-ছিলেন। তিনি চেয়েছেন ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিরূপে অবস্থিত গ্রামীণ 'রায়তওয়ারী' ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থাই রক্ষা করতে। আবার তিনিই চেয়ে-ছিলেন এদেশের মাটিতে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পোৎপাদন প্রতিষ্ঠা করতে, ভারতের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার আব তার ফলে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে। পরিশেষে তিনি ভাবী ভারতের রাজ-নৈতিক ইতিহাসের এবং ঔপনিবেশিকতার দিক দিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের কী সম্পর্ক হবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংযুক্তি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সাময়িক পন্থা হিসাবে তিনি ভারতের কোনো কোনো স্থানে উচ্চস্তরের ইউরোপীয়দের বসতিস্থাপনকেও স্বাগত জানিয়েছেন। জীবনের শেষ লগ্নে এই মানবতাব ঋষির নিকটে উদ্ভাসিত হয়েছিল স্বাধীন, আলোকদীপ্ত, শক্তিশালী ভারতবর্ষের এক ছবি যে ভারতবর্ষ হবে এশিয়াব জাতিগুলির সভ্যতা ও আলোকদাতা, সুদূর প্রাচ্য ও সুদূর পশ্চিমের মধ্যে এক স্বর্ণসংযোগ। এ ছবি একদিকে অতীতের স্মৃতিপ্রতীকময়, অপরদিকে মানবতার ইতিহাসের ভাবী রূপের সত্য পূর্বাভাস।

অনুবাদ: কালিসাধন মুখোপাধ্যায়

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ১৭ সেপ্টেম্বর বাঙ্গালোরে রামমোহন জন্মবার্ষিকীতে প্রদত্ত বক্তৃতা। রামমোহন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত। পরবর্তী কালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ **Rammohun: The Universal Man** নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন।

পরিশিষ্ট

রামমোহন রায়ের 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মওয়াহিদ্দীন্‌'

ঐতিহাসিক ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা

নির্মল মুখোপাধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়ের যে পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ সংকলনে যুক্ত করা হয়েছে, সেটির ভূমিকা লেখার একমাত্র তাৎপর্য হল ঐ পুস্তিকায় অভিব্যক্ত ভাবসত্তার একটা সংক্ষিপ্ত তথ্য ও তত্ত্বগত সর্বতোদর্শী আলোচনা। কারণ, 'তুহ্‌ফাৎ' রামমোহনের নাচিকেত-অভীপ্সা এবং সৃষ্টিশীল মনীষা ও প্রাতিবোধ বা বোধি জাত অনুভবের অনন্য অভিব্যক্তি।

ইউরোপীয় রেনশোঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার য়োকব বুখার্ট একটা সজীব ও গৌরবময় যুগের অবক্ষয় ও বিলুপ্তির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'In history, the way annihilation is invariably prepared by inward degeneration, by decrease of life ; only then a shock from outside put an end to the whole.[১] আঠারো শতক ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ইতিহাস আলোচনা করলে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ঐ গূঢ় মন্তব্যের যাথার্থ্য অনুধাবন করা যায়। একদিকে আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা এবং অন্যদিকে বহুধর্মের দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও চরম ভেদবুদ্ধি ঐ যুগের ধর্মীয় এবং সর্বপ্রকার সামাজিক চিন্তাকে মারাত্মকভাবে খণ্ডিত ও প্রচণ্ড তামসিকতার আচ্ছন্ন করে ধর্ম ও অধ্যাত্ম ভাবের চিরন্তন ভাবসত্তা ও মহৈশ্বর্যকে প্রায় বিলুপ্ত করে রেখেছিল। ধর্মের নামে প্রশ্রয় পেয়েছে অধর্ম, ব্যভিচার ও লাঞ্ছনা। শুধু হিন্দু ঐতিহ্যে নয় মসলমান ধর্মীয় চিন্তা ও ভাবনার ক্ষেত্রেও একটা চরম ভেদবুদ্ধি ও অন্তঃসারশূন্য আচার-আচরণের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়।[২] রাষ্ট্রনীতিক ও সামাজিক আবহ ও পরিবেশ দূষিত হয়েছিল একটা সংকীর্ণ চিত্তের মিথ্যা দম্ভ ও মতুয়ারি বিভজনধর্মী মানসিকতায়। প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে 'When Clive struck at the Nawab, Mughal civilization had become a spent bullet' এবং ঐ সভ্যতার মৌল শুভভাব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।[৩] সর্বপ্রকার শিক্ষণ ও জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ স্থবিরতা ও অবক্ষয়ের রূপ প্রকট হয়ে উঠেছিল।[৪]

২

এই আবহেই ইংরাজি শাসনের মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চমী সভ্যতার বহির্বিষয়ক জ্ঞানের তরঙ্গাঘাতে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু মনন ও চিন্তায় একটা প্রবল ও প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং বিচক্ষণ ও সম্যক দৃষ্টিতে লক্ষ করা যায় যে শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের পটভূমিতে ঐ চিত্ত-জাগরণ ও উদ্‌বোধনের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ঘটেছে সর্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২/'৭৪-১৮৩৩) অগ্র্যাবুদ্ধি ও ধ্যানে, ব্যাপক কর্ম-প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি তাঁর বিশ্ববীক্ষায় যেখানে 'জাতিক সত্তা' ও 'বিশ্বগত' ভাবের মধ্যে একটা ভাবদ্যোতক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যাতে অভিব্যক্ত হয়েছে শুধু শ্রেয়স বা নিঃশ্রেয়সের প্রেষণা নয়, লোক-শ্রেয়সের সুগভীর বজ্রসত্ত্বরূপ চিন্তার অনুবেদ ও নিগূঢ় কল্যাণ শক্তির স্রোত। পূর্ব ও পাশ্চমী জ্ঞান ও ধর্ম-জিজ্ঞাসার অন্যোন্য সংগম ও সচেতনার এক অনন্য ভাব আকারিত ও নিরুক্ত হয়েছে রামমোহনের অসামান্য জ্ঞান ও কর্মযোগের মাধ্যমে।

ভারতীয় ধর্ম-জীবনের ভয়াবহ ও অনুষ্ঠানসর্বস্ব আবহ ও অসার সর্বগ্রাসী পৌত্তলিকতার পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে রামমোহন ইউরোপীয় রেনেশাঁসের পুরোধা এবং প্রবক্তাগণের মতোই উপলব্ধি করেছিলেন যে ধর্মবোধই মানুষকে পশুজগৎ থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাশ্রয়ী মহান সত্তার মহান মর্যাদা দান করেছে এবং ধর্মের সর্বকালীন ও সর্বজনীন শাশ্বত ভাবসত্তাকে পুনরাবিষ্কার করা অত্যাবশ্যক। ঐ মানসিকতারই একটা বলিষ্ঠ ও স্পষ্টভাব ব্যক্ত হল রামমোহনের আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত প্রথম প্রকাশিত 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মওয়াহিদ্দীন' (১৮০০-১৮০৪) পুস্তিকায় মনে হয়, 'তুহ্‌ফাৎ'-এর স্থান ও কাল এখনও বিচার-সাপেক্ষ যদিও ঐ পুস্তিকার আবিষ্কার সম্পর্কে ঐতিহাসিক কালিদাস নাগের ভূমিকা স্মরণীয়।[৫] শ্রীমতী সফিয়া ডবসন কলেট বলেছেন যে মুর্শিদাবাদে থাকাকালীন সময়েই 'তুহ্‌ফাৎ' রচিত হয়েছিল।[৬] কলেটের মতে, 'তুহ্‌ফাৎ'-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তৎকালীন ধর্মীয় অবস্থার বিরুদ্ধে রামমোহনের মানসিকতার সর্বপ্রথম মতাদর্শ। কিন্তু, 'it is too immature to be worth reproducing as a whole'—'তুহ্‌ফাৎ' সম্পর্কে কলেটের এই মন্তব্য—একেবারেই অগ্রাহ্য। আলোচনা প্রসঙ্গে তা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। 'তুহ্‌ফাৎ'-কে কোনোমতেই ষোলো বছরের রচনা বলে গণ্য করা যাবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের 'ষোড়শ বছরে' রচিত একটা বাংলা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন যদিও আজও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।[৭]

স্মরণীয়, 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মওয়াহিদ্দীনে'র ইংরাজি ভাষার অনুবাদক মৌলবী ওবেদুল্লাহ্ অল-ওবেদ যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে ঐ পুস্তিকাটি হল 'Full of Arabic logical and philosophical terms' এবং তিনি স্পষ্টতই ঐ পুস্তিকার

'abstruse oriental style'-এর মাত্রা নির্দেশ করেছেন।[৮] ষোলো বছরের তরুণের পক্ষে এমন ধরনের মননশীল ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক ভাব-সমৃদ্ধ রচনা লেখা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। মনে হয়, 'তুহ্ফাৎ'কে অতি অল্প বয়সের রচনা বলে মনে করার একটা যুক্তিসংগত কারণ হয়তো এই যে ঐ পুস্তিকা প্রকাশের পর ১৮১৫ সালের আগে রামমোহনের আর অন্য কোনো গ্রন্থ রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই, মনে হয়, রামমোহনের 'Precepts of Jesus' গ্রন্থের সমর্থনে রচিত 'An Appcal to the Christian Public (a friend to Truth)' রচনার অভিব্যক্ত মন্তব্য উপলব্ধি করা সহজতর হবে। ঐ রচনায় বলা হয়েছে যে 'although he (Rammohun Roy) was born a Brahmin, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise <u>in Arabic and Persian</u> against <u>that system and no sooner acquired a tolerable knowledge of English than he made his desertion of idol-worship by his English Publication</u>'[৯] (নিম্নরেখা লেখকের)।

এই উল্লিখিত রচনাকে 'তুহ্ফাৎ' হিসাবে গণ্য করা যায়। তবে নিশ্চিত করে কোনো সিদ্ধান্ত করা যায় না। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে আঠারো শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্মেরও ক্ষেত্রে চরম বিকৃতি ও বিচ্যুতি ঘটেছিল এবং হিন্দুধর্মের একাধিক অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা তাতে প্রকট হয়ে উঠেছিল। মূল কোরানের সঙ্গে প্রায় অধিকাংশ মুসলমানের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না।[১০] শাহ্ উল্লাহ্ ওল্লাহের মতো মনে হয় রামমোহনও সে অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তুহ্ফাৎ-এ রামমোহন শুধু হিন্দুধর্মের নয় সমস্ত ধর্মের বিশেষ করে মুসলমান ধর্মের অসার ও অগ্রাহ্য দিক নির্দেশ করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করেন নি। কিন্তু আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখিত ঐ রচনা যে তাঁর ইংরাজিতে দক্ষতা অর্জনের আগেই রচিত হয়েছিল, সেটি রামমোহন স্বয়ং নিজেই স্বীকার করেছেন। 'তুহ্ফাৎ' রচনাকালে রামমোহনের বয়স সম্পর্কে আরো কিছুটা ধোঁয়াটে ভাবের সৃষ্টি হয়েছে ইংলন্ডে রামমোহনের মৃত্যুর পর। ১৮৩৩ সালের ৫ অক্টোবর স্টান্ডফোর্ড আর্নট 'Athenaeum Magazine'-এ রামমোহনের 'Autobiographical Sketch' শীর্ষক একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়েছে 'When about the age of sixteen I composed a manuscript calling in question the validity of the idolatrous system of the Hindoos'। কিন্তু ঐ পাণ্ডুলিপি কোন্ ভাষায় রচনা করেছিলেন সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। তবে ঐ পাণ্ডুলিপি যে 'তুহ্ফাৎ' নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। সফিয়া ডবসন কলেট ঐ চিঠিকে 'the spurious autobiographical letter published by Standford Arnot in the Athenaeum of October 5, 1833' বলে অগ্রাহ্য করেছেন। মনে হয়,

ঐ চিঠিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে মনে করা সমীচীন হবে না। ম্যাক্সম্যুলরও ঐ চিঠিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা সমীচীন মনে করেন নি।

৩

মৌলবী ওবেদুল্লাহ্ সাহেব 'তুহ্ফাৎ'-উল-মওয়াহিদ্দীন্ (Tuhfatul Muwahhiddin) পুস্তিকার ইংরাজি অনুবাদ করেছেন 'A Gift to the Deist' ; তিনি 'Monothiest' প্রত্যয় ব্যবহার করেন নি। আমার বিবেচনায় Monothiest এবং Deist প্রত্যয়দ্বয় সমনার্থক বা অবিনাভূত নয়। ইউরোপের প্রকৃতি আশ্রয়ী নিরাকার ঈশ্বরবাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের প্রসঙ্গে ক্লেমেন্ট ওয়েন মন্তব্য করেছেন যে 'The accepted meaning of 'Deism' is a belief in a God known by the light of nature apart from revelation,[১০] এবং তাঁর মতে, ঐ ভাবধারার উৎপত্তি ঘটেছে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে। কিন্তু, ধর্ম-আন্দোলন হিসাবে ঐ মতাদর্শ বস্তুত সতেরো শতকের শেষার্ধে এবং, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ক্যামব্রিজ প্লেটোনিক হোইস্কট, জন স্মিথ, রালফ কাউ-ওয়ার্থ, হেনরি মুর এবং জন লক, টোল্যান্স, ব্লন্ট, কলিন্স, ক্লার্ক, উলস্টোন, টিন্ডাল টমাস বার্নেট, জন রে, যোসেফ বাটলার, ডেভিড হার্টলি, হলবাক প্রমুখগণের চিন্তায় ও প্রবচনে অভিব্যক্ত হয়েছিল এবং তাঁরা দেব-প্রত্যাদেশ বা ঐশ্বরিক সংবিৎ (revelation) অগ্রাহ্য করে প্রচলিত ধর্মের একটা বিকল্প আশ্রয় ভূমি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।[১১] রামমোহনের 'তুহ্ফাৎ-এ মূলত এ-ধরনেরই ভাবসত্তা প্রাধান্য পেয়েছে যদিও তদতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র ভাবও আকারিত হয়েছে।

৪

'তুহ্ফাৎ-উল-মওয়াহিদ্দীন'-এর মৌল উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক ধর্মের সার ও অসার ভাব এবং সত্যরূপ ও ভ্রান্তধারণার বিচার এবং অনুসন্ধান করা। একদিকে মানুষের নিজস্ব স্বভাব ও প্রকৃতি এবং অন্যদিকে প্রচলিত ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে রামমোহন বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করলেন যে অনন্ত অদ্বিতীয় শাশ্বত পরমসত্তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ হল তার সহজাত নিজস্ব স্বভাব আর বিশেষ কোনো দেব-দেবী-বা ধর্মমত ও ধর্মাচরণের প্রতি মানুষের আনুগত্য আসলে পরিবেশ আশ্রয়ী অভ্যাস ও শিক্ষার ফল।

স্বভাবতই এই ধরনের ভাবনা ও চিন্তা মূলত ইসলামের যুক্তিবাদী মুতা'জেলা মতাদর্শ এবং নব্য-প্লেটোনিক অধ্যাত্ম-ভাবনা ও সুফীবাদের মৌল ভাব-সঞ্জাত। কিন্তু, এযাবৎ, রামমোহনের চিন্তায় ঐ মতাদর্শ ও গূঢ়ভাবনা সমূহ কী ভাবে অন্বিত ও যুক্ত হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো বিশেষ আলোচনা হয় নি।

যাঁরা আরব-দেশের ইসলাম ধর্মমতের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা অবশ্য অনুধাবন করতে পারবেন যে তুহ্ফাৎ-এ অভিব্যক্ত চিন্তা ও ভাবনার সঙ্গে ঐ-সমস্ত মতাদর্শ ও মননসত্তার সাধর্ম্য কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আরব দেশের অসামান্য সৃষ্টিশীল কবি, চিন্তাবিদ ও ভাবক আবু-আলা-অল-ম'আরী (৯৭৩-১০৫৭) ধর্মকে 'a product of human mind in which men believe through forces of habit and education (নিম্নরেখা লেখকের) never stopping to consider whether it is true' বলে গণ্য করেছেন এবং প্রচলিত শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষণে প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একাধিক গূঢ় মন্তব্য করেছেন। তার মতে 'To the growing child that which falls from his elders lip is a lesson that abides with him all his life. Monks in their cloister and devotees in the mosques accept their creed just as a story is handed down from him who tells it, without distinguishing between a true interpreter and a false'।[১২] এই প্রসঙ্গে ইসলাম-ধর্মের মহাপণ্ডিত ফনক্রেমার অল-ম' আরীর চিন্তাকে আঠারো শতকের এনলাইটেনমেন্টের (এই ইউরোপীয় দার্শনিক প্রত্যয়ের কোনো সমনার্থক বাংলা প্রতিশব্দ নেই) পূর্বসূরী বলে গণ্য করেছেন।

তুহ্ফাৎ-এ রামমোহন ঠিক আবু-আলা-অল-ম' আরীর মতোই মন্তব্য করেছেন যে '.. each individual on account of the constant hearing of the wonderful and impossible stories of this bygone religious heroes and hearing the good results of those assumed creed of that nation among whom he has been born and brought, from his relatives and neighbours during the time of boyhood when his faculties were susceptible of impressions of ideas conveyed to him acquires firm belief in religious dogmas that he cannot renounce his adopted faith although most of its doctrine be obviously nonsensical and absurd'[১৩] এবং অল ম' আরীর মতোই রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে বিভিন্ন ধর্মবেত্তাগণের নিজেদের শ্রেয়-বর্জিত স্বার্থ ও মিথ্যা দম্ভের পরিতৃপ্তিজনক অভীপ্সাই ব্যক্ত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শে।[১৪]

৫

'তুহ্ফাৎ'-এ অভিব্যক্ত রামমোহনের চিন্তায় ইসলামের যুক্তিবাদী ভাবধারা ও অন্যান্য চিন্তাপ্রবাহ— কিভাবে যুক্ত হয়েছে, সে সম্পর্কে কয়েকটি ঐতিহাসিক মন্তব্য অনিবার্য বলে জ্ঞান করি এবং কিভাবে গ্রীক দার্শনিক ভাবসত্তা ইসলামের ধর্মীয় ভাবধারা প্রভাবিত করেছে, সে দিকটিও উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক। স্মরণীয়, এ-বিষয়ে

আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে বহু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। দেখা গেছে যে ইসলাম-জগৎ ও ঐতিহ্যে যুক্তি-প্রজ্ঞা এবং ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ইতিহাসে গ্রীকচিন্তা অনুশীলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। খৃস্টীয় ৭৫০ এবং ৮৫০ সালের মধ্যবর্তী-কাল আরব সভ্যতা ও ধর্মীয় জিজ্ঞাসার সম্প্রসারণ সভ্যতার ইতিহাসে একটা গৌরবময় যুগ বলে নন্দিত হবে। গ্রীক-চিন্তাধারার আরবী অনুবাদ ও অনুশীলন অধ্যাত্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক ও সুগভীর রূপান্তর ঘটিয়েছে এবং এ-ক্ষেত্রে সিরিয় চার্চের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১৫] গ্রীক-যুক্তি ও প্রজ্ঞাবাদ এবং অ্যারিস্টোটলের 'মস্তিক' বা আন্বীক্ষিকী চিন্তার মাধ্যমে ও আবহেই মুতা'জেলা ভাবসত্তা গড়ে উঠেছে। মুতা'-জেলাগণ সর্বপ্রকার অলৌকিক ঘটনা অগ্রাহ্য করেছেন এবং ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ (revelation) সম্পর্কে গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁরা অদ্বিতীয় ঈশ্বর বা আল্লাহের বিশ্বাসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ঈশ্বর-প্রত্যয়কে নানা অনুসঙ্গ ও ব্যতিষঙ্গ থেকে মুক্ত করে তাঁরা মানুষের কর্তব্য ও কর্মের ক্ষেত্রে সীমাহীন স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করেছিলেন। মুতা'-জেলাদের মতে, পরমার্থ সৎ ও পারমার্থ্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে যুক্তি ও প্রজ্ঞাই (reason) আবশ্যক ও যথার্থ। তাঁরা বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করলেন যে পবিত্র কোরান সৃষ্টগ্রন্থ (created) এবং তাকে অনুল্পখ্য বা অপুরুষবিধ বলে গণ্য করা যুক্তিহীন। অনিবার্যত তাই তাঁরা পবিত্র কোরানকে দৈব সৃষ্ট গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন নি। জর্মান পণ্ডিত স্টেইনারের মতে, অল মনসুর (৭৫৪-৭৭৫) এবং অল-মা'মুনের (৮১৩-৩৩) অনুপ্রেরণায় গ্রীক-প্রকৃতিবাদী এবং অন্যান্য দার্শনিকগণের গ্রন্থাবলী সর্বপ্রথম পাঠ করেন এবং সর্বপ্রকার পারত্রিক জ্ঞান অনুশীলন করেছেন। ফলে, তাঁদের চিন্তাধারা শুধু পবিত্র কোরানের মধ্যে সীমিত থাকে নি। তাঁদের ন্যায়নীতি ও শ্রেয়োবোধের সুদূর-প্রসারী প্রভাব গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন প্রাজ্ঞ ধর্মতত্ত্ববিদ ইলাইনে জিলস' তাঁর প্রখ্যাত 'The History of the Christian Philosophy in the Middle Ages' গ্রন্থে (পৃ ১৮২)। অধিকন্তু, অ্যারিস্টটলের এবং পরফারী ও অন্যান্য গ্রীক ও আলেকজেন্দ্রীয় চিন্তাবিদ ও লেখকগণের সঙ্গে ইসলামের যোগসূত্র ও সংগমের ফলেই মুসলিম ঐতিহ্যে 'ইলাম-উল কালাম্' অর্থাৎ যুক্তি ও প্রজ্ঞার তত্ত্ব বা যুক্তি ও তর্ক বিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল[১৬]। মুতা'জেলাদের নৈতিক অনুজ্ঞা ও অনুশাসনকেই 'আদল-তত্ত্ব বা বিধি' (Law of Justice) বলা হয় যা জিলস' তাঁর গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে ফাতিমিদ ইসলামী যুগের চিত্ত উদ্বোধন ও নব-জাগরণের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছিল হেলেনীয় সংস্কৃতি ও ভাবসত্তার সঙ্গে ইসলাম-ধর্মের অনন্য সংযোগের ফলে এবং তারই ফলে ইসলামের মতুয়ারি ঐতিহ্যে একটা দুর্বার নাচিকেত-এষণার প্রকাশ ঘটেছিল।[১৭]

৬

'তুহ্ফাৎ'-এ রামমোহন মানুষের যুক্তি ও প্রজ্ঞাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাব-দ্যোতক সত্তা হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তাকে ঈশ্বর-প্রদত্ত দান বা ভাগবত-মহৈশ্বর্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আরো সম্যক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে রামমোহন কিভাবে আর্বী ভাষায় অনূদিত গ্রীক ভাবধারা এবং নব্য-প্লেটোনিক ও সুফী মরমী ভাবসত্তাকে স্বীয় চিন্তার অঙ্গীভূত করেছেন। ঐ অসামান্য আত্তীকরণের মাধ্যমে রামমোহন দ্বিধাহীন ভাষায় মন্তব্য করলেন যে 'Although each individual mankind without instruction and guiding of anyone···has an innate faculty in him by which he can infer that there exists a *Being* who (with His wisdom) governs the whole Universe'[১৮] এবং মুতা'জেলা চিন্তাবিদ অল-নজ্জাম ঘোষণা করলেন যে 'Man is capable without revilation, by reflection of recognising the Creator and of distinguishing between virtue and vice' [১৯] এবং এ ক্ষেত্রে অল-নজ্জামের যুক্তি ও প্রজ্ঞাবাদের একাধিক মাত্রা স্মরণীয়। এ ছাড়া, অল-ফারাবীর যোগ্য শিষ্য ইব্‌নে বাজ্জা (Avenpace) সুস্পষ্ট ভাবে রামমোহনের মতোই মন্তব্য করেছেন যে 'The intellect is the highest element in man's being ; but is only immortal as it joins itself to the One Active Intellect, (নিম্নরেখা লেখকের), which is all that is the Gift of God' অর্থাৎ ইব্‌নে বাজ্জাও মানুষের যুক্তি ও প্রজ্ঞাকে ভাগবত-প্রদত্ত সম্পদ বলে গণ্য করেছেন।[২০]

প্রজ্ঞাবাদ ও নব্য প্লেটোনিক মরমীভাবে উদ্‌ভাসিত ইসলামের চিন্তায় 'অল-নূর'[২১] (জ্যোতি) প্রত্যয়টির আন্তর তাৎপর্য ও ভাবের ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান এবং এ ক্ষেত্রে ইব্‌নে আরবীর চিন্তা খুবই ব্যঞ্জনাময় যদিও তাঁর চিন্তার একাধিক মাত্রা আজও সম্যকভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয় নি। ইব্‌নে আরবী মানুষের গুহাহিত সম্বোধিকে 'অল-নূর' অর্থাৎ স্বয়ং গূঢ় চৈতন্যের দীপ্তি ও অনুজ্ঞা বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে ঐ জ্যোতি বা চৈতন্যের দীপ্তি একটা প্রজ্ঞা-আশ্রয়ী আত্মার প্রকাশ বা বস্তুত একটা বিশ্বাত্মা বা বিশ্বভূত প্রজ্ঞার ('অল-অকল-অল-কুল্লি') দিশারী ; অর্থাৎ অ্যারিস্টটলীয় 'Active Intellect' বা নব্যপ্লেটোনিকগণের 'Logos' প্রত্যয়ের সমনার্থক নিগূঢ় প্রত্যয়।[২২]

ক্লেমেন্ট ওয়েব সন্ত-টমাস অ্যাকুইনসের প্রকৃতি-আশ্রয়ী ধর্মতত্ত্ব এবং লর্ড হার্বার্টের প্রকৃতি-আশ্রয়ী নিরাকার ঈশ্বরবাদ (Deism) আলোচনা প্রসঙ্গে নব্য-প্লেটোনিক ভাবসত্তায় অভিষিক্ত ইব্‌নে তু' ফেল-এর ভাবসত্তা নির্দেশ করে বলেছেন, 'One feels that it might be the product of a spiritually minded deist of the seventeenth century or eighteenth-century'[২৩] এবং এই গূঢ়ভাব একান্ত.

ভাবে অনুধাবণ করা অত্যাবশ্যক—বিশেষ করে রামমোহনের 'তুহ্‌ফাৎ'-এর অন্তরাধার উপলব্ধির ক্ষেত্রে।

৭

'তুহ্‌ফাৎ'-এ সূফীবাদের প্রভাবের স্বরূপ তেমন আলোচনা হয় নি। স্মরণীয়, সূফীবাদ কোনো বিশেষ ধর্মের ভাবধারাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে নি; এতে নানা মরমী ও গূঢ়ার্থবাদের সংসৃষ্টি ও সংযোজনের মহিমময় ভাব স্ফুরিত হয়েছে এবং সেজন্যই তার বিচিত্রধারা অনস্বীকার্য। মহম্মদ ইকবাল যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন যে 'on its speculative side Sufism is a form of free-thought and in alliance with Islamic rationalism' এবং ধর্মের ক্ষেত্রে এর প্রকাশ ঘটেছে মুসলিম মজতাহিদগণের তথাকথিত অসার ধর্মানুশীলনের বিরুদ্ধে।[২৪] রামমোহন ফার্সী সংগীত (বিশেষত গজল) এবং কাব্যের ('দীবান') অসামান্য স্রষ্টা ও সর্বপ্রকার ধর্মীয় ভণ্ডামি ও মূঢ়তার নির্মম সমালোচক শিরাজের শামস্ অল-দিন-হাফেজ-এর ভাবসত্তার একান্ত ভক্ত ছিলেন (যেমন ছিলেন পরবর্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ)। 'তুহফাৎ'-এ তাঁদের একাধিক উদ্‌ধৃতি লক্ষ করা যায়। রামমোহন হাফেজের এই কাব্যাংশটি উদ্‌ধৃত করেছেন যে ইসলামের বাহাত্তরটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ অগ্রাহ্য করো। কারণ তারা সত্যের সন্ধান করতে পারে নি; তারা শুধু কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী ও উপকথাই সৃষ্টি করেছে মাত্র। স্মরণীয়, পারস্যের আর-কোনো স্রষ্টা হাফেজের মতো ধর্মীয় মূঢ়তা ও অসাধুত্বের নির্মম সমালোচনা করেছেন বলে আজও জানা যায় নি।[২৫]

রামমোহন-গবেষকগণের এই ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা অত্যাবশ্যক যে ভারতবর্ষে ইব্‌নে সিনা (Avicenna), ইব্‌নে তু'ফেল, অল-ফারাবী, ইব্‌নে বাজ্জা (Avenpace) ইব্‌নে রুশ্‌দ (Averroes) প্রমুখ মহান মুসলিম চিন্তানায়কগণের গ্রন্থাবলী এবং অ্যারিস্টটলের আরবী অনুবাদ পাঠ প্রচলিত ছিল কিনা। শুধু ইউক্লিডের আরবী-অনুবাদের সন্ধান পাওয়া গেছে।[২৬] কিন্তু, ঈশ্বরের প্রজ্ঞাসঞ্জাত চৈতন্যের গুরুত্ব আরোপ করার ক্ষেত্রে এবং প্রচলিত ইসলামের মতুয়ারি মতাদর্শ অগ্রাহ্য করতে গিয়ে রামমোহন বস্তুত তাঁদের চিন্তার সমনার্থক ভাবনাই প্রকাশ করেছেন।

ইব্‌নে সিনা শুধু একেশ্বরবাদী ছিলেন না, তিনি দ্বিধাহীন ভাবে মৃত্যুর পর মানবদেহের পুনরুত্থান বা পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ধারণা (Resurrection) সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ও বাতিল করেছেন এবং তিনি মনন ও প্রজ্ঞাশক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের উপলব্ধি করাই মর্ত্যধামে মানুষের সত্য-ধৃতি এবং সাধুতার সার্বভৌম প্রতিদান বলে মনে

করেছেন।[২৭] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 'তুহ্‌ফাৎ-এ রামমোহন মানুষের সহজাত স্বভাব ও প্রকৃতি এবং অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে সর্বপ্রকার প্রচলিত ভ্রান্ত প্রথা-আশ্রিত শিক্ষাকে পরমার্থ-সত্যের ও সত্যানুসন্ধানের অগ্রাহ্য করেছেন। এই ক্ষেত্রেও মুসলিম স্পেনের সর্বশেষ দার্শনিক ইব্‌নে রুশ্‌দের (Avorreos) চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তার সুগভীর সাধর্ম্য অবশ্যই লক্ষণীয় এবং সেটি রামমোহন-গবেষকগণের পক্ষে অত্যাবশ্যক অনুসন্ধানের বিষয় বলে মনে করি। ইব্‌নে রুশ্‌দের মন্তব্য উদ্ধার করেই রোজার বেকন আপ্তবাক্য এবং প্রচলিত প্রথাগত কর্তৃত্বের সার্বভৌম অধিকারকে অগ্রাহ্য করেছেন।[২৮]

'তুহ্‌ফাৎ'-এর একটা বড়ো অংশ হল অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিক বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বলিষ্ঠ অস্বীকৃতি এবং তাদের নির্মম সমালোচনা। ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে যে উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে একজন ক্রান্তদর্শী ভারতবাসী যিনি তখনো যথার্থভাবে ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন নি এবং ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন নি, তিনি কিভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম, কার্য-কারণ-প্রত্যয় (হেতুবাদ) এবং ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার যুক্তি প্রদর্শন করে সর্বপ্রকার অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার অধিষ্ঠানকে সমূলে বাতিল করেছেন। রামমোহন দেখালেন যে যখন সাধারণ মানুষ কোনো ঘটনাকে তাদের অনুধাবন শক্তির দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে না তখনই তারা তাকে অলৌকিক ঘটনা বলে মনে করেন। কিন্তু যদি অনুধাবন করা যায় যে জগতের ঘটনা ও বস্তু পরস্পর যুক্ত ও অন্যোন্য-নির্ভর তবে দেখা যাবে যে পার্থিব অস্তিসত্তার সব-কিছুই একটা হেতু-নির্ভর এবং তখন আমরা দেখতে পাব যে সমস্ত বিশ্বই অন্যোন্য-নির্ভর ও অন্যোন্য সংসৃষ্ট। সমস্ত অলৌকিক-শক্তি ও ঘটনাকে অগ্রাহ্য করে রামমোহন দীপ্ত-ভাষায় ঘোষণা করলেন যে যাদের সম্যক-বিচার ও মননশক্তি আছে এবং যারা ন্যায়নীতি বা শ্রেয়োনীতির দোসর তাদের কাছে ঐ-সব অলৌকিক ঘটনাবলী কারণ ও হেতু অজ্ঞাত থাকে না। রামমোহনের মতে, ন্যায়শাস্ত্র বা আন্বীক্ষিক বিদ্যার আরোহ-পদ্ধতির মাধ্যমে ঐ ঘটনাবলীর সন্তোষজনক হেতুও নির্দেশ করা যায়। 'তুহ্‌ফাৎ'-এর আর্বী ভূমিকাতেও রামমোহন আরোহ-পদ্ধতির অসামান্য গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন। মনে হয়, যুক্তিবাদী ইসলামের ঐতিহ্যে যে আরোহ পদ্ধতির ব্যাপক ধারা প্রচলিত ছিল, রামমোহন সেই ধারাই অনুসরণ করেছেন। মুসলিম দার্শনিক আবু-বকর-রাজি প্রায় জন স্টুয়ার্ট মিলের মতোই আরোহ পদ্ধতিকে সত্য সন্ধানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ইরুনে-ই-হাসেন তাঁর ন্যায়বিদ্যায় ইন্দ্রিয়জ অনুভব ও অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের মৌল উৎস বলে ঘোষণা করেছেন। অধিকন্তু অল-জাহিজ অ্যারিস্টটেলের Natural Law বা প্রাকৃতিক বিধি অনুসরণ করে অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং অল-বাওয়াতি, ইব্‌নে সিনা এবং আবু-আলা-অল-ম'আরীও অলৌকিক ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন।

৮

'তুহ্ফাৎ'-এর নিষ্ঠাবান পাঠকমাত্র লক্ষ করবেন যে রামমোহন ধর্মকেও অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তীব্র ও বলিষ্ঠ ভাষায় তথাকথিত ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের মধ্যস্থতার ধারণা ও প্রত্যয় অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, পরমার্থ্যসৎ ও মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে পীর-পয়গম্বর, নবী ও ত্রাতার তিলমাত্র মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয়তা অযৌক্তিক। রামমোহন কিভাবে ঐ ভ্রান্ত যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন তা পাঠক বঙ্গানুবাদের মধ্যেই দেখতে পাবেন।

'তুহ্ফাৎ'-এ রামমোহন শুধু অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীর মৌল ভিত্তিকেই অগ্রাহ্য করেন নি তিনি ঠিক সমভাবেই ইসলামের 'তওয়াতোরের' (বিভিন্ন ব্যক্তির বিবরণের মাধ্যমে মহম্মদের সম্পর্কে গড়ে ওঠা ঐতিহ্য) অসারতা ও হেত্বাভাস অত্যন্ত বলিষ্ঠভাষায় সমালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মুতা'জেলাদের পথ ও পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। অল-নজ্জাম সর্বপ্রকার ইসলামের ঐতিহ্য-আশ্রিত বিবরণকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং আবু-হোরাইরার বিবরণকে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন।[২৯] স্মরণীয়, ইবনে ইল-আরবী সমস্ত ধর্মীয় কর্তৃত্বকে অযৌক্তিক বলে পরিত্যাগ করেছেন।[৩০] রামমোহন অবশ্য হাদিথের 'আহাদ' বা 'হাসান' ঐতিহ্যের আলোচনা করেন নি।[৩১] তিনি শুধু 'তওয়াতার' বা 'মও-তওয়াতারে'র সমালোচনা করেছেন।

৯

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে 'তুহ্ফাৎ'-এর ভাবসত্তা আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্য ষোড়শ শতকের ধর্ম-সংস্কারক—কবীর ও দাদূদয়ালের ভাবাদর্শের কথা স্মর্তব্য। কবীর এবং দাদূদয়াল দুজনেই সুফীবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কবীর 'কোরান'কে অগ্রাহ্য করেছেন এবং বেদকে পৌরাণিক গল্পের সমষ্টি বলে বাতিল করেছেন। তিনি হিন্দু পৌত্তলিকতা এবং নানা ধরনের প্রাণীর বলিদান প্রথা ও যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করেছিলেন। অধিকন্তু তাঁর দৃষ্টিতে মুসলমানদের 'হজ' এবং হিন্দুদের 'তীর্থযাত্রা' ইত্যাদি অর্থহীন। কবীরের শ্রেষ্ঠতম শিষ্য দাদূদয়াল সমস্ত ধর্মীয় শাস্ত্র ও কর্তৃত্বকে বলিষ্ঠভাবে বাতিল করেছেন। এ ছাড়া মধ্যযুগের আরো অন্যান্য সাধকদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় থাকা অসম্ভব ছিল না। শাহইনায়ৎ, শাহলতীফ, শিবনারায়ণ, বুল্লেশাহ, প্রাণনাথ, পলটুশাহ, তুলসী সাহেব প্রমুখ প্রায় দুইশত সাধকের ও ভাবকদের সঙ্গে রামমোহনের চিন্তাভাবনার একাধিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৩৪]

'তুহ্ফাৎ' রামমোহনের অধ্যাত্ম ও ধর্ম-জিজ্ঞাসার একটা অনন্য অসাধারণ

গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল এবং ভবিষ্যতে যদি তাঁর 'মানজারাতুল আদিয়ান' (বিবিধ ধর্মের আলোচনা) গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয় তবে তাঁর প্রাথমিক অথচ মৌল ধর্ম-জিজ্ঞাসার একটা সমধিক নির্দেশ ও নির্বাচিরূপের পরিচয় পাওয়া যাবে।

আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে 'তুহ্‌ফাৎ'-এর ভাবসত্তা রামমোহনের পরবর্তী চিন্তা ও ভাবসত্তায় সুগভীরভাবে আকারিত এবং অভিব্যক্ত হয়েছে। যে প্রকৃতি-আশ্রয়ী নিরাকার ঈশ্বরবাদ 'তুহফাৎ'-এ ব্যক্ত হয়েছে তারই নির্দেশ্য গুহাহিত ভাব স্ফুরিত হয়েছে তাঁর 'Treatise on Universal Religion' (১৮২৯) এবং 'Trust Deed of Brahma Somaj' (১৮৩০) ও বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম রচনা 'বেদান্তগ্রন্থে' (১৮১৫)। 'তুহ্‌ফাৎ' সম্পর্কে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্য যথার্থ নয়। প্রথমত, 'তুহ্‌ফাৎ'-এর মধ্যে অবশ্যই 'Sublime Theism' এর ভাব স্ফুরিত এবং দ্বিতীয়ত শুধু 'তুহ্‌ফাৎ'-এ নয়, বরং রামমোহনের পরবর্তী রচনাতেই পৌত্তলিকতার মারাত্মক ভাব ও পরিণতি সমধিক বলিষ্ঠভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। স্মরণীয়, 'তহ্‌ফাৎ'-এ মানুষের সহজাত স্বভাব ও প্রজ্ঞা এবং অভ্যাস ও প্রচলিত শিক্ষণের প্রভাবের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে, সে ভাব ও যুক্তি অনুসৃত হয়েছে হিন্দু ও খৃস্টান ধর্মের সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। রামমোহনের পরবর্তী চিন্তায় দার্শনিক জন লকের প্রভাব অবশ্যই স্মরণীয় এবং লক্ষণীয়। 'তুহ্‌ফাৎ'-এর পরবর্তী রচনায় (বিশেষ করে ১৮২০ সালের পর হতে) 'প্রাকৃতিক বিধি (Law of Nature), যুক্তি ও প্রজ্ঞা (Reason) এবং ঐশ্বরিক-প্রত্যাদেশ (Revelation)-এ তিনের যাথার্থ্য স্বীকৃত হয়েছে।[৩৪] অবশ্য, রামমোহনের কাছে ঐ ঐশ্বরিক-প্রত্যাদেশ দার্শনিক জন লকের গ্রীকো-হিব্রু-খৃস্টীয় ভাবধারা-সঞ্জাত 'Natural Revelation' বলে প্রতিভাত হয়েছে। লকের মতে 'Natural Revelation' ব্যক্তিচিত্তে 'Father of Light and the fountain of all Knowledge'-এর সংবিৎ ঘটায়।[৩৫] আসলে আমাদের স্মর্তব্য যে রামমোহনের 'তুহ্‌ফাৎ'-এর ভাবসত্তার সঙ্গে তাঁর পরবর্তী চিন্তাভাবনার যোগসূত্র এবং ধারাবাহিকতা কিংবা তাঁর চিন্তাধারার রূপান্তর সম্পর্কে আজও তেমন বিশদ ও তথ্যবহ আলোচনা হয় নি। এ ক্ষেত্রে তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও প্রখ্যাত রামমোহন-গবেষক অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের প্রচেষ্টা অবশ্যই অর্থবহ ও উৎসাহ-ব্যঞ্জক।[৩৬] তিনি মহাজ্ঞানী এবং অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের একাধিক গূঢ় মন্তব্য ও বক্তব্য অনুসরণ করে জন লক ও আঠারো শতকের এনলাইটেনমেন্টের চিন্তাপ্রবাহ এবং ভলতেয়ারের চিন্তা ও ভাবনার সঙ্গে 'তুহ্‌ফাৎ'-এ অভিব্যক্ত ভাবসত্তার সাদৃশ্য দেখাতে চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক বিশ্বাস অবশেষে দ্বিধাহীনভাবে মন্তব্য করেছেন যে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে 'তুহ্‌ফাৎ প্রকাশের কালে রামমোহনের ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় বিদ্যার

প্রবেশ বেলীদের অগ্রসর হয়নি (নিম্নরেখা লেখকের)। তাই তিনি বললেন, 'সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ এই গ্রন্থের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল— এমন সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া একটু কঠিন। সযত্নে অর্জিত ইসলামীয় বিদ্যার ছাপ তুহ্‌ফাৎ-এর প্রতি পংক্তিতে এবং সমগ্র রচনা ভঙ্গীতে অতি স্পষ্ট। এই প্রখর যুক্তিবাদের উৎস তাই ইসলামীয় আকরেই অনুসন্ধান করতে হবে।'[৩৭] পনেরো-ষোলো বছর আগে আমার ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রবন্ধে আমি ঐ মত ও ভাবাদর্শ তথ্য ও যুক্তি-সহকারে ব্যক্ত করেছি এবং অধ্যাপক বিশ্বাস তাঁর তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থে সেটি উল্লেখও করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা অত্যাবশ্যক যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের বিশ্বস্তর পাণ্ডিত্য ও নিগূঢ় চিন্তা রামমোহন-গবেষকগণের প্রেরণা ও পাথেয় যোগাবে। কিন্তু 'তুহ্‌ফাৎ' সম্পর্কে তাঁর চিন্তা কিছুটা অনির্দেশ্য। মনে হয়, 'তুহ্‌ফাৎ'-এর রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁর একটা সংশয় ছিল। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত'-এর ষোড়শ অধ্যায়ে (ঐ গ্রন্থের ষোড়শ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ অধ্যায়ের ভাষা ছাড়া সমগ্র ভাবসত্তাই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের বলে গ্রন্থকার জানিয়েছেন)। বলা হয়েছে 'রংপুর কিংবা মুরশিদাবাদে রাজা 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মওয়াহিদ্দীন' নামক পুস্তক পারস্য ভাষায় রচনা করিয়া প্রচার করেন।' আমি আগেই মন্তব্য করেছি যে তুহ্‌ফাৎ-এর রচনাকাল ও স্থান আজও বিচার-সাপেক্ষ।

তুহ্‌ফাৎ-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রখ্যাত বক্তৃতায় (১৯২৪) মন্তব্য করেছেন যে 'When he was about 30 years of age, he seems to have studied the writings of the Rationalists and free-thinkers, certainly the Muwahhidins, the Sufis, and the Mutazilas and perhaps also the speculations of Hume, Voltaire and Volney' এবং ঐ অনুমানের ভিত্তিতেই তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন যে, 'in this work, the influence of Locke and Hume may, perhaps be traced in his analysis of the causes of superstitionan dits prevalence, an analysis which gives greater importance to Psychological factors than to historical ones' (নিম্নরেখা লেখকের)।[৩৮] স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে আচার্য শীল জন লক ও ডেভিড হিউমের প্রভাব সম্পর্কে দ্বিধাহীন ও নিশ্চিত হতে পারেন নি, অধ্যাপক বিশ্বাস তাই তুহ্‌ফাৎ-এ অভিব্যক্ত ভাবনাকে পাশ্চাত্য 'ডীইস্ট বা নৈসর্গিক ধর্মবাদীদের' চিন্তার 'সমগোত্রীয়' বলে নির্দেশ করেছেন। তুহ্‌ফাৎ-এ অবশ্যই শাস্ত্র-নিরপেক্ষ প্রখর যুক্তিবাদের প্রকাশ ঘটেছে; কিন্তু সেটিই তুহ্‌ফাৎ-এর একমাত্র ভাবসত্তা নয়—তদতিরিক্ত আরেকটি শাস্ত্র-নিরপেক্ষ সূক্ষ্মমাত্রাও অভিব্যক্ত

ও আকারিত হয়েছে যা রামমোহনের পরবর্তী চিন্তা ও ভাবনায় ক্রমশ বিকশিত এবং স্ফুরিত হয়েছে। তুহ্ফাৎ-এ রামমোহন একদিকে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে যুক্তি ও প্রজ্ঞা (Reason) ছাড়াও অপরোক্ষানুভব বা বোধি-জাত সংবিৎ ('intuition') এবং অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মবিলম্বী শিষ্যদের মতুয়ারি বুদ্ধি-সঞ্জাত ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ ('invented revelation') অস্বীকার করতে গিয়ে মানুষের অপরোক্ষ-বৃত্তির ('intuitive faculty') গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন।[৩৯] আসলে আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে 'তুহ্ফাৎ' রচনাকালে রামমোহন শুধু যুক্তিবাদী ইসলামের ভাবধারার দ্বারা উদ্‌বোধিত হন নি; নব্য-প্লেটোনিক, মরমী সুফীবাদ এবং গূঢ়ার্থবাদী মুসলমান দার্শনিকগণের ভাবধারার দ্বারাও সুগভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং সেজন্যই তাঁর চিন্তা শাস্ত্র-নিরপেক্ষ ভাবসত্তার পুণ্যস্রোতে অভিষিক্ত ও সঞ্জীবিত। স্মরণীয়, আবু-আলী-আল-মা'আরি, ইব্নে আবারি, ইব্নে তু'ফেল প্রমুখ ভাবুক ও ভাবকগণ শুধু যুক্তি ও মননশক্তিকে (reason) পরমার্থগত ও পারার্থ্য উপলব্ধির একমাত্র পাথেয় বলে মনে করেন নি। হাফেজ তো অসামান্য মরমী কবি ও ভাবক বলে স্বীকৃত। তাই তাঁরা যুক্তি ও মননসত্তার অতিরিক্ত একটা বোধিজাত সংবিৎ ও চৈতন্যের দিক উন্মোচিত করেছেন যা মানুষী-অস্তিসত্তায় সর্বপ্রকার শাস্ত্র-নিরপেক্ষভাবে একটা প্রায় নিরুপাখ্য ব্যঞ্জনাময় উপলব্ধি ঘটায় এবং যা একটা অন্তর্গূঢ় বোধি-জ্যোতিতে উদভাস্কর হয়ে উঠে।

মনে হয়, এই আবহেই তুহ্ফাৎ-এর ভাবসত্তা ও মর্মবাণী সহৃদয়বান ও জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে সম্যকভাবে প্রতিভাত হবে।

উল্লেখপঞ্জি

১। *Force and Freedom*, পৃ. ৯২।

২। S. K. Ikram, *History of Muslim Civilization in India and Pakistan*, পৃ. ৩৫২।

৩। *The History on Bengal*, Academica Asiatica,

৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১।

৫। 'তুহফাৎ' একাধিক স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে: (১) মুর্শিদাবাদ সংস্করণ (? ১৮০৩-১৮০৪), (২) ১৮৫৯ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং এর পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ ম্যুজিয়মের প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক বিভাগে রক্ষিত এবং (৩) ১৮৯৮ সালে পাটনার আজিমাবাদের কপি (*Tuhofat-ul-Mawahhiden a tract on the*

superiority of Pure Deism, summarised in Arabic and Expanded in Persian. pp. 38, *litho*) *'Tuhfat-ul-Muwahhidin* (In Persian with an Introduction in Arabic) ; ডঃ কালিদাস নাগের ভূমিকা সংবলিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫০)।

৬। *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Compiled and edited by Late Sophia Dobson Collet and completed by a friend, London, ১৯০০, পৃ ৭ ; Marry Carpenter Ed. *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy*, পৃ ৪ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামমোহন', পৃ ২৩ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *Modern Review*, May 1930, *The Calcutta Review*, December, 1933.

৭। যতীন্দ্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত এবং ভূমিকা সংবলিত *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India*, ভূমিকা ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম-প্রণালী', 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত', পৃ ৪।

৮। *Tuhfat-ul-Muwahheddin*, আদি ব্রাহ্ম-সমাজ কর্তৃক ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত মৌলভী ওবায়েদুল্লাহ আল-ওবেদি কর্তৃক অনূদিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক ১৯৪৯-এ প্রকাশিত সংস্করণে অনুবাদকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য ; এই রচনায় ঐ সংস্করণই অনুসরণ করা হয়েছে। 'তুহ্‌ফাৎ' সম্পর্কে বর্তমান লেখকে বিশদ তথ্য ও তত্ত্বগত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৯ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরের *Humanist of Review*-এর "Rammohun, Islam and Deism" শীর্ষক প্রবন্ধে।

৯। *English Works of Rammohun Roy*, (Ed) by Kalidas Nag and D. Burman, Part V, পৃ ৫৮, ; *Selection from official Letters and Documents Relating to the Life of Raja Rammohun Roy*, Edited by Ramaprasad Chanda and Jatindra Kumar Mazumdar, Vol I, 1791-1830, Introductory Memoirs IV.

১০। Clement C. T. Webb, '*Studies in the Natural Theology*, Oxford, ১৯১৫, পৃ ৩৪৪।

১১। Sir Leslie Stephen, *English Thought in the Eighteenth Century*, Vol I ; Ernst Cassirer, *The Platonic Renaissance in England* ; *The Philosophy of Enlightenment* ; Basilwilley, *The Seventeenth Century Background* ; *The Eighteenth Century Background* ; Frank E, Manuel, *The Eighteenth Century confronts God*, 1959,

১২। R. A. Nicholson, *Literary History of the Arabs*, পৃ. ৩১৩-১৮, D. B. MacDonald, '*Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, পৃ. ১১৯।

১৩। *Tuhfat*, পৃ. ২-৩।

১৪। *Ibid.*, পৃ. ১, ১৭।

১৫। P. K. Hitti, *The History of the Arabs*, চতুর্দশ অধ্যায়; অনুবাদ-যুগের পরেই সৃষ্টিশীল চিন্তার সূচনা হয় যদিও ঐ দুয়ের মধ্যে কোনো মৌল সীমা টানা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থের ছাব্বিশ অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য। আর আরবীয় নব-জাগরণ ও চিত্ত-উদ্‌বোধনের ক্ষেত্রে সিরিয়া ও সিরিয় চার্চের অবদান বিষয়ে Hitti-এর *History of Syria* গ্রন্থের পৃ. ৫৪৮-৫৬ দ্রষ্টব্য। মুসলিম দর্শনে অ্যারিস্‌টোটল্‌ এবং নব্য প্লেটোনিক ভাবধারার সম্মিলনের ফলে যে বুদ্ধিযোগ ও প্রজ্ঞা এবং ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ ও বোধিজাত চেতনা গড়ে উঠেছিল তার নির্ভরযোগ্য আলোচনা করেছেন A. J. Arberry তাঁর '*Revelation and Reason in Islam* গ্রন্থে, ২য় অধ্যায়, পৃ. ৩৪-৫৭।

১৬। মুতা'জেলা যুক্তিবাদী বিদ্রোহের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে R. A. Nicholson-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থ (পৃ. ২২২-২৪), Syed Amir Ali-এর *The Spirit of Islam*, ১০ম অধ্যায়; S. Khuda Buksh-এর *Contribution to the History of Islamic Civilization*, Vol I, পৃ. ২১৩-১৫; Alfred Guillame, *Islam*, সপ্তম অধ্যায়; মুতা'জেলাদের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে D. B. MacDonald-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৯-৫২ দ্রষ্টব্য; আর মুতা'জেলা ও আলআসা'রি সম্প্রদায়ের ঈশ্বর সম্পর্কে A. J. Arberry-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২২-২৩ দ্রষ্টব্য।

১৭। Hamilton A. R. Gibb, '*Medieval Islam, an Interpretation, Studies on the Civilization of Islam*, পৃ. ৭।

১৮। *Tuhfat*, পৃ. ৭।

১৯। Syed Amir Ali-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪১৫।

২০। D. B. MacDonald-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৫১।

২১। 'অল-নুর'-এর স্বরূপ সম্পর্কে *Encyclopaedia of Islam*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য।

২২। Rom Landon, *The Philosophy of Ibn-Arabi*, পৃ. ৩৬।

২৩। Clemant Webb-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৫৩; *Encyclopaedia of Islam*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯২-৯৩।

২৪। Mahammad Iqbal, *Reconstruction of Religious Thought in Islam*, পৃ. ১৫০; সুফীবাদ বস্তুত কোনো একটি বিশেষ ধর্ম-উদ্ভূত মরমী ভাবসত্তা নয়। এটি হল ইসলাম, হিন্দু, খৃস্ট ও বৌদ্ধধর্ম এবং নব্য

প্লেটোনিক ভাবসত্তার সংশ্লিষ্ট মরমী ভাবনা ও বোধি-জাত সংবিৎ-এর সমন্বয়ের অনন্য অভিব্যক্তি। R. A. Nicholson, *The Mystics of Islam*, পৃ. ৮-১৯ ; সুফীবাদের মধ্যে স্ফুরিত *Divine Personality*-প্রত্যয় এবং ইসলাম ও খৃস্টধর্মের মধ্যে ঐ প্রত্যয়ের বিশদ আলোচনা করেছেন' R. A. Nicholson তাঁর *Idea of Personality in Sufism* গ্রন্থে ; তুহ্ফাৎ-প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে সুফী ভাবধারার ঐতিহাসিক বিকাশ ও বিবর্তনের এবং স্বরূপ অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষে সুফী মরমী ভাবসত্তা ও সুফী খানদান'রা সুফী সম্প্রদায়ের (Sufi-orders') একটা নির্ভরযোগ্য আলোচনা করেছেন ডঃ এমানুল হক্ তাঁর *Sufi Movement in India* শীর্ষক প্রবন্ধে, *India-Iranica*-এর October 1948 এবং January 1949 সংখ্যায়।

২৫। *Tuhfat*, পৃ. ১০, Arthur Arberry, *Fifty Poems of Hafiz*, পৃ. ১৬।

২৬। যদিও অ্যারিস্টোটল পরীক্ষীরীর আর্বী অনুবাদ গ্রন্থ আজও ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় নি তথাপি কিছু ঐতিহাসিক তথ্য হতে অন্তত এ অনুমান অসংগত নয় যে সতেরো ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে হুগলির সঙ্গে নদীপথে আরব ও পারস্য দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সে সূত্র আশ্রয় করেই আর্বী-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিগণ হুগলিতে এসেছিলেন। এছাড়া ধর্মীয় শাস্ত্রজ্ঞ সুফীদার্শনিকগণ যাঁদের অনেকেই দরবেশ বা আউলিয়া বলে গণ্য করা হত। তাঁরা অনেকেই নানাধরনের মুসলিমশাস্ত্র নিয়েই বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ বিষয়ে যদুনাথ সরকার-সম্পাদিত *The History of Bengal* (Muslim period) গ্রন্থের দ্বাদশ ও একবিংশতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য। দক্ষিণ ভারতে ইউক্লিডের আর্বী-অনুবাদ 'Tahris-e-Uqlidas' পাঠের প্রচলন ছিল (*History of Muslim civilization in India and Pakistan* by S. M. Ikram, পৃ. ১৬৭ দ্রষ্টব্য)। এছাড়া, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আল-আসা'রি, মুতা'জেলা এবং অন্যান্য মুসলিমধর্মতত্ত্ব, সুফীবাদ, মুসলিম অধিবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। স্মরণীয়, যে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ 'তুহফাৎ-উল-মুওয়াহিদীন' শীর্ষক একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ঐ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের একেশ্বরবাদ নির্দেশ করা এবং ইসলামের ঐ ভাবকে, সর্বপ্রকার অন্যান্য প্রভাব থেকে মুক্ত করা যাকে 'শার্ক' বলা হয়। ১৮৯৪ ঐ পুস্তক প্রকাশিত হলেও রামমোহন কি ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ? রামমোহনের পক্ষে ঐ-সব মুসলমান ন্যায়শাস্ত্র, অধিবিদ্যা এবং অন্যান্য ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা অসম্ভব ছিল না। নইলে তুহ্ফাৎ-এ তিনি আর্বী ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের সূক্ষ্ম সূত্রাবলী কিভাবে প্রয়োগ করলেন এবং কোন্ সূত্রে ? কোনো রামমোহন-গবেষক এ বিষয়ে তেমন কোনো চিন্তা করেছেন বলে মনে হয় না।

২৭। Arthur Arberry, *Avicenna on Theology*, পৃ. ২৬।

২৮। *The Opus Majus of Roger Bacon*, translated by Robert Bille Burke, (University of Pensylvania) Vol I, পৃ. 9.

২৯। Mahammad Iqbal-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪৯-৫০। Window Sweetman, *Islam and Christian Theology*, Part I, Vol II, পৃ. ১৫৪ ; *Encyclopaedia of Islam*, Vol III, পৃ. ৮৯২-৯৩।

৩০। R. A. Nicholson, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪০৯।

৩১। Mohamed Munzur Ilahe, *The English Translation of the Holy Tradition*, Vol I, পৃ. XII-XIII।

৩২। W. H. Westcott, *Kabir and Kabir Panth* ; W. C. Orr, *A Sixteenth Century Indian Mystic*; S. N.Dasgupta, *Hindu Mysticism* ; আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, 'কবীর', 'দাদু', 'হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা', 'বাংলার সাধনা', 'রামমোহন ও মধ্যযুগের সাধনা'।

৩৩। *Tuhfat-ul Muwahhiddin*, Preface by the President of the Adi Brahma Somaj, ১৮৮৪।

৩৪। *Prec pts of Jesus* (১৮২০), *Introduction ; Second Appeal to the Christian Public, Advertisement* ; *English works* (Ed) by Kalidas Nag and D. Burman, Part IV এবং VI

৩৫। John Locke, *An Essay on the Human Understanding*, Book IV, chapter 18, sect 4 / লকের 'Revelation' প্রত্যয় অবশ্য একাধিক ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ এবং তাঁর 'Intuition' প্রত্যয়এক অর্থে 'Revelation'-এর সঙ্গে যুক্ত। স্মর্তব্য যে লক 'Revelation'কে আবার 'Divine Revelation'ও বলেছেন। কিন্তু কোন্ ধরনের ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ যথার্থ, সেটি কিন্তু লক-ব্যাখ্যাত 'Reason' দ্বারা নির্ণীত হবে। তিনি আবার 'Reason'কে 'Natural Revelation' বলে গণ্য করেছেন। লকের দর্শনে 'Reason' এবং 'Revelation' অন্যোন্য-নির্ভর প্রত্যয়। পরের অধ্যায়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে 'Revelation is *natural reason* enlarged by a new set of discoveries communicated by God immediately, which reason vouches the truth of by the testimony and proofs it gives that they come from God.' (Book IV, chapter 19, sect 4)।

একেশ্বরবাদীদের উদ্দেশে নিবেদন

(তুহ্ফৎ-উল-মুওয়াহ্হিদীন)

মহামহিম ঈশ্বরের নামে

রামমোহন রায়

ভূমিকা

পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে সমতল দেশ বা পার্বত্য অঞ্চল যেখানেই সফর করেছি সেখানকার অধিবাসী সবাই দেখেছি সাধারণত একটি পরমসত্তায় বিশ্বাসী যিনি বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, যদিও সেই পরমসত্তায় আরোপিত বিশেষ বিশেষ গুণাগুণ, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন ধর্মনীতি এবং শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবৈষম্য দেখতে পাওয়া যায়। তাই থেকে আমার মনে হয়েছে যে চিরন্তন এক পরমসত্তায় বিশ্বাস মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি যা সবার মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। আর বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণাগুণের অধিকারী বিভিন্ন দেব-দেবতায় বিশ্বাস এবং বিভিন্ন সাধন ও পূজনরীতি যা দেখতে পাওয়া যায় তা হল সংস্কার ও শিক্ষাগত একটি বিশেষ প্রবণতা। প্রকৃতিগত এবং প্রথাগত এই দুই ধরনের মানসিকতায় অনেক তফাত। বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্গত কেউ কেউ মতবৈষম্যের কারণে অপর গোষ্ঠীর ধর্মনীতি ও সাধনরীতির বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন এই বিশ্বাসে যে তাঁদের পূর্বপুরুষরা যা বলে গিয়েছেন তাই একমাত্র অভ্রান্ত সত্য। অথচ তাঁদের সেই পূর্বপুরুষরাও অন্যান্য লোকেরই মতো পাপাচার বা ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে কেউ ছিলেন না। তাই নিজ নিজ ধর্মের ধ্বজাধারী বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর এই লোকেরা ভ্রান্তও হতে পারেন, অভ্রান্তও হতে পারেন। অভ্রান্ত হলে স্পষ্টতই সে ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী দুটি মতের সমাবেশ ঘটে যা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়, আর ভ্রান্ত হলে বিশেষ কোনো ধর্মমত, নয়তো সব ধর্মমতই ভ্রান্ত বলে ধরে নিতে হয়। একতরফা বিচারে বিশেষ কোনো ধর্মমতকে যদি ভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হয় তবে তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তাই থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে সব ধর্মমতই ভ্রান্ত। যাঁরা আরবীভাষী নন তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে ফারসী ভাষায় আমার এই পুস্তিকাটি নিবেদন করছি।

দয়াল ও পরমকরুণাময় ঈশ্বরের নামে

ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে একদিকে চিরাচরিত সংস্কার ও নিজ নিজ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত যে মানসিকতা দেখতে পাওয়া যায় এবং অন্যদিকে সাধারণ মানবপ্রকৃতি ও ব্যক্তিগত মনমেজাজ অনুযায়ী তার সহজাত গুণাবলী, এই দুয়ের বৈশিষ্ট্যনির্ণয়ে যারা আগ্রহী, যাঁরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন ধর্মমতের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চান, এমন-কি সর্বজনস্বীকৃত কোনো মতবাদ, তার প্রবক্তা যেই হোন-না কেন, খুঁটিয়ে বিচার করতে ইচ্ছুক, সুসময় তাঁদেরই। কারণ, বিভিন্ন প্রয়োজনে সৃষ্ট বিভিন্ন পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং বিভিন্ন মানের কাজকর্মের পরোক্ষ ফলাফল জানতে ও বুঝতে পারা মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও দুটির কোনোটিই সহজসাধ্য নয়। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ধর্মনায়করাই অক্ষয় নামযশ ও গৌরব অর্জনের প্রত্যাশায় অলৌকিক নানারকম ক্রিয়াকর্মের ছলাকলা দেখিয়ে বা কথার জোরে বা তাঁদের সমকালীন জনসমাজের উপযোগী অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করে তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মমতই একমাত্র সত্যপথ-নির্দেশক বলে প্রচার করে গিয়েছেন। তার ফলে বেশ-কিছু লোক আকৃষ্ট হয়েছে তাঁদের দিকে, হতভাগ্য সেই লোকগুলি বোধশক্তিরহিত হয়ে তাদের ধর্মনায়কদের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে, এমন-কি তাঁদের বিধান মানতে গিয়ে সত্যিকার পাপপুণ্যের বিচার পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে এবং সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলাও পাপাচার বলে মনে করে। ধর্মের খাতিরে অপর গোষ্ঠীর লোকদের খুনজখম, সম্পত্তিহরণ ও নির্যাতন করাও তাদের ধারণায় মস্ত বড়ো পুণ্য কাজ, সেই গোষ্ঠীর লোকেরা একই জাতির একই বংশোদ্ভূত হলেও। মিথ্যাচার, বেইমানি, চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি যে-সব নীচ কর্ম অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, ধর্মগুরুদের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠায় অচল থাকলে সেই-সব অপরাধজনিত পাপও কাউকে স্পর্শ করতে পারে না এই বিশ্বাসে তারা উদ্ভট কল্পকাহিনী পড়ে সময় কাটায়; তার ফলে পূর্বতন ধর্মনায়ক ও তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মের বর্তমান টীকাকারদের উপর তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়। তাদের মধ্যে দৈবক্রমে কেউ যদি বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে নিজ ধর্মের সত্যাসত্য যাচাই করতে প্রবৃত্ত হয়, পরক্ষণেই ধর্মপ্রিয়ী আর-সব লোকের অভ্যাসমত আবার সে পিছিয়ে যায় এই ভেবে যে তার এই প্রবৃত্তির পিছনে রয়েছে শয়তানের কুমন্ত্রণা যার পরিণামে তার ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হতে পারে। আসল কথা এই যে মানুষ শৈশব থেকেই (যে বয়সে যা শেখানো হয় তাই সহজে গ্রহণ করবার একটা মানসিক প্রবণতা থাকে) আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের মুখে সর্বদাই পূর্বতন ধর্মনায়কদের নানারকম আজগুবী কীর্তিকলাপের কাহিনী এবং যাদের মধ্যে তার জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা তারা যে ধর্মে বিশ্বাসী সেই ধর্মের গুণগান শুনে অটল বিশ্বাসে সেই ধর্মমতই আঁকড়ে থাকে এবং যতই অর্থহীন বা আজগুবী হোক

নিজের ধর্মমতকে অন্যান্য ধর্মমতের উপরে স্থান দেয়। নিজধর্মের প্রাত্যহিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে সেই ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধাভক্তি দিনদিন আরো বেড়ে যায়। কাজেই একটি বিশেষ ধর্মমতে গভীর বিশ্বাসী কোনো লোক যখন সেই ধর্মের পুস্তকাদি পড়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, বহুবৎসর ধরে বহুজনস্বীকৃত ধর্মমতের সত্যাসত্য নির্ণয়ে যার কোনো আগ্রহ থাকে না, তার মনোভাব সত্যানুসন্ধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে লোক বরং নিজধর্মের একজন ব্যাখ্যাকার হিসাবে গৌরব অর্জনের প্রত্যাশায় কখনো কখনো নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে নতুন নতুন ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবন করে সনাতনী ধর্মমতকে আরো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়। আর সেই ধর্মের অনুগামী সাধারণ লোকেরা, যারা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় স্বধর্মকেই শ্রেয় বলে জানে, পাগলকে "হেই" বলতে যেমন ক্ষেপে যায় তেমনি ভুল যুক্তিতর্কের অবতারণায় অযথা বিরোধের সৃষ্টি করে এবং স্বধর্মের গৌরব ও পরধর্মের নিন্দায় মুখর হয়। দৈবাৎ কেউ যদি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে নিজ সম্প্রদায় বা ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন তোলে বা মতান্তর প্রকাশ করে তবে তার স্বধর্মীরা ক্ষমতা থাকলে অনভিজ্ঞ সেই লোকটিকে বর্শাফলকে সমর্পণ করে আর তা সম্ভব না হলে বাক্যবাণে জর্জরিত করে। ধর্মগুরুদের প্রভাব তাঁদের অনুগত শিষ্যদের উপর এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে যে তাঁদের কথায় বিশ্বাস করে কেউ কেউ নুড়িপাথর, গাছপালা বা জন্তুজানোয়ারকেও দেবতার আসনে বসিয়েছে। তাদের উপাস্য এই দেবতাদের কেউ যদি ধ্বংস বা মর্যাদাহানির চেষ্টা করে তবে তার বিরোধিতায় তারা রক্তপাত বা আত্মোৎসর্গ করা ইহলোকে গৌরব ও পরকালে মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ জ্ঞান করে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তাদের ধর্মের ব্যাখ্যাকাররাও অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের অনুকরণে ন্যায় ও সততা বিসর্জন দিয়ে এই জাতীয় ধর্মাচারের সমর্থনে অনেক নতুন নতুন ধর্মীয় সূত্রের আমদানি করেন যা আপাতগ্রাহ্য হলেও আসলে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অবাস্তব এবং এইভাবেই তারা সত্যমিথ্যার বিচারবিভেদে অসমর্থ অন্তর্দৃষ্টিহীন সাধারণ লোকদের ধর্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন। ...ঈশ্বর সহায় হোন আমাদের নিজেদের কুমতি ও দুষ্কর্ম থেকে আমরা যেন রক্ষা পাই... (কোরান থেকে উদ্ধৃত)।

এ কথা অনস্বীকার্য যে সামাজিক জীব হিসাবে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করাই মানুষের ধর্ম, কিন্তু সমাজব্যবস্থা যেহেতু মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক ভাববিনিময় এবং সেইসঙ্গে এমন কতকগুলি নিয়মকানুনের উপর প্রতিষ্ঠিত যা দিয়ে একের সম্পত্তি অপরের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা' এবং ব্যক্তির উপর ব্যক্তির উৎপীড়ন নিবিদ্ধ করা যায়, সেই হেতু বিভিন্ন দেশের অধিবাসী নানা জাতির লোকেরা, এমন-কি বহুদূরবর্তী দ্বীপ ও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরাও,

বিশেষ বিশেষ শব্দ উদ্ভাবন করেছে বিশেষ বিশেষ ভাবনা প্রকাশের জন্য, এবং এই সব ভাবনার ভিত্তিতে যে ধর্মমত গড়ে উঠেছে সমগ্র সমাজব্যবস্থা তার উপর নির্ভরশীল। সব ধর্মেরই মূলমন্ত্র হল চিদশক্তি বা পরমাত্মায় (চিদশক্তি বা পরমাত্মা বলতে বোঝায় যে আধ্যাত্মিক শক্তি জড়দেহ বা পদার্থের নিয়ামক) এবং পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস (পরলোক বলতে সেই স্থান বোঝায় যেখানে দেহ থেকে আত্মা ছেড়ে যাবার পর ইহলোকের পাপপুণ্যের ফলাফল ভোগ করতে হয়)। পরমাত্মা ও পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার এবং এই দুটি তত্ত্বের শিক্ষণ ও প্রচার সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্যাণকর বলে প্রশ্রয় দেওয়া চলে (যদিও পরমাত্মা ও পরলোক বলতে সত্যি কিছু আছে কি নেই সে ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত), কারণ পরলোকে নির্যাতন এবং ইহলোকে শাসন-কর্তৃপক্ষের হাতে দণ্ডভোগ এই দুয়ের ভয়ে মানুষ নিষিদ্ধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। কিন্তু আবশ্যিক এই দুটি তত্ত্বে বিশ্বাসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে শুদ্ধাশুদ্ধ, শুভাশুভ, পানভোজন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত শত শত নিরর্থক কষ্টসাধ্য ব্রত যার ফলে সমাজব্যবস্থায় উন্নতির পরিবর্তে ক্ষতি হয়েছে অনেক, সমাজজীবনে নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের দুঃখকষ্ট ও বিভ্রান্তি আরো বেড়েছে।

ধন্য ঈশ্বর যে ধর্মনায়ক ও শাস্ত্রকারদের এই অত্যুৎসাহিতা সত্ত্বেও মানবপ্রকৃতির মধ্যে সহজাত এমন একটি মৌলিক মননশক্তি আছে যে স্থিরবুদ্ধি কেউ যদি কোনো বিশেষ ধর্মমত গ্রহণ করবার আগে বা পরে বিভিন্ন ধর্মের মূল ও গৌণতত্ত্বগুলি ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে তবে নিশ্চিত আশা করা যায় যে সে এই-সব ধর্মতত্ত্বের সত্যাসত্য, কোনটি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কোনটিই বা ভ্রান্ত তা নির্ণয় করতে সমর্থ হবে। এবং নিরর্থক যে সব ধর্মীয় বাধানিষেধ কখনো কখনো মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধসৃষ্টি এবং দৈহিক ও মানসিক দুঃখকষ্টের কারণ হয় তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিশ্বজগতের সুষম সংগঠনের উৎসস্বরূপ একমেবাদ্বিতীয় সেই পরমসত্তার দিকে তার মুখ ফেরাবে এবং সমাজহিতকর কার্যে মনোনিবেশ করবে। · ঈশ্বর যার পথপ্রদর্শক কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না আর তিনি যাকে বিপথে নিয়ে যান তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই ··(কোরান থেকে উদ্ধৃত)।

কোনো কোনো ধর্মের অনুগামীদের বিশ্বাস করতে দেখা যায় যে বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেই ধর্মের বিধান অনুযায়ী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলার্থে তাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করতে। তাদের এও বিশ্বাস যে অন্যধর্মে বিশ্বাসী যাদের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ পরকালে তারা নির্যাতন ও শাস্তিভোগ করবে। এবং যেহেতু প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের পুণ্যকর্ম ও অপর সম্প্রদায়ের পাপকর্মের ফলাফল পরকালের জন্য তুলে রাখে সেই হেতু ইহজীবনে তারা অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ ধর্মমত খণ্ডন করতে সক্ষম হয় না।

তার ফলে আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার পরিবর্তে তাদের মনে বিদ্বেষ ও অনৈক্যের বীজ উপ্ত হয় এবং পরস্পরকে তারা অত্যন্ত হেয় ও ভগবৎপ্রসাদবঞ্চিত বলে জ্ঞান করে। অথচ স্পষ্টতই তারা সবাই জাতিধর্মনির্বিশেষে ঐশ্বরিক দানস্বরূপ নক্ষত্রের আলো, বসন্তের আনন্দবিলাস, বৃষ্টিপাত, শারীরিক স্বাস্থ্য, মঙ্গলময় জীবন, আন্তরিক ও বাহ্যিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সব-কিছুতেই সমানভাবে অধিকারী এবং তেমনি ভাবেই অন্ধকারের বিভীষিকা, শীতের তীব্রতা, মানসিক পীড়া, দারিদ্র্য, আন্তরিক ও বাহ্যিক অকল্যাণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখযন্ত্রণার ভুক্তভোগী।

মানুষ মাত্রই অন্য কারও নির্দেশ বা প্রেরণা ছাড়াই কেবল তার অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় বিশ্বজগতের যে-সব রহস্য পর্যবেক্ষণ করে, যেমন বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু ও গাছপালার জীবনধারা ও বংশবৃদ্ধি, গ্রহনক্ষত্রের পরিক্রমণরীতি, জীবজন্তুর সহজাত অপত্যস্নেহ এবং ভবিষ্যতে কোনো প্রতিদানের আশা না করেও যেভাবে তারা নিজ নিজ সন্তানদের পালন করে, তাই থেকে বিশ্বজগতের নিয়ন্তা একটি পরমসত্তার অস্তিত্ব সহজেই মেনে নেয়। কিন্তু এও দেখা যায় যে তারা প্রত্যেকেই যে সম্প্রদায়ের মধ্যে লালিত হয়েছে সেই সম্প্রদায়ের লোকদের অনুকরণে বিশেষ বিশেষ গুণসমন্বিত বিশেষ কোনো দেবদেবতাকেই স্বীকার করে এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী বিশেষ একটি ধর্মমত বেছে নেয়। যেমন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রোধ, দয়া, ঘৃণা, ভালোবাসা প্রভৃতি মানবীয় চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন কোনো দেবতায় বিশ্বাস করে, আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করে সর্বত্র বিদ্যমান সর্বব্যাপী কোনো সত্তায়। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মতে কাল বা প্রকৃতিই সৃষ্ট জগতের মূলাধার, আবার কেউ কেউ দেবত্ব আরোপ করে বৃহদাকার কোনো সৃষ্ট জীবে এবং তাকেই পূজার আসনে বসায়। যে বিশ্বাস সামাজিক শিক্ষা ও সংস্কারজাত এবং সৃষ্টির উৎসস্বরূপ পরমাত্মায় যে নিশ্চিত বিশ্বাস মানুষ-মাত্রেরই একটি প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য, এই দুই বিশ্বাসের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য করে না। এমন-কি অভ্যাসগত সংস্কার এবং সত্যাসত্য ও কার্যকারণ নির্ণয়ে অনীহাবশত তারা নদীনালায় পুণ্যস্নান, নুড়িপাথর ও বৃক্ষপূজা, কৃচ্ছ্রসাধন এবং বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রধানুযায়ী ধর্মযাজকদের মার্জনাক্রম সারা জীবনের কলুষ ও পাপমোচনের উপায়স্বরূপ জ্ঞান করে। এবং তাদের বিশ্বাস এই-সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মযাজকদের তন্ত্রমন্ত্র ও অনুগ্রহের ফলেই সব-কিছু শুদ্ধ হয়ে যায়, তার সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা বা মতামতের কোনো সম্পর্কই নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তাদের বিরোধী ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেদের উপর এই-সব তুকতাক ও আচার-অনুষ্ঠান কোনোই প্রভাব বিস্তার করে না। মোক্ষলাভের এই-সব কল্পিত উপায় সত্যি সত্যি কার্য-কর হলে তার ফলাফল বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকত না,

বিভিন্ন-মতাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও সমান ফললাভের অধিকারী হত। কারণ, কোনো কিছুর ফলাফল ও প্রভাব প্রভাবিত ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে কমবেশি হবার সম্ভাবনা থাকলেও বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী কারও ধর্মমতের উপর নির্ভরশীল নয়। দেখতে পাও না কি মিণ্টান্নজ্ঞানে যে বিষ সেবন করে পরিণামে তার মৃত্যু অবধারিত? ...হে ঈশ্বর, সহজাত প্রবৃত্তি আর প্রথাগত সংস্কার এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ করার শক্তি দাও আমাকে...।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্মনায়করা অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের ভাঁওতা দিয়ে নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে জনসমক্ষে প্রচার করেন এবং সেভাবেই তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মে সাধারণ লোকের বিশ্বাস বাড়াতে সমর্থ হন। কল্পনাপ্রবণ সাধারণ লোকের স্বভাবই হল যখন তারা বুদ্ধির অতীত কোনো ঘটনা বা ক্রিয়াকর্ম দেখতে পায় অথবা কোনো ঘটনা বা ক্রিয়াকর্মের প্রত্যক্ষ কারণ খুঁজে পায় না, তখন সেগুলি তারা কোনো অলৌকিক শক্তি বা কারণ-সম্ভূত বলে মনে করে। আসল কথা এই যে, এই জগতে বিদ্যমান প্রত্যেকটি পদার্থ পৃথক পৃথক ভাবে কতকগুলি কারণ, পরম্পরা ও নিয়মশৃঙ্খলার অনুবর্তী, এমন-কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সেই কারণ, পরম্পরা ও নিয়মগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেকটি পদার্থের অস্তিত্ব বিশ্বজগতের একটি পরিকল্পনায় বাঁধা। কিন্তু যখন কেউ অভিজ্ঞতার অভাব বা কল্পনার আধিক্য হেতু বিরলদৃষ্ট কোনো পদার্থ বা ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়, তখন প্রায়ই নিজ উদ্দেশ্য সাধনে আর কেউ সেই পদার্থ বা ঘটনা তারই অলৌকিক ক্ষমতায় সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করে এবং অলৌকিক শক্তিধর ও পূজ্যপাদ পরিচয়ে সাধারণ লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বর্তমানে আমাদের এই ভারতবর্ষে অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম ও ঘটনায় বিশ্বাস এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে এই দেশের লোকেরা যখনই কোনো অদ্ভুত বা বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন হয় যা তাদের পূর্বতন ধর্মনায়ক বা বর্তমান মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্ষমতাবলে সম্ভব হয়েছে বলে চালানো যায়, তখনই তারা মনেপ্রাণে তাই বিশ্বাস করে এবং সেই ঘটনার প্রত্যক্ষ ও বোধগম্য কোনো কারণ থাকলেও তারা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু যারা স্থিরবুদ্ধি ও ন্যায়প্রেমী তাদের কাছে এ কথা গোপন নেই যে এমন অনেক অদ্ভুত জিনিস আছে, যেমন য়ুরোপীয়দের আবিষ্কৃত বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য এবং বাজিকরদেব হস্তকৌশল যা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য এবং আপাতদৃষ্টিতে যার কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে বা অন্য-লোকের কাছে সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করলে সব-কিছুরই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আরোহী প্রথায় বিচার করবার ক্ষমতাই বুদ্ধিমান লোকদের

এই-সব অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের ছলনা থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারে। এ সম্বন্ধে বড়ো জোর বলা যায় যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সূক্ষ্মবিচার ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা সত্ত্বেও কারও কারও কাছে কোনো কোনো অদ্ভুত ঘটনা বা ক্রিয়াকর্মের রহস্য অজ্ঞাত থেকে যায়। সে ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধির শরণাপন্ন হয়ে নিজেকে এই প্রশ্নই করতে হবে— দুটির মধ্যে কোন্‌টি যুক্তিযুক্ত, আমরাই ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি এবং তার কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়েছি না কি এই-সব ঘটনা প্রকৃতির নিয়মবহির্ভূত কোনো অসম্ভব বা অলৌকিক কারণসম্ভূত? আমার মনে হয় যে আমাদের বিবেকবুদ্ধি প্রথম যুক্তির পক্ষেই সায় দেবে। তা ছাড়া এমন সব ঘটনায় আমাদের বিশ্বাস করবার প্রয়োজনই বা কি যা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য এবং আমরা যা স্বচক্ষে দেখি নি, যেমন মৃতদেহের পুনরুজ্জীবন, স্বর্গারোহণ প্রভৃতি যে-সব ব্যাপার শত শত বছর আগে কোনো সময় ঘটেছিল বলে শোনা যায়? অবাক লাগে যখন দেখা যায় অভিজাতবংশীয় লোক বা সাধারণ লোকই হোক প্রত্যেকেই যদিও সাংসারিক কাজকর্মে একটি ব্যাপারের সঙ্গে আর একটি ব্যাপারের বিশেষ কী সম্পর্ক তা না জেনে একটি কারণ এবং আর-একটি তার কার্য বলে বিশ্বাস করে না, তবুও ধর্মীয় ব্যাপারে এবং ধর্মপ্রভাবিত অন্যান্য কাজকর্মে (যেমন গ্রহনিবৃত্তির জন্য পূজার্চনা, রোগমুক্তির জন্য কবচধারণ ইত্যাদি) পরস্পর কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও দুটি ব্যাপারের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করে নেয়।

এই-সব অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার যুক্তি যা সহজে গ্রহণ করতে চায় না সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলা হলে ধর্মনায়করা তাঁদের শিষ্যদের কখনো কখনো এই বলে স্তোক বাক্য দেন যে ধর্মীয় ব্যাপারে যুক্তিতর্কের কোনো স্থান নেই, বিশ্বাস ও ভগবৎপ্রসাদই হল ধর্মের ভিত্তি। কিন্তু যে-সব ব্যাপারের পিছনে কোনো যুক্তি নেই এবং সাধারণ বুদ্ধিতে যার নাগাল পাওয়া যায় না, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো লোক তা গ্রহণ করবে কেমন করে? ···অন্তর্দর্শী লোকেরা এই থেকে শিক্ষা নাও·· (কোরান থেকে উদ্‌ধৃত)।

ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত লোকেরা কখনো কখনো এই বলে বিতর্কের অবতারণা করেন যে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা যিনি সম্পূর্ণ নাস্তির আড়াল থেকে বিদ্যমান এই বিশ্বজগৎ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেছেন, মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার এবং দূরদূরান্ত পরিক্রমায় পার্থিব দেহে আলোর ধর্ম ও বায়ুবল প্রদান করা তাঁর ক্ষমতাবহির্ভূত নয়। কিন্তু এই বিতর্কে এই-সব ঘটনার সম্ভাব্যতা ছাড়া আর কিছুই প্রমাণিত হয় না। প্রাচীন ধর্মনায়ক ও বর্তমান মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি এই রকম অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই, অধিকন্তু

বুদ্ধিমান লোকের কাছে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি হেতু এই বিতর্ক সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। তা ছাড়া তাঁদের এই জাতীয় যুক্তি মেনে নিতে হলে বিতর্কপ্রসঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিধারা অনুযায়ী সূত্রের সত্যাসত্য নিয়ে কোনো প্রশ্নই করা চলে না, এবং কোনো প্রস্তাব আদৌ গ্রহণীয় কিনা তা নিয়ে সকল বিতর্কের অবসান ঘটে। কারণ, অসম্ভব ও অযৌক্তিক কোনো কিছুর সত্যতা প্রমাণ করতে যে-কেউ বিতর্কপ্রসঙ্গে এই জাতীয় প্রশ্নাতীত কোনো প্রস্তাবের আশ্রয় নিতে পারে। সে ক্ষেত্রে সম্ভব ও অসম্ভব এই দুটি ধারণার মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকে না এবং তার ফলে অবরোহী প্রথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যুক্তির সাহায্যে কোনো কিছু প্রমাণ করার ন্যায়শাস্ত্রসম্মত যে পদ্ধতি তা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে সৃষ্টিকর্তা অসম্ভব কোনো কিছু সৃষ্টি করতে অপারগ, যেমন ঈশ্বরের অংশীদার আর কেউ বা ঈশ্বরের অনস্তিত্ব বা দুটি বৈপরীত্যের সহাবস্থান :

একটি বয়েত (হাফিজ-এর কাব্যসংগ্রহ থেকে) :—

জাঙ্‌-এ-হাফ্‌তাদ্‌ ও দো মেল্লাৎ-র হামে ওজ্‌র্‌ বেনাহ্‌
চুন্‌ নাদিদান্দ্‌ হাকিকাত্‌ রাহ্‌-এ-আফসনে জাদান্দ্‌*

বাংলা অনুবাদে বাহাত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সবই মার্জনীয়। কারণ সত্যানুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে তারা কল্পকাহিনীর পথ বেছে নিয়েছে।

যেহেতু এই সুদীর্ঘ কাল পরে বিভিন্ন ধর্মের প্রাচীন নায়কদের অতিমানবিক শক্তিমত্তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো প্রমাণ দাখিল করা সম্ভব নয়, বিভিন্ন শাস্ত্রকারেরা তাই তাঁদের অনুগামী শিষ্যদের সরল বিশ্বাসের উপর ভরসা করে পুরুষানুক্রমে প্রচারিত অজস্র কল্পকাহিনীর আশ্রয় নেন এই-সব অলৌকিক ঘটনা ও ক্রিয়াকর্মের প্রমাণস্বরূপ। কিন্তু পুরুষানুক্রমিক সংস্কার অনুযায়ী যে বিচারপদ্ধতি যথার্থই নিশ্চিত বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ এবং ধর্মভীরু লোকেরা পুরুষানুক্রমিক সংস্কার অনুযায়ী যে বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে, এই দুয়ের একটু তুলনামূলক বিচার করলেই কুতর্কের মুখোশ খুলে যায়। কারণ, ধর্মপ্রিয়দের মতে পুরুষানুক্রমে প্রচারিত এই সব কাহিনীর জনক ছিলেন বিশেষ মর্যাদা-সম্পন্ন এক শ্রেণীর লোক যাঁদের মুখে কোনো মিথ্যাভাষণ কল্পনাই করা যায় না, যদিও প্রাচীন কালে এই শ্রেণীর কোনো লোক ছিলেন কিনা আধুনিক যুগের মানুষের কাছে তার কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ নেই বা সে সম্বন্ধে তাদের

* ইরানদেশে প্রচলিত ফারসী উচ্চারণরীতি অনুযায়ী বাংলা লিপ্যন্তরে আ-কার, এ-কার ও ও-কার হ্রস্ব এবং অ-কার, ই-কার ও উ-কার দীর্ঘ উচ্চারিত হবে। ক্‌ খ, গ, ও হ এই চারটি অক্ষরই উচ্চারিত হয় কণ্ঠপথে এবং জ ইংরেজী Z-এর মতো। ভারতবর্ষে প্রচলিত ফারসী বর্ণবর্ণের উচ্চারণরীতি এই লিপ্যন্তরে অনুসরণ করা হয় নি।

কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও নেই। এই নিয়ে বরং যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, ব্যাপারটাও সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। তাছাড়া প্রত্যেক ধর্মের প্রাচীন ধর্ম-নায়কদের সম্পর্কে যে-সব কাহিনীর প্রচলন আছে তার মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়, তাই থেকে তাঁদের ভাষণ অসত্য বলেই প্রমাণিত হয়। যদি বলা হয় যে প্রাচীন ধর্মনায়কদের অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের কাহিনী প্রথম যে গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের স্বচক্ষে দেখা বলে প্রচার করেছিল তাদের সমকালীন পরবর্তী গোষ্ঠীর লোকেদের কথায় তার সত্যতা প্রমাণিত হয়, তবে সেই পরবর্তী বা দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লোকের কথার সত্যতা প্রমাণেও তাদের সমকালীন তৃতীয় কোনো গোষ্ঠীর সাক্ষ্য সংযোজন করতে হবে। কারণ দ্বিতীয় গোষ্ঠীর বক্তব্যও প্রমাণসাপেক্ষ, এবং সেই মতো তৃতীয় গোষ্ঠীর বক্তব্য প্রমাণেও চতুর্থ কোনো গোষ্ঠীর সাক্ষ্যসংযোজন আবশ্যক। এক গোষ্ঠীর বক্তব্যপ্রমাণে তার পরবর্তী গোষ্ঠীর সাক্ষ্যসংযোজন এইভাবেই চলবে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের এই ধারাবাহিকতা আধুনিক যুগ থেকে ক্রমে ক্রমে উত্তর-কালে প্রসারিত হবে। স্থিরবুদ্ধি কোনো লোকের হিসাবে তার সমকালীন যে জাতীয় লোকের সঙ্গে সে বসবাস করে থাকে তাদের সততা কোনোরকম মিথ্যাচারের উর্ধ্বে কিনা, বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপারে, সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ থাকবেই। তা ছাড়া বিভিন্ন ধর্মনায়কদের ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁদের যে-সব সদ্‌গুণ আরোপ করা হয় তার সমর্থনে ও বিরোধিতায় প্রচুর অসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যায়, পুরুষানুক্রমিক সংস্কার অনুযায়ী বিচারপদ্ধতিতেও সেসব অসঙ্গতি ধরা পড়ে। সুতরাং উভয় পক্ষের বক্তব্য যদি সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় তবে পরস্পরবিরোধী দুটি মতের সমাবেশ ঘটে। এবং বিনা কারণে এক পক্ষের তুলনায় আর পক্ষের বক্তব্যে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করলে তা হবে পক্ষপাতমূলক বিচার। কারণ, উভয় পক্ষই সমানভাবে তাদের পূর্বতন পুরুষদের উক্তি সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলে দাবি করতে পারে। আসল কথা এই যে যুক্তিগ্রাহ্য এমন কোনো কাহিনী যদি পুরুষানুক্রমে চলে আসে যার সত্যতা কেউ অস্বীকার করে নি তবে তা নিশ্চিত বিশ্বাস উৎপাদনের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় কাহিনীর সঙ্গে পরস্পরবিরোধী যে-সব কাহিনী মোটেই যুক্তিপূর্ণ নয় তার কোনো সম্পর্ক নেই। এই থেকে নীচের অর্থহীন দুটি যুক্তিই খণ্ডন করা যায়:—১. পুরাকালের রাজাদের কাহিনী ইতিহাসে উল্লিখিত এবং পুরুষানুক্রমে প্রচারিত বলে তার সত্যতায় যারা বিশ্বাস করে তারাই আবার প্রাচীন ধর্মপুস্তকে উল্লিখিত এবং পুরুষানুক্রমে প্রচারিত ধর্মনায়কদের অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের কাহিনী কোন্ যুক্তিতে অবিশ্বাস করে? ২. যারা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তার সন্তানদের গাত্রবর্ণ, আকৃতি ও

প্রকৃতির পার্থক্য এবং প্রকৃত ঘটনার সম্বন্ধে নিজেদের অজ্ঞতা সত্ত্বেও কেবল-মাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর ক'রে তাদের জন্মবৃত্তান্ত ও বিশেষ বংশপরিচয়ে বিশ্বাস করে তারাই আবার লোকপরম্পরায় বর্ণিত প্রাচীন ধর্মনায়কদের সাধুতায় ও মহত্ত্বে সংশয় প্রকাশ করে কেমন ক'রে? প্রাচীন রাজাদের কাহিনী, যেমন কোনো রাজার সিংহাসনপ্রাপ্তি, শত্রুদের সঙ্গে তার যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি, তখনকার দিনে সম্ভাব্য ও বিশ্বাসযোগ্য এবং সর্বজনস্বীকৃত কতকগুলি ঘটনার বিবরণ; কিন্তু অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের এই-সব উদ্ভট কাহিনী সর্বজন-সম্মত নয়। যেমন, জীবজন্তুর সন্তান জন্মায় তাদের পিতামাতা থেকে, এ তো চাক্ষুষ সত্য, কিন্তু পিতামাতা ছাড়া সন্তানের জন্ম সম্পূর্ণ যুক্তিবিরোধী।

হাফিজের একটি কবিতাংশ :—

বেবিন্ তাফভোত্-এ-রাহ্ আজ্ কোজস্ত্ ত বে কোজ

বাংলা অনুবাদে : দুটি পথের ফারাক দেখো, কোন্‌খান থেকে কোথায়।

তা ছাড়া প্রাচীন রাজাদের কাহিনী এবং তাঁদের বংশপরিচয় কিছুটা অনুমান বা কল্পনাশ্রয়ী, কিন্তু বিশেষ কোনো ধর্মমতে বিশ্বাস সেই ধর্মের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী নিশ্চিত কতকগুলি প্রকল্প বা সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুয়ের মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্য হেতু কোনো তুলনা করা চলে না। তা সত্ত্বেও প্রাচীন রাজাদের ইতিহাসে তাদের জন্ম ও বংশবৃত্তান্ত নিয়ে যখনই কোনো রকম সন্দেহজনক অসঙ্গতি দেখা দেয় তখনই সেই-সব কাহিনী বিশ্বাসের অযোগ্য বলে বাতিল করা হয়। যেমন, আলেকজান্দার-এর চীন-বিজয়ের কাহিনী এবং তাঁর জন্মবৃত্তান্ত গ্রীক ও পারসীক ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন নি, সে-সব কাহিনী তাই নিশ্চিত বিশ্বাসের অযোগ্য।

কারও কারও মতে পরমকরুণাময় ঈশ্বর ধর্মাবতার বা ধর্মগুরুদের মাধ্যমে সত্যপথের নির্দেশ দিয়ে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন। কিন্তু এই কথার মধ্যে যে সারবত্তা কিছু নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ এই-সব লোকেই আবার বিশ্বাস করে যে এই জগতে ভালোমন্দ সব-কিছুর অস্তিত্ব বিনা মধ্যস্থতায় সরাসরি বিশ্ববিধাতার সঙ্গে যুক্ত এবং গৌণ কারণগুলি সর্বৈব তাদের মধ্যবর্তী কার্যকারক ও অস্তিত্বসাপেক্ষ। অতএব ধর্মগুরু বা নবীরা স্বয়ং ঈশ্বর-কর্তৃক প্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিলেন, না, আর কোনো নিমিত্তের মধ্যস্থতায় তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। প্রথম ক্ষেত্রে, এই জগতে বিদ্যমান সব-কিছুই প্রত্যক্ষ কারণ সম্ভূত এই তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায় এবং ধর্মগুরুদের মাধ্যমে ভগবৎনির্দেশের প্রয়োজন থাকে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয় যে ধর্মগুরু বা নবীরা আর কোনো নিমিত্তের মধ্যস্থতায় প্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিলেন তবে কারণেরও যেমন কারণ থাকে তেমনি ধর্মগুরুদের

এই প্রেরণ ও প্রত্যাদেশ যে নিমিত্তের মধ্যস্থতায় হয়েছিল তারও মধ্যস্থ অশেষ একটি নিমিত্তপরম্পরা কল্পনা করে নিতে হয়। সুতরাং ধর্মগুরু বা নবীদের আবির্ভাব ও দৈববাণীপ্রচার জাগতিক অন্যান্য ব্যাপারের মতোই ঈশ্বর-সম্পর্করহিত বাহ্যিক কোনো কারণ সম্ভূত, অর্থাৎ এই-সব কোনো উদ্ভাবকের কল্পনাপ্রসূত। কল্পিত কোনো ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মগুরু বা নবীরা প্রেরিত হন না। তা ছাড়া এক জাতি যে ধর্মমতকে সত্যপথনির্দেশক বলে বিশ্বাস করে অন্য জাতির ধারণায় সেই ধর্মমত মানুষকে বিপথে চালিত করে।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এই বলে তর্কের অবতারণা করে যে বিভিন্ন ধর্মমতে অসঙ্গতি থাকলেও কোনো ধর্মই মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। প্রাচীন ও আধুনিক শাসনব্যবস্থায় আইনকানুনের যে অসঙ্গতি দেখা যায় ধর্মমতে এই-সব অসঙ্গতিও সেই ধরনের। আধুনিক যুগের শাসকরা প্রাচীন শাসকদের প্রবর্তিত আইনকানুন বর্তমান সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী অনেক সময় পরিবর্তন ও বর্জন করে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে থাকেন। ঈশ্বরও তেমনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্মমতের প্রবর্তন করেছেন এবং তাঁরই ইচ্ছামত কোনোটা বর্জিত কোনোটা হয়তো নতুন ধর্মমতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমার বক্তব্য এই যে, একদিকে অপরিণতবুদ্ধি মানুষ যারা প্রতিটি কর্মের ফলাফল বুঝে উঠতে পারে না, অনেক সময় যারা ভুলভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে এবং যাদের কাজকর্মে সর্বদাই মিশে থাকে ভণ্ডামি, ছলনা ও স্বার্থপরতা এবং অন্য দিকে ঈশ্বর যিনি ধর্মবিশ্বাসী লোকদের মতে প্রতিটি অণুপরমাণু কী অবস্থায় আছে এবং গোপনে বা প্রকাশ্যে কোথায় কী ঘটছে তার খবর রাখেন, যিনি সর্বজ্ঞ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এই তিন কালই যাঁর করতলগত, যাঁর প্রভাবে মানুষের হৃদয় তাঁরই ইচ্ছামত যে-কোনো দিকে ফেরানো যায়, যিনি বিদ্যমান সব-কিছুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ স্বরূপ, নিজের স্বার্থে কোনো ব্যাপারে যাঁর কিছুমাত্র রাগ বা বিরাগ নেই এবং যিনি সর্বপ্রকার চাপল্য থেকে মুক্ত, এই দুয়ের শাসনরীতি ও শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। গুণগতভাবে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিসের মধ্যে কি তুলনা চলে? তা ছাড়াও অনেক আপত্তি তোলা যায় এই মতের বিরুদ্ধে, যেমন ব্রাহ্মণদের একটি সংস্কার অনুযায়ী ঈশ্বরের কঠোর নির্দেশ আছে তারা যেন আনুষ্ঠানিক পূজাচার ও যাগযজ্ঞাবিধি সঠিকভাবে পালন করে এবং অচল নিষ্ঠায় অনন্ত কাল পর্যন্ত স্বধর্মে বিশ্বাসী থাকে। সংস্কৃত ভাষায় এই সম্বন্ধে অনেক দৈববিধান আছে, এবং ঈশ্বরসৃষ্ট জীবের মধ্যে দীনতম আমি ও ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মহেতু এই ভাষা আয়ত্ত করে এ-সব শাস্ত্রীয় বিধান মুখস্থ করেছি। ইসলামধর্মীদের হাতে অনেক পীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করেও, এমন কি-প্রাণ

নাশের ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও, এই-সব দৈববিধানে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণসমাজের লোকেরা তাদের ধর্মমত বর্জন করে নি। অন্য দিকে ইসলামধর্মীরা কোরানের দুটি আয়াত অনুযায়ী—"পৌত্তলিকদের যেখানেই পাও হত্যা কর" এবং "তারপর ধর্মযুদ্ধে তাদের বন্দী করে হয় বশ্যতার অঙ্গীকার নয়তো মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দাও"—ঈশ্বরের দোহাই দেয় এই বলে যে বহু দেবদেবতায় বিশ্বাসী পৌত্তলিকদের (ইসলামধর্মীদের মতে তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই উগ্র বিশ্বাসে আর সবাইকে ছাড়িয়ে যায়) হত্যা বা নির্যাতন করা ঈশ্বরনির্দেশে আবশ্যিক। সুতরাং ইসলামধর্মীরা ধর্মীয় উন্মাদনা ও ঈশ্বরের নির্দেশপালনে তাদের অত্যুৎসাহিতায় ইহজগত ও পরজগতের আশীর্বাদস্বরূপ ধর্মগুরুকুলশ্রেষ্ঠ মোহম্মদ-এর (তিনি ও তাঁর অনুগামীদের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক) সর্বশেষ দৌত্যে যাঁরা অবিশ্বাসী সেই পৌত্তলিকদের হত্যা ও নির্যাতন করতে একালে বা সেকালে কখনোই বিরত হয় নি। এই জাতীয় ক্ষতিকর ও পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কি মহদাশয় ও নিরপেক্ষ ঈশ্বরের করুণা ও বিবেচনাসম্মত হতে পারে, না এ সবই প্রতারকদের কল্পনাপ্রসূত? আমার মনে হয় যে স্থিরবুদ্ধি যে-কেউ দ্বিতীয় বিকল্পটিই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করবে। তা হলে এই-সব নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণা ঈশ্বরকেই আরোপ করা না পরস্পরবিরোধী এই দুটি মতই প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে? যেমন, কোনো সম্প্রদায় তাদের ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দাবি করে থাকে যে তাদের ধর্মগুরু বা নবীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মসংস্থাপনের জন্য নবীদের প্রেরণ ও দৌত্যের পালা শেষ হয়েছে, আবার অপর একটি সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের নির্দেশে নবীদের প্রেরণ ও দৌত্যের পালা শেষ হয়েছে দাউদ-এর প্রজন্মেই। এই দুটি বিবৃতিই প্রকৃতপক্ষে আখ্যান মাত্র, আইনের অনুশাসন নয় যে তা বাতিল বা প্রত্যাহার করা চলে, কারণ একটিকে সত্য বলে ধরে নিলে অপরটি মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং অবৈধভাবে অদলবদল হবার সম্ভাবনা দুটি আখ্যানেই সমানভাবে প্রযোজ্য। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে প্রাচীন ধর্মগুরু সবাই তিরোহিত হয়েছেন তারও শত শত বছর পর, যখন ধর্মোদ্দেশ্যে নবীদের প্রেরণ ও দৌত্যের পালা শেষ হয়ে যাবার কথা, তখনও নানক ও অন্যান্য কেউ কেউ ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে ধর্মগুরুর পতাকা উত্তোলন করে বহুলোকের আনুগত্য ও শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী লোকদের নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধনে ধর্মীয় শিক্ষাদানের দরজা সব সময়েই খোলা থাকবে। প্রত্যহই দেখা যায় যে শত শত লোক কিছু সম্মানপ্রাপ্তি বা সামান্য লাভের প্রত্যাশায় নানা রকম কৃচ্ছ্রসাধন ও দৈহিক কষ্ট স্বীকার করে, যেমন নিরন্তর উপবাস, একটি হাত অচল অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা, দেহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি। অতএব

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে জননেতা ও বিশ্বত্রাতার পদগৌরব লাভের উদ্দেশ্যে কিছু লোক সেই সময়কার বিপদাপদ অগ্রাহ্য ক'রে নানা রকম দুঃখকষ্ট বরণ করেছেন।

বিভিন্ন ধর্মনায়কদের মুখে নিজ নিজ ধর্মে তাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করার জন্য একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়—আমার ধর্ম মৃত্যুর পর পাপপুণ্যের ফলাফল সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করে, তা সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আমার ধর্ম যদি মিথ্যা হয় এবং পরকাল বলে কিছু না থাকে তবে আমার ধর্ম স্বীকার ও গ্রহণ করে নিতে ভয় কি? প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমার ধর্ম যদি সত্য হয় তবে তা অস্বীকার করলে অবিশ্বাসীদের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হতভাগ্য লোকগুলি সবাই তাদের ধর্মনায়কদের কথাই শেষ কথা বলে জানে এবং তা নিয়ে গর্ববোধ করে। আসল কথা এই যে, মানুষ যে শিক্ষা পায় এবং তার যা স্বভাব তা অনেক সময় তাদের চোখ থাকতেও অন্ধ ও কান থাকতেও কালা করে দেয়। ধর্মনায়কদের এই-সব ছলচাতুরী দুটি কারণে ধরা পড়ে যায়। প্রথমত তারা যে বলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাদের ধর্ম স্বীকার করে নিলেও ভয় নেই সে কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া যায় না, কারণ যে-কোনো জিনিসের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে মানুষমাত্রেই সেই জিনিসের সত্যতায় বিশ্বাস করে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোনো লোক বুদ্ধির অতীত ও সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো জিনিসের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যদি তা স্বীকার করে নেওয়া হয় তবে তাই থেকে মানুষের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা হেতু নানারকম দুঃখকষ্ট, ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্নীতির উদ্ভব হতে পারে, যেমন ধর্মান্ধতা, প্রতারণা ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও এই যুক্তি মেনে নিলে সব ধর্মই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, কারণ ধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকেই একই যুক্তির আশ্রয় নিতে পারে। তার ফলে মানুষ কি সব ধর্মমতই গ্রহণ করবে, না, বিশেষ কোনো ধর্মমত গ্রহণ করে অন্য সব ধর্মমত প্রত্যাখ্যান করবে, তাই নিয়ে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ সর্বধর্মে বিশ্বাস যে অসম্ভব তাতে কোনো ভুল নেই, কাজেই ফিরে যেতে হয় দ্বিতীয় বিকল্পেই এবং সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মমতের সত্যাসত্য নিয়ে আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। আমার এই কলহমুখর ও বাদপ্রতিবাদপূর্ণ নিবন্ধের উদ্দেশ্যও তাই।

কোনো কোনো শাস্ত্রকারদের আর একটি যুক্তি হল এই যে আমাদের পিতৃপুরুষদের রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস সত্যাসত্য বিচার না করেই আমাদের গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, এই-সব রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস অবজ্ঞা করলে বা তা থেকে বিচ্যুত হ'লে ইহজগতে সম্মানহানি ও পরকালে অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের অবমাননা ও অসম্মান করা হয়। সাধারণ

মানুষ যারা পিতৃপুরুষদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা আবশ্যিক বলে জানে, এই-সব কুতর্ক তাদের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে এবং সত্যাসত্য বিচার ও সত্যপথ অবলম্বনে তাদের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ একটু ভেবে দেখলেই এই যুক্তির অসারতা সব শ্রেণীর লোকের কাছেই ধরা পড়ে যায়। কারণ প্রথমত বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা যাঁরা জনগণের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন এবং দ্বিতীয়ত যাঁরা তাঁদের ধর্মনায়কদের প্রচারিত ধর্মমত গ্রহণ করার পর পিতৃপুরুষদের সনাতন পন্থা বর্জন করে সেই ধর্মমত সমূলে বিনাশ করতে উদ্যত হন, এই যুক্তি তাঁদের উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। মানুষ যদি তার নিজস্ব কল্পনা ঈশ্বর-প্রণোদিত বলে এই-সব অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পায় তবে তার চেয়ে সহজ উপায় আর কী আছে? আসলে প্রাচীন যুগের লোকদের মধ্যে এক ধর্ম ত্যাগ করে আর-এক ধর্ম গ্রহণ করার যে প্রচলন ছিল তাই থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে ধর্মান্তর গ্রহণ মানুষের একটি স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। তা ছাড়া ঈশ্বর যে প্রত্যেকটি মানুষকে বোধশক্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রদান করেছেন তার অভিপ্রায় হল এই যে অধিকাংশ পশুর মতো সে স্বজাতীয় অন্যান্য মানুষের অনুকরণ না করে অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে প্রত্যেক ব্যাপারে ভালোমন্দের বিচারবিবেচনায় নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করবে, যাতে ঈশ্বরদত্ত এই বোধশক্তি নিরর্থকতায় না পর্যবসিত হয়।

একেশ্বরবাদীরা সংখ্যায় কম এই যুক্তিতে বহু দেবদেবতায় বিশ্বাসী কোনো কোনো সম্প্রদায়ের লোক গর্ববোধ করে থাকে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো বিবরণের সত্যাসত্য সেই বিবরণে বিশ্বাসীদের সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যাল্পতার উপর নির্ভর করে না, কারণ সত্যান্বেষী সবাই স্বীকার করেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবিরোধিতা সত্ত্বেও সত্যপালন অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া যদি সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে বিশ্বাসীরা সংখ্যায় কম হলেই কোনো বিবরণ অসত্য হয়ে যায় তবে সব ধর্মের ভিত্তিমূলেই প্রচণ্ড আঘাত করা হয়। কারণ, যে-কোনো নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার সূচনায় সেই ধর্মের প্রবর্তক ও তাঁর সহধর্মী মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুগামী ছাড়া আর কেউ তা সমর্থন করে নি। তার পর সেই সামান্য সংখ্যক কয়েকজন লোকের কথার উপর ভিত্তি করে একটি তৃণশীর্ষে পর্বতস্থাপনের মতো হাজার হাজার বৃহদায়তন পুস্তক রচনা ও যুক্তিজাল বিস্তার করা হয়েছে, যদিও একমেবাদ্বিতীয় পরমসত্তায় বিশ্বাস প্রত্যেকটি ধর্মের মূলনীতি বলে স্বীকৃত। ঈশ্বরলব্ধ স্বাভাবিক প্রেরণা যা মানুষকে মানুষের সঙ্গে সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপনের শিক্ষা ও ভালোমন্দ বিচারের স্বজ্ঞা দেয়, তার উপর যারা মানবিক প্রেরণাকে প্রাধান্য দেয় তারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে তাদেরই সগোত্র অন্যান্য মানুষের সঙ্গে প্রেম ও প্রীতির আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে (যা ঈশ্বর ও প্রকৃতিগ্রাহ্য বিশুদ্ধ ভক্তির পরিচায়ক) বিশেষ কিছু মন্ত্রোচ্চারণ ও অঙ্গসঞ্চালনই ঐশ্বরিক প্রসাদ ও মার্জনালাভের উপায় স্বরূপ

জ্ঞান করে। বস্তুত ঈশ্বর তাদেরই হাতের মুঠোয় এই দাবির অহমিকায় তারা অনেক সময় প্রচার করে যে দৈহিক ক্রিয়াকর্ম ও মানসিক ক্ষমতাবলে অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরেরও অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব। এই-সব দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াকর্মের সাহায্যে ঈশ্বরের ক্রোধপ্রশমন ও তাঁর প্রসাদ ও মার্জনা লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। একটু ভেবে দেখলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান এই অপপ্রচারের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে যায়।

একটি বয়েত :—

চান্দিন্ ফানুন্-এ-শেখ্ নাইআরজাদ্ বে নিম্ খাস্

রহাত্ বে দেল্ রাসন্ কে হামিন্ মাশ্‌রাব্ আস্ত্ ও বাস্।

বাংলা অনুবাদে: শেখ বা ধর্মগুরুদের এই ছলাকলার আধকুটো খড়ের মূল্যও নেই / লোকের প্রাণে শান্তি দাও, মানুষের ধর্ম একমাত্র তাই।

এক কথায় প্রতাবক ও প্রতারিত এবং যারা প্রতারকও নয় প্রতারিতও নয় এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে মানুষকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, এক জাতীয় প্রতারক যারা অন্য লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করতে নিজের ইচ্ছামত ধর্মীয় তত্ত্ব ও ধর্মমত উদ্‌ভাবন করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে উত্তেজনা ও বিবাদ-বিরোধের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, প্রতারিত এক জাতীয় লোক যারা কোনো রকম বিচার-বিবেচনা না করেই অন্যের আনুগত্য স্বীকার করে। তৃতীয়ত, প্রতারক ও প্রতারিত এক জাতীয় লোক যারা আর কারো কথায় বিশ্বাস ক'রে অন্য লোকদেরও সেই বিশ্বাসে প্ররোচিত করে। চতুর্থত, মহামহিম ঈশ্বরের করুণায় যারা প্রতারকও নয়, প্রতারিতও নয়।

একটি বয়েত (হাফিজের কাব্যসংগ্রহ থেকে) :—

মা বশ্ দার্ পেইয়ে অজর্ ও হার চে খহি কোন্

কে দার্ তারিকাত্-এ-ম গৈর্ আজ্ ইন্ গোনাহি নিস্ত্।

বাংলা অনুবাদে: কারো অনিষ্টসাধনের ধান্দায় থেকো না, আর যা খুশি তাই করো। কারণ আমাদের সাধন পন্থায় তা ছাড়া আর কোনো পাপ নেই।

সংক্ষেপে হলেও এই অধমের মতে বিশেষভাবে বিবেচ্য ও কার্যকর এই কয়েকটি কথা ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মতামত অগ্রাহ্য করে এই আশায় নিবেদন করা হল যে স্থিরবুদ্ধি লোকেরা সংস্কারমুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর বিচার করবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমার অন্য একটি পুস্তকের জন্য ("মনাজরুতুল্ আদিয়ান্"—"বিভিন্ন ধর্মবিষয়ক আলোচনা") তোলা রইল। ভবিষ্যতে নকলনবিসদের হাতে আমার এই পাণ্ডুলিপির অদলবদল আশঙ্কায় এই কটি পাতা লেখার পরেই ছাপাতে দিয়েছি। এখানে বলা প্রয়োজন যে ধর্মগুরুদের

উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা এই পুস্তিকায় যেরূপ লিপিবদ্ধ হয়েছে আরবী ও ফারসী গ্রন্থকারদের রীতি অনুকরণেই সেরূপ করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রাজা রামমোহন রায়ের এই পুস্তিকাটি আগাগোড়া ফারসী ভাষায় লিখিত হলেও পুস্তিকার ভূমিকা ও পুস্তিকার মূলপাঠে কোরান থেকে উদ্‌ধৃত কয়েকটি আয়াত আরবী ভাষায় লিখিত। আরবী ভাষায় আমার অজ্ঞতা হেতু পুস্তিকার এই অংশগুলি মূল থেকে সরাসরি অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি, মৌলভী ওবায়দুল্লাহ্ এল্ ওবায়দ-কৃত এই পুস্তিকার একটি ইংরেজী অনুবাদের সাহায্য নিতে হয়েছে। বাকি অংশ সবই মূল ফারসী থেকে সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে মূল বক্তব্য, বাক্‌ভঙ্গি ও সেকালের ফারসী ভাষায় ব্যবহৃত জটিল বাক্যগঠনরীতির সঙ্গে যথাসম্ভব সাযুজ্য রক্ষা ক'রে। তার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদের ভাষা জটিল ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেও আশা করি মূল বক্তব্যের অর্থবোধে পাঠকদের কোনো অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া আমার মনে হয়েছে যে বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য রক্ষা করে সহজ চলতি বাংলা ভাষায় এই পুস্তিকার অনুবাদ অন্তত আমার কলমে সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলায় যেমন তৎসম শব্দের ছড়াছড়ি এখন যা আমাদের কানে একটু অন্য রকম ঠেকে, ফারসী ভাষায় লিখিত এই পুস্তিকার মূলপাঠেও তেমনি অনেক আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আধুনিক ফারসী ভাষায় যে-সব শব্দের প্রচলন নেই। সেখানেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাকে আরবী অভিধান ও আরবীভাষাবিদ কোনো বন্ধুর শরণাপন্ন হতে হয়েছে। মূলপাঠে জটিল কোনো বাক্যের জট ছাড়াতেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৌলভী ওবায়দুল্লাহ্ এল্ ওবায়দে-কৃত ইংরেজী অনুবাদের সাহায্য নিয়েছি, তার পর যদিও অনুবাদ করেছি মূল ফারসী থেকেই। তাঁদের সবার কাছেই আমি ঋণী। মৌলভী ওবায়দুল্লার এল্ ওবায়দের সম্পূর্ণ মূলানুগ ইংরেজী অনুবাদ ফারসী ও ইংরেজী ভাভায় তাঁর যে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয় এখানে তার সপ্রশংস উল্লেখ না করে পারছি না।

কৃষ্ণনগর কলেজের ফারসী বিভাগের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম. এ., ডি. লিট্. এবং আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বদিয়ুর রহমান, এম. এ., অনুগ্রহ করে এই পুস্তিকার আরবী ভাষায় লিখিত ভূমিকাটির বাংলা অনুবাদে মূল্যবান কিছু পরামর্শ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। ফারসী অংশের বাংলা অনবাদেও ড. পাল তাঁর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ দিয়ে আমার অনুবাদকর্মে সহায়তা করেছেন। তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ যত্নসহকারে সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদটি আদ্যোপান্ত পড়ে দেখেছেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী আমার প্রাথমিক অনুবাদ অনেক জায়গায় পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়েছে। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই কলিকাতা মাদ্রাসার প্রক্তন সিনিয়ার অধ্যাপক ও জামিয়া ইসলামিয়া মদনিয়ার অধ্যক্ষ জোনাব মুহম্মদ তাহির সাহেবকে যিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে সম্পূর্ণ অনুবাদটি দেখে দিয়েছেন।

অনুবাদ : সুনীলবরণ রায়

বেদান্ত-সার *

রামমোহন রায়

একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে বিশ্বাসীদিগের নিকট নিবেদন—
ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের এবং হিন্দু-সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়েরও অধিকাংশ ব্যক্তিই, আজ পর্যন্ত তাঁহারা যে পৌত্তলিক-পূজার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, সেই পৌত্তলিকতাকে যুক্তিপ্রদর্শন-পূর্বক সমর্থন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই-বিষয়ে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা, তাঁহাদের আচরণ সমর্থন করিবার জন্য যুক্তি-পূর্ণ-বিচার-প্রদর্শনের পরিবর্তে, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের দোহাই দেওয়াই যথেষ্ট মনে করেন। এবং আমি একমাত্র নিত্য-সত্য ঈশ্বরের পূজার জন্য পৌত্তলিকতাকে পরিহার করিয়াছি বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছেন! সুতরাং, আমার নিজের এবং আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদিগের ধর্মবিশ্বাসের যাথার্থ্য-প্রতিপাদন-কল্পে কিছুকাল যাবৎ আমি আমাদের ধর্মশাস্ত্র-সমূহের যথার্থ অর্থটিতে আমার স্বদেশবাসীকে বিশ্বাস করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি ; এবং গতানুগতিক পথ পরিহার করিয়া আমার ভিন্নপথে চলিবার জন্য কতকগুলি অবিবেচক লোক আমার উপর যে অপযশ ও লাঞ্ছনা বর্ষণ করিতেছেন, আমি যে সেই-সকল লাঞ্ছনা-অপযশের ভাজন হইবার যোগ্য নই, তাহাও প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিতেছি।

হিন্দু যে বেদ-সমূহকে বিশ্বসৃষ্টির সহিত সমকালীন বলিয়া বিশ্বাস করেন, হিন্দুর সমগ্র তত্ত্বশাস্ত্র, ব্যাবহারিক-ধর্মশাস্ত্র এবং সাহিত্য— সমুদায়ই সেই বেদ-সমূহের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই বৈদিক গ্রন্থগুলি অতীব বৃহৎকায় এবং অতিশয় দুরূহ ও আলংকারিক বা রূপকাচ্ছন্ন রীতিতে লিখিত হওয়ায়— এবং তাহার ফলও সহজেই অনুমেয়— অনেক স্থলেই আপাত-বিভ্রম-জনক এবং পরস্পর-বিরোধী। দুই-সহস্র বৎসরেরও অধিক-কাল পূর্বে মহামতি ব্যাসদেব এই-সকল মৌলিক শাস্ত্র-সমূহ হইতে নিরন্তর যে বৈষম্য বা বুদ্ধি-ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল, তাহা চিন্তা করিয়া, অতিশয়-বিচারপূর্বক (উপাসনা-কাণ্ড, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে বিভক্ত) সমগ্র বেদগ্রন্থরাজির একখানি পরিপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত সার-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং বেদের মধ্যে যে-সকল স্থান আপাত-বিরুদ্ধার্থক ছিল, তাহাদেরও সামঞ্জস্যময় মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন। 'বেদ' এবং 'অন্ত'— এই দুইটি সংস্কৃত

* ইংরাজি ভূমিকার অনুবাদ বেদান্ত-সারের বাংলা সংস্করণে এই ভূমিকা নাই।

শব্দের সমবায়ে তিনি তাঁহার এই গ্রন্থের নামকরণ করেন বেদান্ত— অর্থাৎ সমগ্র বেদ-সমূহের মীমাংসা বা সন্দিগ্ধার্থ-নিরসন। আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থ (বেদান্ত) সমগ্র হিন্দু-জাতির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং বেদসমূহের অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিকীর্ণার্থের পরিবর্তে এই গ্রন্থখানিই তাহাদের সম-প্রমাণ রূপে আশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃত-ভাষারূপ অন্ধকারময় যবনিকার অন্তরালে ইহা লুক্কায়িত থাকায়, এবং কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকেই এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, এমন-কি এতাদৃশ পুস্তকের স্পর্শে, অধিকারী করিয়া রাখায়, এই বেদান্ত গ্রন্থ, যদিও ইহা নিরন্তর প্রমাণ-রূপে উদ্‌ধৃত হইয়া থাকে, তথাপি সাধারণের নিকট অল্পই পরিচিত; এবং বাস্তবিক অতিশয় অল্প-সংখ্যক হিন্দুরই আচরণ ইহার উপদেশের কথঞ্চিৎ অনুযায়ী!

আমার মত-সমর্থনের জন্য, আজ পর্যন্ত সাধারণের নিকট অপরিচিত এই বেদান্ত-গ্রন্থের, তথা ইহার সার-ভাগের, হিন্দি ও বাংলা অনুবাদ আমার সাধ্যানুসারে করিয়া, বিনামূল্যে আমার স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে যতদূর ব্যাপকভাবে বিতরণ করা আমার অবস্থার পক্ষে সম্ভব, তৎদূর বিতরণ করিয়াছি। বেদান্তের সংক্ষিপ্ত সার-ভাগের বর্তমান ইংরাজি অনুবাদের দ্বারা আমি আশা করি যে, আমি আমার ইয়োরোপীয় বন্ধুগণের নিকট প্রমাণ করিতে পারিব যে, কুসংস্কার-পূর্ণ যে-সমুদায় আচরণ বা অনুষ্ঠান আমাদের হিন্দুধর্মকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সহিত এই ধর্মের পবিত্র উপদেশাবলীর মর্মগত কোনো সম্পর্ক নাই।

আমি বহু ইয়োরোপীয় ব্যক্তির লেখায় এবং তাঁহাদের সহিত কথোপকথনকালে দেখিয়াছি যে, তাঁহারা হিন্দুর পৌত্তলিকতার রূপটিকে লঘু ও প্রচ্ছন্ন করিয়া এইরূপ উপদেশ-দানে অভিলাষী হন যে, পূজার সকল বস্তুই পূজকেরা সেই পরম-পুরুষের লাক্ষণিক প্রতিভূরূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন! যদি বিষয়টি বস্তুতই এইরূপ হইত, তাহা হইলে, বোধ হয় এই বিষয়ের তত্ত্বানুরূপণে আমি প্রবর্তিত হইতে পারিতাম; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, ইদানীন্তন কালের হিন্দুগণের এ-বিষয়ে এরূপ কোনো ধারণা নাই: পরন্তু আপন আপন অধিকার-ক্ষেত্রে পূর্ণ ও স্বাধীন বা স্বতন্ত্র-শক্তিবিশিষ্ট অসংখ্য দেব-দেবীর বাস্তব সত্তায় তাঁহারা দৃঢ়বিশ্বাসী; এবং তাঁহাদেরই—পরন্তু সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের নহে— তুষ্টি-বিধানের জন্য মন্দির-সমূহ নির্মিত এবং বিবিধ পূজোৎসবাদির অনুষ্ঠান সংঘটিত হইতেছে। যাহা হউক, এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং আমিও সর্বান্তঃকরণে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে চাহি যে, আমাদের (হিন্দুদিগের) পূজার প্রত্যেক অনুষ্ঠানটি এক অদ্বিতীয় সত্য দেবতার রূপকাবৃত বা লাক্ষণিক পূজা-পদ্ধতি হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই তথ্যটির বিস্মৃতি ঘটিয়াছে এবং অনেকের নিকট এই বিষয়ের উল্লেখ পর্যন্ত দাম্ভিকতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

আমি আশা করি, আমার এই-সকল উক্তি হইতে কাহারও এইরূপ ধারণা হইবে না যে, অন্যান্য ব্যক্তিগণের ধর্মবিশ্বাসের অপেক্ষা আমার ধর্মবিশ্বাসের প্রাধান্য বা অধিকশ্রেয়স্কতা স্থাপনে আমি অভিলাষী। এই বিষয়ের তর্কবিতর্কের মাত্রা যতগুণ বর্ধিতই হউক-না কেন, ইহার ফল চিরদিন অসন্তোষ জনকই থাকিবে ; কারণ, মানুষের যে বিচার শক্তি মানুষকে তাহার বিচার-গ্রাহ্য বিষয়ের নিঃসংশয়তায় উপনীত করাইয়া দেয়, তাহা তাহার বিচারশক্তির অতীত বিষয়ের সমস্যার সমাধানে কোনোরূপে ফলোৎপাদক হয় না। আমি শুধু এই কথাটিই বলিতে চাই যে, যদি অভ্রান্ত যুক্তি ও সাধারণ ব্যাবহারিক জ্ঞানের প্রেরণা একমাত্র-সর্বজ্ঞ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের শাস্তা, পাতা ও অনাদি পুরুষের বিশ্বাস উৎপাদন করে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে আমাদের বুদ্ধিবচনের অতীত সর্বশক্তিমান্ পরমসত্তা বলিয়াও জ্ঞান করিব ; এবং যদিও অশিক্ষিত-চিত্ত ব্যক্তিগণ, এবং এমন-কি কতিপয় বিজ্ঞ (পরন্তু এই একটি বিষয়ে সংস্কারান্ধ) ব্যক্তিও, নির্বিচারে, সর্বদা তাঁহাদের চক্ষু-গ্রাহ্য এবং তাঁহাদের স্পর্শাদির গম্যরূপে প্রতীয়মান যে-কোনো বস্তুকে উপাস্যরূপে নির্বাচিত করিয়া লন, তথাপি তাঁহাদের এইরূপ আচরণের অসংগতির মাত্রা কিয়ৎ-পরিমাণেও হ্রাস পায় না।

হিন্দুদিগের বিচিত্র পৌত্তলিক পূজাপ্রণালী অন্যান্য যে-কোনো পৌত্তলিক-জাতির পূজাপদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতরভাবে সমাজের যোগসূত্র-নাশক যে-সকল অসুবিধাজনক ও বরং অনিষ্টকর অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করিয়াছে, সেই-সকল বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে ও আমার স্বদেশবাসীদিগের প্রতি আমার কারুণ্যানুভূতিতে আমি তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের ভ্রান্তিস্বপ্ন হইতে জাগাইবার জন্য ও তাঁহাদিগের শাস্ত্রের সহিত তাঁহাদিগকে পরিচিত করাইয়া যাহাতে তাঁহারা অকপট ভক্তির সহিত বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়ামক প্রভুর অদ্বিতীয়ত্ব ও সর্বব্যাপিতার বিষয়ে ধ্যান করিতে পারেন, তাহার জন্য যতপ্রকার চেষ্টাবলম্বন আমার পক্ষে সম্ভবপর, তাহা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার দ্বারা প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে যাইয়া আমি আমার প্রবল-কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পার্থিব সুখ-সুবিধার জন্য বর্তমান সামাজিক ধর্মপ্রথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কতিপয় আত্মীয়স্বজনেরও অনুযোগ ও তিরস্কারের ভাজন হইয়াছি। কিন্তু এই সকল (অনুযোগ, অভিযোগ ও তিরস্কার) যতই পুঞ্জীভূত হউক-না কেন, তাহা আমি এই বিশ্বাসে সহ্য করিতে পারি যে এমন একদিন আসিবে যে-দিন আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা-সমূহ নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচিত হইবে, এবং, বোধ হয়, কৃতজ্ঞতার সহিত অনুমোদিত হইবে। সে যাহাই হউক— মানুষে যাহাই বলুক-না কেন, আমি এই সান্ত্বনা হইতে কখনও বঞ্চিত হইব না যে,—যে পরম-পুরুষ গোপনে গোপনে সমস্তই অবলোকন করেন এবং

প্রকাশ্যে পুরস্কার দেন, তিনি আমার অন্তরের অভিপ্রায়-সমূহ অনুমোদন করিয়াছেন।

স্বর্গত অধ্যাপক দেবকুমার দত্ত-কর্তৃক অনূদিত এবং তাঁর রামমোহন স্মৃতি' নামক পুস্তিকা থেকে সংকলিত।

শঙ্করাচার্যের সংস্কৃতভে রচিত 'বেদান্ত-সূত্র' গ্রন্থটি রামমোহন রায় প্রথম বাংলা হরফে প্রকাশ করেন। তিনি শুধু বইটির অনুবাদই করেন নাই সকলের অধিগম্য ও সহজ-বোধ্য করিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে 'বেদান্তসার' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। সেটিকে ইংরাজি, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া সর্বসাধারণের কাছে রামমোহনই বেদান্তের বাণী পৌঁছাইয়া দেন।

ব্রাহ্মসমাজের ন্যাসপত্র

The Trust Deed of the Brahmo Somaj

[ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল ১২৩৫ বঙ্গাব্দের ৬ ভাদ্র তারিখে (২০ অগাস্ট ১৮২৮) ; নিজস্ব ভবনে এই প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত হয় ১১ মাঘ ১২৩৬ বঙ্গাব্দ বা ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। শেষোক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই এই বিখ্যাত ন্যাসপত্রটি রচিত হয়। বাহ্য দৃষ্টিতে এটিকে আদালতী ভাষায় প্রণীত একটি দলিল বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে রামমোহন রায়ের সর্ববিধ সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত বিশ্বজনীন অধ্যাত্মবোধের অতি সুষ্ঠু ও সুন্দর প্রতিফলন ঘটেছে। উদার অসাম্প্রদায়িক উপাসনার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তিনটি প্রশ্নের যে সমাধানে বহু অন্বেষণ ও অনুশীলনের পর তিনি উপনীত হয়েছিলেন, এই ন্যাসপত্রপাঠে তা অবগত হওয়া যায়। প্রথম প্রশ্ন, উপাস্য কে? তার উত্তরে এখানে বলা হয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা, অনাদি, অনন্ত, অসীম, অগম্য, অপরিবর্তনীয়, এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই মাত্র উপাস্য। কোনো সাম্প্রদায়িক নামে এই মন্দিরে তাঁর উপাসনা হতে পারবে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন— উপাসক কে? এই প্রশ্নের উত্তরে ন্যাসপত্র বলছেন, এই মন্দিরের দ্বার জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত; যিনিই ভদ্র ও সংযত ভাবে এবং সশ্রদ্ধ চিত্তে উপাসনায় যোগদানেচ্ছু হবেন, তিনি সর্বদা এ মন্দিরের উপাসনানুষ্ঠানে স্বাগত। তৃতীয় প্রশ্ন— এই অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উপাসনার প্রণালী কি? ন্যাসপত্রানুসারে এর উত্তর: কোনো প্রকার সৃষ্ট বস্তু, অর্থাৎ ছবি, প্রতিমূর্তি বা খোদিত দেবমূর্তি প্রভৃতি এখানকার উপাসনায় ব্যবহার করা যাবে না। জগতের স্রষ্টা ও পালন কর্তা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা ও আরাধনাই এই উপাসনার একমাত্র বিষয়। যার দ্বারা মানবহৃদয়ের প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতা, সেবা প্রভৃতি বৃত্তির বিকাশ হয় এবং সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হয় এখানে তার উপযোগী প্রার্থনা, উপদেশ, বক্তৃতা ও সংগীত অনুষ্ঠিত হবে। অপর পক্ষে এখানে কোনো ধর্মশাস্ত্র, ধর্মগুরু বা কোনো সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট উপাস্য দেবতা বা বস্তুর প্রতি কোনো প্রকার অবজ্ঞা, ঘৃণা বা নিন্দা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। 'তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদ্দীন'-এ আমরা রামমোহনকে দেখি পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী রূপে। এ ছিল তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার প্রথম স্তর। তাঁর অন্বেষণ সেখানে থেমে যায় নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দীর্ঘ পথপরিক্রমার অন্তে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন অধ্যাত্মচেতনার গভীর ও পূর্ণাঙ্গ রূপ।

এখানে যুক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছে শ্রদ্ধা, মনীষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রজ্ঞা। এই ন্যাসপত্রই এক অর্থে তাঁর বিশ্বজনীন ধর্মচেতনার সার্থকতম প্রকাশ। এই অর্থেই 'Brother, our religion is universal' এ বাক্য উচ্চারণের কালে তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠত। —দিলীপকুমার বিশ্বাস]

ন্যা স প ত্র

দাতা— দ্বারকানাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকো, শহর কলিকাতা, জমিদার ; কালীনাথ রায়, বরানগর, জেলা হুবেলী, পূর্বোক্ত কলিকাতার উপকণ্ঠ, জমিদার ; প্রসন্নকুমার ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা, পূর্বোক্ত কলিকাতা, জমিদার ; রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, শিমলা, পূর্বোক্ত কলিকাতা, পণ্ডিত : এবং রামমোহন রায়, মানিকতলা, পূর্বোক্ত কলিকাতা, জমিদার।

গ্রহীতা— বৈকুণ্ঠনাথ রায়, বরানগর, জেলা হুবেলী, পূর্বোক্ত কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠ, জমিদার ; রাধাপ্রসাদ রায়, মানিকতলা, পূর্বোক্ত কলিকাতা, জমিদার ; এবং রমানাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকো, পূর্বোক্ত কলিকাতা, বেনিয়ান (এতৎপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির জন্য নামাঙ্কিত ও নিযুক্ত ট্রস্টীগণ)।

মূল্য—দশ সিক্কা টাকা

সম্পত্তির পরিচয়—চিৎপুর রোড, সুতানটিস্থিত কমবেশী চার কাঠা দুই ছটাক জমি মায় তদুপরিস্থিত ভদ্রাসন, যাহার চৌহদ্দি নিম্নলিখিতরূপ :—

উত্তর—ফুলুরী রতনের গৃহ ও জমি।

দক্ষিণ—সাবেক মালিক, অধুনা মৃত, রামকৃষ্ণ করের গৃহ ও জমি।

পূর্ব—জনৈকা রাধামণি ভামনীর বাটি ও জমি।

পশ্চিম—সাধারণভাবে চিৎপুর রোড নামে অভিহিত আম রাস্তা।

মূল উদ্দেশ্য— উক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায় এবং রমানাথ ঠাকুর, অথবা তাঁহাদের উত্তরজীবী বা উত্তরজীবীগণ, কিম্বা এইরূপ উত্তরজীবীগণের উত্তরজীবীগণ, কিম্বা তাঁহাদের অথবা তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ সময়ে সময়ে এবং এতৎপর চিরকাল, সকলশ্রেণী ও প্রকার নির্বিশেষে, যে-সকল ব্যক্তি সুশৃঙ্খল, সংযত, ধার্মিক এবং ভক্তিপূর্ণভাবে আচরণ করবেন,— কোনো বিশেষ সত্তা বা সত্তাগণ সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য কোনও নাম, পদ বা উপাধি বিশেষরূপে ব্যবহার ও প্রয়োগ করিলে তদ্ব্যতিরেকে, তাঁহারা যাহাতে বিশ্বের স্রষ্টা ও সংরক্ষক সেই "অনন্ত অজ্ঞের" এবং "অব্যয় সত্তার" উপাসনা ও আরাধনা করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদের সাধারণ সভাস্থল হিসাবে উক্ত ভদ্রাসন, ভবন, জমি, বসতবাড়ি, উত্তরাধিকার এবং গৃহ মায় আওলাৎ অধিকার, ভোগ, প্রয়োগ এবং ব্যবহার করিবার জন্য অনুমতি দিবেন

এবং তাহা গ্রাহ্য করিবেন ; এবং উক্ত ভদ্রাসন, ভবন, জমি, বসতবাড়ি, উত্তরাধিকার এবং গৃহের মধ্যে কোনো খোদাইমূর্তি, প্রস্তরমূর্তি অথবা ভাস্কর্যকার্য, খোদাইকৃত বস্তু, রঙিন চিত্র, চিত্র, প্রতিকৃতি অথবা কোনো জিনিসের প্রতিমূর্তি রাখা যাইবে না এবং সেখানে কোনো বলিদান, কোনো নৈবেদ্যাদি উপচার নিবেদন করা চলিবে না এবং উক্ত ভদ্রাসন, ভবন, জমি, বসতবাড়ি, উত্তরাধিকার এবং গৃহের মধ্যে কোনো পশু বা জীবিত প্রাণী ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অথবা আহারের জন্য হত্যা করা চলিবে না এবং তথায় কোনোপ্রকার আহার বা পান (আকস্মিক কারণে জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজন ব্যতীত) কোনো ভোজনোৎসব বা হট্টগোল চলিবে না এবং উক্ত উপাসনা এবং আরাধনা চালাইবার নিমিত্ত উক্ত ভদ্রাসন বা ভবনে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীদ্বারা পূজনীয়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, আছে অথবা এতৎপর হইবে— এইরূপ কোনো জড় বা চেতন বস্তুর নিন্দা অথবা তাহার সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞাপূর্ণ কোনো উক্তি বা পরোক্ষ উল্লেখ— ধর্মোপদেশ, প্রার্থনা বা স্তোত্র বা অন্য পূজাপদ্ধতির মধ্যে করা চলিবে না ; এবং কেবলমাত্র বিশ্বের স্রষ্টা ও সংরক্ষকের ধ্যানের বিকাশসাধনের প্রবৃত্তিযুক্ত এবং পরহিত, নৈতিকতা, ভক্তি, সদাশয়তা, নৈতিকসদ্‌গুণের বিকাশসাধনের এবং সর্বপ্রকার ধর্মীয় মত ও পথের অনুযায়ী মনুষ্যগণের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত উপদেশ, ধর্মোপদেশ, আলোচনা, প্রার্থনা বা স্তোত্রই এইরূপ উপাসনায় প্রদত্ত, কৃত ও ব্যবহৃত হইবে।

কৃত—৮ জানুয়ারি, ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ণ ন্যাসপত্রটির একটি বাংলা অনুবাদ কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীমানসনাথ রায় করাইয়া দিয়াছিলেন। সেটি হারাইয়া যাওয়ায় উক্ত হাইকোর্টের অ্যাসিস্টেন্ট রেজিস্ট্রার শ্রীসুকুমার দত্ত মহাশয়-কর্তৃক অনূদিত ন্যাসপত্রটির গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ এখানে প্রকাশিত হইল।

রামমোহন রায়ের আত্মজীবনীর রূপরেখা

'আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। স্মরণাতীত কাল থেকে আমার ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের কুলপ্রথা অনুযায়ী ধর্মীয় কর্তব্য পালন করেছেন। প্রায় দেড়শো বছর আগে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বিষয় চিন্তায় ও বিষয় আশয় বৃদ্ধিতে মন দিলেন। তাঁর পরবর্তীরা সেই ধারাই অনুসরণ করে চললেন। রাজপুরুষদের ভাগ্যে যা ঘটে, তাঁদের ভাগ্যেও তাই ঘটল। তাঁরা হলেন কখনো উচ্চ সম্মানের অধিকারী, কখনো সমাজচ্যুত, কখনো ধনী, কখনো দরিদ্র, কখনো চরম সাফল্য, কখনো চরম নৈরাশ্য। কিন্তু আমার মাতুল বংশ চিরদিনই ছিলেন যাজক বৃত্তিতে নিযুক্ত। আজও পর্যন্ত তাঁরা ধর্মানুশাসিত নিষ্ঠাবান জীবন যাপন করে এসেছেন। তাঁদের কাছে উচ্চাভিলাষের উত্তেজনা ও পার্থিব বৈভবের বেশি আকর্ষণীয় ছিল প্রশান্ত জীবনচর্যা।

'আমার পিতৃবংশের রীতি অনুযায়ী এবং পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী আমি ফার্সী ও আরবী ভাষা অধ্যয়ন করলাম। মুসলিম বাদশাদের দরবারের সঙ্গে যাঁরাই যুক্ত হতে চান, তাঁদের পক্ষে এই দুটি ভাষা আয়ত্ত করা ছিল অপরিহার্য। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মাতুল বংশের রীতি অনুসারে সংস্কৃত অধ্যয়ন করলাম। তাতে আমি পরিচিত হলাম হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম ও আইনের ধারার সঙ্গে।

'আমার বয়স যখন ষোলো বছর, তখন আমি হিন্দুদের পৌত্তলিকতার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে একটি প্রবন্ধ রচনা করলাম। আমার নিজের বিচারবুদ্ধি এবং এই প্রবন্ধ আমার ও আমার নিকটতম পরিজনদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করল। আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। হিন্দুস্তানের অভ্যন্তরে আমি অনেক জায়গায় ঘুরলাম। কখনো কখনো দেশের সীমা ছাড়িয়ে গেলাম। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠায় আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ছিল। আমার বয়স যখন কুড়ি বছর, তখন আমার পিতা আমাকে ডেকে নিলেন এবং আমাকে তাঁর অনুরাগভাজন করলেন। তখন থেকে ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে আমার সংস্পর্শ শুরু হল। অল্পকালের মধ্যেই আমি তাঁদের আইন কানুন ও সরকারী রীতি নীতি মোটামুটি আয়ত্ত করলাম। আমি দেখলাম, তাঁরা সাধারণত বেশি বুদ্ধিমান। তাঁদের আচরণে স্থৈর্য বেশি। তাঁদের সম্পর্কে আমি আমার প্রতিকূল ধারণা পরিহার করলাম। তাঁদের প্রতি আমি আকৃষ্ট হলাম। আমি অনুভব করলাম, তাঁদের শাসন বিদেশী শাসন হলেও তাতে ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি সুনিশ্চিত হবে, দ্রুততর হবে। আমি অনেক ইউরোপীয়ান রাজপুরুষের আস্থা অর্জন করলাম।

'এদিকে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আমার তর্ক-বিতর্ক বেড়েই চলল। বিধবাদের জীবন্ত দগ্ধ করার রীতি এবং অন্যান্য অরুচিকর আচরণের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আমার সম্পর্কে তাদের বৈরীভাব বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমার পরিবারের প্রতি তাঁদের প্রভাবের দরুন আমি আবার আমার পিতার বিরাগভাজন হয়ে পড়লাম।

'আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি আরো উদ্যমের সঙ্গে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করতে লাগলাম। ভারতে এখন যে মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে আমি তাদের ভুল ত্রুটি দেখিয়ে দেশী ও বিদেশী ভাষায় অনেক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রকাশ করতে লাগলাম। এ-সবের ফলে আমার বিরুদ্ধে এমন একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি হল যে, দু-তিন জন স্কচ্ বন্ধু ছাড়া সবাই আমাকে পরিত্যাগ করল। এই দু-তিন জনের কাছে এবং তাঁরা যে-দেশের মানুষ সেই দেশের কাছে, আমি চিরকৃতজ্ঞ।

'যাবতীয় বিতর্কে আমার যুক্তি কখনোই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকৃতির বিরুদ্ধে। আমি এটাই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, তাঁদের পৌত্তলিকতা তাঁদের পূর্বপুরুষদের আচরিত ধর্মের বিরোধী। তাঁরা যে-সব প্রাচীন গ্রন্থ ও শাস্ত্রাদির কথা উল্লেখ করে থাকেন, সেগুলি তাঁদের বিরোধী। আমার অনেক উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আত্মীয় ও অনাত্মীয় ব্যক্তি একই ভাবে ভাবিত হতে লাগলেন আমার মতামতের বিরোধিতা ও বৈরিতা সত্ত্বেও।

'আমি ইউরোপ পরিদর্শনের জন্য এবং সেখানকার রীতি-নীতি আচার-আচরণ ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তীব্র ইচ্ছা বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু যতদিন না আমার সুহৃদবর্গের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, ততদিন আমার ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত থাকলাম। শেষ পর্যন্ত সুযোগ এলো। ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ নিয়ে আলোচনা হবার কথা। এর ওপর দীর্ঘদিন নির্ভর করবে ভারতে পরবর্তী সরকারের স্বরূপ এবং দেশীয়দের প্রতি তাঁদের আচরণ। সতীদাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইনের বিরুদ্ধে সপারিষদ রাজার কাছে একটি আপীল করা হয়েছে। সেই আপীলের শুনানী হবে প্রিভিকাউন্সিলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির সম্রাটের অধিকারে যে-সব হস্তক্ষেপ করছিল, সেগুলি ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করার জন্য সম্রাট আমাকে মনোনীত করলেন। ১৮৩০ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমি যাত্রা করলাম, ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌছলাম ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে।'

অনুবাদ : নির্মল সেনগুপ্ত

এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি পাওয়া যায় কলকাতায় মিঃ গর্ডন নামক রামমোহনের এক বন্ধুকে লেখা পত্রে। এই পত্রের সূচনায় রামমোহন লিখছেন, "আমার প্রিয়

বন্ধু, আমি আমার জীবনের বর্ণনা করি এই ইচ্ছা আপনি প্রায়শই প্রকাশ করেছেন। সেই অনুসারে আমি আপনাকে এই অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা জানালাম।'' এর পরই উল্লিখিত বক্তব্যের সূচনা। সমাপ্তিতে রামমোহন লিখছেন, ''এই রূপরেখা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার দরুন আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন আশা করি। আরো খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে যাবার মতো অবসর আমার নেই।''

মিস্ মেরী কার্পেন্টার তার *The Last Days in England of the Raja Rammohun Roy* (১৮৬৬) গ্রন্থে জানিয়েছেন, রামমোহন লন্ডন থেকে ফ্রান্সে যাবার আগে এই পত্র লেখেন। সেটি প্রথম প্রকাশিত হয় লন্ডনের *Athenoeum* পত্রিকায়, তারপর *Literary Gazette*-এ। তারপর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ইংরাজি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু মিস্ সোফিয়া ডবসন কলেট তাঁর *Life and Letters of Raja Rammohun Roy* গ্রন্থে এই পত্রটিকে জাল বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি এটিকে জাল মনে করার কোনো কারণ দেখান নি। *Athenoeum* পত্রিকায় পত্রটি প্রকাশের তারিখ ৫ অক্টোবর ১৮৩৩।

ম্যাক্স মুলার তাঁর *Biographical Essays* (১৮৮৪) গ্রন্থে লিখেছেন, *Athenoeum* পত্রিকায় পত্রটি প্রকাশ করেন মি. স্ট্যানফোর্ড আর্নট। আর্নট ইংল্যান্ডে রাজা রামমোহনের সেক্রেটারিরূপে কাজ করেন। রাজা নিজের হাতে এই পত্রটি লিখেছিলেন কিংবা ডিক্টেশন দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু এটিকে সম্পূর্ণ বানানো বললে খুব বেশি বলা হবে। —অনুবাদক

রামমোহন রায়ের গ্রন্থসূচী

সংক্ষিপ্ত

গৌতম নিয়োগী -কর্তৃক সংকলিত

ক. আরবী ও ফারসী

১ তুহফাৎ-উল-মুওয়াহিদ্দীন, মুর্শিদাবাদ, ১৮০৩-৪
মূলে লেখা ফারসীতে, ভূমিকা আরবীতে।

২ মানজারাতুল আদিয়ান, মুর্শিদাবাদ, ১৮০ ?

খ. বাংলা এবং সংস্কৃত

১ বেদান্ত গ্রন্থ. কলিকাতা, ১৮১৫
২ বেদান্তসার, কলিকাতা, ১৮১৫
৩ তলবকার উপনিষৎ, কলিকাতা, ২৯ জুন ১৮১৬
৪ ঈশোপনিষৎ, কলিকাতা, ১৩ জুলাই ১৮১৬
৫ উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, কলিকাতা, ১৮১৬-১৭
৬ ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার, কলিকাতা, ১৮১৭
৭ কঠোপনিষৎ, কলিকাতা, অগাস্ট ১৮১৭
৮ মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, কলিকাতা, অক্টোবর, ১৮১৭
৯ গোস্বামীর সহিত বিচার, কলিকাতা, জুন ১৮১৮
১০ সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সম্বাদ, কলিকাতা, ১৮১৮
১১ গায়ত্রীর অর্থ, কলিকাতা, ১৮১৮
১২ মুণ্ডকোপনিষৎ, কলিকাতা, ১৮১৯
১৩ সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক দ্বিতীয় সম্বাদ, কলিকাতা, ১৮১৯
১৪ আত্মানাত্মবিবেক, কলিকাতা, ১৮১৯
১৫ কবিতাকারের সহিত বিচার, কলিকাতা, ১৮২০
১৬ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, কলিকাতা, ১৮১৬
১৭ ব্রাহ্মণ-সেবধি (ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সম্বাদ), কলিকাতা, ১৮২১
১৮ চারি প্রশ্নের উত্তর, কলিকাতা, মে ১৮২২
১৯ প্রার্থনাপত্র, কলিকাতা, মার্চ ১৮২৩
২০ পাদ্রী ও শিষ্য সম্বাদ, কলিকাতা, ১৮২৩

২১ গুরুপাদুকা, কলিকাতা, ১২৩
২২ পথ্যপ্রদান, কলিকাতা, ১৮২৩
২৩ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, কলিকাতা, ১৮২৬
২৪ কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার, কলিকাতা, ১৮২৬
২৫ বজ্রসূচী, কলিকাতা, ১৮২৭
২৬ গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্, কলিকাতা, ১৮২৭
২৭ ব্রহ্মোপাসনা, কলিকাতা, ১৮২৮
২৮ ব্রহ্মসংগীত, কলিকাতা, ১৮২৮
২৯ অনুষ্ঠান, কলিকাতা, ১৮২৯
৩০ সহমরণ বিষয়, কলিকাতা, ১৮২৯
৩১ ক্ষুদ্রপত্রী, কলিকাতা, ১৮২৯
৩২ গৌড়ীয় ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১৮৩৩

গ. হিন্দি

১ বেদান্ত গ্রন্থ, কলিকাতা, ১৮১৫ (?)
২ বেদান্তসার, কলিকাতা, ১৮১৫ (?)
৩ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, কলিকাতা, ১৮২০

ঘ. ইংরেজি

1. Translation of An Abridgement of the Vedanta or the Resolution of all the Vedas, Calcutta-1816.
2. Translation of the Cena [Kena] Upanishad, Calcutta,1816.
3. Translation of the Ishopanishad, Calcutta,1816.
4. A Defence of Hindoo Theism, Calcutta,1817.
5. A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas in reply to An Apology for the Present System of Hindoo Worship, Calcutta, 1817.
6. Counter-Petition of the Hindoo inhabitants of Calcutta against Suttee Calcutta. August 1818.
7. Translation of a Conference, between an Advocate for and an opponent of, the Practice of Burning Widows Alive from the original Bengali, Calcutta, November 1818.

8. Translation of the Moonduk Opunishud of the Uthurvuved, Calcutta,1819.
9. Translation of the Kuth-Opunichud of the Ujoor-Ved, Calcutta,1819.
10. An Apology for the Pursuit of the Final Beautitude, Independently of Brahmunical Observances, Calcutta, 1820.
11. A Second Conference between an Advocate for, and an opponent of, the Practice of Burning Widows Alive, Calcutta,February 26, 1820.
12. The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness, Calcutta,1820.
13. An Appeal to the Christian Public in Defence of the 'Precepts of Jesus,' Calcutta, 1820.
14. Second Appeal to the Christian Public in Defence of the 'Precepts of Jesus', Calcutta,1821.
15. The Brahmunical Magazine, or the Missonary and the Brahman being a Vindication of the Hindoo religion against the attack of Christian Missionaries, Nos. I, II, III, Calcutta,1821.
16. Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to Hindoo Law of Inheritance, Calcutta,1822.
17. The Brahmunical Magazine, or the Missionary and the Brahmun, No IV, Calcutta,1823.
18. Final Appeal to the Christian Public in Defence of the 'Precepts of Jesus', Calcutta,January 30, 1823.
19. Humble Suggestions to his Countrymen who believe in one true God, Calcutta,1823.
20. A Vindication of the Incarnation of the Deity as the Common Basis of Hindooism and Christianity against the schismatic Attacks of R. Tyler, Esq. M. D., Published under the pseudonym Ram Das, Calcutta,1823.
21. A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarian,

Part I, Calcutta, May 9,1823; Part II, May 12, 1823.

22. Petitions Against the Press Regulations.
    A) Memorial to the Supreme Court, Calcutta, March 1823.
    B) Appeal to the King-in-Council, Calcutta, 1823.
23. A Dialogue between a Missionary and Three Christian Converts, Calcutta, May 12, 1823.
24. A Letter to Lord Armherst on Western Education, dated, Calcutta, the 11th of December, 1823.
25. A Letter to Rev. Henry Ware on the Prospects of Christianity in India, Calcutta,1824.
26. Translation of a Sunscrit Tract on different modes of Worship, Calcutta,1825.
27. Bengali Grammer in English Language, Calcutta,1826.
28. A Translation into English of a Sanskrit Tract, inculcating divine worship; esteemed by those who believe in the revelation of the Veds, as most appropriate to the nature of the Supreme Being, Calcutta,1827.
29. Answer of a Hindoo to the Question, "Why do you frequent a Unitarian Place of Worship instead of the numerously attended Established Churches",Calcutta,1828.
30. Symbol of the Trinity, Calcutta,1828 (?).
31. The Universal Religion: Religious Instructions founded on Sacred Authorities, Calcutta,1829.
32. The Petition to the Padishah [Akbar II] of Delhi, to King George IV of England, February, 1829.
33. The Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands, 1829.
34. Address to Lord William Bentinck, Governor General of India upon the passing of the Act for the Abolition of Suttee, 1830.
35. Essays on the rights of Hindoos over Ancestral Property, according to the Law of Bengal, 1830.
36. Letters on Hindoo Law of Inheritance, 1830.

37. Abstract of the Arguments regarding the Burning of Widows, considered as a religious rite, Calcutta, 1830.
38. Counter-Petition to the House of Commons to the Memorial of the Advocates of the Suttee, 1830.
39. On the Possibility, Practicability and Expendiency of Substituting the Bengali Language for the English, 1830.
40. Hindu Authorities in favour of Slaying the Cow and eating its flesh, (Unpublished)
41. Trust-Deed of the Brahmo Somaj, 1830.
42. Exposition of the Practical operation of the Judicial and Revenue Systems in India etc. as submitted in Evidence to the Authorities in England Elucidated by a Map, London, 1832.

ঙ. রচনাবলী : বাংলা

১ রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম বাংলা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাজার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুরাগী, হুগলী জেলার তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় নি তবে উল্লেখ পাওয়া গেছে।

২ রামমোহন রায় প্রণীত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে নির্বাচিত রচনাবলী। কলকাতার তত্ত্ববোধিনী সভা-কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৪৩-৪৪।

৩ রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী
সম্পাদনা : রাজনারায়ণ বসু এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা ১৮৮০।

৪ রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলী
বাহাদুরগঞ্জের পাণিনি অফিস কর্তৃক প্রকাশিত, এলাহাবাদ, ১৯০৫।

৫ রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী
বসুমতী কার্যালয় হইতে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯১১ ; এবং বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী ১-১২১ পৃষ্ঠা।

৬ রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড)
ব্রাহ্ম সমাজ শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষে প্রকাশ করেছিলেন হেমচন্দ্র সরকার, কলিকাতা, ১৯২৮।

৭ রামমোহন গ্রন্থাবলী

সম্পাদনা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সাত খণ্ডে প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৪৪-৫২।

৮ রামমোহন রচনাবলী

এ ছাড়া 'ব্রহ্মোপাসনাবিধি' শীর্ষক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা থেকে, যার মধ্যে রামমোহন রায়ের কয়েকটি ধর্মবিষয়ক পুস্তিকা সংগৃহীত।